KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮বি, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী
Title : পরিচয় (PARICHAYA)	Size : 6" x ৭"
Vol. & Number : 13/1 (১৩শ খণ্ড) 13/2 13/3 13/4 13/5 13/6	Year of Publication : শ্রাবণ ১৩৫০ ভাদ্র ১৩৫০ আশ্বিন ১৩৫০ কার্তিক ১৩৫০ অগ্রহায়ণ ১৩৫০ পৌষ ১৩৫০ Condition : Brittle / Good ✓
Editor : হিরণ কুমার সান্যাল, গোপাল হালদার	Remarks : Title Page missing

C.D. Roll No. : KLMLGK

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

১৩শ বর্ষ ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৫০

পরিচয়

উপনিষদে জড়তত্ত্ব

দ্বাদশ অধ্যায়

(৩)

দেহ-সৃষ্টি

গতবারের 'পরিচয়ে' আমরা দেখিয়াছি যে, প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মাকে যখন মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক—এই পঞ্চ-লোকের সহিতই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় এবং ঐ পঞ্চলোকের মধ্যে দেবলোকের যখন দুইটি স্তর—রূপস্তর ও অরূপস্তর—তখন প্রত্যগাত্মাকে প্রত্যেক ভূমিকার উপযোগী বাহন—উপনিষদে যাহাকে 'কোশ' বলে—রচনা করিতে হয়—অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ, মনোময় কোশ, বিজ্ঞানময় কোশ, আনন্দময় কোশ ও হিরণ্ময় কোশ। অতএব লোকের দিক হইতে দেখিলে ঐ ছয়টি কোশ অত্যাবশ্যক ও অবশ্যংভাবী। এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মার অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জকে ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত করিবার জন্যও কি ঐ কোশষট্‌কের প্রয়োজন? অর্থাৎ, শক্তির বিকাশের দিক দিয়া দেখিলেও কি ছয়টি কোশের উপযোগিতা ও অবশ্যংভাবিতা অনিবার্য হয়? বিষয়টা একটু বুঝিবার চেষ্টা করি।

আমরা জানিয়াছি প্রত্যগাত্মা চিদাকাশের চিন্মাত্র—মমৈবাংশঃ—Divine fragment—ব্রহ্ম যখন সচ্চিদানন্দ, তখন ব্রহ্মখণ্ড প্রত্যগাত্মাও সচ্চিদানন্দ।

ব্রহ্মৈবাহং সচ্চিদানন্দরূপম্—সর্বসার

সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী, ৩।২৮

সেইজন্য থিয়সফিতে প্রত্যগাত্মাকে 'Triune monad' বা ত্রেধাত্মা বলা হয়।

This divine spirit (monad)—a ray from the logos, has the triple nature of the logos himself—Dr. Annie Besant's Ancient Wisdom.

ত্রিভুজের কেন্দ্রস্থলে বিন্দু পাতন দ্বারা ঐ Triune monadএর চিত্র প্রদর্শিত হয়ঃ—

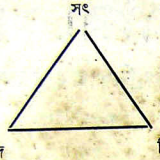

ঐ প্রপঞ্চাতীত প্রত্যগাত্মা—যিনি সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ (উপনিষদ্).—যখন প্রপঞ্চের মধ্যে প্রবিষ্ট হন, অর্থাৎ, যখন transcendence ছাড়িয়া immanent হন, তখন সচ্চিদানন্দরূপী তাঁহার সৎ-ভাব সন্ধিনী-শক্তি-রূপে, চিৎ-ভাব সম্বিৎ-শক্তিরূপে, এবং আনন্দ-ভাব হ্লাদিনী-শক্তিরূপে স্ফুরিত হয়। এই তিন শক্তির খৃষ্টানি নাম 'Life', 'Light' ও 'Love'—থিয়সফিতে উহাদিগকে 'Power', 'Wisdom' ও 'Bliss' বলে—এদেশে ইহাদের প্রচলিত নাম 'প্রতাপ', 'প্রজ্ঞা' ও 'প্রেম'।

স্ফুলিঙ্গে যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি অব্যক্ত (latent) থাকে, প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মাতেও ঐ সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি, যাহা পরমাত্মায় সম্পূর্ণ বিস্ফুর্জিত—ঐ শক্তি-ত্রয় অব্যক্ত থাকে। সেইজন্য বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ—ব্রঃ সূ, ২।১।২২
জীবাৎ অধিকং ব্রহ্ম—শঙ্কর

ভিন্ন নহেন, অধিক; অর্থাৎ, পরমাত্মায় যে প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মায় তাহা বীজভাবে স্থিত। ঐ বীজকে বৃক্ষে পরিণত করিবার জন্য, ঐ অব্যক্ত সম্ভাবনাকে সুব্যক্ত করিবার জন্য, ঐ স্ফুলিঙ্গকে অগ্নিতে সন্ধুক্ষিত করিবার জন্যই জীব-বীজকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বপন করা হয়। ইহাই প্রত্যগাত্মার প্রপঞ্চে প্রবেশের সার্থকতা। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

মমযোনির্মহদ্-ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—গীতা, ১৪।৩

বাইবেলের ভাষায়—

He is sown in weakness in order to be raised in power.

ঐ বীজই—প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মাই—ঋগ্‌বেদের 'প্রত্নরেতঃ' (ancient seed)—মন্থর 'তাসু বীজম্ অবাকিরৎ'—ভাগবতের 'বীর্যমাধত বীর্যবান্'। এই যে ক্রমাভিব্যক্তি—অব্যক্ত শক্তির ব্যক্তীভবন, ক্রমবিকাশ—ইহারই নাম Evolution. *

প্রত্যগাত্মার প্রপঞ্চে অবতরণের প্রকার ও প্রণালী কি? এ সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় খণ্ডে, জীবতত্ত্বের চতুর্থ অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করিব। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রপঞ্চে প্রবেশ জন্য প্রত্যগাত্মার অভ্যন্তর হইতে একটি কিরণ বা 'Ray' ঐ প্রপঞ্চে বিস্ফুরিত হয়—The Monad sends down a ray into the higher worlds। ঐ উচ্চতর লোক (higher worlds) আমাদের উল্লিখিত ব্রহ্মলোক, প্রজাপতিলোক, ও অরূপ-ভূমিক দেবলোক। প্রত্যগাত্মার এই কিরণই জীবাত্মা—পাশ্চাত্য দর্শনের 'Ego', বেদান্তের 'চিদাভাস'।

জীবাত্মা যখন প্রত্যগাত্মার আভাস, তখন প্রত্যগাত্মার ঐ তিন শক্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—জীবাত্মার অভ্যন্তরেও যে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য।

---

* The evolution of man as man consists in the gradual manifestation of these three aspects—their development from latency into activity. —Dr. Besant.

অর্থাৎ, 'All the powers and capacities lie latent within, pre-existent —awaiting the right conditions for their manifestation.'

বস্তুতঃ একটু লক্ষ্য করিলেই ধরা যায়, জীবাত্মার ঐ সন্ধিনীশক্তি প্রতাপ (Power)-রূপে, ঐ সম্বিৎশক্তি প্রজ্ঞা (Wisdom)-রূপে এবং ঐ হ্লাদিনী শক্তি প্রেম (Love)-রূপে ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত হয়।

এইবার প্রত্যগাত্মা উচ্চতর লোক হইতে নিম্নতর লোকে অবতরণ করেন, ঐ নিম্নতর লোক আমাদের পূর্বোক্ত রূপ-ভূমিক দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক। এই ত্রি-লোকে অবতরণ করিয়া প্রত্যগাত্মা ভূতাত্মা-রূপে আত্ম-প্রকাশ করেন।

জীবাত্মা যদি অক্ষর পুরুষ হন, তবে ক্ষর পুরুষ ঐ ভূতাত্মা *—উহাই পাশ্চাত্য দর্শনের Personality। ঐ ভূতাত্মা জীবাত্মারই ছায়া (Reflection),—চিদাভাসের আভাস—চিদাপাত—

The ego puts down only a fragment of himself into incarnation (in the lower worlds).

এই ভূতাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

আভাস এব চ—ব্র, সূ, ২।৩।৫০

এবং— অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ—ব্র, সূ, ৩।২।১৮

'জলে যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব ইহাও তদ্রূপ।'

থিয়সফিতে ঐ ভূতাত্মাকে 'The lower self of sensuality' ও ঐ জীবাত্মাকে 'The Higher self of Spirituality' বলা হয়। একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় আমাদের দেহপঞ্জরে 'একটি নয় দুইটি 'সোল' বিরাজ করিতেছে'—

Two souls alas! reside within my breast—Goethe's Faust.

একজন জীবাত্মা ও অন্যজন ভূতাত্মা।

জীবাত্মার যে তিন শক্তি, সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ, জীবাত্মার ছায়া (Reflection) ভূতাত্মাতে ঐ তিন শক্তি জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-রূপে ব্যঞ্জিত হয়।

* ভূতাত্মা 'ক্ষর' পুরুষ এই জন্য যে 'it is the group of *temporary* lower vehicles which a soul assumes when he descends into incarnation'—C. W. Leadbeater.

জ্ঞান-শক্তি = Power of Thought—জ্ঞানশক্তির প্রকাশ ভাবনায় (Cognition এ)। ইচ্ছাশক্তি = Power of Desire। ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ বাসনায় (Emotion-এ), ক্রিয়াশক্তি = Power of Action—ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ চেষ্টনায় (Conation বা Action-এ)।

অতএব আমরা দেখিলাম, জীবাত্মার তিন শক্তি—সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এবং জীবাত্মার ছায়া ভূতাত্মারও তিন শক্তি,—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি।

আমরা দেখিয়াছি, বিষয়-গ্রহণার্থ—Plane বা লোকের সহিত সম্পর্ক স্থাপন জন্য কোশরূপ শরীর গ্রহণ আবশ্যক, কিন্তু শক্তির প্রকাশের জন্যও কি কোশের প্রয়োজন আছে? যদি থাকে তবে কয়টি কোশের প্রয়োজন? একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় উপাধি স্বীকার ভিন্ন শক্তির প্রকাশ সম্ভব নয়। আমার দর্শন-শক্তি আছে, শ্রবণ-শক্তি আছে, গ্রহণ-শক্তি আছে, বাক্-শক্তি আছে। কিন্তু যদি চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, বাক্ (vocal organ) না থাকে, তবে শক্তির প্রকাশ হইবে কিরূপে? যদি কেহ আমার চক্ষু উৎপাটন করে, আমার জিহ্বা ছেদন করে, তবে আমার দৃক্-শক্তি ও বাক্-শক্তি সত্ত্বেও আমি উপাধির অভাবে অন্ধ ও মূক থাকিব। পরে যদি কোন দিন আমার নষ্ট চক্ষু ও বাগিন্দ্রিয় ফিরিয়া পাই তবেই সেই স্তম্ভিত শক্তির পুনঃপ্রকাশ হইবে।

জীবাত্মার যে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি—যাহার প্রকাশ প্রতাপে, প্রজ্ঞায় ও প্রেমে—উপযুক্ত উপাধি ভিন্ন ঐ ঐ শক্তির প্রকাশ হইবে কিরূপে? অতএব জীবাত্মার ত্রিবিধ উপাধির প্রয়োজন—উহারাই আমাদের পরিচিত বিজ্ঞানময় কোশ, আনন্দময় কোশ ও হিরণ্ময় কোশ। বিজ্ঞানময় কোশের সাহায্যে জীবাত্মার সম্বিৎ-শক্তির প্রকাশ হয়, আনন্দময় কোশের সাহায্যে জীবাত্মার হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ হয় এবং হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে জীবাত্মার সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ হয়। আমরা দেখিয়াছি এই কোশ-ত্রয় মিলিয়া কারণ শরীর। *

* এই জীবাত্মা প্রসঙ্গে একজন অভিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন—The ego is the spirit of man, clothed in the Causal Body (কারণ শরীর). It is the '*Augocides*' of the Greeks, a central focus of consciousness, surrounded by a shining aura.

এইরূপ ভূতাত্মার যে জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি—যাহাদের প্রকাশ ভাবনায়, বাসনায় ও চেষ্টনায়—উপযুক্ত উপাধি ভিন্ন ঐ ঐ শক্তিরই বা প্রকাশ হইবে কিরূপ? অতএব, ভূতাত্মারও ত্রিবিধ উপাধির প্রয়োজন। উহারাই আমাদের পরিচিত মনোময় কোশ, প্রাণময় কোশ ও অন্নময় কোশ। মনোময় কোশের সাহায্যে ভূতাত্মার জ্ঞানশক্তির প্রকাশ হয়, প্রাণময় কোশের সাহায্যে ভূতাত্মার ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ হয়, এবং অন্নময় কোশের সাহায্যে ভূতাত্মার ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ হয়। আমরা দেখিয়াছি ঐ মনোময় ও প্রাণময় কোশদ্বয় মিলিয়া আমাদের সূক্ষ্ম শরীর এবং ঐ অন্নময় কোশই আমাদের স্থূল শরীর।

নিম্নলিখিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমাদের বক্তব্য বিশদ হইতে পারে।

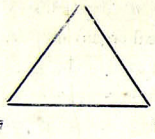

সন্ধিনী (Power) (সৎ)-Spiritual
হ্লাদিনী (Love) (আনন্দ)-Intuitional
সম্বিৎ (Wisdom) (চিৎ)-Causal
} Ego = জীবাত্মা

জ্ঞান (Thought)-Mental
ইচ্ছা (Desire)-Astral
ক্রিয়া (Action)-Physical
} Personality = ভূতাত্মা

'সরসীব তটদ্রুমাঃ'—তড়াগের জলে যেমন তীরস্থ তরুর প্রতিবিম্ব পড়ে, ভূতাত্মায় সেইরূপ জীবাত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। বিম্বে যাহা চূড়ায় থাকে, প্রতিবিম্বে তাহা সর্বনিম্নে। সেইজন্য জীবাত্মার চূড়াস্থ ঊর্ধ্বগা সন্ধিনী শক্তি ভূতাত্মার ক্রিয়া শক্তি, তাহার মধ্যগা হ্লাদিনী শক্তি ভূতাত্মার ইচ্ছাশক্তি, এবং তাহার নিম্নগা সম্বিৎ শক্তি ভূতাত্মার জ্ঞানশক্তি। অতএব আমরা বুঝিলাম, ভূতাত্মার উৎসারিত ঐ ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—জীবাত্মা হইতে

প্রসৃত সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তিরই আভাস (reflection)। অর্থাৎ, নিম্নতর গ্রামে (on a lower level) যাহা ক্রিয়াশক্তি (Power of Action), উচ্চতর গ্রামে (on a higher level) তাহাই সান্ধিনী; নিম্নতর গ্রামে যাহা ইচ্ছাশক্তি (Power of Desire), উচ্চতর গ্রামে তাহাই হ্লাদিনী; এবং নিম্নতর গ্রামে যাহা জ্ঞানশক্তি (Power of Thought), উচ্চতর গ্রামে তাহাই সম্বিৎ।

অতএব আমরা দেখিলাম যে জীবাত্মা হইতে উৎসারিত শক্তিত্রয়—সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এবং জীবাত্মার ছায়া, ভূতাত্মা হইতে উৎসারিত শক্তিত্রয়—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—যথাক্রমে বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় এবং মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোশরূপ উপাধি দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে। সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ যথাক্রমে প্রতাপ, প্রেম ও প্রজ্ঞারূপে এবং জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি যথাক্রমে ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা রূপে প্রকাশিত হয়। শক্তির দিক হইতে ইহাই কোশষট্‌কের সার্থকতা। নিম্নে মুদ্রিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ বিষয় অনেকটা বিশদ হইবে।

লোক (Planes)		কোশ (Bodies)	শক্তি (Powers)
ব্রহ্মলোক (Nirvanic) ব্যোমগঠিত	সত্য জনঃ তপঃ	হিরণ্ময় Spiritual	সন্ধিনী (সৎ), প্রতাপ (Potency, Life)
প্রজাপতিলোক (মহঃ) (Buddhic) মরুৎ গঠিত		আনন্দময় Intuitional	হ্লাদিনী (আনন্দ) প্রেম (Love, Bliss)
দেবলোক (স্বঃ) (Mental) তেজঃগঠিত	অরূপান্তর (Abstract) রূপান্তর (Concrete)	বিজ্ঞানময় Causal মনোময় Mental	সম্বিৎ (চিৎ), প্রজ্ঞা (Wisdom, Light) জ্ঞানশক্তি—Power of Thought
পিতৃলোক (ভুবঃ) (Astral) অপ্‌গঠিত		প্রাণময় Emotional	ইচ্ছাশক্তি—Power of Desire.
মনুষ্যলোক (ভূঃ) (Physical) ক্ষিতি গঠিত		অন্নময় Physical	ক্রিয়াশক্তি—Power of Action.

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মার পঞ্চলোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন জন্য—তথাচ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত করিবার জন্য—দহরকোশ ব্যতীত ঐ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোশের উপযোগিতা ও অবশ্যম্ভাবিতা অনিবার্য।

এই ছয় কোশ ও তাহাদিগের পরতর ব্রহ্মকোশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য দ্বিতীয় খণ্ডে আরও বিশদ হইবে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম হইলেও এই সকল কোশই এবং তাহাদের অবয়ব ইন্দ্রিয়াদি জড় উপাদানে গঠিত, প্রকৃতির বিকারে রচিত। অতএব ইহারা জড়তত্ত্বের অন্তর্গত।

আমরা এখানেই জড়তত্ত্বের আলোচনা শেষ করিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডে জীবতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

দুঃসংবাদ

ভঙ্গুর দেহ—সে কি দুঃসংবাদ ?
অনিন্দ্য প্রাণ এখানে বেঁধেছে বাসা,
বর্ণে রেখায় লীলয়িত রূপাতীত,—
আবদ্ধ জলে স্রোত-বন্যায় ভাসা।

এই প্রাণলীলা গূঢ় রহস্য। এর
সমাধান খোঁজা শক্তির অপচয় ;
আত্মস্ত সে জারিত বেদনা রসে,
জীবনকাব্য তবু মধু-মধুময়।

ওষ্ঠে রয়েছে অমৃতের আস্বাদ
নিশীথ রতির চুম্বনমধু সম ;
কোথা হ'তে এলো ফৌজদারী পরোয়ানা—
জীবনধারীর বারতা কঠিনতম।

দেহ কোষে কোষে যতো প্রাণ-কণিকারা
শিশিরলাস্যে সদা করে টলমল,
বার্তা এসেছে—আর নয় চপলতা—
ধীরে থেমে যাক সে নৃত্য উচ্ছল।

চেতনার দীপ যে পলকে নিভে যাবে
দেহ আর প্রাণ সমান অর্থহীন !
জানালার ধারে বসে আছি চুপচাপ,
আলোকিত নীলে মধুর মধ্য দিন !

নারিকেল পাতা রোদে করে ঝিলিমিল
পাতার আড়ালে মাকড়সা পাতে ফাঁদ ;
বক্ষ কপাটে কার দ্রুত কড়ানাড়া ?
ভঙ্গুর দেহ—সে কী দুঃসংবাদ !

রবীন্দ্রনাথ সরকার

মাষ্টার

বিদ্যার ভরা কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছে। ন'বছর বয়সে পাঠশালায় গিয়াছিল ছেলে, কুড়ি বছরে পাস দিয়াছে, বুকের রক্ত জল করিয়া পড়ার কড়ি জুগাইয়াছে মধুর মা, ছেলে এইবার রোজগার করুক। মধু খুঁৎখুঁৎ করিয়াছিল : মেধাবী ছেলে সে, গাধার মত খাটিতে পারে, কলেজটা যদি একবার—। কিন্তু তাহা হয় নাই। হইবার নয় বলিয়াই হয় নাই।

মধুর মায়ের উপরোধে, মধু গাঁয়ের ছেলে আর ভাল ছেলে বলিয়াও বটে, ছোটবাবু মধুর চাকুরীটি করিয়া দিলেন : মাছিমপুর মধ্যম ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক; মাহিনা পনর টাকা, বৎসরে এক টাকা করিয়া বৃদ্ধি যে-ইস্তক ত্রিশে না পৌঁছায়। আঁচলে চোখ মুছিয়া কৃতজ্ঞতার সকরুণ সুরে মা বলিয়াছিলেন, যে-উপকার তিনি করিলেন তাহাদের তা' শোধ হইবার নয়। শোন কথা, মধু যে তাঁহার ছেলের মত, মতই বা কেন, মধু তো তাঁহার ছেলেই—হাসিয়া বলিয়াছিলেন ছোটবাবু—তিনি যদি না করিবেন মধুর জন্য তবে কি করিবে ও-গাঁয়ের বগা চক্কোত্তি নাকি!

বউ আসিবে। বউ আসিবার আগে চালা ঘরটা বদলাইয়া চৌচালা করিতে হইবে। চালাঘর আপনা হইতেই চৌচালা হয় না, তেল খরচ করিতে হয়। চাকুরী হইয়াছে আজ তিন বছর, তিন বছর ধরিয়া তেল জুগাইতেছে মধু মাষ্টার : পোষ্টাপিসের বইএ টাকা জমিয়াছে একশ র উপর। মা সেই যে কবে হইতে সুরু করিয়াছেন,—বউ! বউ! বউ! শুনিয়া শুনিয়াই বুঝি নেশা ধরিয়া গিয়াছে মাষ্টারের। বউ আসিবে? কেমন বউ? নরসুন্দার কোমর জলে ডুব-সাঁতার কাটে সেই-যে মেয়েটা, দুষ্টু চপল চাউনি যার, তার মত? না গরবিনী রানুর মত?—যে-রানু হেলিয়া দুলিয়া গয়নার ঝঙ্কারে চলার পথ মুখরিত করিয়া চলে। কিন্তু যেমনটিই হোক, বউ আসিবে সোজা মাষ্টারের বউ হইয়া, যে-মাষ্টার আঠার টাকা মাইনা পায় আর চৌচালার নীচে ঘুমায়, চালার নীচে ঘুমাইত যে-মধু তাহার সঙ্গে বউএর কোন সম্পর্ক নাই। ঘরটা তুলিতে হইবে। জারুল কাঠের আট ইঞ্চি চৌকাঠে টিনের দরজার পাল্লা বসিবে, দরজাটা কাঠের হইলেই ভাল হইত, কিন্তু খরচ বড় বেশী পড়িয়া যায়।

ভাওয়ালগড়ের খুঁটির কাঠ গোটা ছয়েক সে সস্তায় কিনিয়া ফেলিয়াছিল বছর-খানেক আগেই, বাকী খুঁটি আপাততঃ বাঁশের লাগাইলেই চলিবে, চালা হইবে টিনের, বেড়া হইবে তক্তার। টেপাখোলার কৈবর্ত্তদের ঘুনসী-বেত সেরখানেক যদি কেনা যায় লোহার তারের আর প্রয়োজন হইবে না; গঞ্জ হইতে টিন তক্তা আর বল্টু পেরেক আনাইলেই কাজ সুরু করা যায়। ছোট কর্ত্তার ডোবাপুকুর হইতে ভিটের মাটি পাওয়া যাইবে তাতে কামলা খরচ অনেকটা বাঁচিবে, যোগেন মিস্ত্রী কমসম লইয়া ঘর তুলিতে রাজী আছে। কিন্তু হিসাবে যে এখনও কিছু টাকা কম পড়ে! থাক্ না আরও ক'টা মাস!

মা বকর বকর করেন : এত বড় ঢেঙা ছেলে, ঘরে বউ নাই এ আবার কি রকম! মধু বোঝায় : আগে অন্নসংস্থান পরে ঘরদোর তার পর বিবাহ—যে-যুগের যে-রীতি। এখন বড় হইয়াছে মধু, মাষ্টার হইয়াছে, বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া কথা বলে সে। তা'ছাড়া ছোট কর্ত্তাও এই পরামর্শই দেন। মা চুপ করিয়া যান। পাড়ার সালিসিতে গাঁ-অলা মাষ্টারকে সেদিন ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল—এত অল্প বয়সে সালিসি করিবার অধিকার ইহার আগে কে কবে পাইয়াছে? হয়ত ভবিষ্যতে মাষ্টার পাড়ার সেই আসনটির দখল পাইবে, যার কল্যাণে শত্রু হোক মিত্র হোক সকলেই পথ ছাড়িয়া দাঁড়ায়, দুই চারিটা সম্ভ্রমের কথা বলে।

মাষ্টারের চৌচালা আর উঠে না। কোথায় কোন্ মুল্লুকে যুদ্ধ বাধিয়াছে ছাই, আর এইখানে কিনা জিনিষপত্র কেনা হইয়া উঠিল দায়! জমানো তাকে তোলা রহিল, এইবার বুঝি পোষ্টাপিসের টাকা ভাঙাইয়া খাইতে হয়! রঙীর মা বলে (রঙীর মা পাড়ার মেয়ে, রাঁধিয়া বাড়িয়া দেয়—মা বুড়া হইয়াছেন তিনি আর পারেন না।) রাজায় রাজায় যুদ্ধ ইত্যাদি। আরও বলে, 'আপদ বালাই যত সব!'

রায় বাহাদুর সতীশ চক্রবর্ত্তী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থির করিলেন, কলিকাতায় নয়, দেশেই বসবাস করিবেন। ছেলেমেয়েরা আপত্তি তুলিয়াছিলেন, গিন্নীও মৃদুভাবে; রায় বাহাদুর সকল আপত্তি কাটাইয়া শেষ পর্য্যন্ত দেশেই আসিলেন। কলমীফুলার চক্রবর্ত্তীরা সাতপুরুষের জমিদার : চক্কোত্তিদের কেউ কেউ আবার কলকারখানা আর ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে বিস্তর

টাকাকড়ি করিয়া বনিয়াদী ইমারত আরও দৃঢ় আরও মজবুত করিয়াছেন। এই বংশের ছেলে রায় বাহাদুর। লেখা পড়ায় ভাল ছিলেন : বি, এ, পাশ করিয়া ডেপুটিগিরিতে ঢুকেন। কোন প্রয়োজন ছিল না অবশ্য ; ধরিতে গেলে একরকম সখের চাকরী, কিন্তু চাকরীতে তখন মানমর্য্যাদা ছিল। পল্লী-সংস্কারের ইচ্ছা বরাবরই ছিল, বাল্যাবস্থায় এতৎসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, চাকরী-জীবনে কচুরীপানা ধ্বংস করিয়াছেন, মশা মারিয়া ম্যালেরিয়া দূর করিয়াছেন, মাছি মারিয়া কলেরা তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর গ্রামের প্রতি মমতা আর পল্লী-উন্নয়নের মহৎ উদ্দেশ্য তাঁকে দেশে টানিয়া আনিল। ছোট ছেলে অমিয়কে পড়াইবার ভার পড়িল মাষ্টারের উপর। মধু কলমীফুলার চক্কোত্তিদের বাড়ীতে গিয়া পড়াইবে ইহা ছোট কর্ত্তার পছন্দ নয়,—কিন্তু তিরিশ টাকা মাইনা—ছোটকর্ত্তা আর বিশেষ আপত্তি করেন না। মাষ্টারের ঘরটা এইবার নিশ্চয়ই উঠিবে।

রোজ সন্ধ্যায় মাষ্টার পড়াইতে আসে—তার এক হাতে ছাতি অপর হাতে লাঠি, হারিকেনও একটা দরকার বটে কিন্তু দুইটা হাতে আর কুলায় না।

কথা হইতেছিল অমিয়র লেখা রচনা লইয়া :

'গরু ঘাস খায় লেখবার দরকার কি স্যার ?'

'নেই কেন ?'

'ও তো সবাই জানে।'

'অনেকেই জানে তবে সকলে নয়। এই ধর, ছোট খুকী হয়ত ভাবে গরু দুধ খায়।'

'তা বটে', অমিয় স্বীকার করে। দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া চুলে আঙুল চালাইয়া এমন সুন্দরভাবে স্বীকার করে অমিয়, যেন গাম্ভীর্য্যের প্রতিচ্ছবি। তারপর, গরু সম্বন্ধে অনেকেই যা' জানে অমিয় যে তা' জানে না, যেমন ছোট খুকী জানে না যে গরু ঘাস খায়, মাষ্টার তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে। অমিয় তো আর জানেনা যে গরু জাবর কাটে।

'জানি, স্যার, খুব জানি, খুব জানি! গরু জাবর কাটে, The cow chews the cud.' হাসিয়া চোখ নাচাইয়া ঘাড় দুলাইয়া অমিয় বলিয়া উঠে।

'তবে লেখোনি কেন ?'

'ভুলে গিয়েছিলুম।'

এইবার মাষ্টার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয় অমিয়র মত ছেলেদের রচনা লেখার উদ্দেশ্য কি। কথা হইতেছে অমিয় নিজে কতখানি জানে আর যা' জানে তা' বেশ ভাল করিয়া গুছাইয়া স্পষ্ট করিয়া সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে পারে কিনা—অপরে জানে কি জানে না সে কথাই নয়। বুঝিল তো অমিয় ? হাঁ, অমিয় বুঝিয়াছে।

এমন করিয়া আর কখনও সে পড়ায় নাই, পড়াইতে বেশ লাগে মাষ্টারের। স্কুলে হয় ভাল ছেলে একটানা সুরে গড় গড় করিয়া বলিয়া যায়, হিমালয়ের কোন্ স্থান হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশের ভিতর দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ সাগরে পড়িয়াছে, নয় খারাপ ছেলে কাচুমাচু করে, "উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত দক্ষিণে প্রশান্ত—" 'Stand up on the bench'—মাষ্টারকে হাঁকিতে হয়। অব্যতিক্রমণীয় রীতি। হেড্ মাষ্টার কড়া লোক। কত ছেলে তাঁর হাতে বৃত্তি পাইল, কত গাধা মানুষ হইয়া গেল। আর আজ ছেলে-ছোকরার পরামর্শ শুনিয়া স্কুল চালাইতে হইবে তাঁকে! যত সব!

অমিয় ছেলে ভাল, অমিয়কে পড়াইয়া আনন্দ আছে। মিহি গলায় এমন সুন্দর কথা বলে ছেলেটা, আর চমৎকার তার হাবভাব ধরন-ধারণ নড়ন-চড়ন। তুলনা খুঁজিতে গিয়া মাষ্টার হাজির হয় প্রাণী জগতে : অমিয় যেন বনের হরিণ আর তার স্কুলের ছেলেরা গাড়ী-টানা বলদ কিম্বা বুনো মোষ।

অমিয়র মত অমিয়র পড়িবার ঘরটিও সুন্দর। যে-চেয়ারে বসিয়া যে-টেবিলের উপর মাষ্টার পড়ায়, যে-আলোর নীচে সে পড়ায়, চোখ তুলিলে যে-দেওয়াল তার চোখে পড়ে আর সেখানে যত ছবি আর যত শেল্ফ্, যে-মেজেতে পা রাখিয়া সে পড়ায়, সব তা'র ভাল লাগে, তা'র মনে মায়াজাল বোনে।

দিন যায়। এমন একটা দিন যায় না মাষ্টার যেদিন তার নূতন জগতের একটা কিছু নূতন আস্বাদ না পায়। চায়ের আসরে চা খাইয়াছে, টুংটাং আওয়াজের সঙ্গে দ্রুত লয়ে চলিয়াছে তার হৃৎস্পন্দন। গিন্নীমার বিনয়ে মাঝে মাঝে থতমত খাইয়া গিয়াছে সে। বড় মিষ্টি করিয়া বলেন গিন্নীমা—

স্বর তো নয় কণ্ঠে যেন সুর, হয় বিনয়ের নয় মিনতির। আর তার নিজের মা? অমিয়র মা কথা বলিলে গরম চা জুড়াইয়া পেয় হয়, তার নিজের মা কথা বলিলে চায়ের পেয়ালা খান খান হইয়া যায় বুঝিবা! আর রায় বাহাদুর? রায় বাহাদুরের রসিকতায় মাষ্টার অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়াছে। অতটা বয়সে কি ছেলেমানুষিই করেন ভদ্দর লোক: রসিকতা করেন, হো হো করিয়া ঘর ফাটাইয়া হাসেন, সেদিন আবার তাদের ভেল্‌কিবাজি দেখাইয়াছেন তাহাকে আর অমিয়কে, দেখাইয়া পরে শিখাইয়া দিয়াছেন।

অমিয় বলে: কলিকাতা হইতে বড়দা আসিবে, দিদিও আসিবে; সেদিন কিন্তু তাহার ছুটি, কেমন তো?

রমাকে মাষ্টার দেখিল, দেখিয়া মনে হইল সহরের রাস্তায় (সহরে বৎসরে দুই একবার যাইতে হয় তাহাকে) মোটর গাড়ীতে রমাকে সে দেখিয়াছে আগেই। রমাকে ঠিক নয়, দেখিয়াছে রমার মত আর পাঁচজনকে, সহরের রাস্তায় মোটর গাড়ীতে যারা ঘুড়িয়া বেড়ায়, চোখ দুটি বড় বড় করিয়া দুই চোখ ভরিয়া দেখিয়াছে, দেখিয়াছে আর মনে হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য! কি চমৎকার! আর বেশী কিছু ভাবে নাই মাষ্টার। স্বর্গে থাকে অপ্সরীরা, সাহরের অতলজলে রূপকথার রাজকন্যা, আর সহরের রাস্তায় মোটর গাড়ীতে রমারা। মাষ্টার শুধু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে পারে, সে আবার ভাবিবে কি? হঠাৎ কিনা গাড়ী হইতে নামিয়া দুই হাত তুলিয়া রমা দেবী নমস্কার করিয়া বসিল তাহাকেই! পায়ের তলার পৃথিবীটা মাষ্টারের কাঁপিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে পঞ্চানন কথা বলিয়া যাইতেছিল।

পঞ্চাননের বোল ফুটিয়াছিল এক বছর বয়সে, তিন জন নার্স তখন তার মন জুগাইত। সাত বছরে গানের মাষ্টার গান শিখাইত, জ্ঞান ভাণ্ডারের মণি-মুক্তা আহরণ করিয়া দিবার জন্য আরও ছিল দুই জন মাষ্টার। এগার বছরে রায় বাহাদুর নিজে তাহাকে বন্দুক ধরিতে শিখাইয়াছিলেন আর কিনিয়া দিয়াছিলেন ওয়েলার ঘোড়া। মা তাকে শিখাইতেন বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ—রায় বাহাদুরের পূর্ব্ববঙ্গীয় রক্ত জিভ্‌টাতে যেন পঞ্চাননের দাগ কাটিতে না পারে। তারপর যখন ইস্কুলে গেল সে, দেখিয়া শুনিয়া ইস্কুলের ছেলেরা থ' বনিয়া যাইত আর লুকাইয়া ছড়া কাটিত, 'পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী মন্দকাজে অগ্রবর্ত্তী'।

এখন আর সে কথা খাটে না, কারণ পঞ্চানন এখন ভালমন্দ কোন কাজই করে না। এখন সে শুধু কথা বলে—বাঁকা চোরা কথা, রসিকতা, বিদ্রূপ, জ্ঞান-গর্ভ সার-কথা—সব কিছুই বলে। এক মুখেই কথা বলে পঞ্চানন, কিন্তু নাম তা'র ব্যর্থ হয় নাই। আর কথা যখন সে বলে না তখন চুপ করিয়া ভাবে কি বলা যাইতে পারে: পঞ্চাননের নীরবতা বাক্যের গর্ভাবস্থা।

মধু মাষ্টারকে পঞ্চানন পাইয়া বসিয়াছে। ঠিক বলা শক্ত, মাষ্টারকে পঞ্চানন পাইয়া বসিয়াছে না পঞ্চাননকে মাষ্টার পাইয়া বসিয়াছে। মাষ্টারকে পঞ্চাননের চাই কথা বলিবার জন্য, পঞ্চাননকে মাষ্টারের চাই কথা শুনিবার জন্য।

মাষ্টার পড়াইতে আসিলে পাঁচু বলে, 'চল মাষ্টার, মাঠের পথে ঘুরে আসা যাক্।'

অমিয় বলে, 'বারে! আমার পড়া?'

অমিয়ও সঙ্গে চলুক না হয়।

'তবে তো খু-উব ভাল।' বনের হরিণের মতই সজীব হইয়া উঠে অমিয়। এমন সময় কোথা হইতে উড়িয়া আসে রমা।

'আমিও আসব তোমাদের সঙ্গে, দাদা?'

মাঠের পথে তাহাদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইবে রমা? এ্যাঁ? জিভ্‌টা মাষ্টারের তালুতে আঁটিয়া যায়। পঞ্চানন ধমক দেয়, 'আমাদের সঙ্গে যাবে মানে? বিলেত থেকে এই নাব্‌লে নাকি?' আত্মস্থ হইয়াছে মাষ্টার। ভাল করিয়া রমার মুখের দিকে তাকায় এইবার। নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন মুখখানি নত করিয়া তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায় রমা। অমিয় যদি বনের হরিণ রমা তবে কি? সোনার হরিণ?

পঞ্চানন আলগোছে বলিয়া চলিয়াছে।

স্বেচ্ছাচারী লাভের আওতায় সমাজদেহ বিষে জর্জ্জরিত, 'মর্ম্মে মর্ম্মে করিছে বিরাজ সংক্রামিত মড়কের কীট, শুকায়েছে কালস্রোত কর্দ্দমে মিলে না পাদপীঠ।' টাকার নৌকা পাহাড় দিয়া আকাশ ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে, মানুষ শুধু ডুবিতেছে আর মরিতেছে।—ছবি দেখিতেছে নাকি মাষ্টার? চোখের সামনে স্তূপীকৃত হইয়া উঠে ভোগবিলাসের আয়োজন,

পাশাপাশি কি দুঃসহ নিঃস্বতার করালগ্রাস! আর কি নিদারুণ অপচয়! বাঁচিবার প্রয়োজন মেটে না মানুষের আর দেশের সম্পদের বার আনাই কিনা পড়িয়া রহিল অকেজো হইয়া। অথচ অন্ত নাই বিজ্ঞাপনের ঝক্‌মারির, অন্ত নাই হাজারো দোকানপাটের মানুষ যেখানে খাটিয়া খাটিয়া অমানুষ হইতেছে। কোটিপতি মালিকের কারখানা দেখিয়াছে মাষ্টার? সেখানকার মজুরদের?

'কিন্তু উপায়?'

'উপায় সহজ। প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য বিধান এটা নয়, মধু, এ হচ্ছে নির্ব্বোধ অব্যবস্থা, মানুষের গড়া। উৎপাদনকে প্রয়োজন মেটাবার কাজে লাগাও, লাভের যন্ত্রটাকে উড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দাও, ঘুণ-ধরা সমাজটা দেখবে আপনা থেকেই সতেজ হ'য়ে আস্‌ছে।'

আরও কত কি বলে পঞ্চানন।

লেবার মা'র ছেলেটা মরিয়া গিয়াছিল সেদিন। মাষ্টারের মনটা ছিল খারাপ। শুনিয়া পঞ্চানন বলিয়াছিল, মাষ্টার জানে এদেশের শিশুমৃত্যুর হার?

'আমাদের এই গরম দেশটায় মাটির মত মেয়েরাও উর্ব্বর।'

মাষ্টারের ভাল লাগে নাই, লজ্জাও পাইয়াছিল। কিন্তু পঞ্চানন থামে নাই। গর্ভ সঞ্চারের ছ'সাত মাস পর মেয়েটি হইয়া পড়ে অকেজো, মেজাজটি হয় খিট্‌খিটে, পুরুষটিরও তাই, বিশেষ কারণে: ফলে গেরস্থালিতে জ্বলে অশান্তির আগুন। তার পর শিশু জন্ম নেয়, আরও কয়েক মাস ধরিয়া চলে মেয়েটির অকাজের মেয়াদ আর পুরুষটির খিট্‌খিটে মেজাজ। তারপর স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত উদ্যমে শিশুর লালন-পালন। একদিন অকস্মাৎ হয় শিশুটির মৃত্যু। ভাগ্যিস্ মরে, নইলে দেশটা কিলবিল করিত, মানুষের মাংস মানুষে খাইত। কিন্তু কি অসীম অপচয়! আর কত সহজেই না এর নিরাকরণ হইতে পারিত!

এতও ধরিয়াছে পাঁচুর মাথায়, একেবারে ঠাসা!

রঙীর মা গজ্ গজ্ করে। পড়াইবার কথা মাষ্টারের সন্ধ্যা বেলায়, ভোর সকালে সে চক্কোত্তি-বাড়ী রওয়ানা হয় কেন? কিসের জন্য? দুধবাজার হইতে দুধটা আনিয়া দেয় তাহার কোন্ কুটুমে, শুনি?

মাষ্টার বলে, 'জগার ফিরাবার আইল কিডা?'

জগা, অর্থাৎ জগৎচরণ সূত্রধর, যোগেন মিস্ত্রীর ছেলে, বয়স তের।

'আর কইয়ো না হেই বুইত্যামরা হারামজাদাডার কথা, মানুষ অইছে নাকি হেইডা? তিন পইসা দিয়া চাইর চুঙ্গা দুধ আইন্যা কয় চাইর পইসা, আর চাইর পইসা দিয়া আইন্যা কয় পাচ পইসা। এগ্‌গুয়া পইসা চুরি করে রোজই ডেকাইত্যাডা!'

জগাটা ডাকাত, দুধ কিনিতে গিয়া একটি করিয়া পয়সা সে রোজ চুরি করে। শুধু এই জন্যই মাষ্টারকে সকাল বেলায় চক্কোত্তির-বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিতে হইবে?—যে-বাড়ীতে পাঁচু কথা বলে আর রমা কথা না বলিয়াই বিদ্যুৎ ঝলকায়। কী যে আক্কেল রঙীর মা'র!

'করুক্‌গ্যা, এগ্‌গুয়াই ত পইসা।' মাষ্টার হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চায়।

যেন বিছুটিপাতা লাগিয়াই ছিল রঙীর মা'র সর্ব্বদেহে, এইবার জল লাগিল। কি বলিল মাষ্টার? মোটে একটাই তো পয়সা! পোয়াটা নয় আধটা নয় রোজ আস্ত একটি পয়সা, তাও গায় লাগে না মাষ্টারের! লাটসায়েব বনিয়াছে নাকি মাষ্টার ঐ চক্কোত্তিদের সঙ্গে মিশিয়া, না লাটসায়েবের নাতি? ওদের কিরে বাপু, পাঁচ হাত লম্বা আইবুড়ো মেয়েটা টুলের উপর পা তুলিয়া বিড়ি ফুঁকে। সব জানে রঙীর মা, সব শুনিয়াছে!

'উপুর টগ্‌গায় পাইছে তুমারে মাষ্টর! সর্ব্বনাশ অইব তুমার।'

কী-ই বা হইয়াছে তাহার? সর্ব্বনাশই বা কেন হইবে? এই সব কি বলিতেছে রঙীর মা? রঙীর মা'টা যেন কেমন, শালীনতার একেবারেই অভাব।

পড়ানো শেষ হইয়াছে, অমিয় এইবার যাইবে। কিন্তু মাষ্টার যায় কি করিয়া? যে-জোরে বৃষ্টি পড়িতেছে। অমিয় চলিয়া গেলে বৃষ্টি ধরিয়া আসিবার অপেক্ষায় একা একা বসিয়া থাকে মাষ্টার, বসিয়া বসিয়া দুই হাতের দশটা আঙুল মটকায় আর নাকের ডগা হইতে মশা তাড়ায়। অনেক রাত হইতে চলিল যে। এমন অসুবিধা এই বর্ষাকালটায়! 'মা ব'ল্‌লেন—' মাষ্টার তড়াক্ করিয়া উঠে, ঠিক লাফায় না, চেয়ারটা হইতে সটান উঠিয়া

দাঁড়ায়। 'বসুন না', বলিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া নিজেই রমা মাষ্টারকে বসাইয়া দেয় চেয়ারটায়। 'মা ব'ললেন, আজ রাত্তিরে এখানেই খেয়ে যেতে হবে আপনাকে।' বলিয়া রমা খাবার ব্যবস্থা দেখিতে চলিয়া যায়।

এতক্ষণে মাষ্টার চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়াছে। আসুক বৃষ্টি, নামুক বৃষ্টিঃ ঘুটঘুটে অন্ধকারে নিরাকার বৃষ্টি ঝম্‌ঝম্ করিয়া ঝরুক বারান্দার টিনের ছাদে। বৃষ্টির ছাটে আজ জল নয়, পঞ্চশরের মোহ!

'ইস্, ভিজে একেবারে চুপচুপে হ'য়ে গেলেন যে!' রমা ফিরিয়া আসিয়াছে। মাষ্টারের হাত ধরিয়া টানিয়া জানালার আরও কাছে সরাইয়া আনে সে, মাষ্টারকে আরও ভিজাইয়া তবে আজ ছাড়িবে রমা!

গ্রাম হইতে টিনের চাল লোপ পাইতেছে। চালের টিন বেচিয়া বেচিয়া খায় গাঁয়ের লোক, আর কোন রকমে-গুঁজিয়া-দেওয়া খড় হইতে চুপ্‌সিয়া-পড়া জলের ফোঁটায় দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠে। কিন্তু জাগিয়াই কি ছাই রেহাই আছে!

অরাজকতা নাই। সুশৃঙ্খল-জীবন যাপন করে মানুষ। চক্কোত্তিদের ধানের আড়তে হাজার হাজার মণ ধান। শুধু খাদ্যাভাব। খাদ্য নাই। আগাছা-কুগাছা খাইয়া মানুষ বাঁচে। যাহারা মরিতেছে, না খাইয়া নয়, রোগে মরিতেছে। রোগ ছাড়াও মরে নাকি মানুষ! নইলে অত বড় বড় ডাক্তার বৈদ্য রহিয়াছে কেন?

রায় বাহাদুর সপরিবারে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। তিনি গ্রামে আসিয়াছিলেন বৃহৎ আদর্শ লইয়া। কিন্তু বাসের অযোগ্য জায়গায় বাস করা যায় কি করিয়া? আদর্শ লইয়া বাঁচিয়া সুখ আছে। কিন্তু আদর্শ সুদ্ধ মরিয়া লাভ কি? আদর্শ বাঁচাইয়া রাখিবারও একটা দায়িত্ব আছে। মস্ত বড় বাড়ী চক্কোত্তিদের, বিরাট পরিধি, চারিদিকে গাছপালায় ঘেরা। কিন্তু গাছপালা তো আর মড়ক আটকায় না।

বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দিন, সকাল হইতে সূর্য্য জ্বলিতেছে। এমনটি কদাচিৎ ঘটে, আর যখন ঘটে বেশ লাগে ছেলেবুড়া সকলের। পাঁচটা বাজে প্রায়, স্কুল হইতে মাষ্টার বাড়ীর পথে চলিয়াছে। হঠাৎ চোখে পড়ে মস্ত তাহার

ছায়া আগে আগে চলিয়াছে। কী দীর্ঘ ছায়া! মাঠের পথে বাড়ীমুখীন চলিতে চলিতে দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হইবে—কিন্তু এতটা হইবে না যে কলিকাতায় রমার কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারে। 'তা' ছাড়া', নিজের সঙ্গেই রসিকতা করে মাষ্টার, 'কলিকাতা পুবে নয়, দক্ষিণ-পশ্চিমে'। আচ্ছা, রমাও ভাবে নাকি তাহার কথা? ভাবিয়া ভাবিয়া মন খারাপ করে? তাও কি হয়!

বাড়ীতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই রঙীর মা নাক সিট্‌কায়। ওমা কি ঘেন্নার কথা!

'ঘিন্নার ফিরাবার অইল কিডা?'

শুনে নাই বুঝি এখনও মাষ্টার? কালু ধোপা করিয়াছে কি, নিজের মাথাটায় নিজেই লাঠি বসাইয়া একেবারে ফাঁক করিয়া দিয়াছে। যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ছোটলোকদের!

মাষ্টার ঘরে না ঢুকিয়াই ফিরে, সে কালু ধোপার বাড়ী যাইবে।

'তুমি হেইখনে গিয়া করবা কিডা?'

মাষ্টার কান দেয় না, রঙীর মা'র সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

'খাইয়া যাও মাষ্টার, ও মাষ্টার।'

মাষ্টার হন্‌হন্ করিয়া চলে।

উপুর টগ গায় অর্থাৎ ভূতে পাইয়াছে ছেলেটাকে, এমন সোনার চাঁদ ছেলে! রঙীর মা'র মনটা খারাপ হইয়া যায়।

'সাধু আমারে অক্কবারে মাইরা ফালাইয়া গেছে মাষ্টরবাবু, শ্মশান ছাড়া আমার আর গতি নাই।'

স্ত্রী, তিনটি কাচ্চাবাচ্চা, আর ভাইপো সাধুচরণ—এই লইয়া কালুর সংসার। সাধুচরণের বয়স সতর-আঠার। সমর্থ ছেলে। কালু আর সাধু দুইজনে মিলিয়া যে-রোজগার করিত তাহাতে একরকম চলিয়া যাইত। কিছুদিন হইতে আর চলিতেছিল নাঃ জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য, ব্যবসাও কমিয়া আসিয়াছে, সংসারে বড়ই অনটন, অন্ন একবেলা জোটে ত আরবেলা উপবাস। হঠাৎ সাধুচরণ উধাও হইয়াছে, সঙ্গে লইয়া গিয়াছে গাঁয়ের বিত্তবান্‌দের এক গাঁট্‌রী কাপড় আর কালুর সর্ব্বস্ব, মায় ইস্ত্রিটি পর্য্যন্ত।

'এমন কুমতি অইল ক্যাম্‌নে পোলাডার, বাবু ? কুলকাথ কইর্‌য়া মানুষ কর্‌ছিলাম, উতুখানি বাইচ্চ্যাডারে' দুই হাত কাছাকাছি আনিয়া মানব-শিশুর দৈর্ঘ্য বুঝাইয়া দেয় কালু, 'বড় অইয়া আমার এই সর্ব্বনাশ করনের লাইগ্যা !'

কিন্তু নিজের মাথাটা ফাটাইল কেন কালু ?

'কপাল বাবু, কপাল !' ভাঙা মাথায় চাপড় লাগায় কালু। অর্থাৎ ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

কী-ই বা ছিল ? সাধু গিয়াছে আজ আট দিন। যাহাদের কাপড় সে নিয়াছে, সকলেই কালুকে শাসাইয়া গিয়াছে, কেউ কেউ মারধরও করিয়াছে। কাপড় তাহাকে কেহই আর দিবে না, দিলেও পয়সা দিবে না, যে-পর্য্যন্ত না পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া পাইয়াছে। এদিকে ধোপা বউএর পড়নে কাপড় নাই, যে-দুয়েকখানি ছিল ইতিমধ্যেই বিক্রী করিয়া বাচ্চাগুলিকে খাওয়াইয়াছে, এখন সে শুধু একটা ছেঁড়া গামছা পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছে, কোথাও বাহির হইবার উপায় নাই। বাচ্চাগুলি মাটিতে পড়িয়া কুঁকাইতেছে, পেট তাহাদের মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। 'মুরাদ নাই এগ্‌গুয়া পইসার, ফিরাবার তেজ দেখ', বলিয়া কর্কশ তীক্ষ্ণকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল ধোপাবউ, তাহাকে সায়েস্তা করিতে লাঠি তুলিয়া নিজের মাথায় নিজেই বসাইয়া দিয়াছে কালু।

কি করিবে এখন তবে কালু ?

'কি আর করবাম বাবু, রেলের তলায় পইর্‌য়া মরবাম না অইলে যেখান দুইচোখ যায় যাইবাম গিয়া।'

কালুর বাড়ীর পাশ দিয়াই রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। মধুর গা কাঁটা দিয়া উঠে। আর রেলগাড়ীর তলায় না পড়িয়া যদি দেশান্তরী হয় কালু, আসামে বা আর কোথাও চলিয়া যায় সংসারের দায় এড়াইতে ? (মাটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বেশ ভাল করিয়া গুছাইয়া ভাবে মাষ্টার—কালুর সংসার সম্বন্ধে সে যেন প্রবন্ধ রচনা করিতেছে।) কি হইবে তখন ? হয় ধোপাবউ ছেলে মেয়েদের হাত ধরিয়া এই দুর্ভিক্ষের দেশে ভিক্ষা করিতে বাহির হইবে নয় তাহাদের ফেলিয়া পলাইয়া যাইবে সহরের গলিতে, মানুষের যেখানে তৃপ্তির জন্য পয়সা খরচ করিবার সামর্থ্য আছে। ভাবিয়া ভাবিয়া মাষ্টারের হাত পা হিম হইয়া আসে।

ইস্কুলে বসিয়া হেড্‌মৌলবী ইদ্রীস মুন্সী গল্প করেন, কুমিল্লায় না কোথায় কণ্ট্রাক্টারী করিয়া এই সাতমাসে এগার লাখ টাকা মারিয়াছে বগা চক্কোত্তির বড় ছেলে শচীনবাবু। 'আরে ভাই যার যেমুন' কপাল। সবই খোদাতলার মরজি।'

কাজীসায়েব গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। সে কি ? পঁচিশ বৎসর হইয়া গেল তিনি গ্রামের মস্‌জিদে ইমামতি করিতেছেন, গাঁয়ের লোকে ভুলিয়া গিয়াছে তিনি এ গাঁয়ের লোক নন। দৃঢ় চরিত্র, কর্ম্মঠ, অতিশয় নিষ্ঠাবান্ এই মানুষটি দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া নানান ভাবে লোকের সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন ; গাঁয়ের অর্দ্ধেক লোক তাঁহার কথায় উঠেবসে। আজ এই দারুণ দুর্দ্দিনে তিনি গ্রাম ছাড়িয়া গেলে চলিবে কেন ? মাষ্টার কাজীসায়েবের কাছে দরবার করিতে যায়। কিন্তু কাজীসায়েবকে বলা বৃথা, তিনি মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। এইজন্য :

মৃতদেহ কবরস্থ করিতে হয় কাপড় মুড়াইয়া, কিন্তু কাপড় যদি দুষ্প্রাপ্য হয়, ধব্‌ধবে শাদা কাগজে মুড়াইয়া কবর দিলে তেমন ক্ষতিটা আর কি ? কাজীসায়েব শুধু এইটুকু কারণে গ্রাম ছাড়িতেছেন না। কাজীসায়েবের ধর্ম্মানুভূতিতে ঘা লাগিয়াছে অন্য কারণে। সবসুদ্ধ প্রায় পাঁচশ' জনের উপর মুসলমান পুরুষ মানুষের বাস গাঁটাতে ; মেয়ে পুরুষ মিলাইয়া চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মরিয়াছে দুইশ'এর কাছাকাছি, আর বাকী এতগুলি লোক মিলিয়া কিনা ইহাদের কবরের সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না, যেখানে সেখানে একহাত মাটি খুঁড়িয়া পুতিয়া রাখিতেছে। মড়ার দুর্গন্ধে সমস্ত গ্রামটা ভরিয়া গেল। মড়ার দুর্গন্ধে কাজীসায়েব অবশ্য গ্রাম ছাড়িতেছেন না। গাঁয়ের লোকেদের এই অধার্ম্মিকতা, নাস্তিকতা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহার ধর্ম্মানুভূতিতে ঘা লাগিয়াছে, বিবেক পীড়িত, তিনি চলিলেন।—

নিরাশায় ভাঙিয়া পড়িয়া অনুনয় করে মধু, তারপর পঞ্চাননের ভঙ্গীতে বক্তৃতা সুরু করিয়া দেয়। কাজীসায়েবের হাসিমুখের ধমক খাইয়া পা'দুটি তাহার মাটিতে ঠেকে ধপ্‌ করিয়া। ভুলিয়া গিয়াছে নাকি মধু কাহার সঙ্গে সে কথা বলিতেছে !

পঞ্চানন বলিয়াছিল, 'প্রচলিত ধার্ম্মিকতা কায়েমী স্বার্থের ব্রহ্মাস্ত্র, ওর আসল রূপ বুজরুকী আর নিছক আত্মপরতা।' আলগোছে বলিয়া যাইত পঞ্চানন, নির্ব্বিকার নির্লিপ্তচিত্তে, মনোযোগ ছিল তার শুধু বলিবার ভঙ্গীটির উপর। মাষ্টার মরিয়া হইয়া আজ তাহার বক্তব্য উপলব্ধি করে। কাজী-সায়েবের প্রতি শ্রদ্ধার তাহার অন্ত ছিল না, মরিয়া হইয়া মাষ্টার আজ তাহার বিচার করে: কাজীসায়েব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষাটা হইয়াছে তাহার কসাইএর।

বিধু সাহার বাড়ীতে পালা-কীর্ত্তন। টাকা বিধুর আগেই ছিল অনেক, ধানের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় টাকা তার আরও বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও। পাঞ্চ্লাইটের তীব্র আলোর নীচে গাঁয়ের মানুষ ভিড় জমায়, শোনে গোঁসাই-জীর মুখে রাধার বিরহ মিলন কথা, কবিতাপ্রিয়ার করুণ কাহিনী শোনে: শোনে আর খোলের তালের সঙ্গে তাল রাখিয়া মাথা নাড়ে, থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়া একটা করিয়া বিড়ি ধরায় আর দু'তিন জনে ফুঁকে।

বেঞ্চের উপর বসিয়াছে মধু: মাষ্টার মানুষ, সম্মান আছে তার, বিধু সে সম্মান রাখিতেও জানে। ইতিমধ্যেই পান খাইয়াছে দুইবার, কিন্তু তামাক ফিরাইয়া দিয়াছে, তামাক সে খায় না।

বড় মজা গলা গোঁসাইজীর! সখীর কাছে রাধার সর্ব্বহারা প্রেমের ব্যাকুলতা—

সই, কী আর কুলবিচারে।
শ্যাম বঁধু বিনে তিলেক না জীব,
কী মোর সোদরে পরে।
পীরিতি মন্তর জপি নিরন্তর
নাহিক তাহার মূল।
বঁধুর পীরিতে আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতিকুল॥

রাধার তীব্র আকুতি গোঁসাই'র কীর্ত্তনের সুরে ধ্বনি তুলিয়া বহিয়া চলে, বুকের তটে প্রতিধ্বনি ঢেউএর মত আছাড় খাইয়া পড়িয়া মনটাকে ভিজাইয়া দিতে থাকে।

আসর ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে মধু, আকাশের দিকে তাকায় একবার: তারায় ভরা আশ্বিনের আকাশ। হঠাৎ মধুর মনে হয়, তাহাকে যদি নিলামে কিনিয়া লইত কেউ, বাঁচিয়া যাইত সে। রমারা কবে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! কত দিন!

বাহিরের দরজার কাছে আসিতেই বিধু পথ আটকায়—'আরে এইড্ডা কি, উঠ্‌লা যে মাষ্টর! আরে বও বও, অখনই যাইবা কিডা!'

'শরীরটা বালা না।' মৃদুস্বরে জবাব দেয় মাষ্টার।

অত সহজে ছাড়ে না বিধু। লাড্ডু খাওয়ায়, হাত ধরিয়া আদর করিয়া দুইটি লাড্ডু খাওয়াইয়া তবে মাষ্টারকে ছাড়ে বিধু।

চলিতে চলিতে মাথাটা হঠাৎ বড় হাল্‌কা বোধ হয় মধুর। একটা চাপা উত্তেজনা সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতে থাকে। বুকের চিন্তাভাবনাগুলি ঢেউএর মত ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে থাকে—রমার চিন্তার সাদা ফেনা তাহাদের চূড়ায়। বুকের পাঁজর ভাঙিয়া একটা অসহ্য উচ্ছ্বাস যেন ফাটিয়া বাহির হইবে এখনি। মধুর পা কাঁপিতে থাকে একটু একটু। তা' হোক, সে যাইবে কলিকাতায়, রমা যেখানে তার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। গ্রাম ছাড়িয়া এক্ষুনি সে যাইবে কলিকাতায়...আলবৎ যাইবে···কেন যাইবে না? হাতের আঙুলগুলি পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে মধুর। গলাটা শুকাইয়া আসে।

কলিকাতায় সে নিশ্চয়ই যাইবে। রমাকে বলিবে—সেই বৃষ্টি, কত বৃষ্টি! সব ভুলে গেলে রমা? ভুলো না রমা! তুমি যদি জানতে রমা—হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গ মোচড় দিয়া উঠে মধুর, একটা প্রবল বমনোচ্ছ্বাস সামলাইতে গিয়া রাস্তার ধারে বসিয়া পড়ে।

বিধু অনায়াসে পারে, কিন্তু লাড্ডুর সঙ্গে মেশানো থাকিলেও এতটা সিদ্ধি মাষ্টার হজম করিতে পারিবে কেন?

পুলটিস লাগাইতে যোগেন মিস্ত্রীর জুড়ি নাই। যোগেনের চেয়ে ভাল পুলটিস লাগায় এমন কাণ্ড আশেপাশের পাঁচটা গ্রামের কেউ কখনও দেখে নাই। বর্ষার আরম্ভেই, চার ছ'য়ে চব্বিশ অর্থাৎ এক টাকা আট আনা মজুরীতে, ছয়টা পুলটিস লাগাইয়াছিল মিস্ত্রী। মাষ্টার নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু সেদিন টপ্ করিয়া একফোঁটা জল গায়ে পড়িল। চৌকির উপর পাটিতে

পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল, চিৎ হইয়া দেখিল, বাঁশের বরগায় দ্বিতীয় ফোঁটাটি চিক্‌চিক্ করিয়া নড়িতেছে, এই পড়িল বলিয়া। মাষ্টার একটু সরিয়া শোয়। চকমিলান বাড়ীটাতে যে-ঘরে অমিয়কে সে পড়াইত,—ঝড়জলে জানালা খোলা থাকিলে বৃষ্টির ছাট সেখানে ঢুকিতে পারে, কিন্তু জলের ফোঁটা বরগায় কখনও চিক্‌চিক্ করে না। সহরেও এমন অনেক বাড়ী সে দেখিয়াছে জলের ফোঁটা যেখানে চিক্‌চিক্ করিবার সুযোগ পায় না। পঞ্চানন বলিয়াছিল, 'বণ্টনের অব্যবস্থাই এই পুঞ্জীভূত—।' সুব্যবস্থা করিয়া চক্‌চকে ফোঁটাটাকে যদি বন্ধ করা যায়, তেমন সুব্যবস্থা হওয়া চাই-ই।

রঙীর মা কাপড় চাহিয়াছে। 'ছগ্‌গুয়া' ছিল, একটা আর এখন পড়া যায় না, মাষ্টার কাপড় কিনিয়া দিক। তা' বটে, একখানা কাপড়ে আর চলে কি করিয়া? কাপড় অসম্ভব আক্রা হইয়া পড়িয়াছে, বার তের বছরের কম বয়সের ছেলেদের গায়ে জামা কাপড় প্রায় দেখাই যায় না, শুধু নেংটী; মেয়েরা কাপড় পরে বটে কিন্তু বেশীর ভাগই তালি। অমিয় বলিয়াছিল—'দিদির যেন কি! খালি শাড়ী আর শাড়ী!' বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল অমিয়। দিদি ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'ভঁদু দরওয়ানকে বল যেন তাঁতিকে ডেকে আনে।' তাই বিরক্ত হইয়াছিল অমিয়। বিরক্ত হইলে অমিয়কে দেখাইত ভারি মজার, যেন ছেলের বাবা, ছেলের বকুনিতে ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন..... .....চলিতে চলিতে মাষ্টারের ভাবনা পথ হইতে গর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। হঠাৎ মাথা ঝাড়া দিয়া ভাবনাকে তাহার উদ্ধার করে সে: রমার যদি অত কাপড়, রঙীর মারই বা দুই চারিটা থাকিবে না কেন? 'দেশে মানুষ আছে, বস্ত্রে তাহাদের প্রয়োজন, কিন্তু প্রয়োজনের দাবীতে নয়, বস্ত্র তৈরী হয় মালিকের লাভের দাবীতে। কি আশ্চর্য্য সুব্যবস্থা!'—পঞ্চানন বলিয়াছিল। হঠাৎ মাষ্টার দ্বিতীয়বার যেন বুঝিল, আগেও বুঝিয়াছিল, কিন্তু আজ দ্বিতীয়বার বুঝিয়া নিজেও সে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কাপড়ের প্রয়োজন রঙীর মা'র, কাপড়ের প্রয়োজন আমার তোমার, দশজনের, সকলের সে-প্রয়োজনের তাগিদে কাপড় উৎপন্ন হইবে না, উৎপন্ন হইবে কারখানার মালিকের লাভের তাগিদে? ফলে যদি রঙীর মা'র গায়ে কাপড় না উঠে, দেশশুদ্ধ লোক কাঁপে আর নেংটী থাকে, আর রমার হয়, গণ্ডায় গণ্ডায় নয়, কুড়িতে কুড়িতে শাড়ি,

তবুও? আশ্চর্য্য হয়, আশ্চর্য্য হইয়া হা করিয়া ফেলে মাষ্টার। এতদিন ধরিয়া এমনটা চলিয়া আসিল কেমন করিয়া?—এত সব বড় বড় বিদ্বান্‌রা পণ্ডিতেরা থাকিতে? এত সব মান্য গণ্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা থাকিতে?

দুধবাজারে যাইবার পথে কালুর বাড়ীটা দেখা যায়। কালু উধাও হইয়াছে···শচীন চক্রবর্ত্তী এগার লাখ টাকা করিয়াছে···এগার লাখ!··· বৃষ্টি নাই কেন, সেদিনের বৃষ্টির ছাট···হঠাৎ করে কি মাষ্টার, পথের ধারেই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া শুঁটির ঝোপে মাথা গুঁজিয়া দেয়। শুঁটির ফুলের স্তরে স্তরে জমিয়া আছে বৃষ্টির জল, চোখে মুখে লাগাইয়া ধুতির কোঁচা দিয়া মুছিয়া মাষ্টার আরাম বোধ করে। কিন্তু এমন করিয়া কতদিন চলিবে? নিয়তই যাহা ঘটিতেছে চোখের সামনে, আশেপাশে, হয়ত ভবিষ্যতেও ঘটিবে, তাহা যদি মনের মধ্যে এমন প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহা হইলে মানুষের মাত্রাজ্ঞান বজায় থাকে কতদিন?

মাষ্টারকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। রঙীর মা ঠিকই বলিয়াছিল। চক্রোত্তিরা মাষ্টারের সর্ব্বনাশ করিয়া গেল।

ফজলুল হক

ইংরেজ-আগমনে ভারতীয় সমাজ

ইংরেজদের ভারত-আগমন বিরাট এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ। মুঘল-সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ—মারাঠা-শক্তির অভ্যুত্থান। প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতন ও নূতন রাজশক্তির অভ্যুত্থান ভারত-ইতিহাসে নূতন নয়। ভারতের মৃত্তিকায় বারে বারেই তা ঘটেছে। কিন্তু রাজশক্তির এবারকার এই যুগান্তসূচক পরিবর্ত্তনে ছিল অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা।—

মুঘল-সাম্রাজ্য ভারতের জনভিত্তিহীন টিউডর স্বেচ্ছাতন্ত্র : কৃষি-সমাজাশ্রয়ী সামন্ততন্ত্রই তার ভিত্তি। মারাঠা-শক্তিও এই সামন্ততন্ত্রকেই তো আশ্রয় করেছিল,—ভরসা করেছিল সুবাদার, জায়গীরদারের উপর। তা' ছাড়া মারাঠা-শক্তির তখন নব যৌবন, সারা দেহে শক্তির দীপ্তি—বৃদ্ধ-মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ মৃত্যুবাণ যে তারই হস্ত-নিক্ষিপ্ত।

মুঘল-সাম্রাজ্যের অবসানে মারাঠা-শক্তির অভ্যুত্থান। পথে কোথাও অনুকূল পরিবেশের ব্যত্যয় ঘটেনি—কিন্তু তবুও মারাঠা সাম্রাজ্য তো দানা বেঁধে উঠ্‌ল না। মুঘল-সাম্রাজ্যের জমাট-রশ্মি মারাঠা-সূর্য্যে তো ধরা দিল না। মুঘল-সাম্রাজ্য তার যৌবনে যেখানে চালিয়েছিল একচ্ছত্র আধিপত্য, সেখানে একমাত্র মারাঠা-শক্তির পরিবর্ত্তে দেখা দিল প্রচলিত-ব্যবস্থা-বিরোধী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত বিপ্লবী দল।

মারাঠা-শক্তির শত যৌবন সত্ত্বেও এ অক্ষমতা ছিল অনিবার্য্য।

ভারতের কৃষি-সমাজাশ্রয়ী সুদীর্ঘ সামন্ততন্ত্র তখন ধ্বংসোন্মুখ—প্রচলিত যৌথ-বিন্যাস সমাজের উন্নত উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্ক ধারণে অক্ষম। তাই, সমাজ-ব্যবস্থার চিরন্তন ধ্বংসবীজের বহিঃপ্রকাশের চিহ্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—এখানে সেখানে বিপ্লব-বহ্নি। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র তখন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়ছে—আর মারাঠা সাম্রাজ্য এই মরণোন্মুখ সামন্ততন্ত্রকেই আশ্রয় করেছিল ;—তাই মৃত্যু তার সহজাত দুর্ভাগ্যে পরিণত হ'ল।

মারাঠা-শক্তির পতনও তাই বিন্দুমাত্র অগৌরবের নয়। মুখ্যতঃ সামন্ত-তান্ত্রিক ভিত্তির শিথিলতা-অক্ষমতার দরুণ মুঘল-সাম্রাজ্যের মৃত্যু যখন পরি-

সমাপ্ত, অক্ষমতর, দুর্ব্বলতর সেই ভিত্তিকে আশ্রয় করেই মারাঠা-শক্তির তখন জীবনারম্ভ। বেশী দিন টিঁকে থাকা তাই তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। জীর্ণ পুরাতন-অবলম্বনে দীপ্ত নূতনকে অবহেলা ক'রে, ইতিহাসকে অস্বীকার ক'রে পৃথিবীর কোন শক্তির পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

ভারতের সুদীর্ঘ মধ্যযুগের যখন এমনিতর অবস্থা, অবসিত-প্রায় সামন্ততন্ত্র যখন মৃত্যুর উপান্তে, তখন এলো ইংরেজ।

প্রসবোন্মুখ ভারত ভাবী সৃষ্টির বেদনায় মত্ত—ভবিষ্য বণিকতন্ত্রের ভ্রূণ কুক্ষিদেশে।

তারপর সত্যি সত্যি একদিন তার ভ্রূণমুক্তি,—বণিকতন্ত্রের উদ্বোধন হ'ল।—কিন্তু সন্তান তার আপন হয়েও আপন নয় : বৈশ্য-বণিক্ ইংরেজের ক্রোড়দেশ তার সূতিকা-গৃহ।

এইখানেই ভারতীয় বণিক্‌তন্ত্রের চরম ট্রাজেডি।

ইংরেজ-আগমনের ঐতিহাসিক বিরাটত্বও তাই শুধু ভারত-বিজয়ে নয়,—ভারতের সুদীর্ঘ কৃষি-সমাজ জীবনে তা তো বহুবারই ঘটেছে, কিন্তু তা' কোন চিরন্তন সমাজবিপ্লবের পরিণতি কিংবা সমকালীনও তো নয়। সমাজের যৌথ-বিন্যাস, বাস্তব কাঠামোর উপর প্রভাবও তার নিতান্তই অল্প—সমাজ-শক্তি সেখানে আহত হয়েছে সত্যি কিন্তু মরণান্তে তার রূপান্তর কিংবা জন্মান্তর ঘটেনি,—সৃষ্টি করেনি কোন নূতন সমাজ ব্যবস্থা বিভিন্ন শক্তির—স্বদেশী কিংবা বিদেশী—রাষ্ট্রাধিকারে সমাজ-এ যাবৎ যে আঘাত পেয়েছে, তার পরিমাণও তাই নিতান্তই অল্প। রাষ্ট্র-শক্তির উত্থান-পতন ঘটেছে সত্যি, কিন্তু তা কৃষি-ভারতের একই সমাজ-ব্যবস্থার আওতায়। তা' ছাড়া, বিশেষ করে কৃষি-সমাজে সমাজ-শক্তি রাষ্ট্র-নগরে কেন্দ্রিত নয়—শক্তি তার বিসর্পিত—প্রাণকোশ তার পল্লীগুলি। নূতন রাজশক্তি—রাজশক্তি হিসেবেই, সমাজব্যবস্থা রচয়িতা অর্থনৈতিক শক্তির রাজনৈতিক পরিপ্রকাশ হিসেবে নয়—সমাজকে স্বল্প যে আঘাত করেছে নগরে-রাজধানীতে। পল্লীপ্রাণে—কৃষিসমাজাশ্রয়ী সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রাণবীজে—যে তরঙ্গাভিঘাত স্পর্শ করার পূর্ব্বেই ভারতের বিস্তৃত কৃষি-সমাজের বিরাট গ্রসিষ্ণুতা'র কাছে সে তার তীব্র স্বকীয়তা দিয়েছে বিসর্জ্জন।

এবারে কিন্তু ইংরেজের ভারত-বিজয় শুধু পুরাতন কৃষি-সমাজাশ্রয়ী সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে আশ্রয় করেই রাষ্ট্রাধিকার নয়। ইংরেজদের ভারত-বিজয় তার সমসূত্রে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বণিক্‌তন্ত্রেরও জয়—অন্ততঃ তার প্রথম স্বাক্ষর।

ভারতের সুদীর্ঘ সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগ তখন মৃত্যুর উপান্তে···সামন্ততান্ত্রিক কৃষিযুগ তার সমগ্র বাস্তব এবং মানস-সম্পদ্ নিয়ে ধ্বংসোন্মুখ। পুরাতন ভূমি সম্পর্ক আর নেই,···সামন্তশ্রেণী অবলুপ্তপ্রায়; কৃষি-সমাজাশ্রয়ী গৃহশিল্প নিস্তেজ, পুরানো গৃহশিক্ষা নিষ্প্রভ;—ধ্বংসোন্মুখ কৃষিযুগাশ্রয়ী পল্লীসমাজের এই হ'ল প্রকৃত রূপ।

সমাজের উন্নত উৎপাদন-শক্তি ধারণে অক্ষম কোন সমাজব্যবস্থার বিদায় ও কালোপযোগী যৌথবিন্যাস রচনার পথে পুরাতন সমাজব্যবস্থাশ্রয়ী সমগ্র বাস্তব এবং মানস-সম্পদের ধ্বসন যেমনি ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি সমাজের ক্রমবিকাশের পথে অকাম্য নয়। অকাম্য নয়, সত্যি, কারণ, সে ধ্বংসের ভেতরেই যে নিহিত ভাবী সৃষ্টির অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা।

ভারতে কিন্তু তা হলো না। সমগ্র বাস্তব এবং মানস-সম্পদ্ সহ সামন্ত-তান্ত্রিক কৃষি-সমাজ ধ্বংসোন্মুখ কিন্তু সে সমাধিস্তূপের উপর তো গড়ে উঠ্‌লনা বণিকতন্ত্রের স্বাভাবিক জীবন। বিদায়-সঙ্গীত সাঙ্গ হ'ল বটে, কিন্তু আগমনী গান তবু মুখরিত বা ঝংকৃত হয়ে উঠ্‌ল না।

ভারতীয় সমাজের ক্রমবিকাশের পথে যে ধারা স্ফুটনোন্মুখ হয়েছিল বণিক্-তন্ত্রে, তার পথ আগ্‌লে দাঁড়াল ইংল্যাণ্ডের বণিকতন্ত্রের বিরোধী স্বার্থ—যা ধীরে ধীরে ধনতান্ত্রিক রূপ পেয়ে, শ্রমশৈল্পিক স্তর ভেদ ক'রে, পণ্য ও পুঁজির স্তরে রূপ নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদে।

ইংরেজদের ভারত-আগমন তাই ভারতীয় বণিক্‌তন্ত্রের এবং সেই সুবাদে সমাজের সামগ্রিক বাস্তব এবং মানস জীবনে চরম ট্রাজেডি।

আর এই ট্রাজেডি চরমতম হয়েছিল বাঙলায়, যেখানে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার অস্বাভাবিক অনুকরণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা ভবিষ্য-বণিক-তন্ত্রের রচনোপযোগী সমাজের উন্নত শক্তি ও প্রকৃতি হয় বিকৃত। অর্দ্ধ-সামন্ততন্ত্র সৃষ্টি করা হয়েছিল খুব সফলতা সহকারে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ইংরেজ বণিকতন্ত্রের লাভের অন্ত ছিল না। ইংরেজ বণিক্ এদেশে বণিক্‌রাজ হতেই এসেছিল, সামন্তরাজ হতে নয়—এবং ভূমির এই নূতন ব্যবস্থা দ্বারা ইংরেজের সেই বণিক্‌তান্ত্রিক স্বার্থ সিদ্ধ হল খুব বেশী করেই।

জমিদারীর দায়িত্ব ছিল এদেশীয় জমিদারের উপর; ফলে, জমির হাঙ্গামা আর কৃষকের অসন্তোষের সম্মুখীন হতে ইংরেজ বণিগ্‌রাজের হত না—হতে হ'লে বিদেশী বলে শুধু যে জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধা ছিল, তা নয়; বণিক-তন্ত্রের কাজেও যে ব্যাঘাত ঘট্‌ত, তার পরিমাণও নিতান্ত অল্প হ'ত না। কাজেই দায়িত্বহীন-অধিকারের অতি বড় সোজা পথে ছিল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্ধারিত রাজস্ব কোম্পানীর হাতে আনাটা ছিল অবধারিত সত্য,—বিশেষ করে শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রা-করের প্রবর্ত্তন ও জমির রাষ্ট্রাধিকার প্রবর্ত্তনের ফলে জমির অবস্থা যতই শোচনীয় হোক্, কোম্পানীর জমিজাত লাভ ঠিক্ আস্‌বেই অথচ তার জন্যে কোম্পানীর কিছুমাত্র চিন্তারও প্রয়োজন ছিল না।—আর বিনা কষ্টে উপার্জ্জিত এই জমিজাত লাভ নিয়োজিত হ'ত বণিকতন্ত্রের পুষ্টি ও পরবর্ত্তী সময়ে শ্রমশৈল্পিক ধনতন্ত্রকে চালু রাখবার জন্যে। তা' ছাড়া, এ-দেশী বিত্তবান্ লোকদের জমিদারীতে ব্যাপৃত রাখায়, বিনা বাধায়, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বণিকতান্ত্রিক দ্বিবিধ লাভের সম্পূর্ণটাই এলো কোম্পানীর হাতে।—সামন্ততন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-সমাজের শিল্পগুলির অবসানে এদেশে যাঁরা বণিকতন্ত্র-রচনোপযোগী বণিক্ পুঁজি ও বৈশ্য-প্রকৃতি নিয়ে দেখা দিলেন, তাঁরা বণিকতন্ত্র রচনা করতে গিয়েই পেলেন বাধা—দেখ্‌লেন বণিকতন্ত্র স্বাভাবিক বিকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বহির্বাণিজ্য কোম্পানীর হাতে; অন্তর্বাণিজ্য অসম্ভব, কারণ সেখানেও চল্‌ছে নবাবী আমল থেকেই কোম্পানীর জুলুমবাজ। বণিকতন্ত্রের ভবিষ্য স্থাপয়িতা যাঁরা, তাঁরা হলেন তাই উপায় অভাবে জমিদার; তা ছাড়া, নূতন ব্যবস্থায় মুদ্রা-করের প্রবর্ত্তন ও অন্যান্য প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে দায়িত্বের তুলনায় লাভের পরিমাণটাও অন্য উপায়ের অভাবে বড় কম লোভনীয় হল না। দালালী মনোবৃত্তি নিয়ে এ-দেশী নূতন জমিদারগণ জমিদারীতে চালালেন "বানিয়তী" —জমির উন্নতি, পল্লী-সংস্কৃতির রক্ষণ নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কোন প্রয়োজনই

যে ছিল না তাদের! তা ছাড়া পুরাণো সামন্ত শ্রেণীর অবলুপ্তিতে পরবর্ত্তী-কালে তাঁদের আভিজাত-মণ্ডলে উন্নীত হওয়ার লোভও এদের বড় কম ছিল না।—এম্‌নিভাবে জমিদারীর মায়া চলল ক্রমাগতই বেড়ে—এবং অবশেষে দেখা গেল, বণিক্‌তন্ত্রের ভবিষ্য স্থাপয়িতা যাঁরা, জমিদার শ্রেণীরূপে তাঁরাই দাঁড়িয়ে আছেন এদেশে—পুরাণো ধ্বংসোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের শেষ বিক্ষোভ এবং বিশেষ ক'রে বণিকতন্ত্রমূলক কোন বিস্তৃত বিক্ষোভের প্রতিষেধক হিসেবে: আর এর প্রমাণ তো বারে বারেই আমরা পেয়েছি কর্ণওয়ালিস-বেন্টিং-এর স্বীকারোক্তিতে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বণিকতন্ত্রের ভাবী স্থাপয়িতা যাঁরা, তাঁরাই এম্‌নি করে রচনা কর্‌লেন বণিকতন্ত্রের সমাধি শয্যা—বাঙ্‌লায় বণিকতন্ত্র রচনার সব সম্ভাব্যতাই হল বিলীয়মান। অন্যান্য প্রদেশ, যেখানে রায়তরী প্রথা প্রবর্ত্তিত হল, ভূমিজাত লাভের লোভে বণিক্‌তন্ত্রের গতি সেখানে কিন্তু বিকৃত ক'রে অর্দ্ধসামন্ততন্ত্রের দিকে প্রধাবিত করা এতটা সহজ হয় নি—এবং তা' হয় নি বলেই ভারতীয় অন্তর্বাণিজ্যে কোম্পানীর জুলুমবাজ যখন কতকটা প্রশমিত হল, এবং ধনতন্ত্রের পুঁজি-রপ্তানীর স্তর যে পর্য্যন্ত পৌঁছল না, সেই অবসরে, বিশেষ করে বাঙ্‌লায় (নিজ নিজ প্রদেশে তো নিশ্চয়ই) ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বল্প যে-টুকু সম্ভাব্যতা ছিল, তার সদ্ব্যবহার কর্‌লে অন্যান্য প্রদেশ—পরবর্ত্তী যুগেও দেখি বাঙালীরা "বর্জ্জন আন্দোলন" করে, কিন্তু "শিল্প পত্তন" করে না। তা শুধু নয়, ভারতের কোথাও কোথাও এ সূচনাশ্রয়ে আজ দেখা যায় "জাতীয় ধণিকতন্ত্রে"র আভাষ—রুদ্ধ-বণিকতন্ত্রের আংশিক প্রকাশের অর্দ্ধ-পরিণত রূপ।

ভূমিব্যবস্থার পার্থক্যের দরুণ ভারতের কৃষকশ্রেণীর অবস্থার কিন্তু কোন তারতম্যই ঘটেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেখানে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, সেখানে যেমন মুদ্রা-কর ও জমির রাষ্ট্রাধিকার প্রভৃতির সাথে জমিদার জমির উন্নতির, কৃষকের সুবিধার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি—জমিদার হয়ে তখনকার বণিকতান্ত্রিক ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে জমির ব্যবসা আর কোম্পানী দালালী—, আর কৃষকশ্রেণী জমির সংস্কারের অভাবে, পল্লী-শিল্পের অরক্ষণে, রাজস্বের বোঝায় হয়েছে নিঃস্ব, রায়তরী প্রদেশেও সেইরূপ মুদ্রাকরের

প্রবর্ত্তনে, জমির অবস্থা সম্পর্কে কোম্পানীর দায়িত্বহীনতায়, অত্যধিক রাজস্বের ভারে কৃষকদের অবস্থা হয়েছে নিতান্তই দুর্দ্দশার। তা'ছাড়া, কৃষি-যুগাশ্রয়ী গৃহ-শিল্পের ধ্বংসে অথচ বণিকতন্ত্রের কোথাও তিলমাত্র আশ্রয় না পেয়ে শিল্পীরা কৃষকদের সংখ্যা তুলেছে বাড়িয়ে—অথচ সে সংখ্যা জমির উৎপাদক শক্তির তুলনায় ছিল অত্যন্তই বেশী। ফলে, জমির উৎপাদনে দেখা দিয়েছে "ন্যূনানুপাতিক ফসল"।

তারপর ক্রমে জমিদারীর রস যখন ফুরিয়ে এল, অক্ষম হল দেশের ক্রম-বর্দ্ধমান চাহিদা মেটাতে, তখন দেখা দিল সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের আওতায় এ-দেশ শাসন-শোষণের জন্যে ইংরেজী শিক্ষিত কেরানীকুল।—অর্দ্ধ-সামন্ততন্ত্র ও নব অভ্যুত্থিত এই কেরানীকুল সমাজের বাস্তব রূপকে (ঔপনিবেশিক ছাঁচে) গড়তে চেষ্টা করেছে, সন্দেহ নেই—কিন্তু সে-প্রয়াস অপরিহার্য্যরূপে এতই দুর্ব্বল যে, নবরচিত সমাজের বাস্তব রূপ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি—হওয়া সম্ভবও ছিল না।

একদিকে ভূমি সমস্যা জটিল হয়ে উঠ্‌ল,—ঋণভার, ঔদাসিন্য, শোষণ নিষ্পেষণে পল্লীর কৃষি-সমাজ হল মৃতপ্রায়, অন্যদিকে পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রের সংকটের দিনে রপ্তানী, পুঁজি ও শাসনযন্ত্রের (ক্রমবর্দ্ধিত চাহিদার তুলনায়) অক্ষমতা এতই অপরিহার্য্য যে পদে পদে ব্যর্থতা তাদের অবশ্যম্ভাবী।

আজ তাই কৃষি-সমাজের হাহাকার আর মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা।

কিন্তু কথা-টা সেখানে নয়—কথাটা সে-দিনের সমাজের বাস্তব-রূপ নিয়ে; সামন্ততন্ত্র তার সমগ্র বাস্তব এবং মানস-সম্পদ্ সহ সমাধিস্তূপে; বণিক তন্ত্র তার স্বাভাবিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না, সে-গতি উপনিবেশাধীন অর্দ্ধসামন্ত-তন্ত্রে বিকৃত। সর্ব্বশেষে সাম্রাজ্যবাদের আওতায় নূতন মধ্যবিত্তের (কেরানী-তন্ত্রের ?) আবির্ভাব—এই বহু বিভিন্ন ও বিরোধী উপাদানে গঠিত সমাজের বাস্তব-অবস্থা স্বভাবতঃই স্ব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ, বহুধা-বিভক্ত। সমাজের বাস্তব অবস্থায়ও তাই ফুটে ওঠেনি কোন বিশেষ একনিষ্ঠ রূপ। বহুবিরোধী উপাদানে গঠিত জন্মগত অসামঞ্জস্য সমাজের ফুস্‌ফুস্‌কে ঝাঁজরা করে তুলেছে—সমাজের জীবনে কিংবা দেহে তাই ফুটে ওঠেনি একনিষ্ঠ স্বাস্থ্য—চলার পথে দেয়নি

একটানা, একমুখী একটি মাত্র রেখা। তাই সমাজের জরদ্গব অবস্থা—তালে-গোলে সমাজের বিভিন্ন শক্তির জগা-খিচুড়ি।

সমাজের বাস্তব জীবনের এই নিজস্ব সামঞ্জস্য দ্বিগুণিত হয়েছে বাস্তব জীবনের সাথে মানস-জীবনের অসামঞ্জস্য দ্বারা।

কথাটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ইংল্যাণ্ডে সামন্ততন্ত্রের অবসানে মানসজীবনে এসেছে বণিকতন্ত্রাভিমুখী নূতন সাড়া—কিন্তু তা একান্তরূপেই বাস্তব জীবনের সমসূত্রে। বাস্তব জীবনের পরিবর্ত্তন সেখানে মানসজীবনের পরিবর্ত্তনকে করে তুলেছে পরিপূর্ণ এবং স্বাভাবিক। তাই ব্যর্থ হয় নি, মানসজীবনেই শুধু আবদ্ধ থাকে নি, সেখানকার রেনেঁসাস্ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্ম-সংস্কারের আন্দোলন, সাহিত্য-আন্দোলন কিংবা পরবর্ত্তীকালে (বণিক ও ধনিকতান্ত্রিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে) যুক্তিবাদ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং জাতীয়তার বোধন—এরা সব সমাজের বাস্তব জীবনজাত, ভাবী বণিকতন্ত্রের প্রয়োজনীয় মানসিক উপকরণ।

ভারতেও সামন্ততন্ত্রের অবসানে স্বাভাবিক রূপেই মানসজীবনে পরিবর্ত্তন এসেছিল—কিন্তু তার সমসূত্রে বাস্তবজীবনের সাড়া তো মেলে নি।—যাও বা তা' মৃত্তিকাজ নয়, সে সাড়া নিজস্ব জীবন থেকে ওঠে নি,—উঠেছিল এদেশে আমদানী ওদেশের বণিক ও ধনিকতন্ত্রের ছোঁয়াচ লেগে। তাই ইংল্যাণ্ডের মতোই এ দেশেও রামমোহনের যুক্তিবাদ, সমাজ-সংস্কার, সংস্কৃত চর্চ্চা, সাহিত্যান্দোলন, নূতন নাট্য ও নৃত্যকলা—সব কিছুই দেখা দিল কিন্তু বাস্তব জীবনে এর সমসূত্রে অনুকূল কোন স্বাক্ষরই ছিল না; সমাজের বাস্তবজীবন তখন গড়ে উঠ্‌ছে ঔপনিবেশিক ছাঁচে ও সাম্রাজ্যবাদের আওতায়।

সমাজের মানস ও বাস্তব জীবনের এই অসামঞ্জস্য ইংরেজাগমনের প্রথম যুগের জমিদার শ্রেণীকে কিন্তু মোটেই পীড়া দেয়নি। বিপ্লবী শক্তি হারিয়ে তাঁরা ইংরেজাধীন জমিদারীতে বিত্ত ও মান সব কিছুই পেয়েছেন। বাস্তব জীবনের নূতন সব কিছু সম্ভাবনাই যখন রুদ্ধ তখন এ অবস্থায় তাঁদের অকর্ম্মণ্য বংশধরদের সুখ আর সখ ছাড়া কী-ই বা করবার ছিল? তাই তাঁরা বিলাসে ডুবে বাস্তবকে ভুলে ছিলেন। আর বিলাসের আদর্শও ছিল মিশ্রিত আদর্শ—একদিকে প্রাচীন ভারতীয় আভিজাত্য চর্চ্চা, অন্যদিকে 'বিলিতী-বিলাস"

—যা ধীরে প্রাধান্য লাভ করে "যুব বাঙ্‌লা" যুগে সমগ্র দেশ জুড়ে বসেছিল। —বিলাসের প্রাচুর্য্যের ফলে নূতন মানস-জীবনকে দূর করা কিংবা আপন করে নেওয়া, কোনটার প্রয়োজনই এঁরা বোধ করেন নি!

কিন্তু বাস্তব জীবনের সাথে মানব জীবনের শত অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও যাঁরা আন্তরিকতা সহকারে তাকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্যে আপন করে নিতে চেয়েছিলেন, তাঁরা পরবর্ত্তী যুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই আপন করে নেওয়াটা তাদের পক্ষে যেমনি ছিল অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক তেমনি ছিল প্রয়োজনীয়। বণিকতন্ত্রাধীন জমিদারী যখন এদেশের ক্রম বর্দ্ধমান চাহিদা মেটাতে অক্ষম, তখন জীবিকার জন্যে এবং সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের নিজ প্রয়োজনে আবির্ভাব হয়েছিল প্রধানতঃ কেরাণী-রূপে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এ পথে উন্নতির জন্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা—এবং সেই সুবাদে ধনতন্ত্রের মানস সংস্কৃতির সাথে পরিচয়। তা ছাড়া, ইংরেজ প্রবর্ত্তিত ধনতন্ত্রের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার না থাক্‌লেও এদেশে এতদিনকার ধনতান্ত্রিক আবহাওয়া এ-দেশের মানস-পটকে ধনতান্ত্রিক ছাঁচে গড়ে তুল্‌তে কম উৎসাহ দেয় নি! তারপর আছে অবকাশ বিলাসের অভাব।—ইংরেজের প্রথম প্রসাদপ্রার্থীরূপে জমিদারগণ ইংরেজের প্রসাদ-লাভের জন্যেই যা' দু' একটা ইংরেজী কায়দা, ইংরেজী দস্তুর শিখেছিলেন, সে ছাড়া অবকাশের অলস দিনে তাঁরা বিলাসে ডুবে থেকে শুধু যে বাস্তব জীবনকে ভুল্‌তে পেরেছিলেন, তা নয়; কী পুরাণো প্রাচ্য সভ্যতা, কী নূতন পাশ্চাত্য সভ্যতা—উভয়কেই শুধু হাল্কাভাবে দেখেছেন, অথবা কোনটাই দেখেন নি অর্থাৎ এই উভয় সংস্কৃতিকে তাঁরা চেয়েছেন শুধু বিলাসের উপকরণ হিসেবে।—নব অভ্যুত্থিত ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে কিন্তু বিলাসে নিমগ্ন থেকে সব কিছুকে শুধুই হাল্কাভাবে দেখা সম্ভব হয় নি—কোন এক বিশেষ মানব জীবন অবলম্বনে বাস্তব জীবনে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা বাঁচ্‌তে চেয়েছেন। বিলাসের নেশায় মাতাল হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। প্রাচীন সামন্ত তন্ত্র ও তার নূতনরূপ জমিদারী থেকে তাঁদের ক্রমবর্দ্ধিত ব্যবধান এবং সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সভ্যতার ক্রমবর্দ্ধমান সংস্পর্শে তাঁরা পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সভ্যতাকেই (যুব-বাঙলা যাকে হঠাৎ গ্রহণ করতে গিয়ে

বাস্তব ভিত্তির অভাবে পিছলে পড়েছিল) ধীরে ধীরে আন্তরিকতা সহকারে আপন করে নিতে চেয়েছে। তাঁদের এই প্রয়াস কষ্টসাধ্য সন্দেহ নেই কিন্তু এই কষ্টকর প্রয়াসে যুগ-বাঙলার প্রথম ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁরা ধীরে ধীরে মানসজীবনকে অন্তত একটা বিশেষ (বুর্জোয়া) রূপ দিতে পেরেছেন।

কিন্তু এ মানস জীবন, এ মানস সংস্কৃতি একেবারেই মানসগত, সমাজের বাস্তব জীবন এর সমসূত্রে একেবারেই প্রসারিত নয়—সেখানে জীবন ডুবে আছে অর্দ্ধ সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে—তাই শত চেষ্টা সত্ত্বেও মানস ও বাস্তব জীবনের অসামঞ্জস্যের ফলে মানস জীবনে আত্মবিরোধ লেগেই আছে। বুর্জোয়া সভ্যতার মাঝেই তাই এখনও মাথা তুলে দাঁড়ায় প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ভারতীয় ঐতিহ্য, বাস্তব জীবনে যার অস্তিত্ব এখনও অর্দ্ধ সামন্ততন্ত্রে বিদ্যমান।

তাই দেখি, রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের পাখায় ভর করে বিচরণ করেন বেদ-উপনিষদের পাতায় পাতায়, শ্যাম-কম্বোজ-যবদ্বীপে অর্থাৎ "বৃহত্তর ভারতবর্ষে" খুঁজে বেড়ান ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ; আর অন্যদিকে পাশ্চাত্য মানস সংস্কৃতি পান করে তিনি দেখা দেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী রূপে য়ুরোপের শহরে-নগরে।

তা শুধু নয়, মানস-সংস্কৃতি যখন শুধু মাত্র মানসগতই থেকে যায়, তখন যে তৃপ্তির অভাব দেখা দেয়, তার ব্যত্যয় এ-ক্ষেত্রেও ঘটেনি। বাস্তব জীবনে সব সম্ভাবনা রুদ্ধ—মানস জীবনে অতৃপ্তি—তাই, এ সময়কার ভুরিভুরি তথাকথিত ধর্ম্ম ও সমাজ-আন্দোলন।

কিন্তু সে-কথা এখানে নয়।

আজকে সমাজের বাস্তব জীবন ও মানস জীবনের নিজস্ব ও পারস্পরিক যে বিরাট অসামঞ্জস্য ও বিরোধ তার ফলে সমাজে কোন আন্দোলনই আজ জমাট বেঁধে উঠছে না।

সমাজের বাস্তব জীবনে যে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অংশ আছে, সে স্থবিরতাকে আশ্রয় ক'রে সে স্থবিরতা-পরিক্রমার ভেতরে থেকে, আজকে জেগে উঠেছে ধর্ম্মমূলক রাজনৈতিক দল ; সমাজজীবনে বণিকতন্ত্রাধীন উপনিবেশ জীবনের যে অংশ আছে তার অক্ষমতার সূত্রে উচ্চ মধ্যবিত্ত জমিদার

ও বিত্তবান্ শ্রেণীর আবেদন-নিবেদন-মূলক জাতীয় আন্দোলন ; সমাজের বাস্তব জীবনের যে অংশ গড়েছে সাম্রাজ্যবাদের আওতায় নিম্ন মধ্যবিত্ত কেরানী শ্রেণী তাঁরা এই আন্দোলনকে করেছেন কিছুটা চরম ; আর সমাজের সর্ব্বনিম্নধারা গড়ে তুলেছে যে শোষিত কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী. তারা ও বুদ্ধিজীবী গড়ে তুলেছে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী আন্দোলন। আর সকল আন্দোলনেই অন্ধ-বস্তুর ছাপ লেগে আছে মানস জীবনে উপার্জ্জিত প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ডের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষার সাহায্যে য়ুরোপীয় বিভিন্ন যুগের সামাজিক আন্দোলনের আঙ্গিকের।

সমাজের উপকরণ বিভিন্ন ধর্ম্মী—সমাজের মানস ও বাস্তব জীবনে বহু গুণের সমাবেশ—, তাই যে-কোন বিশেষ আন্দোলনই সমাজজীবনে বহু উপকরণের ভেতরে কোন একটি বা গুটি কয়েক বিশেষ উপকরণের বৈপরীত্য নিয়ে আসে,—আন্দোলনে সমাজের সামগ্রিক বৈপরীত্য থাকে না ; কোন কোন গুণ নিশ্চয়ই একধর্ম্মী কিংবা একান্ত পক্ষে বিভিন্ন (বিপরীত নয়) ধর্ম্মী থেকে যায়। সমাজজীবনে কোন আন্দোলনেই তাই সংঘর্ষের সমস্ত শক্তি পায়নি এবং পাচ্ছে না।

সমাজের বাস্তব জীবনে যদি কোন সামগ্রিক অবিমিশ্র "হাঁ" (আস্তিক্য) গুণ থাকৃত, তবে কোন সামগ্রিক অবিমিশ্র "না" (নাস্তিক্য) গুণ-মূলক আন্দোলন অনেক বেশী কার্য্যকর হ'ত। আর এ-কথা তো, বৈজ্ঞানিক সত্য যে—গুণের বৈপরীত্যই সংঘর্ষের শক্তি-বীজ।

বিমলেন্দু ঘোষ

লক্ষ্মীছাড়ী

(১)

সংমার মেয়ে চাঁপা, টগর। চাঁপার বয়স হয়েচে, চৌদ্দ পার। টগর ছেলে মানুষ। বছর চারেক বয়স হবে। এই দুটো মেয়ে রেখে ওদের মা জন্মের মতো পালালো। কাজে কাজেই, মাস ঘুরতে না ঘুরতে, ওদের বাপকে আবার একটা বিয়ে করতে হয়। তা নৈলে নাকি, ওই একমেসে মেয়ে টগরকে বাঁচানো দায় হোতো।

ওসব কথা যাক্। গাঁয়ের লোকে বলতো চাঁপার রূপ আছে। কথাটা মিথ্যে নয়। ওর গালে গালে নব-অরুণের ভাতি। মাথার রাশি রাশি ঘন কালো মেঘে লেগেছে নাচন। ওর লম্বা সরল দেহখানায় বলের একটা সৌষ্ঠব আছে। হাত পায়ের চওড়া চওড়া হাড়গুলো বলিষ্ঠের কথা কয় যেন। দিঘির কালো জলের মত একজোড়া চোখ। কী চঞ্চল! চন্‌মন্ করে বেড়াচ্ছে। শুধুই দেখবে। গৌরবর্ণের মুখখানায় টকটকে-লাল সিঁদুরটিপ দেখতে ছুটে এসেচে, দুপাশ থেকে-দুটো কালো কালো তেজি ভুরু। ওর চলনে নাচন আছে। তার দোলা ওর সর্ব্বশরীরে জাগে। চুল ও কিছুতেই বাঁধবে না। আলগা-খোঁপা ঘাড়ের কাছে জড়ো করা আছেই। এই নিয়েই মেয়েটাকে সংমার কাছে অনেক সইতে হয়েচে। তেজী ঘোড়া হঠাৎ যদি ছাড়া পায়, আর দেখে, কেউ তাকে ধরতে আসচে না—তখন সে সতেজ মন্দ-লয়ে চলতে থাকে। ঠিক তেমনি ধারা চলনের চাল চাঁপার। একখানা হাত দুলিয়ে, লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে, ঘাড় দোলাতে দোলাতে ও চলবে। ওর চলনে রীতিমত একটা ভঙ্গিমা আছে। চলতে চলতে ও হঠাৎ থেমে পড়ে। ভাবে, এখানে দেখবার কিছু আছে বা। অত বড় মেয়ে হোলো, তবুও কাউকে ওর লজ্জা নেই। সবাইকার দিকে ওর সেই নিকষ-কালো চোখ তুলে চেয়ে থাকবে। যেন চিন্‌চে। তাও অল্পক্ষণ। তারপর আবার চলন। ও ঠায়ে চলে। কিন্তু তার একটা বেগ আছে। এই বেগ গিয়ে পৌঁছায় ঘাড় পর্য্যন্ত। চলনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানটা বিচিত্র রেখায় রেখায় বেঁকে উঠতে থাকে। চাঁপার গলায় এই যে বঙ্কিম ঢেউ ওঠে, তার ঘা লাগে জড়ো-করা আলগা-খোঁপায়।

দু-চারটে ঠোকা লাগ্‌তে না লাগ্‌তেই সে-খোঁপা কালো ঝরণাধারার মতো ওর পৃষ্ঠগিরি বেয়ে ঝাঁপ খেয়ে নেবে পড়ে। চাঁপা যে নেচে চলে তার প্রমাণ মেলে এইবার, ওর পিঠের কালো ঢেউয়ে ঢেউয়ে। রূপে তো মেয়েটা এই। গুণ-ও নাকি ছিলো। পাড়ার লোকেরা তো তাই বলে। শোনা যায়, সৎমা ওদের ভাল করে মানুষ করেচে। কোনো ত্রুটি রাখেনি। কাজেই ঘর-সংসারের কাজ, ঠাকুরসেবায়, লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে চাঁপার নাকি খুঁৎ মিলতো না।

সৎমার কাজের চাকা থেকে ছুটি মিলত দুপুরে। এইটুকু চাঁপার নিজের সময়। ও খবর নিয়ে দেখে, হয় সৎমা ঘুমিয়েছে, নয় রামায়ণ পড়তে ও-পাড়ায় গেছে। ব্যাস্। কাপড়খানা গুছিয়ে নিয়ে আঁচলটায় গাছকোমর বাঁধে। টগরকে এক হ্যাঁচ্‌কাটানে তার খেলাঘর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলে, চল্ টগ্‌রা।

টগরও তাই চায়। কারণ সৎমাটা ভারি কড়া। খালিখালি ভালো হোয়ে থাক্‌তে বলে। তা নইলে কঞ্চি পেটা। টগর বলে, দিদিরে, আজকে চল দুলে পাড়ায়। যা কামরাঙা পেকেচে! তাড়াতাড়ি জিবের জল সাম্‌লে নেয়।

তারপর টগরকে কোলে নিয়ে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে, তালে তালে ঘাড় বেঁকিয়ে, চাঁপা চলতে থাকে। যেতে যেতে চাঁপা ওর বোনকে চেনায়—কোনটা শালিখ, কোনটা ময়না, কোনটা ছাতারে। কদম, বাঁশ, ঘেঁটু, ছাতিম, ধুঁতরো, আকন্দের তফাৎ বুঝিয়ে দেয়।

টগরের যে আকাশ পাতাল জিগ্যেস্। বল্‌বে, হ্যাঁরে দিদি, বাগ্দীরা—য়্যাঁ? বাগ্দী ক্যানোরে?

চাঁপা বলে, দুর পোড়ারমুখী, তবে কি বাগ্দীরা বামুন হবে?

ও আবার বলে, আচ্ছা ভাই দিদি, রামঠাকুরের বৌ আছে ক্যানো বল দিকি?

চাঁপা ওর গালে ঠোনা মারে। বলে, রাক্কুসী তোরও বর হবে।

টগর ভাবে, ওটা তাহলে বিশেষ কোনো একটা মজা হবে বোধ হয়। ওর বেশ লাগে।

এইভাবে চলতে চলতে ওরা ঝোপে ঝাড়ে বাগানে ঘোরে—বোঁচ, কামরাঙা, আমলকী, বকুল ফল দিয়ে কোঁচোড় ভরে। মুখ এক মুহূর্ত্ত থেমে থাকে না। কথায় আর চিবোনোয় মুখ চলচেই। তাই বলে ফুল ওদের কাছে তুচ্ছ নয়। অশোক, চট্‌কা, ধুঁতরো, দোপাটি, অপরাজিতা, কদম, ঘেঁটু, ভুঁইচাঁপা, যা যেখানে পায় তুলে তুলে টগরের কানে চুলে হাতে গুঁজে দিয়ে সাজাতে থাকে। কোলে চড়ে' টগর নিজের হাতের ফুলে দিদির মাথা সাজায়।

তারপর নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরে আসে। লেগে যায় ঘরের কাজে। দেরি হলে বকুনি তো খায়ই। কাঁটার খোঁচা লেগে চাঁপার কাপড় যে কি করে কখন ছিঁড়ে থাকে, সেইটেই ওর ভারি আশ্চর্য্য লাগে। এর জন্যে চাঁপাকে মার খেতে হয়। সৎমা ওর চুলের ঝুড়ো ধরে নেড়ে দেয়। পিঠে দেয় ঢিপ্‌ঢাল্‌তা। আর অজস্র গালাগালি তো আছেই। ওরা দুবোনে মুখ কাঁচুমাচু করে দিনভোর জোগাড়ের ফলগুলো সাঁঝের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে চিবোয়।

গঙ্গাসাগরের মেলায় চাঁপার সৎমা গেলো, ওদের দুবোনকে ঘর পাহারা দিতে রেখে। আজ হঠাৎ একেবারে একলা হয়ে গিয়ে চাঁপার ওর বাপকে মনে পড়তে লাগলো। ওর মা মারা গেল, সে তো চাঁপা স্বচক্ষে দেখেচে। তারপর এল সৎমা। শেষে গেল বাপ। ওর মনে, পড়তে লাগলো, বাবা ওকে ভালবাসতো! কিন্তু টগরের দৌড়ঝাঁপে, চাঁপার মন থেকে এ সব ভাবনা উড়ে গেল। ও নিজেও লাফিয়ে উঠলো। সায় দিলে ওর মন টগরের ডাকে।

টগর বল্‌লে, দিদি, চল যাই।

চাঁপা বলে, দূর রাক্কুসী! এই সকালবেলা? রান্না করবো না? আজকে যা ইচ্ছে রাঁধবো রে টগর।

টগর যা ইচ্ছের কথা শুনে নেচে ওঠে। বলে, দিদি, তাই কর। চাঁপা বলে, বেশী রাঁধবো না। দেরী হবে তা হলে। তার চেয়ে শুধু ভাত আর ডালভাতে। বেশী করে তেলনুন আর দুটো কাঁচালঙ্কা মেখে—উঃ। ও আর বলতে পারে না। ঐটুকু রান্না হতে আর কতক্ষণ। তারপর বেরবো, কি বল!

টগর খুসী। বলে, খুব খুব।

ওরা যে ছাড়া পেয়েচে। যা-ইচ্ছে করতে পারবে এই আনন্দে ওদের মন যেন সারাদিনমান ধরে চার হাত পা তুলে নাচতে লাগলো।

অনেকদিন থেকে চাঁপার একটা সখ, ছিপ ফেলবে। ভয়ে ভয়ে কথাটা একদিন সৎমার কাছে বলেও ফেলেছিলো।

সৎমা মারমুখী হয়ে উঠলো। গালে এক ঠোনা মেরে বললে, ও হারামজাদি, মেয়ে হয়ে তোমার মদ্দানি চাল ঘোচাচ্চি, দাঁড়াও।

বাস। সেই থেকে কথাটা চাঁপা ভুলতে কত চেষ্টাই না করেচে। আজ ও টগরকে ছোঁ মেরে চ্যাঁকে তুলে নিয়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে চল্‌লো বঙ্কা যুগীর বাড়ি।

টগরের অনেক দিনকার পুরোনো ব্যথা জেগে উঠতে থাকে। দুগাছি করে কচি-কলাপাতারঙের বেলোয়ারি চুরি ও সেবারে সৎমার কাছে পরতে চেয়েছিলো। আর তার মুখে একগাছা করে লাল রুলি। সৎমা ওর বাঁ হাতের নোয়াগাছা দেখিয়ে বললে এর বেশী আর কিছু হবে না। সেই অবধি ঐটুকুন মেয়ে চুপ করে গেচে। আজ তাই দিদির কথার জবাব দিতে গিয়ে বল্‌লে, চুড়ি পরবো বুঝি?

টগরের এই দুঃখটা চাঁপা জানতো না। তাই বললে, দূর পুড়ারমুখী, চুড়ি পরে কি করবি? একবার আছাড় খেলেই তো সব গুঁড়ো। তার চেয়ে চল— পুঁটুলে বোঁড়্‌শি আর সুতুলে কড়্‌কিনে আনি। ডোবায় ডোবায় ছিপ্‌ নাচাবো, দুধে কেঁচো আর পিপড়ের টিপ দিয়ে। ষোল ল্যাঠা কৈ মাগুর পুঁটি বাটা, টগরারে—বেশী করে লঙ্কা বাটা দিয়ে রসো রসো চচ্চড়ী— তুই আর আমি। উঃ। কদ্দিন মাছ খাইনি বল দিকিনি!

টগর দুহাতের তেলোয় চাঁপার গাল দুটো চেপে ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে এনে বলে, আমি ভাই দুটো মাছ খাবো। একটা ন্যাজা।

চাঁপা বলে, দুটো কি? যত ইচ্ছে খাবি। এখন কে আমাদের বকবে! কিন্তু ছাখো টগরমণি, মাকে খবোদ্দার বলো না যেন। তাহোলে কারুর পিঠ আর আস্তো থাক্‌বে না।

টগর মুখখানা ঠেকিয়ে বলে, ইস্, বলবো বৈ কি।

হ্যাঁ দিদি, পয়সা কোথায় পেলিরে ?

চাঁপা বলে, মাকে বলিস্ নি ভাই, লক্ষ্মীটি। সেই যে নুন তেল কিনতে দুগণ্ডা পয়সা দিয়ে গেচে।

টগর বলে, দিদি, তাই থেকে চুড়ি পরিয়ে দিবি, না ?

চাঁপা ওর হাত দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, লুকোবি কি করে ? মা যখন জিজ্ঞেস করবে ?

টগর চোখদুটো বড় করে চেয়ে বলে, ইল্লি! ইঁট দিয়ে ঠুকে ভেঙে ফেলবো না। তারপর দিঘির জলে খুব দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

দিদি বলে, আচ্ছা।

এক পয়সার কড় বঁড়শি কঞ্চির ছিপে চড়লো। ময়ূরের পালক কেটে হলো ফাৎনা।

টগর জিজ্ঞেস করে, দিদি, ছিপ তো নাচাবি। তবে ? ফাৎনা কি হবে ?

চাঁপা বলে, থাকলোই বা। নাচাতে নাচাতে হাত ব্যথা করলে ফেলে বসে থাকবো।

টগরের হাতে একটা নারকেলমালা। তার ভিতরে মাটি চাপা আছে দুধে কেঁচো। এগুলো চাঁপা মিত্তিরদের গোবর গাদা খুঁড়ে জোগাড় করেচে। আর ওর নিজের আঁচলে গেরো দেওয়া আছে কচুপাতে মোড়া পিঁপড়ের টিপ। ঝোপে ঝাড়ে যে সব খানাখন্দ ডোবা পচাজলে ভর্ত্তি থাকে তাতে নাকি মাছ কিল্-বিল্ কোরচে।

চাঁপা ছিপ নাচায়। টগর নারকেল মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর অন্যহাতে তালপাতার একটা ছিলে। তাতে কতকগুলো ল্যাঠা কৈ যোলের কড়া—ফুলগাঁথার মত করে গাঁথা আছে কানকোর ফাঁক আর মুখের হাঁ মিলিয়ে। এদুটো মাটিতে নামিয়ে রেখে টগর মশা মারে। কচি হাতের চাপড়ে শব্দ হয়। বলে, দিদিরে, এখানটায় বড্ড মশা।

চাঁপা একদৃষ্টে ছিপ নাচানোর দিকে চেয়ে থাকে। চুপিচুপি বলে, চুপ।

টগর তবুও শব্দ করে মশা মারে। শব্দ হয় ফটাফট, চটাপট্। চাঁপার চার থেকে মাছ সরে যায়। এই তার রাগ। মাছটা নাকি খুব বড়ো। সেই রাগে ও টগরকে ছিপপেটা করে। মার খেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে টগর ডুকরে কেঁদে

ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে চাঁপারই গায়ের ওপর। দুটো হাঁটু দুহাতে জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে।—ও দিদি ভাই, বড্ড লেগেচে রে। আর কক্ষোনো করবো না ভাই। মারিস নি ভাই।

দিদি ভাইয়ের চখে জল আসে। ও ভাবে, কেনই বা মারলুম! টগরকে কোলে তুলে নিয়ে গালে চুমু খায়। আর চুপ করে থাকে। কোলে উঠে চাঁপার কাঁধে মুখ গুঁজে, টগর ফোঁপাতে থাকে। চাঁপা আস্তে আস্তে ওর পিঠে হাত বুলোয় আর ভাবে কিসে টগর ভুলবে। টগরের সামনে ছিপটা ও টুক্‌রো টুকরো করে ভেঙে পুকুরের জলে ফেলে দিলে। টগর চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। ওর কান্না থামলো। কিন্তু ফুলে ফুলে ওঠা থামে না।

চাঁপা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে আদরের সুরে জিগ্যেস করে, বড্ড লেগেচে টগরমণি ? বড্ডোরে, বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। টগর, চাঁপা বলে, আর মারবো না ভাই, চুপ কর।

ওর গালে মাথায় চুমু খায়। মাছের গাঁথুনিটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চাঁপা চলে। আর ভাবে টগরকে হাসাতে হবে। নইলে মনটা কিরকম খারাপ লাগে।

চাঁপা বলে, টগর, ভাই, চুড়ি পরবি ? কাল নিয়ে যাব বঙ্কা যুগীর বাড়ী।

টগর তাড়াতাড়ি মুখখানা ফুলো ফুলো করে বলে, কলাপাতারঙ চুড়ি —আর লাল রুলি।

চাঁপা বলে, আচ্ছা। কি রাঁধবো বলো তো টগরমণি, আজ খুব খাবো, কেমন ?

টগর সোৎসাহে হাঁফিয়ে উঠে বলে, দিদি সজনে শাক ভাতে আর, আমরুল-পোড়া। আর মাছ দিয়ে বাটী চচ্চড়ী। ব্যস্। কি বল ?

বলতে বলতে ফুঁপিয়ে ওঠে।

কাজেই পথের ধারে যে সজনে গাছ পড়ে, তাতে বাড়ি মারতে হয়। কচি কচি সজনে-পাতা হলো, ওদের সজনে-শাক! টগর ততক্ষণ এদিক ওদিক খুঁজে আমরুল শাক ছেঁড়ে। আর মাঝে মাঝে দুচারটে গালে ফেলে। বলে দিদি, বেশ রে, খা-না!

চাঁপা তখুনি খায়। আমরুলের ছোটো ছোটো ফলগুলো দেখতে ঠিক যেন ঢ্যাঁড়োশ। এই ওদের খেলাঘরের ঢ্যাঁড়োশ। আমরুল ফল পাতার

চেয়ে আর একটু বেশী টক্। তাছাড়া ওর বিচিগুলো জিবে বেশ কড় কড় করে। তাই ওদের যত লোভ।

টগর বলে, দিদি, দেখেচিস্? পাতাগুলো কি সুন্দর দেখতে?

চাঁপা বলে, ঠিক যেন সব্জে ফুল। আঁচলে আলাদা করে দুটো গেরো দেয়। একটায় সজনে শাক্, আর একটায় আমরুল শাক্। টগরের হাতে মাছের পাতার ফালিটা তুলে দিয়ে, চাঁপা ওকে কোলে তুলে নেয়। তারপর ডান হাতখানা দুলিয়ে দুলিয়ে এক কাঁড়ি চুলশুদ্ধ মাথাটা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে এগিয়ে চলে। টগর ওর কোলে চড়ে দোলা খায়। ওকে খুসী করবার জন্য চাঁপা নিজের পায়ের কাপড় হাঁটু পর্য্যন্ত তুলে ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়োয়। খুব ঝাঁকানি খেয়ে টগর খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। চাঁপার মন তখন খুসী হয়। চাঁপা কাপড়ে মুখ পুছে কপাল থেকে চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দেয়। তারপর দীর্ঘ-পদ-বিস্তারে হাত দুলিয়ে মাথা নেড়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চাঁপা গাঁয়ের পথে এগিয়ে চলে।

ওর চলনের এই কায়দা দেখে গাঁয়ের লোক অবাক। ভাবে মেয়েটার এত তেজ কোথা থেকে আসে। এসব ওদের সহ্যও হয় না, ভালোও লাগে না। মেয়েরা তাই বলে, বাবাঃ, মেয়ে নয়তো যেন দস্যি। পুরুষরা বলে, ঘোড়া-মেয়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

পৃথিবী

(১)

স্বর্ণশস্য ছন্দিত মাঠ
ঘন নীলাভ্র স্নিগ্ধ ললাট
উদয়াস্তের দিগন্তরেখা লাল চন্দনে চর্চ্চিত।
নব সভ্যতা যন্ত্র জমাট
ভেঙেছে কালের অন্ধকপাট
প্রাণ-ভাস্বরা হে বসুন্ধরা নামো যুগ যুগ অর্চ্চিত॥

(২)

কপালে কুমুদবান্ধব লেখা
রুপালি তারার চিত্রিত রেখা
পুষ্পিত প্রাণ বসন্তমদমত্ত অলির গুঞ্জনে।
মহামণ্ডলে বাঙ্ময়দ্যুতি
নানা মানুষের ছন্দানুভূতি
অসীম ঐক্যে মাতায় বিশ্ব আনন্দরস ভুঞ্জনে॥

(৩)

তুরীয় সত্যে মহাবলবান
দীক্ষিত কোটি নর-সন্তান
জ্ঞানে ধ্যানে অনুরঞ্জিত করে শ্যামলী স্বর্ণ মৃত্তিকা,
বিগত যুগের চিতানল শিখা
বেদনার স্মৃতি ম্লান মরীচিকা
লুপ্ত করেছে তপ্তগৌরকাঞ্চনকায়া কৃত্তিকা॥

(৪)

প্রাণপুষ্পের অমৃত পরাগ
রসমাধুর্য্যে গাঢ় অনুরাগ

রক্ত চরণে যুগ-প্রগতির রঞ্জত নূপুর নিক্কণে,
তন্দ্রা ভেঙেছে তুন্দ্রালোকের
অরোরার শীত শুভ্রালোকের
আদি অজগর মরেছে কাতর গরলোদ্গারী স্ফুরণে ॥

(৫)

উদয়াচলের লাল আভা জ্বলে
শ্যামা পৃথিবীর কনকাঞ্চলে
অনাগত কাল কল্লোলে কাঁপে প্রশান্তে অতলান্তিকে ।
হে বসুন্ধরা ঐক্যে মাতাও
দেশে দেশে নব সখ্য পাতাও
স্বাদেশিকতার ঘৃণ্য বর্ণবিদ্বেষী-যুগ প্রান্তিকে ।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আজ ভারতবর্ষ আর কেবলমাত্র বৈদিক-আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীর দেশ নহে। ভারত আর পুরাণ ও স্মৃতি কল্পিত জম্বুদ্বীপের চাতুর্ব্বর্ণাশ্রমীয় রাষ্ট্র নহে। একদিকে দুর্লঙ্ঘ্য হিমবন্ত, আর অন্য সবদিকে, সমুদ্র-মেখলাবেষ্টিত হইয়া যুক্তি-বিহীন কাল্পনিক আদর্শে নিমগ্ন দেশ আর ভারত নহে। আজ ভারতের এক তৃতীয়াংশ অহিন্দুর দেশ; ইহার সহিত বেদ ও পুরাণের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার আনুগত্য ভারতের বাহিরে এবং অনুপ্রেরণাও বাহির হইতেই আসে। সেইজন্য অ-হিন্দু ভারতের সমাজতত্ত্বের বিষয় এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এই অ-হিন্দু ভারতের মধ্যে আরবের ইসলাম-ধর্ম্মীয় লোকের সংখ্যা হিন্দুর পরই সংখ্যা-গরিষ্ঠ; তাঁহারাই ভারতীয়দের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বলিয়া কথিত হইতেছে। এইজন্য তাঁহাদের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন আরবের সহিত ভারতের সম্পর্ক জানা প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতীয়দের নিকট আরবদেশ অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু বিদেশ সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যায় নাই [পৌরাণিক শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শ্বেতদ্বীপ প্রভৃতির গল্পগুলি বড়ই কল্পিত (বিষ্ণু পুরাণ, ১।২২।৫-৭); বাবেরু জাতকের গল্প হইতেও কোন সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায় না]; কাজেই এই সম্পর্কে বিদেশীয়দের নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে বাধ্য। এইরূপ কথিত আছে, প্রাচীনকালের ভারত, মিশর ও ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যিক-মধ্যবর্ত্তীতা আরবদের হাত দিয়াই হইত (১)। এখনকার অনুসন্ধানকারীদের

১। ভারতের সহিত ইসলাম-পূর্ব্ব আরবের সম্পর্কের পরিচায়ক তিনখানি প্রস্তর ফলক পশ্চিম ভারতের 'ভূজ' (Bhuj) নামক জায়গার গোরস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। একখানি হিব্রুভাষায় লিখিত জনৈক ইহুদির কবর মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ

বিবরণ এই যে প্রাচীন ভারতীয়েরা যেমন পূর্ব্ব-আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তদ্রূপ আরবেও ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল (২)।

ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব নেতাদের লোলুপ দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপর পতিত হয়। কোরাণে যে তাহারা অজ্ঞাত ছিল মনে হয় না। ইহুদি জনশ্রুতিতে পাওয়া যায় যে নোওয়ার এক পুত্র হামের সন্তান "হানুদ" ভারতে বসবাস করিতে আসে। কোরাণেও উক্ত জনশ্রুতি আছে বলিয়া শোনা যায়। আবুল ফজলের 'আকবর-নামা' পুস্তকে এই ইসলামীয় প্রবাদটি উল্লিখিত আছে। এইরূপ বলা হইয়াছে যে বাবা আদম স্বর্গ হইতে

১২৫ খৃঃ বলিয়া অনুমিত হয়। অপর দুইখানি দক্ষিণ-আরবের হিমইয়ারীয় (Himyaritic) ভাষায় এবং অক্ষরে লিখিত। এইগুলি আরবের সাবাইয় (Sabaean) প্রস্তরলিপির অন্তর্গত। আরবের সভ্যতা সর্ব্বপ্রথম সাবাইয়-যুগে দক্ষিণে বিবর্ত্তিত হয় (Hitti—History of the Arabs, Pp. 30-66)। বোম্বাই মিউজিয়ামে এই ধরণের আর একখানি প্রস্তরলিপি রক্ষিত আছে। এই লিপি একটি নরমূর্ত্তির গাত্রে খোদিত হইয়াছে ; মূর্ত্তিটির মস্তকে একটি টুপি এবং কোমর হইতে জানু পর্য্যন্ত loin-cloth দ্বারা আচ্ছাদিত, আর বাকী সব অংশ অনাচ্ছাদিত। এই মূর্ত্তিটি 'Waddab' নামক এক দেবতার মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। হিটি বলেন, দক্ষিণ-আরবদের চন্দ্র-দেবতার নাম ছিল Wadd (পৃঃ ৬০)। এতদ্বারা নির্দ্ধারিত হয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতে আরবেরা কার্য্যোপলক্ষে ভারতে আগমন করিতেন। ব্যবসায় নিশ্চয়ই এই কার্য্যের উপলক্ষ ছিল। এই বিষয়ে Epigraphica Indica, Vol. XIX ; 1927-28 ; No. 54 "Three Shemitic Inscriptions from Bhuj", Pp. 300-330 দ্রষ্টব্য।

২। Margoliouth—The Rise and Development of Mahomedanism ; Von Luschan—Rassen, Sprachen und Voelker ; De Lcay O' Leary—Arabia before Mohammed দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ব আফ্রিকায় হিন্দু-স্থাপত্যের ভগ্নস্তূপ এবং ভারতীয় কুঁজ বিশিষ্ট গরুর (Bos Indicus) নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৯২৪ খৃঃ জার্ম্মান পণ্ডিত Dr. Friedrich জার্ম্মানীর নরতাত্ত্বিক সোসাইটীর এক বক্তৃতায় বলেন, বান্টু-নিগ্রো জাতির ভাষার মধ্যে অনেক ইণ্ডো-ইউরোপীয় শব্দ (সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি) রহিয়াছে। তিনি লেখককে বলেন, যে প্রাচীন জার্ম্মাণ-পূর্ব্ব-আফ্রিকায় তিনি এমন একটি কৌম (২০০০ সংখ্যক) দেখিয়াছেন যাহারা রক্তে খাঁটি ভারতীয় ; কিন্তু তাহারা স্বীয় ভাষা বিস্মৃত হওয়ায় নিজেদের উৎপত্তির কথাও ভুলিয়া গিয়াছে।

বিতাড়িত হইয়া মর্ক্তে সোরণ দ্বীপে (সুবর্ণ দ্বীপ ?) অবতরণপূর্ব্বক বাসস্থল নির্ম্মাণ করেন (আমীর খস্রোর ফার্শী কবিতা দ্রষ্টব্য)। এই জন্যই সিংহলের Adam's Peak আজও পর্য্যন্ত মুসলমানদের নিকট একটি তীর্থস্থল হইয়া রহিয়াছে (৩)।

ইসলামীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উম্মিয়াদ খলিফাদের শাসনকালে মহম্মদ-বিন্-কাসেমের সিন্ধু আক্রমণ হয়। কথিত আছে, লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহের সহিত সেই সময় উষ্ট্র পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়াই ভারতীয় পুস্তক সমূহও আরব রাষ্ট্রে প্রেরিত হয়। তৎপর বোগদাদে আব্বাশীয় খলিফাদের শাসন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয়ের তথায় সমাগম হয় এবং সংস্কৃত পুস্তক সমূহও আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইতে থাকে। কেহ কেহ আবার ইহাও বলেন যে বারমেকী নামক আরব সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বংশীয় লোকদের দ্বারাই এই যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ আকার ধারণ করে। এই বারমক বা বারমকীয় বংশের ইতিহাস অতি রহস্যজনক। আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন, আরবীয়েরা এক পারশীককে বালখ সহর হইতে ধরিয়া আনিয়া খলিফার নিকট হাজির করে। সে তাহার পরিচয় প্রদানকালে বলে যে, সে একজন বারমাক এবং বলখের "নিউ-বিহার মন্দিরে"র পুরোহিতের পুত্র (৪)। এই 'নিউ-বিহার' শব্দের উৎপত্তি লইয়া প্রাচীন আরব ভাষাতত্ত্ববিদেরা নানা গবেষণা করিয়াও উহার কোন কূলকিনারা করিতে পারেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ব বিশারদগণ স্থির করেন যে এই শব্দ সংস্কৃত 'নব-বিহার' হইতে উৎপন্ন। এককালে যাহা জারতুষ্ট্রীয়দের অগ্নিপূজার মন্দির ছিল তাহা পরে বৌদ্ধ বিহারে পরিণত হয় এবং মুসলমান যুগে তাহা আবার মসজিদে পরিণত হয়। ইহার নিদর্শন ধ্বংসাবশেষ এখনও পর্য্যটকেরা দেখিতে পান। অধ্যাপক সাখাউ অনুমান করেন যে, হয়ত 'বারমকী' শব্দ সংস্কৃত "পরামক" শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ প্রধান ব্যক্তি, অর্থাৎ বিহারের অধ্যক্ষ। হিটি বলেন, আব্বাশীয় খলিফ আল-মানসুরের প্রধান উজির খালিদ-ইবন্ বারমক-এর

৩। এই তীর্থস্থল সম্পর্কে Ibn Battutah's Travels দ্রষ্টব্য।

৪। Christomatic Persan—Les Bermecide ; Kern—Geschichte des Buddhisums in Indien, P. 445, 543.

পিতা বল্‌খের বৌদ্ধ মন্দিরে 'বারমক' (Barmak), অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত ছিলেন (৫)। বারমেকীদের বংশের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে যে, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের জন্য ইহাদের একজন কাশ্মীরে আগমন করিয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহারা জাতীতে পারসিক ছিলেন এবং হয়ত এককালে হিন্দু গোঁসা লোক ছিলেন। তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব-সময়ে অনেক সংস্কৃত পুস্তক আরবী ভাষায় তর্জমা করা হয় এবং অনেক হিন্দু যোগদাদের রাজসভায় স্থান পায়। খলিফার দরবারে হিন্দু পাণ্ডিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল এই বংশ (এই বিষয়ে সাখাউয়ে আলবেরুণী, পৃঃ XXXI দ্রষ্টব্য)। (৬) আরবদের সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণের ফলে একদিকে যেমন সংস্কৃত পুস্তক সমূহ, হিন্দু বৈদ্য (৭) প্রভৃতি আরবের রাজসভায় আনীত হয় আর একদিকে তদ্রূপ অনেক ভারতীয় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে খুব খ্যাতনামা হন। লেখক বিভিন্ন প্রাচ্য-বিদ্যা-বিশারদের পুস্তক হইতে এরূপ্রকারের সাত জন ভারতীয়ের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কারম্যাথীয় নামক সম্প্রদায় সিরিয়া (সাম) শাসনকালে যিনি প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন তিনি কোন এক ভারতীয় বংশোদ্ভব ব্যক্তি। তিনি একজন খুব বড় আরব-কবি ছিলেন। ইঁহার নাম ছিল ইবন্ কুসাগিন বা কুসগিম্ মাহমুদ বিন্ অল্-হোসেন বিন্ সাহাক। ইঁহার পিতামহ সিন্ধুদেশ হইতে তথায় আগমন করেন। ইনি ৯৭১ খৃঃ মারা যান (৮)। অপর একজন বড় পণ্ডিতের নাম বিন-জিহাদ বিন অল্ আরাবি। ইনি ৭৬৭ খৃঃ কুফা নগরে জনৈক সিন্ধুদেশীয় গোলামের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। হাশেমী আব্বাস ইঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। ইনি অল্-মফদ্দলের দত্তকপুত্র ও শিষ্য ছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণিকও ছিলেন। তিনি যখন শিক্ষাদান করিতে থাকেন তখন তিনি অনেক ছাত্র পাইয়াছিলেন।

৫। P. K. Hitti—History of the Arabs, p. 294 ; Ibn-al-Faqih, Pp. 322-24 ; Tabari, Vol. II, p. 1181 ; Ya-qut, Vol. IV. p 818

৬। John A. Subhan—Sufism, its Saints and Shrines, p. 133.

৭। হারুণ উল্-রসিদ্-এর হিন্দু-বৈদ্যের নাম ছিল "মাঙ্কা"। Brockelmann—Geschichte des Arabischen Literatur, Vol. I. p. 23

৮। Goige's Carmathes, p. 151-152 এবং Brockelmann—Geschichte des Arabischen Literatur, Vol. I, p. 85.

তিনি সামারাতে ৮৪৪ খৃঃ মারা যান। তাঁহার রচিত পুস্তক সমূহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে (৯)। আরও একজনের নাম এখানে উল্লিখিত হইল যদিচ ইহা অমীমাংসিত ও তর্কের বিষয়। ইনি খ্যাতনামা শাস্ত্রবিৎ আবু হানিফা ; তিনি ৮৯৫ খৃঃ মারা যান। তাঁহার পিতামহ ছিলেন খোরসান হইতে আনীত জনৈক গোলাম—নাম ছিল ওয়ানন্দ (Wanand)। এইজন্য Brockelmann তাঁহাকে পারসিক বংশীয় বলিয়া ধরিয়াছেন (১০)।

মিঃ ব্রাউনও তাঁহাকে পারসিক বলেন। কিন্তু তাঁহার পিতমহের নামটি সবিশেষ লক্ষণীয় ; আনন্দ নামটি জারতুষ্ট্রীয় না হইয়া ভারতীয় হইতে পারে।

যে কয়েকজন ইসলামীয় শাস্ত্র ও আইন ব্যাখ্যাতা উদ্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আবু হানিফা অন্যতম। ভারতের বেশীর ভাগ মুসলমান তাঁহার মত মানিয়া চলেন।

জনৈক ভারতীয় মওলানা লেখককে বলিয়াছেন, আবু হানিফা জাঠ বংশীয় ছিলেন। আরবগণ আফগানীস্থান আক্রমণকালে তাঁহার পিতামহকে ধরিয়া লইয়া যায়। আরবীভাষায় তাঁহাকে Zot বলা হইয়াছে। তিনি বলেন, এক সময়ে জাঠেরা আফগানীস্থান শাসন করিতেন, তজ্জন্য তথায় জাঠ জাতির অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। মওলানা সাহেবের সংবাদ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়, কারণ পূর্ব্বোক্ত 'আনন্দ' নামটি হিন্দু নামেরই পরিচায়ক বলিয়া অনুমান হয়। এক সময় পূর্ব্ব-পারস্য হইতে উত্তর-ভারতের একাংশ পর্য্যন্ত 'খোরসান' নামে অভিহিত হইত এবং পারস্যের কারমান প্রদেশ পর্য্যন্ত জাঠদের বাসস্থান ছিল (১১)। কাজেই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এ-বিষয়ে ভ্রম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই বিষয়ে সঠিক অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

এক্ষণে লক্ষণীয় যে ইস্‌লাম-জাত সুফীধর্ম্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে দুইটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাব আবিষ্কৃত হইয়াছে : (১) বৈদান্তিক ও (২) জৈন। অবশেষে, সুফীদের যোগের প্রক্রিয়ার মধ্যে হিন্দুর

৯। Brockelmann—op. cit., Vol. I, Pp. 116-117 ; Browne—History of Persian Literature, p. 278.

১০। Brockelmann—op. cit. Vol. I, p. 123.

১১। Masudi—French Translation, Vol. III, p. 254.

যৌগিক প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য ও মিল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরলোকগত মওলভী ওয়াহেদ হোসেন বলিয়াছেন, এই মিল ধার করা নয়। তাঁহার অভিমত এই যে ইহা Parallelism in History নিয়মানুসারেই উদ্ভূত। কিন্তু অনুসন্ধানকারীদের মতে ইহা Diffusion of Culture-এর ধারানুসারে হিন্দুর নিকট হইতে ধার করা। পারস্যে সুফী-ধর্ম্মের প্রথম উদ্ভবের সময় বায়জিদ বোস্তামী ভারতের সিন্ধু প্রদেশে আসিয়া আবু আলি নামক জনৈক ভারতীয়ের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ আবু আলির নিকট হইতেই বোস্তামী হটযোগের প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষা করিয়া সেগুলি পারস্যে প্রচার করেন। পরে সুফী জুনইদের শিষ্য মনসুর আল-হাল্লাজ নামক জনৈক সুফী ভারতে আগমন করেন। খলিফা যখন কাফের বলিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করেন তখন তাঁহার বিচারকালে এই তথ্য প্রকাশ পায় যে তিনি Rope-trick দেখিবার জন্যই ভারতে আসেন। তিনি বলিতেন যে তিনি শরীর ঘরজোড়া করিয়া ফুলাইতে পারিতেন, শূন্যে উঠিতে পারিতেন, পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতেন ইত্যাদি (১২)। 'দম-মাদার' নামক সুফী সম্প্রদায় মধ্যে 'দম' (প্রাণায়াম) প্রক্রিয়া অভ্যাস করা হয়। নানাপ্রকারের গবেষণার পর নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারীদের মত এই যে, সুফীধর্ম্মে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রভাবের চিহ্ন স্পষ্ট ধরা পড়ে (১৩) এবং সকল প্রকারের মুসলমানদের "তসবীহ" (জপমালা) বৌদ্ধ-

১২। Browne—A Literary History of Persia, Pt. I, p. 431.

১৩। সুফীধর্ম্ম ও ভারতবর্ষের সহিত উহার সম্বন্ধ লইয়া বিভিন্ন ভাষায় নানা পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহাদের ভিতর এখানে মাত্র কয়েকজনের মত বিবৃত করা হইল।

(i) The Legacy of Islam—Edited by Sir T. Arnold, 1931.—তিনি বলেন, বায়জিদ বিস্তামী সম্ভবতঃ ভারতীয় অদ্বৈতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া 'ফানা' (passing away of the self) এবং 'বাকা' (united life in God) মত উদ্ভূত করেন (পৃঃ ২১৫)।

(ii) Encyclopaedia of Religion and Ethics—Vol. 8-এ বর্ণিত হইয়াছে যে আবুল আলি আলমারি নামক বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত ও কবি ৯৭৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বোগদাদে এক প্রকারের ভারতীয় ধর্ম্মমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন যাহা জৈন ধর্ম্ম বলিয়াই অনুমিত হয়। তিনি খাওয়ার জন্য পশু হনন করা অথবা তাহাদের কষ্ট দেওয়া অন্যায় ও দোষনীয় মনে করিতেন।

(iii) John A. Subhan—Sufism, its Saints and Shrines, 1938.—ইনি বলেন, সুফীধর্ম্মে পারসীক, ভারতীয়, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টীয় অতীন্দ্রিয়বাদ (mysticism) প্রভৃতির প্রভাব

আছে। তিনি বলেন, বায়জিদ্ বিস্তামী জনৈক জারতুষ্ট্রের পৌত্র এবং সিন্ধুদেশের আবু আলী তাঁহার সুফীধর্ম্মের গুরু ছিলেন। তিনিই প্রথমে 'ফানা' (নির্ব্বাণ) মত প্রচার করেন। এই সুফী মতে 'ধিকর' (Dhikr) এক প্রকারের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বিশেষ। (পৃঃ ১৭—৯০)।

(iv) আবদুল কাদের—"বাঙ্গালার পল্লীগানে বৌদ্ধ-সাধনা ও ইসলাম" বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৩৫ সন।—তিনি বলেন, বস্তামির শিষ্য মাদার তৈফুর হয় গুরুর অথবা ভারতীয় কোন সাধকের নিকট হইতে স্বয়ং এই 'দম'-এর সাধনা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অনুমান করেন আবু আলী ভারতীয় শ্বাস-সাধনা জানিতেন। (পৃঃ ৫৪৩)

(v) Jethwal Passram Gulraj—Sind and its Sufis, 1924.—ইনি বলেন যে বড় বড় সুফীদের বংশধর ও শিষ্যদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছেন যে, এক সময়ে সিন্ধু প্রদেশ আত্মবিদ্যা, যাহাকে সুফীরা 'তসয়ুফ' (Tasauuf or Theosophy) বলেন, তাহার একটা বড় গুপ্তবিদ্যার কেন্দ্র (great occult centre) ছিল। ইনি কুতুবসাহ নামক শতবর্ষীয় জনৈক পবিত্রাত্মা ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ করেন। তিনি বলেন যে সিন্ধুর কোহিস্থান জেলায় পর্ব্বত শিখরে যোগীরা আসিতেন এবং বিদ্যার্থীদের শিক্ষাদান করিতেন। তিনি নিজে এই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সিন্ধুর জনৈক বড় সুফী সাহ লতিফ (১৬৪০—১৬৯০ খৃঃ) বোধ হয় এই স্থানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে 'নানি', যেখানে নাগারা (যোগীরা) বাস করেন, বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কুতুবসাহ বলিতেন, এই স্থানে ইসলাম ও হিন্দুধর্ম্মের কোন পার্থক্য নাই। (পৃঃ ১২৭—১২৮)

(vi) Moulvi Wahed Hossain—University Extension Lectures on Sufism—Calcutta University—ইনি বলেন, সুফী অতীন্দ্রিয়বাদের সাধনার সহিত যোগদর্শনের অনেক মিল আছে। সুফীদের 'সপ্তজগত' (plane)-এর সহিত যোগশাস্ত্রের সপ্তলোকের সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু উভয় মতের 'লোক' (plane) বর্ণনায় পার্থক্য আছে যদিচ কতকগুলির মধ্যে সৌসাদৃশ্যও রহিয়াছে। পুনঃ সুফীদের "Six principles of psychic regions" যোগশাস্ত্রের "ষটচক্র"-এর সহিত কতকটা মিলে। ইহার মতে উভয়ের দার্শনিক চিন্তার ধারা একই খাতে প্রবাহিত। তৎপর সুফীমতের 'ইস্ক' ও 'মহবত' ধারণাতে বৈষ্ণব 'প্রেম' ও 'ভক্তির' প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর সুফীমতের 'ভিসাল' (union) ও 'হিজ্রা' (separation) এবং বৈষ্ণবদের 'মিলন' ও 'বিরহ' প্রায় একই। তাঁহার মতে, সুফী ও বৈষ্ণবদের প্রেম-সঙ্গীতের ভাবের একত্ব কেবল বৈষ্ণব কবিদের উপর সুফীমতের প্রভাব বিস্তারে সম্ভব হইয়াছে (Pp. 27-47).

(vii) Von Kraemer—Islamische Strief Zunge: ইনি কনষ্টান্টিনোপোলস্-এর Dancing Dervish সম্প্রদায়ের একটি দলের গুপ্ত ধর্ম্মপুস্তক পাইয়া উহার অনুবাদ করিয়া

দের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে *। আরবদের হিন্দুদের "বদ্-পরস্তি" (বুদ্ধ) আখ্যা প্রদান দ্বারাই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে তাহাদের সহিত বৌদ্ধদের ভারতের বাহিরেই পরিচয় হইয়াছিল।

ভারতীয় মুসলমান সমাজতত্ত্ব

অতীতের এই চিত্রপট স্মরণ রাখিয়া ভারতীয়-ইস্‌লামের সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান করিতে হইবে। ভারতীয় মুসলমান সমাজ সম্পর্কে হিন্দুর মনে

দেখিয়াছেন যে তাহা "বেদান্তসার" পুস্তকের সহিত মিলে! এই সম্প্রদায় জেলালুদ্দিন রুমী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, ইহাদিগকে Melvi Sects বলা হয়। উপরোক্ত দরবেশ দল ঊর্দ্ধে বাহু তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে এবং দশা প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গলার বৈষ্ণবদের নৃত্যের সহিত এই নৃত্যের সৌসাদৃশ্য আছে। কন্‌ষ্টান্টিনোপলে বৈষ্ণবদের সহিত নৃত্যের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া লেখক আশ্চর্য্যান্বিত হন। তাঁহার ধারণা গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা দরবেশদের নিকট এই বিষয়ে ঋণী। রুমীর দল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব্বেই স্থাপিত।

(viii) Nicholson—The Mystics of Islam.—এই পুস্তকে তিনিও বলেন 'ফনাহ' মতটি ভারত হইতে গৃহীত বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার ধারণা বায়জিদ্ বিস্তামী তদীয় গুরু সিন্ধুদেশের আবু আলীর নিকট হইতে এই তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আরও বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব সুফীদের সাধনার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে ভারতীয় সন্ন্যাসীদের "যোগাভ্যাস" অন্যতম।

(ix) Gold Zicher Vorlesugen—ইনি Von Kramer-এর অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, সুফীদের 'ধিকর' শ্বাস প্রক্রিয়াগুলি ভারতীয় মূল-উৎপত্তির পরিচয় প্রদান করে (পৃঃ ১৭৬—১৭৭)।

(x) P. K. Hitti—History of the Arabs, 2nd Edn, 1940.—ইনি বলেন, ইসলামীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সুফীধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম, নব-প্ল্যাটনিক মত, গ্নস্‌টিকবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে অনেক তথ্য ও উপকরণ গ্রহণ করেন। আঘানী নামক আরব পুস্তক বৌদ্ধ-জীবনের একটি সুন্দর সুস্পষ্ট চিত্র প্রদান করিয়াছেন (Aghani Vol. III, p. 24) এবং আল জাহিজের বর্ণিত 'জিন্দিক' (Zindiq) সন্ন্যাসীগণ হয় ভারতীয় সাধু, না হয় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী অথবা তাহাদের অনুকরণকারী দল ছিল (Gold Ziherin Vorlesungen Ueber den Islam, p. 160) পৃঃ ৪৩৫।

* হিট্টি বলেন, জপমালা হিন্দুদের দ্বারাই উদ্ভূত; কিন্তু মনে হয় ইহা মুসলমানেরা সাক্ষাৎভাবে পূর্ব্ব-খৃষ্টীয় চার্চ্চ হইতে গ্রহণ করেন (পৃঃ ৪৩৮)।

এই ধারণা আছে যে, এই সমাজ সম্পূর্ণ বিজাতীয় ও বৈদেশিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক মুসলমান নেতাও তদ্রূপ বলায় উক্ত ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে আজ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ও আকার ধারণ করিয়াছে। পারস্যে ইসলাম পারসীক রূপ ধারণ করিয়াছে; প্রাচীন পারস্যের (জারতুষ্ট্রীয়) ছাপ তাহাতে বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তদ্রূপ উত্তর আফ্রিকায় ইসলাম। সেখানে মারাবিট্‌দের (ফরাসী—Marabouts) ভক্তি এবং আজ্ঞা পালন করায় ধর্ম্মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়। যবদ্বীপে ইস্‌লামী সমাজ প্রাচীন হিন্দু কৃষ্টির প্রভাব হইতে আজও মুক্ত হইতে পারে নাই। পশ্চিম-এশিয়ার তুর্কিদের নৈষ্ঠিক সুন্নীমত প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের পুরাতন কৌমগত অনেক রীতি-নীতি আঁকড়াইয়া ছিল বা আছে। কামালের তুর্কীরা প্রাচীন কৌমগত নাম প্রভৃতি গ্রহণ করিতেছে। আফগানীস্থানের লোকদের মধ্যে আইনে ও রীতিতে প্রাচীন সংস্কারের চিহ্ন ধরা পড়ে। এক্ষণে কথা এই, ভারতের অবস্থা কি?

ঐতিহাসিকেরা বলেন, সিন্ধু প্রদেশে স্বল্পকাল স্থায়ী আরব-শাসনের যে-ধ্বংসাবশিষ্ট উপনিবেশ মনসুরা সহরে ছিল তাহার মধ্যে ভারতীয় আচার-ব্যবহারের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইত।

তুর্কীদের ভারত-বিজয়ের বহুপূর্ব্বেই ইবন্ হকল (Ibn Haukal) ও ইস্তাখ্রি (Istakhri) নামক আরব ও পারসীক পর্য্যটকেরা মনসুরা সহরের মুসলমানদের বিষয়ে বলিয়াছেন, এই দেশের রাজারা 'হিন্দ'এর রাজাদের ন্যায় ইজার ও জামা পরিধান করেন ("The dress of the sovereigns of the country resembled in the trousers and tunics that were worn by the kings of Hind.")। ইবন্ হকল আরও বলিতেছেন যে, কোন কোন স্থানের মুসলমানেরা "কাফেরদের ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং দাড়ী রাখে ("wear the same dresses and let their beards grow in the same fashion as the infidels"!) এতদ্বারাই বোধগম্য হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদেশীয় মুসলমান হইতে বিভিন্নকৃত ভারতীয় মুসলমান সমাজ গড়িয়া উঠিতেছিল (১৪)।

১৪। H. C. Roy—Dynastic History of Northern India, Vol. I, Pp. 19-20; Elliot—Vol. II, p. 39.

এতদ্বারা এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, প্রথম মুসলমান বিজেতৃ দলের বংশধরেরা বাহ্যিক বেশভূষায় অন্যান্য ভারতীয়দের ন্যায়ই রূপ ধারণ করিয়াছিল। মোগল-পূর্ব্ব যুগের বিজেতৃবর্গের বংশধরগণ যে মধ্য-এসিয়া ও আফগানীস্থানের পোষাক পরিধান করিত তাহার প্রমাণ কি? গৌড়ের সুলতানদের আমলে ইউরোপীয় পর্য্যটক বার্ব্বোসা বাঙ্গলা পর্য্যটনকালে বলিয়াছেন, এই স্থানের মুসলমান অভিজাতেরা ধুতি পরিধান করেন, এবং তদুপরি একটা লম্বা 'পিরান' পরেন। তৎপর মুঘলযুগে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে সম্রাট আকবর হিন্দু ও মুসলমানদের একচ্ছত্রাধীন করিয়া এক ধর্ম্ম ও এক আচার-ব্যবহার দ্বারা একজাতীয়তা গঠনে প্রয়াসী হয়েন। তিনি ভারতীয় খানা, ভারতীয় পোষাক, ভারতীয় রাজসভার আদব-কায়দা বিভিন্ন দেশের খানাপিনা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আদব-কায়দার সহিত মিলাইয়া সর্ব্ব বিষয়েই এক নূতন ফ্যাসন প্রচলন করেন (আবুল ফজলের আকবরনামা দ্রষ্টব্য)। ফলে মোগল রাজসভায় এক নূতন ধরণের রীতিনীতির উদ্ভব হয়; এবং ইহারই ফলে একটা মিশ্রিত ভাষাও উদ্ভূত হয় যাহা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বলিতে থাকে (এই বিষয়ে অধ্যাপক আজাদের "আবে হায়াৎ" দ্রষ্টব্য)। এই মিশ্রিত ভাষারও ভিত্তি হইতেছে দিল্লী ও তাহার আশেপাশের সৌরসেনী-প্রাকৃত ভাষা প্রসূত হিন্দী; ইহাকে আজকাল খড়িবোলী বলা হয় (আজাদ বলেন 'ব্রজভাষা' আর সাকসেনা বলেন 'খড়িবোলী' ও 'ব্রজভাষা' উভয়ই ভিত্তি)। বর্ত্তমানে এই মিশ্রিত ভাষার নাম হইতেছে "উর্দ্দু"; কিন্তু পূর্ব্বে ইহাকে হিন্দি বলা হইত (১৫)। এই ভাষার প্রাধান্যের সময় ফারসী আর রাজভাষা অথবা মুসলমান অভিজাতদের মাতৃভাষা রহিল না। সাকসেনা সত্যই বলিয়াছেন যে উর্দ্দু দ্বারা ফার্সী বিতাড়ন ব্যাপারটিতে বিজিত কর্ত্তৃক বিজেতাকে পরাজিত করবার অনুষ্ঠান বলিয়াই প্রতীত হয় (১৬)। যেমন আঙ্গলো-সাক্সন ও ফরাসী-মিশ্রিত ইংরেজী, ফরাসী ভাষাকে ইংলণ্ডের রাজসভা ও অভিজাতদের মধ্য হইতে বিতাড়ন করে।

১৫। পদ্মসিংহ শর্ম্মা—হিন্দী, উর্দ্দু ঔর হিন্দুস্থানী, পৃঃ ১৫।

১৬। Rambabu Saxena—History of Urdu Literature, p. 6.

আজাদ বলেন, ইরাণ ও তুর্কীস্থানীদের ভারতীয় বংশধরগণ হিন্দুদের সহিত ভারতকে মাতৃভূমি এবং তাহার ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা ফরাসী ছাড়িয়া এই উর্দ্দুতে লিখিত আরম্ভ করিলেন ('আবে হায়াৎ', পৃঃ ২৯)

এই প্রকারে দেখা যায় যে কেন্দ্রাধীন মোঘল-শাসনের ফলে এক ঐতিহাসিক ও এক কৃষ্টির প্রভাবে ভারত আবার একজাতীয়তা গঠনের পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু ধর্ম্মান্ধতার প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। তথাকথিত মোগল-শাসনকে "জাতীয়" করিবার শেষ প্রচেষ্টা করেন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় (১৭)। কিন্তু বিদেশীয় ইরানীয় ও তুরানী অভিজাতদের চক্রান্তে উহা সম্ভবপর হয় নাই (ইহাদের পক্ষে ঐতিহাসিক কাঁফিখাঁর ওকালতী দ্রষ্টব্য)। হিন্দুর পুনরুত্থান হয় এবং হিন্দু রাজশক্তি পুনঃ বেশীর ভাগ ভারতকে করায়ত্ত করে। তথাপি, এই তথাকথিত মোগলযুগ-প্রসূত কৃষ্টি হিন্দুদের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

এই যুগের হিন্দু-মুসলমান একতার শেষ চিহ্ন উর্দ্দু সাহিত্যের প্রথমাবস্থার কবিদের লেখার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। মুসলমান কবি ফুঁগা বলিয়াছেন—

"আয় সেখ, আগর কুফ্র সেই সলাম জুদা হৈ।
পস্ত চাহিয়ে তসবিহ মেঁ জুন্নার ন হোতা।"

আর একজন বলিতেছেন:

বুদ্ পরস্তিকো তোই সেলাম নেঁহী কহতে হৈঁ।
জাতরিদ কেয়া হ্যায় 'মির' এইসি মুসলমানীকা!"

কবি আকবর পর্য্যন্ত অনেক মুসলমান কবিই উর্দ্দুতে জাতীয়তা ভাবপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন এবং হিন্দু ও মুসলমান যে একই দেশের লোক তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। এমন কি, বিখ্যাত কবি হালী মুসলমানদের স্মরণ করাইয়া বলিয়াছেন,—

১৭। এই বিষয়ে Rapson এবং J. N. Sarkar-এর 'History of Aurangzeb' দ্রষ্টব্য।

"রামকে হামরাহ চড়ী বন মেঁ তু।
পাণ্ডবোঁ কো সাত ফিরী বন মেঁ তু॥
* * *
তু আগর চাহতে হো মুক্তকী খৈর।
ন কিসী হমও তনকো সমঝো গৈর॥"

কৃষ্টির অন্যান্যাংশেও উভয় জাতির মিলনের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুসলমানযুগের স্থপতি কার্য্যের পরাকাষ্ঠা হইতেছে—তাজমহল। হ্যাভেলের মতে (১৮) ইহা হিন্দু-বৌদ্ধ আর্টেরই বংশগত সন্তান, কেবল ইসলামধর্ম্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধন করা হইয়াছে। মুসলমান দেশসমূহের বিভিন্ন প্রকারের স্থপতি কার্য্যের উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধানকালে ভারতীয়-মুসলমান আর্ট সম্পর্কে হিটি বলিয়াছেন: "Indian, bearing clear marks of Hindu style" (১৯)। এইস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুসলমানযুগে ভারতবর্ষ কারুকার্য্য, সৌখিন দ্রব্য, খাদ্যাদির বিবিধ ফলমূল, অনেক রাজনীতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য দ্রব্য বিদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছে (২০)। হিটি বলেন, কমলালেবু, ইক্ষু ভারত হইতে আরবদের দেশে মুসলমান যুগে প্রচলিত করা হয় (পৃঃ ৩৫১)। এই যুগের বিদেশাগত দ্রব্যসমূহ ভারতে বিশেষভাবে নিজের (acculturated) হইয়া গিয়াছে; এইজন্য আজ বুঝা খুব সহজ নয় যে কোনটি প্রাচীন আর কোনটি মুসলমান যুগে আনীত! আজ ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভিন্ন ও পৃথক বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় এবং তাহাদের পৃথক ও স্বতন্ত্রীকরণকে ভবিষ্যতে মানবতার বিরুদ্ধ-কার্য্য বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৮। Havell—History of Indian Architecture.
১৯। Hitti—op. cit. p. 260.
২০। James Mill—History of India পুস্তকে প্রদত্ত তালিকা দ্রষ্টব্য।

প্রাসঙ্গিক

সম্প্রতি সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা সংঘবদ্ধতার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঘটনাটা সাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্য খুব বেশী অভিনব নয়। কারণ দু'চারজন সাহিত্যিক মিলে একটা গোষ্ঠী রচনা করার দৃষ্টান্ত এই বাংলাদেশেও ভূরি ভূরি মেলে। সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা অন্য সহযোগিদের সমর্থন ও সমালোচনা আত্মবিকাশের সহায়ক ব'লে মনে করেন। তাছাড়া তাতে আত্মপ্রাধান্য প্রচারেরও খানিকটা সুযোগ থাকে। বলাবাহুল্য এই শেষের কারণটি রীতিমত পারম্পারিক, এবং সেই কারণে ধ্বংসের বীজও এর মধ্যেই নিহিত থাকে। যতক্ষণ সাহিত্যিকেরা নিজেদের নাবালক ব'লে মনে করেন সে পর্য্যন্ত এই দলবদ্ধতা আত্মরক্ষার জন্যই আবশ্যক হ'য়ে থাকে। কিন্তু যেই প্রতিপক্ষের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হন তখনই তাঁরা পরস্পরকে দূরে ঠেলেন। সৌরজগতের মতই সাহিত্যমণ্ডলেও এক কক্ষে দুই গ্রহের স্থান হয় না। নীহারিকার স্তর পার হ'য়ে স্বতন্ত্র সত্তা খুঁজে পাওয়ামাত্রেই তাঁরা নিজ নিজ মণ্ডলে কক্ষপতি হ'য়ে ওঠেন। এরকম দলগড়া ও দলভাঙার দৃশ্য অনেকস্থলে মর্ম্মপীড়াদায়ক হ'লেও অনিবার্য্য ব'লেই মনে হয়। বিশেষত বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায়।

কারণ, কৃষিকর্ম্মের প্রচলন হবার পর থেকে যন্ত্রের আবিষ্কার পর্য্যন্ত মানব সভ্যতার যে প্রবণতা ক্রমাগত পরিপুষ্টি লাভ করেছে সেটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক। আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় কালক্রমে গোষ্ঠীপতির প্রাধান্য ঘটায় ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আত্মমুখী হ'য়ে পড়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছিল। নানা মোড় ঘুরে রঙ বদ্‌লে সেই মনোভাবই আজ পর্য্যন্ত সক্রিয় হ'য়ে রয়েছে। 'আমার পৃথিবীর আমিই হচ্ছি কেন্দ্র' এই হ'ল মূল সুর; কারণ আমার সুখ দুঃখ যখন নেহাৎ-ই আমার ইন্দ্রিয়গোচর এবং আমার বাঁচা-মরা যখন আমারই বাঁচা-মরা তখন আমার সমস্ত রকম চিন্তা এবং চেষ্টা যে আমাকে কেন্দ্র করেই চলবে তাতে আর বিচিত্র কি! তাছাড়া এতে নাকি প্রকৃতিদেবীর নিজেরই সমর্থন রয়েছে, প্রাণী আর উদ্ভিদ্‌জগৎ সেই শিক্ষাই দেয়। অতএব নেহাৎ জৈব ধর্ম্মের বশেই প্রতিযোগিতার পথ প্রশস্ত হ'ল; কথা উঠল

"জীবন সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম", যার ন্যায়সঙ্গত বিস্তৃতি হ'চ্ছে "জাতি সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম।"

সামাজিক প্রতিক্রিয়ার গতিচিহ্ন বহন ক'রে এ যুগের সাহিত্যিকগণও তাই স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী। 'তোমার সঙ্গে আমার সদ্‌ভাব ততক্ষণই যতক্ষণ আমরা উভয়ই নাবালক; বহিঃ শত্রুর বিরূপতা থেকে আত্মরক্ষা শেষ হ'লেই আমরা বিজয়ী হ'য়ে পৃথক পৃথক রাজ্যের রাজচক্রবর্ত্তী হব। তুমি আমার স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করতে আসলেই তোমার সঙ্গে আমার সংগ্রাম সুরু হ'বে। প্রথমে লেখনীতে অর্থাৎ বৈধ উপায়ে, কিন্তু হারাতে থাকলে ব্যক্তিগত শত্রুতাতেও পিছ পা হব না,—বেসামরিক জনসাধারণকেও আধুনিক যুদ্ধ রেহাই দেয় না।'

এই সব কথা ভাবছিলাম বলেই সাহিত্যিকদের সাম্প্রতিক সংঘবদ্ধতার প্রচেষ্টাকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার আগ্রহ হ'ল। কারণ সংঘবদ্ধ হ'য়ে সাহিত্য-সৃষ্টি করা সম্ভব হয় তখনই, যখন সাহিত্যসৃষ্টির গরজেই সঙ্ঘবদ্ধতা আসে। কিন্তু যখন সাহিত্যসৃষ্টির চেয়ে রাজনৈতিক কারণটাই প্রবল হ'য়ে ওঠে, তখন এই সংঘবদ্ধতা কী ইঙ্গিত করে? তখন কি এই বুঝতে হবে যে সাহিত্যিকগণ আপাতত সাহিত্যিকতা স্থগিত রেখে সাধারণ নাগরিকের কর্ত্তব্য পালন করতেই উদ্‌গ্রীব হ'য়েছেন? তা যদি হয় তবে, সাহিত্যিক সংঘ গঠন না ক'রে অন্য কোনো সাধারণ রাজনৈতিক দলে তাঁরা যোগ দিলেন না কেন? কিন্তু তা যখন তাঁরা করেন নি তখন বুঝতে হবে সাহিত্যিকভাবেই তাঁরা সংঘবদ্ধ হ'তে চান; এবং রাজনৈতিক কারণ প্রবল হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের ভেতর দিয়েই তাঁরা সেই দায়িত্বকে উদ্‌যাপিত করতে চান।

অথচ, ইতিমধ্যে এই ধারায় সাহিত্যসৃষ্টি যে রকম হ'চ্ছে তাতে সাহিত্যের ওস্তাদ সমজদারেরা কেউই প্রসন্ন হন নি দেখতে পাচ্ছি। যাঁরা লিখছেন তাঁরাও এ বিষয়ে খুব বেশী ভুল ধারণা পোষণ করেন এমন মনে হয় না। তবু তাঁরা লিখছেন; আর অধিকাংশই কবিতা। তাতে প্রতিভার তো কথাই নেই, লিপিকুশলতা পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থলে অনুপস্থিত; অথচ তাগিদ রয়েছে। সাহিত্য যদি তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিফলন বহন করে, তবে এর থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে যে, সাহিত্যিকদের এই সংঘবদ্ধভাবে

সাহিত্যসৃষ্টি করার তাগিদ এবং প্রচারগন্ধী সাহিত্যসৃষ্টির দিকে আগ্রহান্বিত হ'ওয়ায় এই সাহিত্যিক গোষ্ঠী যে শ্রেণীর মুখপাত্র সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই একটা একতার উন্মেষ সূচনা করছে। ব্যাপারটা বিশেষ ক'রে কবিতায় ঘটছে এই কারণে যে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কবিতায় আবেগ-নির্ভরতা অনেক বেশী, এবং আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এখনও আবেগের দ্বারাই বেশী বিচলিত। আমার মনে হয় অতঃপর নাটকের দিকে হস্তক্ষেপ করলে সাহিত্যিকেরা আরো বেশী কল্যাণকৃৎ হবেন। খাঁটি প্যামফ্লেট লিখেও চলতে পারত; কিন্তু প্রবন্ধের যুক্তিনির্ভরতা ইদানীন্তন মধ্যবিত্ত মগজে দ্রুত সাড়া পাবে না আশঙ্কা ক'রে নাটকের সম্ভাবনাই উল্লেখ করলাম। এতে আবেগটা বস্তুরূপায়িত হ'য়ে অনেক বেশী দানা বাঁধবে, এবং কালক্রমে শ্রেণী-অতিক্রান্ত হ'য়ে জনগণের ঐক্যের দিকেও হাত বাড়াবে। সাহিত্যসংঘগুলির সভ্যেরা যাচাই ক'রে দেখতে পারেন।

পরীক্ষিৎ

পুস্তক-পরিচয়

সাম্প্রতিক কবিতা

অভিজ্ঞান বসন্ত—অমিয় চক্রবর্ত্তী। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ২৭।এ, এলগিন রোড হইতে প্রকাশিত। দাম—দেড় টাকা।

কবি অমিয় চক্রবর্ত্তীর জাগ্রত মনের পরিচয় পেলুম তাঁর নব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "অভিজ্ঞান বসন্তে"। ভাব, ভাষা ও কল্পনার বিষয় আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রেখে আঙ্গিকের দিক থেকে বিচার করলে মুক্ত কণ্ঠে বলবো যে "অভিজ্ঞান বসন্তের" কবিতাগুলি আধুনিকতম আঙ্গিক হিসাবে অমিয়বাবুর সার্থক-পরীক্ষা। গভীরতম অর্থের সূক্ষ্ম রেখাঙ্কিত অভিব্যক্তি কবিতাগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। আঙ্গিকের ও বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের দিক থেকে অমিয়বাবু প্রগতিশীল হ'লেও তাঁর মনের গঠনটি কিন্তু ঔপনিষদিক সেজন্য কয়েকটি কবিতা ছাড়া ভারতীয় সাংস্কৃতিক আভিজাত্যকে তিনি কোথাও ভুলতে পারেন নি। তাঁর আধুনিকতম কবিতাগুলি স্বল্পভাষণের সার্থক নমুনা হ'লেও অধিকাংশ কবিতার অংশবিশেষ মহাকাব্যিক সুরঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত। আধুনিক কাব্যরচনাতেও তাই তাঁর কবিতায় শুনতে পাই বৈদিক বন্দনাত্মক ঃ

"জয় জয়শ্রী হিমালয় রাজ
ধরণীর ধ্যানী কিরীট ঝলে
বিন্ধ্যবক্ষ ; দক্ষিণ পদ ঘিরি
বিচিত্র নীলগিরির সত্তা—" (রুদ্রাক্ষর)

আধুনিক কবিদের মধ্যে সূক্ষ্ম রেখার ভাবসমৃদ্ধ ব্যঞ্জনায় ও প্রচ্ছন্ন ছন্দের অত্যাশ্চর্য্য দক্ষতায় কবি অমিয় চক্রবর্ত্তী অদ্বিতীয়। অমিয়বাবুর কবিতার মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের অতি লঘু ছন্দানুরণন ধ্বনি মাঝে মাঝে শুনতে পাই, প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের চরম উপলব্ধি প্রসূত মন্ত্রকাব্যের মত তাঁর কবিতা-গুলি ছন্দের কারুকৌশলে অনুভূতির গাঢ়তায় সংক্ষিপ্ত। মনের ও আঙ্গিকের দিক থেকে বাংলা কবিতায় অমিয়বাবু আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এনেছেন। এ কথা মানতেই হবে মাইকেলী বাক্‌বাহুল্যের ও রাবিন্দ্রীক বৈচিত্রানুকরণের প্রতিভা-

বিনাশী প্রভাব থেকে আধুনিক শক্তিশালী কবিরা অনেকটা মুক্ত হয়েছেন। যাঁরা বাস্তবিকই মুক্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অমিয়বাবু শীর্ষ স্থানীয়। সংস্কার-মুক্ত কর্ণেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম মাত্রাবোধ যার নেই তার পক্ষে অমিয়বাবুর কাব্যের রসাস্বাদন করা বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁরা স্বাদেশিকতার উৎকট আওতায় বাল্যাবধি খেয়াল ধ্রুপদ কীর্ত্তন বাউল শুনেই অভ্যস্ত—ইউরো-আমেরিকার আধুনিকতম সুরগুলি তাঁদের মনের ও কানের বিন্দুমাত্র আনন্দ জোগাতে পারে না। এ আনন্দ পেতে হ'লে তৈরী কান থাকা দরকার। দেশকালপাত্রানুযায়ী শ্রবণ-সংস্কারের জন্ম হয়, এতদ্দেশীয় এক শ্রেণীর প্রাচীনপন্থী সমালোচক-গোষ্ঠীর কান —বৈষ্ণবমহাজন-মাইকেল-রবীন্দ্র-ছন্দভাবকল্পনানুসারেই সংস্কারবধির, ফলে উক্ত গোত্রীয় সমালোচক-গোষ্ঠী আধুনিক কাব্যের রসাস্বাদনে বঞ্চিত, ফলে প্রগতিশীল মন ও সংস্কারমুক্ত কান তাঁদের জন্মায় নি।

অমিয়বাবুর কবিতা নিয়ে সমসাময়িক লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে যত বেশী আলোচনা হ'য়েছে আর কোনো কবি সম্বন্ধে তত হয় নি। আমরা অনেকেই দীর্ঘকাল থেকে অমিয়বাবুর কাব্যের গতি ও প্রকৃতি গভীর কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করে আস্‌ছি। প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রাচীন ছন্দে তাঁর দক্ষতা অসামান্য তবু তিনি গতানুগতিককে পরিহার কোরে যে অভিনব আঙ্গিকের সাধনায় মগ্ন, তা'র পরিণতি ক্রমাগতই সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। "এক মুঠো", "খসড়া" ও "মাটির দেয়ালের" দুঃসাহসিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে "অভিজ্ঞান বসন্তে" অমিয়বাবু সিদ্ধিলাভ করেছেন। আধুনিকদের মধ্যে তাঁর মন আন্তর্জ্জাতিক ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও অন্যান্য কবিদের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভৌগলিক পৃথিবীর সৌন্দর্য্যময় সত্তাকে তিনি রূপদক্ষ শিল্পী ও প্রগতিশীল বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখেছেন। এই শ্রেণীর বিচিত্র ভৌগোলিক কাব্য ইতিপূর্ব্বে তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও পড়েছি কিন্তু রসমাধুর্য্যের দিক থেকে "অভিজ্ঞান বসন্তের" কয়েকটি কবিতা আগেকার তুলনায় বহুগুণে উৎকর্ষতা লাভ করেছে। স্থানাভাবে বেশী উদাহরণ দিতে পারলুম না একটি ছাড়া ঃ

(১) লাইন বেঁকলেই অন্যমাটি, সোনার বালি, মালয়, সুমাত্রা ; বহির্দূর দক্ষিণ মেরুর—
দ্বীপময়
ক্রান্তিবলয়। [অয়ন—২৬শ পৃষ্ঠা]

(২) গ্রীষ্ম দুপুর-
ভরা
ঘনশ্বাস ধরা
রবারের পুরু পাতার আলয়ে
বুক দুরু দুরু
ঘুরব, শুনব দখিন মালয়ে
নীল অরণ্য নুপুর। [সৌখীন ভ্রমণ (২) মালয়—২২শ পৃষ্ঠা]

(৩) মঙ্গোল পথে ধুলো ওড়ে উদাসীন—
দেখি ঐ ধারে
ইতিহাসপটে আঁকে আর ঢাকে
চলে সারাদিন
মাঝএশিয়ার কারাভান ; দূরে ; খচ্চড় সারি গুনি,
উব্‌ড়ো খাব্‌ড়ো পাহাড়ের পাশে ইয়াক্-ঘণ্টা শুনি,
কম্বললোম পশমবস্তা পিঠে।
[সৌখীন ভ্রমণ (৩) উত্তর চান্—পৃষ্ঠা ২৪শ]

অমিয়বাবুর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে শ্লেষাত্মক গৌড়ীয় বিন্যাসকৌশলের চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন :—

(১) বনকীর্ণশ্যামলরুদ্রকম্পিততরঙ্গ
—তোমার পটদূরান্তে হ'ল বিলীন [অন্তিক—৩য় পৃষ্ঠা]

(২) শ্যামলরক্তিম ঘণ্টাধ্বনি
শুনেছ কি ? [অভিজ্ঞান—৯ম পৃষ্ঠা]

(৩ক) গ্রানিট্ পাথর-খোদাই মূর্তি আকাশী বুদ্ধ।
হিন্দুকুশের হিমশিখা ; নীচে গম্ভীর নীল। [বামিয়ান—১৬ পৃষ্ঠা]

(৩খ) শান্তপ্রহরীশৈলদলের ইঙ্গিতে
মনে জানে দূর
এসেছি—ভারতবর্ষে ॥ [ঐ]

(৪) দূর বিমিশ্র কত কাহিনী
লৌহবিদ্যুতাগ্নিবাহিনী— [উর্ব্বশী—২০ পৃষ্ঠা]

(৫) একলা পাথুরে কর্ণে-ফ্যাকাশে ছায়াতে

উদ্ধৃত গাঢ়বন্ধ পদগুলির মধ্যে কোথাও তিনি সংস্কৃত ঘেঁষা গুরু বাক্যের রূঢ় গাম্ভীর্য্যে পাঠকের কর্ণপীড়া সৃষ্টি করেন নি—এইখানেই তাঁর বাহাদুরী। দ্রুত শব্দতরঙ্গাভিঘাতে মনকে উত্তেজিত করেই তিনি এমন এক শান্তশ্রীমণ্ডিত পংক্তিতে ফিরে আসেন যে তাঁর কাব্যের নিঃশব্দ সঙ্গীতধারায় মন মুগ্ধ হয়। "বনকীর্ণ-শ্যামলরুদ্রকম্পিততরঙ্গ—"মহাকবি কালিদাসের—"শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈর্কুমুদ-ধবলৈর্যোবিতত্য স্থিতঃ খং—" (কুমুদধবলশৃঙ্গ সমুচ্ছৃত ব্যাপিয়া আকাশ) অথবা "কল্পদ্রুমকিশলয়ানংশুকানীব বাতে" (কল্পবৃক্ষ কিশলয় মৃদুবাতে কোরো সঞ্চালন) মনে করিয়ে দেয়। তিনি খুব সহজেই পরিচিত বাংলা শব্দগুলিকে দীর্ঘসমাস ও সন্ধির বন্ধনে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন অথচ সম্পূর্ণ রচনা কোথাও দুর্ব্বল হয় নি। তাই তাঁর কতকগুলি কবিতা কল্পনায়, রসে, আঙ্গিকে, সৌন্দর্য্যে ওজঃস্বিনী হয়ে উঠেছে। তবে কবির সব কবিতা সম্বন্ধে একথা খাটে না ; কতকগুলি কবিতা পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় কবি এখনো নানা অদ্ভুত পরীক্ষাচক্রের গোলোক ধাঁধায় পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, এখনো সেগুলি কোনো স্পষ্টরূপ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে নি। স্থানাভাবের জন্য উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারলুম না। এখনো অমিয়-কাব্যকাননের কবিতাকুসুমগুলির কতকগুলি পূর্ণবিকশিত কতকগুলি অর্দ্ধবিকশিত এবং কতকগুলি প্রাথমিক অবস্থায় আছে।

অমিয়বাবুর কাব্যে বৈচিত্র্যের চমৎকারীত্ব মনকে খুসি করে। "অভিজ্ঞান বসন্তের" অধিকাংশ কবিতাগুলি মনোধর্ম্মী গদ্য ঘেঁষা সমিল ছন্দে রচিত অথচ সমর সেন গোত্রীয় খাঁটি গদ্য কবিতা নয়, এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।—যেমন

আকাশ চাদরটা ময়লা, জেটির একটানা কালো কয়লা
নূরনবীর মাস পয়লা
অত্যন্ত ঘটা ক'রে নয় ট্যাঁকে পয়সা গোটা ছয়
গড়ের মাঠ পেরিয়ে ঘোরে,
ফুটবল দেখে, ডোরাকাটা গেঞ্জি খেলোয়াড় লাফাচ্ছে, জোরে।
[আটপৌরে, ৩৩শ পৃষ্ঠা]

গদ্য ঘেঁসা হ'লেও এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে চমৎকার একটা সূক্ষ্ম সুর-সংহতি আছে। অথচ ছন্দটি মোটেই গতানুগতিক নয়—এইখানেই তাঁর

'অরিজিন্যালিটি'। অবশ্য প্রতিভাশালী কবিরা কোনো কালেই আইন মেনে কবিতা লেখেন না, কবিকে আইনের নজির দেখানো মূর্খতা। উপেক্ষণীয় খুঁটিনাটি দোষত্রুটি বাদ দিয়ে রচনার সমগ্রতা যদি পাঠকের মনে আনন্দ জোগাতে পারে তাহ'লেই ব্যস্—কুচপরোয়া নেই—সেইখানেই কবির প্রতিষ্ঠা।

বেশীর ভাগ কবিতাতেই অমিয়বাবু স্বল্পভাষী, (এক এক জায়গায় তিনি স্বল্পভাষণের সংক্ষিপ্ততায় এত বেশী অস্পষ্ট হ'য়ে পড়েন যে রসগ্রহণে বাধা জন্মায়) কারণ প্রধানতঃ তিনি মনোধর্ম্মী কবি সেজন্য তাঁর অন্তর্মুখী কাব্যাদর্শ বাঙ্ময় অভিব্যক্তিতে সংক্ষিপ্ত। সে কারণে অমিয়বাবুর কবিতার বিরুদ্ধ সমালোচনা অধিকাংশ লোকের কাছেই শুনেছি। কিন্তু অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের আমি বলবো—যেখানে জোরালো কয়েকটা কথাই কাব্যের মেরুদণ্ডকে ঋজু রাখতে পারে সেখানে বাছা বাছা কয়েকটি শব্দের অনাবশ্যক ব্যবহার বাহুল্য মনে করি। আধুনিক কাব্যে তাই রচনার দেহটাই বড় নয়, মনই মুখ্য। আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাসঙ্কুল বর্ত্তমান সামরিক যুগে পৃথিবীর বড়ো বড়ো প্রাচীন সমাজ যখন যে কোনো মুহূর্ত্তে ভেঙে পড়ার দিকে ঝুঁকে আছে তখন সনাতন রসবিচারের গতানুগতিক পন্থা আঁকড়ে থাকার কোনো মানেই হয় না। তাই আধুনিক কবিতা পরীক্ষামূলক এবং মনোধর্ম্মী হ'তে বাধ্য।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

মাটি ও মানুষ

মরা মাটি (উপন্যাস)—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা। পৃঃ ১৭৭। দাম ২৲ টাকা।

'মরা মাটি' কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয় উপন্যাস। 'বৃত্ত' লিখে সঞ্জয়বাবু ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। আলোচ্য উপন্যাস তাঁর সে-খ্যাতি নিঃসংশয়ে বাড়াবে। বইখানা নানা কারণেই অসাধারণ। বাংলা সাহিত্যে এমন উপন্যাস

সম্ভবত এই প্রথম পাওয়া গেল যাতে রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর ছাপ নেই। রোমান্টিসিজ্‌ম্ হচ্ছে "a short cut to the strangeness without the reality"। তাই এ-কথাটা জোর ক'রে বলবার সময় হয়েছে যে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কখনো রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর রফা হ'তে পারে না। অধিকাংশ আধুনিক লেখক এই বিরোধের জন্যেই বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরাতে পারছেন না। এই দিক থেকে বিচার করলে সঞ্জয়বাবুর কৃতিত্ব বিস্ময়কর ; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি আধুনিক।

বাংলার কৃষক-সমস্যা নিয়ে এই উপন্যাস। মহাজনের চক্রান্তে জমিদারকুল উচ্ছন্নে যাচ্ছে, চাষীরা ক্ষেত হারিয়ে মজুর হ'চ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের চেহারাও বদলাচ্ছে। গ্রামের এই রূপান্তরের মূলে আছে ধনতন্ত্রের অনিবার্য্য পরিণাম। এই রকম অতি-সাধারণ বিষয়ের রূপায়ণ রীতিমতো কঠিন কাজ। কারণ এর জন্যে দরকার উপযুক্ত ভাষা আর নতুন আঙ্গিক। নচেৎ উপন্যাস হ'য়ে যায় নীরস। সঞ্জয়বাবু সফল হয়েছেন এই পরীক্ষায়।

কয়েক বছর আগে মনোরঞ্জন হাজরা বাংলার চাষীদের নিয়ে 'নোঙরহীন নৌকা' নামে একখানা উপন্যাস লেখেন। সে-বইয়েও পদার্থ আছে। কিন্তু বিষয়টা 'মরা মাটি'তে যেমন জমেছে, মনোরঞ্জনবাবুর উপন্যাসে তেমন জমে নি। তার প্রধান কারণ, তাঁর ভাষা বিষয়বস্তুর সঙ্গে খাপ খায় নি। সঞ্জয়বাবু সচেতন ও পরিশ্রমী শিল্পী ব'লে বিষয়োপযোগী ভাষা তৈরি ক'রে নিতে পেরেছেন। ফলে, বর্ণনা ও সংলাপের ভেতর দিয়ে স্থানিক প্রতিবেশও চমৎকার ফুটেছে। উপন্যাসখানা আগাগোড়া নৈরাত্ম রীতিতে লেখা। মাটিগতপ্রাণ চাষী তার ক্ষেতকে যে-চোখে দেখে এবং এই ক্ষেত ঋণের দায়ে হাতছাড়া হ'লে তার মনের যে অবস্থা হয়, ভরতের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তার সবটুকুই পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভরতের মধ্যে চাষীকেই দেখি, লেখককে নয়। লেখক চাষীর চোখেই গ্রামের সব-কিছু দেখতে চেষ্টা করছেন। শশীদল গ্রামের কয়েকটি আপাত-অসংলগ্ন চিত্র পর পর সাজিয়ে লেখক উপন্যাসখানা গড়ে তুলেছেন। কিন্তু তার ভেতর থেকেই প্রকাশ পেয়েছে রাহুগ্রস্ত গ্রামের সমগ্র রূপ। অভিনব আঙ্গিক উদ্ভাবনের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। বিষয়বস্তু আর আঙ্গিকের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় লেখকের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। এবং এই জন্যেই বইটা পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না ক'রে পারা যায় না।

'মরা মাটি'র মধ্যে কেবল জমিদারপুত্র শঙ্কর রায়ের চরিত্র তেমন ফোটে নি। বইখানির প্রচ্ছদসজ্জা সুন্দর।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

নব্যবঙ্গের সূচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। মূল্য দুই টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে বর্ত্তমান বাংলা দেশের যোগ যতো নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ, এমন বোধ হয় আর কোনো কালের সঙ্গেই নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই অবশ্য এ দেশে নতুন হাওয়া বইতে সুরু হয়। তারপর পরবর্তী শতকে সেই হাওয়া দুর্দমনীয় ঝড়ের বেগ সংগ্রহ ক'রে আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত করে। নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপারগুলিও এই উন্মত্ত ঝঞ্ঝার প্রকোপ এড়িয়ে চলতে পারে নি। রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি এবং ধর্মনীতিও এই যুগান্তকারী ভাববিক্ষোভে আন্দোলিত হ'য়েছে। সমস্ত জনসাধারণের উপর দিয়ে যদিচ এ হাওয়া প্রবাহিত হ'য়ে গেছে, তবু এই সব নব্যাদর্শের যাঁরা ছিলেন প্রতিনিধি স্থানীয় তাঁদের কথা এ প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মানে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশব সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনস্বী ও মহাপুরুষ অধ্যুষিত বাংলাদেশ। বর্ত্তমান আলোচ্য বইখানির শিরোনামা দেখে স্বভাবতঃই পূর্বোক্ত শক্তিমানদের সম্বন্ধে এ বই-এ অল্পবিস্তর আলোচনার আশা করা যায়। কিন্তু বাগল মহাশয় এঁদের সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই তাঁর এ গ্রন্থে করেন নি। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস লিখিত ছোট একটি ভূমিকায় এবং লেখকের স্বরচিত নিবেদনে এ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ আছে। যোগেশ বাবু "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ইতিহাস লইয়া দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছেন, এই পুস্তকখানি তাঁহার সেই বহু আয়াসসাধ্য গবেষণার ফল। ব্রজেন্দ্র বাবু

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের যে দিকটা বাদ দিয়া গিয়াছিলেন, যোগেশবাবুর যত্নে সেই দিকটি ক্রমশ উদ্ঘাটিত হইতেছে।" ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা এ প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। এই অক্লান্তকর্মী ঐতিহাসিকের আদর্শ অনুসরণ ক'রে যোগেশ বাবু সুনির্বাচনের পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের কৃতিত্বেরও যথেষ্ট নিদর্শন র'য়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাতজন কর্মীর জীবনকাহিনী এই গ্রন্থে আলোচিত হ'য়েছে। এঁদের নাম যথাক্রমে রুস্তমজী কাওয়াসজী, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রাধানাথ সিকদার। এই সব জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে যোগেশ বাবু বাংলা দেশের সমাজ ও সাহিত্যের গবেষক সাধারণের জন্য উল্লেখযোগ্য উপকরণ লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শেষোক্ত সিকদার মহাশয়ের জীবনীরই উল্লেখ করা যেতে পারে। প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম তাঁর "আলালের ঘরের দুলাল"-এর মাধ্যমে আজ শিক্ষিত বাঙ্গালি মাত্রেরই বোধ হয় অল্পবিস্তর পরিচিত। কিন্তু "মাসিক পত্রিকা" নামক যে সাময়িকীর পৃষ্ঠায় এই বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং যার সম্পাদনার ভার ছিল প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ সিকদারের উপর সেই পত্রিকাখানির খবর বেশি লোকের জানা নেই। রাধানাথ যে এই পত্রিকার অন্যতম উৎসাহী সম্পাদক ছিলেন এবং এই পত্রিকা সম্পাদন ব্যতীত তাঁর জীবন যে অন্যান্য কারণেও স্মরণীয়, সে খবর ক'জনেরই বা জানা আছে? অবশ্য পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আলোচনা অন্যান্য বই-এ যে না পাওয়া যায়, এমন নয়। কিন্তু যোগেশ বাবু তাঁর পূর্ববর্তীদের লেখা এই ধরণের বই-এর মারাত্মক ভুল প্রমাদগুলি সংশোধন ক'রে দিয়ে আমাদের ধন্যবাদভাজন হ'য়েছেন এবং তাঁর বইখানির মূল্যও এই কারণে বেড়েছে। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ব্যতীত অন্য দু'জনের একটি ক'রে চিত্র প্রকাশ ক'রেও গ্রন্থকার তাঁর বই-এর মনোজ্ঞতা বাড়িয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ সম্বন্ধে যাঁদের আগ্রহ আছে, মাত্র দু'টাকা দামের প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠার এই আলোচনা পেয়ে তাঁরা শুধু খুশিই হবেন না,—এর অপরিহার্য্যতাও তাঁরা স্বীকার করবেন।

হরপ্রসাদ মিত্র

নূতন গ্রন্থমালা

নব্য বিজ্ঞান কথা—সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। শতাব্দী গ্রন্থমালা। দাম এক টাকা।

ঘর ও সংসার—বিনয় চৌধুরী। শতাব্দী গ্রন্থমালা। দাম এক টাকা।

শতাব্দী গ্রন্থমালার প্রথম বই 'নব্য বিজ্ঞান কথা' পড়ে সাধারণ পাঠকের মনে কি প্রতিক্রিয়া হ'ল, মাত্র সেইটুকু বলার ক্ষমতা আমার আছে যেহেতু আমি বিজ্ঞানের চর্চ্চা করি না। 'নব্য বিজ্ঞান কথা' পদার্থবিদ্যা নিয়ে লেখা এবং এ বিষয়ে আধুনিক মতবাদ ও আবিষ্কারের সারাংশটুকু লেখক অতি চমৎকার ভাবে সরস ভাষায় বলেছেন। এতখানি ইন্টারেষ্টিং করে গল্প বলার ভঙ্গীতে বৈজ্ঞানিক তথ্য সাজানো রীতিমত শক্ত ব্যাপার। লেখক কৃতিত্বের সঙ্গে সে কাজ করেছেন। এ বই আরম্ভ করলে শেষ করতে হবেই এবং গল্প-চ্ছলে সাধারণ পাঠক অনেক জিনিষ জানবেন ও শিখবেন। 'চারইয়ারী কথা'র ভঙ্গিমা লেখকের আদর্শ, এটা বেশ বোঝা যায়। 'একটি অসম্ভব রূপকথা' পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক হবে; দ্বিতীয় রচনা 'একটি আজগবি নাটক' পড়ে কেউ বা চপলতার মাত্রাধিক্যে তেমন প্রীত হবেন না কিন্তু 'বুদ্বুদ-বিদারণ কাহিনী' নামক শেষ লেখাটি সকলের কাছেই সমাদর পাবে বলে বিশ্বাস করি।

বিনয় চৌধুরীর প্রথম রচনা হ'ল এই ছ'টি গল্পের সঙ্কলন। বেশি ভণিতা না করেও বলা চলে যে বিনয়বাবু একটানা গল্প বলে যেতে পারেন এবং সে বলার ধরণটিও মিষ্টি। সব ক'টি গল্প সমস্তরের রচনা নয়, তবে সবগুলিই গ্রামকেন্দ্রিক, অতএব সমব্যথায় ঈষৎ করুণ ও উজ্জ্বল। চরিত্রগুলিও সেই অনুপাতে সরস যদিও সুপরিচিত। কিন্তু প্রথম চারটি গল্প, বিশেষ করে 'অতি দীর্ঘে জীবিতে' নামক গল্পটি গতানুগতিক; অন্ততঃ এখানে পূর্ব্ব প্রভাব সুস্পষ্ট। অনেক স্থলে মনে হয় যেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাপ বেশি পড়েছে। বিষয়-বস্তু যেখানে পুরাতন, আঙ্গিক নিয়েও যেখানে পরীক্ষার চেষ্টা নেই সেখানে ছোট গল্পের স্বাভাবিক আবেদন ছাড়া অন্য কোনো সার্থকতা থাকে না। দু এক জায়গায় যে সম্ভাবনাটুকু উঁকি ঝুঁকি দেয়, শিথিল মুঠিতে তাও

নিষ্প্রভ হয়ে মিলিয়ে যায়। তবু ওরি মধ্যে 'মাসি' গল্পটিতে একটু নতুনত্ব ও সজীবতা পাওয়া গেল।

বইগুলির ছাপা ও বাঁধাই সুদৃশ্য। চোখে পড়লে হাতে তুলে নেবার ইচ্ছা আপনা থেকেই আসে। কিন্তু বইয়ের নাম ও গ্রন্থকারের নাম খুঁজতে গেলে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়; অন্ততঃ সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এটা ব্যবসায়িক ক্ষতি। তারপর মলাট থেকে সুরু করে প্রথম তিনপাতা এবং কভারের শেষ পৃষ্ঠা সর্ব্বাঙ্গে গ্রন্থমালার সম্পাদকবর্গের বিবৃতি এবং তাঁদের গম্ভীর পরিকল্পনার গুরুভার বহন করছে। অথচ এ যাবৎ এই সিরিজে কি কি বই প্রকাশিত হয়েছে বা হবে, তার কোনও তালিকা নেই। এ ছাড়া সম্পাদকীয় বক্তৃতাটুকু না থাকলেই ভালো হ'ত। ওটি শুধু অশোভন নয়, নিরর্থক—যেহেতু বুদ্ধিমান্ পাঠক প্রকাশিত বই দেখে ও পড়ে সম্পাদকীয় প্রচেষ্টার যথাযথ মূল্য দিতে পারবে বলে বিশ্বাস রাখা উচিত। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য আছে কিন্তু সেটা নীরবভাবে করা চলে অথচ নজরেও পড়ে। সংশোধনের আশায় এ ত্রুটিগুলির উল্লেখ করছি। তবে এটা সত্য যে বর্ত্তমান সময়ে এত অল্প দামে এমন শোভন, পরিচ্ছন্ন ও সুপাঠ্য বই প্রকাশ করা কৃতিত্বের কথা। 'শতাব্দী' গ্রন্থমালার প্রচেষ্টা শতায়ু হোক্।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দুষ্মন্তের বিচার—শ্রীপরিমল গোস্বামী; শতাব্দী গ্রন্থমালা প্রদর্শিকা। মূল্য এক টাকা।

প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক পরিমল গোস্বামীর লেখা এই নাটকটি বেতার কেন্দ্রে অভিনীত হয়েছিল। অন্যত্র অভিনীত হয় নি শুনে দুঃখিত হওয়ার কথা, কেননা নাটকটি সর্বাংশেই অভিনয়ের উপযুক্ত হয়েছে বলে মনে হলো। পরিমল বাবু একেবারে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা যা বলেছেন তা আমি মানতে পারলুম না; তাতে তাঁর নিজের প্রতিই একটু অবিচার করা হয়েছে। বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, গ্রন্থকার অভিনয়ের জন্যই নাটকটি রচনা

করেছেন। রসিয়ে রসিয়ে, তারিয়ে তারিয়ে, বিদগ্ধ মনের রং ফলিয়ে, নিভৃতে পড়ার বই এটি নয়। অঙ্গভঙ্গী, আবৃত্তি, গান ও দৃশ্যপটের সাহায্যেই নাটকটির রস জমে উঠ্‌বে। অভিনীত না হলে নাটকটির গুণ বিচার করাও শক্ত।

গানগুলি সুমধুর হয়েছে। বিদূষকের চরিত্রটি চমৎকার জমেছে। কূট লজিক ও অপ্রত্যাশিত ভাঁড়ামি বিদূষক দিয়েছেন প্রচুর। দুষ্মন্ত প্রেমের জগতে licensed freebooter; বহুদর্শী, ঝানু, ভ্রামর প্রেমের কাছে কত অনাঘ্রাত, সংযত্নে সংরক্ষিত যৌবনপুষ্প আত্মদানের জন্য যে কি রকম ব্যাকুল হয়ে ওঠে (হায়রে ঔপন্যাসিক মধ্যযুগ!), তারই একটা দিক লেখক দুষ্মন্ত-শকুন্তলা সংবাদের ভিতর দিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, এদেরো বরাতে পারিষদের প্রেম জুটলো। সতীপনা, নীতিপনা, আশ্রমপনার তলে তলে দুর্দমনীয় জৈব-মানবিক শক্তি নানা বিন্যাসে ক্রিয়া করছে—নিত্যকার ঘটনা। তার প্যাঁচোয়া দুষ্টবুদ্ধির কাছে দমননীতির শোচনীয় পরাজয় পরিহাসেরই বিষয়। কণ্বের সহিত মেট্রনের মিলনে আশ্রমের ফাঁদটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। কেবল মহাপ্রাজ্ঞ বিদূষকই—অনূঢ় রয়ে গেলেন।

হাস্যরসের সহিত নীতিবাগীশতার উৎকট সংমিশ্রণ নাটকটিতে নেই। এই জন্য নাটকটি উপভোগ করে পড়লাম এবং ঠিক এই জন্যই হয়ত নাটকটি বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে না। অশ্রুজলের রীতিমত একটা আকাল আমাদের রঙ্গালয়ে কবে আস্‌বে?

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

পাঠক-গোষ্ঠী

পরিচয় সম্পাদক সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

ভারতের ঐতিহাসিক অগ্রগতিতে অব্যাহত সার্থকতা থেকে রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা প্রবল হ'য়ে উঠল। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থের যে মন্তব্যের আলোচনা আপনি আহ্বান করেচেন, তা-ও সে প্রচেষ্টারই অন্তর্গত।

যে প্রকাশধর্মী অধ্যাত্মবাদ রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে চরম ব'লে পুরাকায়স্থ মহাশয় মনে করেন, বস্তুবাদের সংগে তার প্রত্যক্ষ মিল নেই। কিন্তু রবীন্দ্রমানসে সে অধ্যাত্মবাদও স্থাণু জিনিষ নয়ঃ সে-ও এক পরম জিজ্ঞাসা, গতিবন্ত জীবনের সংগে প্রাণবন্ত সংযোগে যা' আপনার পথ কেটে চলেচে এবং এখানেই বিজ্ঞানাশ্রয়ী বস্তুবাদের অনন্ত জ্ঞানসন্ধানের সংগে তার মিল। এই যে সচলতা এ-ই মার্ক্সবাদেরও প্রাণ এবং নতুন ক'রে এ'কথাটাই আবার বলতে হচ্ছে যে ইংরেজীতে যাকে Dogma বলে মার্ক্সবাদ তেমন কোনো স্থিরসিদ্ধান্ত মতবাদ নয়ঃ বিজ্ঞানানুসারী যে বিচারের সাহায্যে আমরা ক্রমপরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে আমাদের কার্য্যপন্থা নির্ণয় করতে পারি, তাকে ঘিরেই মার্ক্সবাদ গড়ে' উঠেচে। এ' কারণে এমন কথাও বলা যায় যে মার্ক্সের পূর্বেও মার্ক্সবাদ ছিলঃ অর্থাৎ মার্ক্সবাদানুসারে প্রাক-মার্ক্স কালেরও বিচার সম্ভব। স্থানকালপাত্রানুযায়ী একটা বিশেষ অবস্থাতে ঐতিহাসিক অগ্রগতির নির্দেশ আমরা মার্ক্সবাদের সাহায্যে পাইঃ এবং সে অনুসারেই যে কোনো কার্যপন্থা বা মতবাদের বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী রূপ আবিষ্কার করি। পুরকায়স্থ মহাশয় শুনে আশ্চর্য হবেন কিনা জানিনে যে বাংলার ইতিহাসে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের বিপ্লবী ভূমিকাও তাঁদের সমসাময়িক অবস্থার মার্ক্সবাদী বিচারে স্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদী ছিলেন না এ'কথা ঘটা ক'রে বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি মার্ক্সবাদী ছিলেন কি না ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মার্ক্সবাদী বিচারে সেকথা তেমনই অবান্তর যেমন হাস্যকর হবে রুশো ভলটেয়ারের মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণে তাঁরা মার্ক্সকে মানতেন কি না মানতেন সে প্রশ্ন তোলা। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েচে আমাদের সামন্ত প্রথাশ্রিত, আচারসর্বস্ব ধর্মজর্জর জাতীয় জীবনে তা' ব্যক্তিস্বাধীনতারূপেই কার্যকর এবং ঐতিহাসিক অগ্রগতির যে স্তরে আমরা আছি তা'তে তার বৈপ্লবিক তাৎপর্যও অস্বীকার করার উপায় নেই। ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব মধ্যযুগীয় যে রাষ্ট্রিক ও ধার্মিক নিপীড়ন থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিল আমাদের এখনও তা' আয়ত্ত হয় নি, ফরাসী বিপ্লব এখনও এদেশে সংঘটিত হ'তে বাকী আছে। আমাদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের দিকে তাকালে এ'কথা বুঝ্‌তে বিলম্ব হয় না। তারি সংগে মনে

পড়ে যে, যে দুর্বার প্রাণশক্তি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অদম্য গতিশীলতায় ব্যষ্টিকে ও সমষ্টিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তা-ই তাঁকে প্রণোদিত করেচে চরকাদর্শন প্রত্যাখ্যানে, আধুনিক বিজ্ঞানের অর্ভ্যথনায়, উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতায়, সর্বতোমুখী কর্ম প্রচেষ্টায় দেশের শক্তি নিয়োগের আহ্বানে ঃ অবশেষে গণশক্তির স্বীকৃতিতে। আমাদের দ্বিধা-গ্রস্ত জাতীয় জীবনে তার বৈপ্লবিক সার্থকতা যে এখনও বাকী রয়েচে এ'কথা অনস্বীকার্য।

বস্তুবাদকে মার্ক্সবাদের সমব্যাপক, মার্ক্সবাদকে সাম্যবাদের সমার্থক মনে করার মধ্যে যে অজ্ঞতা রয়েচে তা-ই পুরকায়স্থ মহাশয়কেও বিভ্রান্ত করেচে। সবচেয়ে আশ্চর্য হ'তে হয় দেখে যে তিনি স্পেংলার আর রবীন্দ্রনাথকে সমপর্যায়ে ফেলে কবিগুরুকে ফ্যাসিবাদের সমর্থনে টেনে আনতে চেয়েচেন। রবীন্দ্রনাথের এর চেয়ে বড় অপমান আর কীসে হ'তে পারে জানিনে। স্পেংলার ও রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা করতে হলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করতে হয়; এখানে শুধু জিজ্ঞেস করি, যে উদ্ভট জাত্যাভিমান ও শ্রেণীপ্রভুত্ব ফ্যাসিবাদের প্রাণ রবীন্দ্রনাথের মর্মবাণীর সংগে কি তার কোথাও এক তিল মিল আছে? "জীবনের সমস্ত বৈষয়িক প্রয়োজনকে ক্ষুদ্র জানাইয়া রবীন্দ্রসাধনা মানুষের অন্তরতম সৃজনী প্রেরণাকে গরীয়ান করিয়া প্রচার করিয়াছে"—এ যদি সত্য হয় তবে সে সৃজনী প্রেরণায়ই কি আজ ফ্যাসিবাদ সমস্ত জগৎকে বর্বরতায় আচ্ছন্ন করতে উদ্যত? এ যুক্তি এতই অশ্রদ্ধেয় যে এর আলোচনা করতেও গ্লানিবোধ হয়।

তারপর ক্ষেত্রমোহন বাবু বিদ্রূপ করেচেন তাদেরে যারা নিজেদের রবীন্দ্রনাথের মানস-পুত্র ব'লে দাবী ক'রে। ব্যবহারিক জীবনেও দেখা যায় পুত্র চিরদিন তাঁর পিতার পদাঙ্কানুসরণ ক'রে চলতে পারে না, তাকে তার নিজের পথ কেটে নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক অবদানে যারা লালিতপালিত তারাই তাঁর প্রাণবাণীর উত্তরাধিকারী। বস্তুর মধ্যে যে ধ্রুবের দিকে ইংগিত রবীন্দ্রনাথ দেখতে চাইতেন তা' কোনো অজানা অচল অনড় জিনিষ নয়ঃ বিশ্বজীবনে তার অবিরত প্রকাশকেও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেচেন। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার উপকরণাদি নিয়ে কবিতা লেখা বিষয়ে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তখনই তিনি বলেচেন যে আধুনিক সভ্যতার যেখানে চরমের দিকে গতি সেখানেই তিনি তার বন্দনা করেচেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের উপর আধুনিকের দাবী সত্য। অন্যপক্ষে দেখ্তে পাই তাঁকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রগতি থেকে সরিয়ে এক অস্পষ্ট অলীক আধ্যাত্মিকতায় গণ্ডীবদ্ধ ক'রে রাখার প্রয়াস। মার্ক্সবাদীদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে দলে টানবার বা তাঁর সংগে বোঝাপড়া করার কোনো প্রশ্ন নেই। মার্কস্বাদী দেখ্তে পায় যে চারদিক্কার চলন্ত জীবনের মধ্যেই রবীন্দ্রজীবন বিকশিত হয়েচে ঃ আপন আদর্শ সন্ধানেরই গতিবেগে তিনি জনজীবনের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েচেন, সম্মুখপথের নিশানা রেখে গেছেন। এ স্বীকার না কর্লে তাঁকে খাটো করা হয় এ'কথাই আমরা তারস্বরে ঘোষণা কর্তে চাই।

বসুধা চক্রবর্ত্তী

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

১৩শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৫০

পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ও প্রগতি সাহিত্য

সমালোচনা জিনিষটা যত কঠিনই হোক, তার একটা সহজ পথও আছে। সে-পথটা হল কোন মত বা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তার কোন প্রামাণ্য লেখাকে অনুসরণ না করে নিজের অভীপ্সিত চিন্তা অনুযায়ী সেটাকে বিকৃত বা অর্ধ-বিকৃতভাবে প্রকাশ করা। সমালোচকের কলমের স্বাধীনতা থাকে অব্যাহত; কিন্তু সমালোচনার বস্তুটির হয় জীবন্ত-সমাধি। দেখলাম, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'পরিচয়ে' শ্রীযুত পুরকায়স্থ মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রগতি-বাদীদের মত উল্লেখ করতে গিয়ে সেই চমৎকার উপায়টির আশ্রয় নিয়েছেন। প্রগতিবাদীরা জীবন্ত বলেই এই জীবন্ত-সমাধির প্রচেষ্টায় বাধা দেবে এটা স্বাভাবিক। বর্তমান প্রবন্ধ সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ারই একটা সামান্য অংশ।

পুরকায়স্থ মহাশয় ব্যাপকভাবে মত মন্তব্য করেছেন, মার্কসবাদীরা "চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল", "আমার সুরের অপূর্ণতা", "কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন" প্রভৃতি কয়েকটী উক্তিকে প্রামাণ্য ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাহাদের বিশেষ অর্থে "প্রগতি"র সন্ধান করিয়া বেড়ান। বাংলা দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রগতিবাদী সমালোচকের মধ্যে কার লেখা কোন্ প্রবন্ধে তিনি এই ধরণের অনুসন্ধানের চেষ্টা দেখতে পেয়েছেন তা পরিষ্কার করে লেখার তিনি কোন দরকার বোধ করেন নি। যদি সত্যিই কোন প্রবন্ধে তিনি এই ধরণের কোন প্রয়াস দেখে থাকেন তো সেই প্রবন্ধকারের নাম উল্লেখ করলে তিনি প্রতিনিধি-স্থানীয় কিনা তার খোঁজ করার সুবিধা পাঠকদের থাকত। সমালোচকের দায়িত্বের পথ এড়িয়ে পুরকায়স্থ মহাশয় যে-সহজ পথ নিয়েছেন তাতে অন্ধকারের মধ্যে তিনি অনেক চোখা চোখা বাক্যবাণের ঢিল ছুঁড়েছেন।

আমার বিশ্বাস পুরকায়স্থ মহাশয় বিশেষার্থে প্রগতি বলতে এই অর্থ ধরেছেন যে আজকের মার্কস্‌বাদী বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ নিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে তাই হ'ল প্রগতি সাহিত্য। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এ কথা কোন সমালোচক কোথাও লিখেছেন বলে আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। বস্তুতঃ আমাদের দেশে যে আমলে শ্রমিক আন্দোলন যথেষ্ট পরিমাণে গড়ে ওঠার ফলে অগ্রগামী শ্রমিকরা সাম্যবাদী ভাবধারা গ্রহণ করেছে, সে আমলের লেখকই নন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দেশে যে সময়ে একমাত্র বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ আন্দোলনই দেশের অগ্রাভিযানকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল তখনকার প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক হলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর থেকে দীর্ঘকালব্যাপী বুর্জোয়াশ্রেণী এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলেছে তার মধ্যে সব জায়গায় হয়তো রবীন্দ্রনাথ সমানভাবে তাল ফেলে চলতে পারেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে পুরোপুরিভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের শক্তি এবং দুর্বলতা, তাদের সমাজ-সংস্কার এবং পশ্চাৎমুখিতা—এ-সবই যথাযথভাবে পরিচয় লাভ করেছে। আমাদের বুর্জোয়াশ্রেণীর তাদের য়ুরোপীয় দোসরদের সংগে পাল্লা দিয়ে চলার স্বপ্ন, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং জাতীয় উন্নয়ন-প্রচেষ্টা, এ-সবের সংগে মিলিয়ে আবার তার দুর্বলতা, জাতীয় গৌরবের নামে অনেক পুরান আবর্জনাকে আঁকড়ে রাখার চেষ্টা, বৈপ্লবিক প্রেরণাকে ধোঁয়াটে আধ্যাত্মিকতার নিরাপদ পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া—এ সবই রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপ পেয়েছে। এর ফলে বিন্দুমাত্রও চিন্তা না করে বলা চলে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া লেখক (যে কথাটা প্রকান্তরে পুরকায়স্থ মহাশয়ও বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর 'ফ্যাসিষ্ট' বিশেষণটা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খাটে না; কারণ যে-স্তরে মুমূর্ষু বুর্জোয়াশ্রেণী আত্মরক্ষার শেষ মরীয়া চেষ্টায় তারই একালের অর্জিত ব্যক্তিগত এবং চিন্তাগত স্বাধীনতাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সে-স্তরের নন। তিনি উদারনৈতিক বুর্জোয়া আমলের লোক)। কিন্তু বুর্জোয়া লেখকও যে মার্কস্‌বাদীর কাছে কম সম্মানের বস্তু নয় এ কথা বোধ করি পুরকায়স্থ মহাশয় ঠিক মত বুঝে উঠতে পারেন নি, এবং সেই জন্যই যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি। বুর্জোয়া লেখক রবীন্দ্রনাথও মার্কস্‌বাদীদের

কাছে প্রগতিশীল, অবিশ্যি শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণের বাহক হিসাবে নয়। প্রগতিশীলতার কোন পাকা পোক্ত চিরস্থির মানদণ্ড নেই। কালের গতির সংগে সংগে যেমন-ভাবে সমাজের অগ্রাভিযানরত আন্দোলনের গতি এবং প্রকৃতির পরিবর্তন হতে থাকে ঠিক সেইভাবেই সাহিত্যের প্রগতির রূপ বদলাতে থাকে। প্রগতি সাহিত্য তো আসলে সমাজের অতীত এবং বর্তমানকে বিশ্লেষণ করে তার ভবিষ্যতের গতিপথকে যথাযথ নিরূপণ করতে চেষ্টা করে, যার ফলে সর্বদাই এই সাহিত্য সমাজের উন্নতিশীল আন্দোলনের সহায়ক হয়। আমাদের সামন্ততন্ত্র-প্রধান সমাজে তাই একদিন বুর্জোয়া-জাগরণের আন্দোলন নতুন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ খুলে দিয়েছিল; তা সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ এই উভয়ের থেকেই সমাজকে মুক্ত করার যে পরিকল্পনা নিয়েছিল সেটা সেই সময়ে অত্যন্ত অগ্রসর মত ছিল। কাজেই সেই মতের বাহক রবীন্দ্রনাথ তখন অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিলেন। সমাজের ভবিষ্যৎগতির অনুকূল ছিল তাঁর সাহিত্য। তারপর বর্তমান সময়ের শ্রমিক-শ্রেণীর আরও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টিকোণ আমাদের সামনে উপস্থিত সন্দেহ নেই; কিন্তু আজকের স্বাধীনতা-বিরোধী ফ্যাসিজ্‌মের বিরুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণীর সংগে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সমস্বার্থের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে আন্দোলন সৃষ্টি করছে আমাদের সমাজের প্রগতিশীল আন্দোলন আজকে নিশ্চয়ই সেইটে। কাজেই বুর্জোয়াধর্মই হোক, আর শ্রমিকধর্মই হোক, যে সাহিত্য আজ ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ঘোষণায় মুখর, তাকেই প্রগতিশীল বলতে বাধা থাকার কোন কারণ নেই। এই দিক থেকে বিচারে বর্তমান সময়েও যে অনেক ফ্যাসিষ্ট-এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রচনার এবং ঘোষণার লেখক রবীন্দ্রনাথের যে স্পষ্ট প্রগতিশীল 'রোল' রয়ে গেছে তা অস্বীকার করার কোন উপায় দেখি না। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে কাস্তে হাতুড়ীর উল্লেখ খুঁজে বের করে বা কৃষাণের ব্যথার আবেদন বের করে তাঁকে প্রগতিশীল প্রতিপন্ন করার হাস্যকর চেষ্টা নিতান্তই পুরকায়স্থ মহাশয়ের মনগড়া ধারণা।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়তো যথেষ্ট পরিষ্কার হল না। আরও একটু গোড়ার থেকে আরম্ভ করা দরকার। বুর্জোয়া প্রভাবাধীন যে মন তার কাছে সাহিত্য কি? তার কাছে সাহিত্য আমাদের মনে যে সাড়া জাগায়, যে রস

সৃষ্টি করে তার একটা চিরন্তন, স্থায়ী রূপ আছে। যুগে যুগে হয়তো সাহিত্যের আকার বদলায়, নতুন নতুন প্রকাশভংগীর আশ্রয়ে সে হয়তো চির-নতুন থাকে, কিন্তু তার ভিতর থেকে সেই চিরকেলে রস-বোধ এবং মংগলবোধ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। মানুষের সৌন্দর্যানুভূতির, মানুষের মংগলের মানদণ্ডের কোন পরিবর্তন নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সৌন্দর্য এবং রসের রাজ্য হচ্ছে প্রয়োজনের বাইরে গিয়ে। অর্থাৎ যে পৃথিবীতে আমরা আমাদের বাঁচার প্রয়োজনে, আমাদের খাদ্যের প্রয়োজনে ছুটাছুটি করছি এবং নিরন্তর সংগ্রাম করছি সেই পৃথিবীর কোন স্থান নেই সাহিত্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে মার্কস্‌বাদীর ধারণা প্রায় এর উল্টো। মার্কস্‌বাদী জানে সামাজিক মানুষ একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। এই বিবর্তন এত ব্যাপক, এত সর্বাংগীণ, যে যুগ পরিবর্ত্তনের সংগে মানুষের অর্থ-নৈতিক পরিবর্ত্তন তো হয়ই (বিবর্তনের মূল কারণই সেইটে), সেই সংগে আসে নতুন নীতি, নতুন ধর্ম, নতুন সমাজ-সম্পর্ক, নতুন কৃষ্টি। মানুষের মংগলের ধারণা বদ্‌লায়, সেই সংগে সৌন্দর্যের ধারণাও। কাজেই শুধু মংগল আর সৌন্দর্যকেও যদি সাহিত্যের মাপকাঠি হিসাবে ধরা যায়, তবু এই দুটো জিনিষের পরিবর্তনের সংগে সংগে সাহিত্যেরও পরিবর্তন হতে বাধ্য। কিন্তু সমাজের গতির সংগে সাহিত্যের সম্পর্ক আরও একটু জটীলভাবে বুঝতে হবে। এবং তখন বোঝা যাবে সাহিত্যের ভিত্তি হল আসলে মাটীর পৃথিবী, মানুষের অর্থনৈতিক জীবন।

ইতিহাসে আমরা যে সমাজের পরিচয় পাই তা কোন না কোন শোষণ ব্যবস্থায় ক্ষতবিক্ষত। শোষণ ব্যবস্থার ভিতরেও মানুষের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা আসলে শোষক এবং শোষিতের সম্পর্ক হলেও এই রূপটা থাকে প্রায়শঃ মানব-চেতনার আড়ালে। তার কারণ সাময়িকভাবে এই সম্পর্কই মানব সভ্যতার পক্ষে মংগলপ্রসূ হয়ে ওঠে। মধ্য যুগে এই সম্পর্ক ছিল সামন্ত-রাজ আর ভূমি-দাসের মধ্যে; তার আগে দাসতন্ত্রে ছিল প্রভু আর ক্রীতদাসের মধ্যে, এবং তারপরে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজে ধনিক আর শ্রমিকের মধ্যে। একটা সমাজ-সম্পর্কের মধ্যে কাজেই দুটো বিরোধী স্বার্থ থাকেই এবং সেই নিয়ে সংগ্রামও চলে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা এই সম্পর্কের গণ্ডীর মধ্যে নির্বিঘ্নে চালু থাকে, ততক্ষণ সমাজের মধ্যে

কোন গুরুতর বিশৃংখলা আসে না। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির সংগে সংগে তা আর এই সম্পর্কের গণ্ডীর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে চলতে চায় না। দেখা দেয় বিশৃংখলা, জনসাধারণের অসন্তোষ পর্বত-প্রমাণ আকৃতি নেয়; শোষিত শ্রেণী বা এমন-কোন নতুন-জাগা শোষক শ্রেণী—যার পক্ষে নতুন উৎপাদন যন্ত্র চালানো সম্ভব—সংঘবদ্ধ হয়ে যে বিপ্লব করে তার ফলে জন্ম নেয় নতুন সমাজ নতুন সমাজ-সম্পর্ক নিয়ে। যেমন নতুন যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবের ফলে যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্ক অচল হয়ে পড়ল তখন নবাগত বুর্জোয়া-শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের ফলে য়ুরোপে বুর্জোয়াতন্ত্রের পত্তন হল। তেম্নি আবার বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাও আধুনিকতম যান্ত্রিক ব্যবস্থার সংগে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারছে না; তার ফলে রুশ দেশে ইতিমধ্যেই শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের ফলে শ্রেণীহীন সমাজের গোড়াপত্তন হল। প্রত্যেকটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংগে সংগে আবার বিরাট মানসিক পরিবর্তনও এসেছে। নতুন নতুন দর্শন, নতুন নতুন বিজ্ঞান, নতুন নতুন সাহিত্য প্রভৃতি জন্ম নিয়েছে,—আর এই প্রত্যেকটা জিনিষের পিছনেই অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে একটা নতুন দৃষ্টিকোণ—সমাজকে, জীবনকে এমন একটা নতুনভাবে দেখবার চেষ্টা যা আগে ছিল না। এই নতুন দৃষ্টিকোণ আসলে আসে কোত্থেকে? অল্প চেষ্টায়ই লক্ষ্য করা যায়, যে-নতুন শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজে পরিবর্তন এসেছে তার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা, এবং নতুন পরিবর্তিত সমাজে যে অবস্থানের তারতম্য ঘটেছে—এই সব নিতান্তই খাওয়া-পড়ার ব্যাপার দার্শনিকের বা লেখকের আকাশ-পাতাল ভাববার ও কল্পনার পিছনকার দৃষ্টিকোণ গড়ে তোলে। এই অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অবলম্বন করে দার্শনিক বা সাহিত্যিক হয়তো চিন্তা প্রয়োগের সাহায্যে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারেন, যার ফলে জগৎ সম্বন্ধে নতুন নতুন সত্য বা জীবন সম্বন্ধে নতুন কল্যাণ বা রসের ইংগিত তাঁরা আবিষ্কার করেন।

নতুন সমাজ সৃষ্টি হলে তবেই যে এই নতুন দৃষ্টিকোণ জন্মলাভ করে তা নয়। পুরান সমাজ যখন অচল হয়ে আসে যখন তার মধ্যে এই অচল ব্যবস্থা দূর করার জন্য প্রগতিশীল শ্রেণীগুলি সংঘবদ্ধ হতে থাকে তখনই এই প্রগতিশীল সংগ্রামের সাহায্যকারী হয়ে এগিয়ে আসে এই দৃষ্টিকোণ। এই

দৃষ্টিকোণ নিয়ে লেখা সাহিত্য মানুষের পুরান সুরে বাঁধা মনের জড়তাকে ভেঙে তার মধ্যে নতুন প্রেরণা, নতুন সমাজবোধ নিয়ে আসে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই সুরু করা যাক। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-রচনার কালে আমাদের দেশে আংশিকভাবে বুর্জোয়া অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে,—বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, কারেন্সী প্রভৃতি বুর্জোয়া-নীতি অনুসরণ করেই চলেছে। কিন্তু জন্ম নেয়নি কোন বড় দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান। তার ফলে সরকারী চাকুরী, বাণিজ্য এবং জমিদারীর ভিতর দিয়ে কতকগুলি ধনী লোক বের হয়ে এসে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠ্‌ল। তাদের ভিতর ধনিক মনোবৃত্তি গড়ে উঠল; কিন্তু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক না হওয়ার ফলে সে মনোবৃত্তি যতখানি য়ুরোপের অনুকরণপ্রিয় হল ততখানি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী এবং উদ্যোগপ্রধান হল না। তার গোড়াকার পরিপুষ্টি এসেছিল সাম্রাজ্য-বাদের থেকেই, ফলে পরবর্ত্তী কালে সাম্রাজ্যবাদের থেকে বাধা পেয়েও সে তার এই জন্মবৃত্তান্ত চট্ করে ভুলে যেতে পারেনি। তার ফলে সমাজ-তন্ত্রকে ধ্বংস করতে গেল তারা ক্ষুদ্র সংস্কারের ভিতর দিয়ে; বুর্জোয়া সমাজ গড়তে গেল তারা সাধারণ রকমের শিক্ষা বা এম্নিসব প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা ছিল, কিন্তু সেটা বিপ্লবী রূপ নেয়নি। রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কারক সংগঠনশীল মনোবৃত্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

তার ফলে আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কি দেখতে পাই? আমরা দেখি রবীন্দ্রসাহিত্যে একেবারে 'নির্ঝরের স্বপ্নভংগে'র (প্রভাত সংগীত) আমলেই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আহ্বান। তারপর তিনি ক্রমান্বয়ে আমাদের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-নীতি যে নারীর রূপ বর্ণনাকে, যে নর-নারীর স্বাধীন প্রেমোচ্ছ্বাসকে কৃত্রিমভাবে চাপা দিতে চেয়েছে, সেগুলোকে সহজ কাব্যের রূপ দিয়েছেন। কুসংস্কারের থেকে হৃদয়াবেগকে মুক্ত করেছেন (ছবিও গান, মানসী, সোণার তরী প্রভৃতিতে)। ধর্মের দিক দিয়ে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রসাহিত্যের আঘাত গিয়ে পড়েছে জাতিভেদের বিরুদ্ধে, জাতিগত সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে (গোরা, কথা ও কাহিনী প্রভৃতি), তিনি প্রচার করলেন নতুন উদার মানবতার ধর্ম। ঠিক তেম্নি আবার শিক্ষার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র-মন অলস ছিল না; শিক্ষাকে গতানুগতিকতা, যান্ত্রিকতা, প্রভৃতির থেকে উদ্ধার

করে তাকে জীবন্ত করে তোলার জন্য রয়েছে আহ্বান এবং পরিকল্পনা ('শিক্ষার হেরফের' প্রভৃতি প্রবন্ধ)। এই সব ব্যাপক যুগান্তকারী মনোভাবগুলি একত্র করলে যা' দাঁড়ায় তা হল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নির্জীব ব্যবস্থার নাগপাশের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মনের আক্রমণ। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বংশমর্যাদা-প্রধান বনিয়াদের উপর ক্ষমতা-লোভী বুর্জোয়া শ্রেণী সমানা-ধিকারের দাবী নিয়ে যে আঘাত করেছে, সেই আঘাত সাহিত্যের ভিতরেও প্রতিভাত হয়েছে নতুন নীতি, নতুন স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারে। যতদিন না আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলেছে ততদিন রবীন্দ্রনাথের জন্ম সম্ভব হয়নি। নতুন অর্থনৈতিক রদ বদল রবীন্দ্রনাথের জীবনে নিয়ে এল নতুন বুর্জোয়া দৃষ্টিতে লেখা সাহিত্য, আবার এই সাহিত্য দেশের লোকের মনোবৃত্তি বদলাতে সাহায্য করে তার অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে সম্পূর্ণতর করার পথে পরিচালিত করেছে। কাজেই যদি বলি সাহিত্যের মূলগত প্রেরণা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তবে তা সত্য। রবীন্দ্রনাথের সময়ে এই নয়া অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা আমাদের কূপমণ্ডুক জড়ত্বপ্রাপ্ত সমাজকে নতুন গতি দিচ্ছিল, নতুন উন্নতির পথ দেখাচ্ছিল। কাজেই এই অর্থনীতি আমাদের সমাজের পক্ষে তখন ছিল প্রগতিশীল। আবার এই ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে নতুন মনোবৃত্তি দরকার তা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে রবীন্দ্রসাহিত্য। কাজেই এই সাহিত্যও প্রগতিশীল। রবীন্দ্রসাহিত্যকে বুর্জোয়া বলে মার্কস্‌বাদী তাকে অবজ্ঞা করতে চায় না; তাকে তার ন্যায্য সম্মানই দেয়।

সামন্ততন্ত্রের প্রভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধই আমাদের দেশে বুর্জোয়া অগ্রাভি-যানের একমাত্র প্রয়োজন ছিল না। তার একটা আরও বড় প্রয়োজনীয় জিনিষ ছিল সাম্রাজ্যবাদের থেকে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে মুক্ত করা। তার অর্থনৈতিক বিস্তারের জন্যই এটা অপরিহার্য ছিল। অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যে এই অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ছাপ পড়তে আট্‌কায়নি। তিনি সাম্রাজ্যবাদী জুলুমের প্রতিবাদ জানিয়েছেন, দেশে জাতীয় জাগরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন (১৯০৫—০৭ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত স্বদেশী বক্তৃতাবলী উল্লেখযোগ্য)। এই স্বাধীনতা কামনার ছাপ পড়েছে তাঁর উপন্যাসে, কাব্যে (গোরায় এবং বহু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতায়)।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রয়োজনের রাজ্যের বাইরে তাঁর সাহিত্যের স্থান। এর চেয়ে সত্য করে বুর্জোয়া মনোবৃত্তি আর কী করে প্রকাশ করা যায়? বুর্জোয়া-মন তো কোনদিনই তার নিছক প্রয়োজন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি। বিজ্ঞান তার হাতে শিল্প-প্রসারের যে অগাধ সুযোগ দিয়েছে তার সাহায্যে সে কেবলি নিজেকে প্রসারিত করে বিশ্বগ্রাসী হতে চেয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বুর্জোয়া-মনোবৃত্তির মধ্যে যে শক্তির দিকগুলো দেখা-লাম তার পাশাপাশি আবার দুর্বলতার দিকও ছিল। বুর্জোয়াশ্রেণী যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহযোগিতায় বার বার করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানছে—কখনো অহিংস আন্দোলনের ভিতর দিয়ে, কখনো সন্ত্রাসবাদী কার্য কলাপের ভিতর দিয়ে,—তার সংগে সায় দিয়ে চলতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ। সাম্রাজ্যবাদের থেকে মুক্তির একমাত্র পথ যে সংগ্রাম, মানবতা এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সম্মানজনক আপোষ-চেষ্টা যে নয়, তা তিনি স্বীকার করতে চাননি। তার ফলে ১৯০৭ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত জীবনে এবং সাহিত্যে বৈপ্লবিক রাজনীতির পথ থেকে দূরে সরে গেছেন; এবং ছোট-খাটো সংগঠনের ব্যাপারে তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করে বের করা খুব শক্ত নয়। তিনি ফ্যাক্টরীর মালিক ছিলেন না, অথচ ফ্যাক্টরীই বুর্জোয়ার আসল স্থান। তিনি ছিলেন জমির মালিক; এবং যে সমাজে তিনি মানুষ হয়ে উঠেছিলেন সে-সমাজও তখন মোটেই যন্ত্রপ্রধান নয়। তার ফলে শিল্প-সম্প্রসারণে সাম্রাজ্যবাদের বাধা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ তাঁর হয়নি; এবং সেই জন্য বিদ্রোহের মনোবৃত্তিও তাঁর মধ্যে ততখানি তীব্র হয়ে ওঠেনি। আস্তে আস্তে তিনি যখন দেখেছেন তাঁর শ্রেণীর তেমন লক্ষ্যণীয় অগ্রগমন আর সম্ভব হচ্ছে না, তাদের ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা ভোঁতা হয়ে এসেছে, তখন এই জড়ত্বের আসল কারণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে না গিয়ে তিনি আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আত্মগোপন করেছেন। উপনিষদের দর্শন থেকে সুরু করে (গীতাঞ্জলি) তিনি অত্যন্ত আধুনিক বার্গসোঁর দর্শন পর্যন্ত এগিয়ে এলেন (বলাকা)। তাঁর বিরাট সৃজনী প্রতিভা শত শত ছন্দের জন্ম দিল, বাংলা ভাষাকে নতুন করে গড়ে তুলল। কিন্তু তা স্বাধীনতার সংগ্রামকে সাক্ষাৎ-ভাবে স্বীকার করল না। শেষে এমনও হল, তিনি আধুনিক নগর

সভ্যতাকে ধিক্কার দিলেন ("আমি চাই না হতে নব-বংগে নবযুগের চালক"); প্রাচীন ভারতের আদর্শে গড়ে তুললেন শান্তিনিকেতন (যদি চ শান্তিনিকেতন দু'একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছাড়া একটা উৎকৃষ্ট বুর্জোয়া শিক্ষায়তন হয়ে উঠল)। বুর্জোয়া চিন্তাধারার মধ্যে এ দুর্বলতা, এই স্ব-বিরোধ প্রায় অধিকাংশ বুর্জোয়া সাহিত্যিকের মধ্যেই দেখা যায়। অনেক ইংরেজ কবি, যেমন ইয়েট্‌স্ (ইংরেজী গীতাঞ্জলির ভূমিকার লেখক) বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে সাম্রাজ্যবাদের সম্ভাবনাহীন, নিগীড়নপ্রিয় কুৎসিৎ রূপ দেখে তার বিরুদ্ধে না গিয়ে জীবন-সম্পর্কহীন আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। কাজেই এই দুর্বলতাকে অনর্থক গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথ তো অন্তত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিকূলতা করেন নি, তিনি তো অন্ততঃ আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি না চাইলেও তাঁর সাহিত্য যে-ভাবে বাংলাভাষাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়েছে, তা দেশবাসীর মনে নতুন জাতীয় বুর্জোয়া চেতনা গড়ে তুলেছে, এবং সেই চেতনা তাদের ঠেলে দিয়েছে বিপ্লবের পথে।

আমরা দেখলাম, রবীন্দ্রনাথের সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথের জন্ম সম্ভব করেছে; আবার রবীন্দ্রসাহিত্য এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ক্রম-বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। কাজেই যত আকাশচুম্বী কল্পনা আর হাজার বছর আগের আদর্শবাদই রবীন্দ্রসাহিত্যে থাকুক, তার জন্মও এই মাটিতে এবং তার যে ক্রিয়া তাও হয়েছে এই মাটির উপরে। এই ভাবেই মার্কস্‌বাদী সাহিত্য ও সাহিত্যিককে বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত; এবং এই উপায়েই মার্কস্‌বাদী রবীন্দ্রনাথের কপালে 'প্রগতি'র জয়টিকা পরিয়ে দিয়েছেন।

পরিশেষে আধুনিক কালের সংগে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিরূপণ করা দরকার। এ কথা সত্য যে বুর্জোয়া অর্থনীতি যে পৃথিবীতে বানচাল, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যে অস্তমিত, মার্কস্‌বাদী তা জানেন এবং মানেন। কাজেই প্রগতি সাহিত্যিকের মধ্যে ভবিষ্যতের সাম্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ইংগিত থাকা ভাল। কিন্তু খুব স্পষ্ট ভাবে বলা দরকার যে আজকের দিনের প্রগতি-শীলতার মাপকাঠি এই সংকীর্ণ ভিত্তিতে হতে পারে না। বর্তমান

সমাজের ভিতরে যে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে ভবিষ্যৎ সমাজের দিকে এগিয়ে যেতে সেইটে আজ একমাত্র পথ। কাজেই এই সংগ্রামে যোগ দেওয়া, তাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার উপরে নির্ভর করছে আজকের সমাজের প্রগতি, সাম্যবাদী সমাজের দিকে এগিয়ে যাবার প্রথম ধাপ। আজকে প্রগতির আসল মাপকাঠি হল ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্বীকার করা। আজ এমন লেখকও থাকতে পারেন যিনি অনেক কৃষাণের ব্যথা, অনেক মজুরের অশ্রুজলের কথা বলেও প্রতিক্রিয়াশীল শুধু এই সংগ্রামের বিরোধিতা করার জন্য, কারণ তিনি তো আসলে সারা পৃথিবীকে মানবতার নিকৃষ্ট শত্রু ফ্যাসিজমের হাতে তুলে দিতে চাইছেন, হাজার বছরের জন্য শ্রমিক কৃষককে তো বটেই, মানব জাতিকে সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে খারাপ অংশের হাতে বন্দী করতে চাইছেন। পক্ষান্তরে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রাম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার খাতিরে সমর্থন করলেও তাতে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের পতন হচ্ছে, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে সেটা অপরিহার্য ধাপ। এই আলোকে বিচার করে আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ নোগুচি এবং র‍্যাথবোনের কাছে লিখিত চিঠিতে, রঁলার সংগে পত্রালাপে, "দানবেরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস" প্রভৃতি কবিতায়—বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার আগেই ফ্যাসিজমের ভয় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কলম ধরেছিলেন। বস্তুতঃ ১৯২৯-এ রুশদেশে গিয়ে সেখানকার শ্রমিক স্বাধীনতার দেশ দেখে এবং তার সংগে ইটালী এবং জার্ম্মানীর নিরংকুশ যুদ্ধ-সাধনার তুলনা করে, এদেশে বৃটিশের চাতুরী বিশ্লেষণ করে তিনি শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ মানবতার বা গণতন্ত্রের দাবী চিরদিনই অস্বীকার করবে; একমাত্র সংগ্রাম ছাড়া তার হাত থেকে নিস্তার নেই। তাই বৃদ্ধ বয়সে তিনি আগেকার আপোষের মনোবৃত্তি ছেড়ে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন (নবজাতক, ছড়া প্রভৃতি)। আজকের দিনে এর চেয়ে প্রগতিশীলতা আর কী হতে পারে। আজকের দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপযোগিতা আছে এর চেয়ে বড় কথা আর কী আছে!

একমাত্র মার্কসবাদীই জোর করে বলতে পারে, আমরা রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতির বাহক, আমরা রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি।

অচ্যুত গোস্বামী

[শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ মহাশয় লিখিত "সাহিত্য ও ব্যক্তিস্বরূপ" নামক 'পরিচয়ের' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধের প্রতি-আলোচনা।]

ব্রজেশ্বরীর দিবাস্বপ্ন

এইমাত্র দুপুরের খাওয়া সেরে ব্রজ একটু গড়িয়ে নিচ্ছে।

সে যে বিধবা এবং তিনটি ছেলের মা, তার এই সামাজিক সম্পর্কের দিকে খেয়াল না রেখে বদখেয়ালী যৌবন তার প্রতিটি অবয়বের সঙ্গে যে-খেলা খেলে চলেছে, তা সাত্বিক মানুষেরও দৃষ্টি এড়ায় না। পাথরের মূর্তি যেমন ভাস্করের নিঃসমীহ সৌন্দর্য-বোধ লোকচক্ষুর সামনে অসঙ্কোচে মেলে ধরে, ব্রজও তেমনি তার বিধাতার হাতে গড়া অঙ্গ-সৌষ্ঠব তেলচিটে থানের প্রচ্ছদে গোপন করবার বৃথা চেষ্টা করতো না।

তাই চৈত্রের দুপুরে ঘুঁটে আর কয়লা-ভরা ঘুপ্‌সী ঘরখানার একপাশে নক্সী-কাঁথার ওপর তার শোবার ভঙ্গিটা আজ নিতান্ত বেপরোয়া।

এঁচোড়ের ডালনাতে জলপাইয়ের তেলটুকুর আমিষ স্বাদ বারে বারে জিভের ডগায় পাওয়া যাচ্ছে। ব্রজ ভাবছে, সেদিন কী কুক্ষণে সে গিন্নীর কাছে একাদশীর কথা তুলেছিল!—ওমা, তা বলিস্ নি কেন বাছা, তোর হাত-সুদ্দি হয়েচে?—গিন্নীর মৃদু অনুযোগ—ওমা, দেকোদিকিন কী কাণ্ড! ওতে গেরস্তর অকল্যেণ হয় যে রে বাপু! ঠাকুরটোরও যেমন আক্কেল, ওর পাতে এমন-এমন মাচের দাগা! তা খা না বাছা, খেতে কি আর সাদ যায় না! কিন্তু গেরস্ত বাড়ীতে বিধবা মানুষকে ওসব গেলানো কেন্‌রে বাবু! না না, ব্রজ তুই বাছা, একটা ডুব দে আয় বরং, কালীঘাট তো এই দু-পা, দর্শনটাও অমনি সেরে আসিস্। মা জগদম্বার পায়ে ঘাট মেনে আসবি, বুঝলি?—চিন্তার নিভৃত অন্ধকারে কথাগুলো রঙের বুদ্বুদের মত ভেসে ওঠে। সে ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? পাশের গারাজঘর থেকে ঝাঁঝালো তেলের গন্ধে তন্দ্রা ঘনিয়ে আসে। জানলার ওপর বোলতার চাকটা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। কী যেন ভাবছিল না?···কাল মাংস হয়েছেলো, বাবুরো অনেক আত করে খেতে বইলো। কারু পাতে এক টুগ্‌রোও পড়ে অইলো নে, মেজবাবু ফুকো হাড্‌টো থালার উব্‌রে ঠুকে ঠুকে তার ভিদ্‌রেকার সারটুকু বের করে খেয়ে ফেললে, তারপর তার চার পাশের মাংসটুকুও ইঁদুরের মতন কুরে কুরে বের করে নিলে। যাই বলো, বাবু, ঠাকুটোর শরীলে মায়াদয়া আচে, গিন্নী শুতে

গেলে পারে তেলো উনুনটোর পেচন থেকে বাট্‌টে সামনে ধরে দিলে তো। বললে, আসঅ ব্রজঅ, নিঅ, অখনঅ কেউ দেখিব নি।—কেমন বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কতা কয়, হাঁসি পায়, ওদেঘরের কতা বাংলা না কী? বাংলা নয়, অতচ বাংলার মতন শোনায়। সিদ্‌নের বলে, অ ব্রজঅ মো তুম্মামে প্রেমঅ করি। —কী বলে?—প্রেমঅ করি।—সে আবার কী?—দেখিব সে কঁড় অছি।—কী?—সে টিকে অমতঅ অছি।—বলে দু-হাত দে জইড়ে ধরেছেলো! অমন আজকাল পেরাই করে।—শুতে যাবার আগে ব্রজ যখন সিঁড়ির তলাকার দরজাটা বন্ধ করতে যায় তখন ঠাকুরের আধ ময়লা কাপড় আর গেঞ্জি অন্ধকারে স্কন্ধকাটার মত তার দিকে এগিয়ে আসে। তারপর দুখানা পেশীবহুল হাতের বেষ্টনীর মধ্যে সে কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলে। রোজই এমন ঘটে। তবুও অন্ধকারে স্কন্ধকাটার তুলনা তার নিত্য মনে আসে। গাটা শিউরে ওঠে আচমকা ভয় পাওয়ার মত, আর সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়-ভরা দুখানা হাতের অবলম্বন তার সমগ্র চেতনায় একটি মধুর, আবিষ্ট নির্ভর এনে দেয়। পুরুষের সংস্পর্শে এই অদ্ভুত অনুভূতি সে খুব সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে। তাই ঠাকুর যখন তার মুখের খুব কাছে মুখ নামিয়ে চায় তখন সে চোখ বুজে চুপি চুপি মিনতি করে—আজ নয়, লক্ষ্মীটি, আজ নয়, আর একদিন, কেমন?

ব্রজ নিত্যকার ঘটনাটাকে নিখুঁতভাবে কল্পনা করতে চেষ্টা করে, দুখানা দৃঢ়বেষ্টন হাতের আলিঙ্গনে সে যেন ঘুমের স্নিগ্ধ গহ্বরে আস্তে আস্তে নেমে চলেছে একটির পর একটি ধাপ অতিক্রান্ত করে। তার প্লীহাক্লিষ্ট স্বামীর চামড়া-ঢাকা কঙ্কালটার কথা মনে পড়ে। নির্লজ্জ ক্ষুধার সে কী হ্যাবলামি। স্বাদগ্রহণ না করে উদরপূর্তির সে কী বীভৎস দৃশ্য! তিন বছরে তিনটি শিশু, যেন তারই দোষ! বলে, বেরজ, তুই কি আড়ি করে ষষ্টি ঠাকুরুণের দোর আগলে পড়িচিস্, এ্যাঁ? শেষ কটা দিনও ভোগ করতে দিলি নে?—খালের ধারে যেদিন তার স্বামীর কঙ্কালসার দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, সেদিন সে তার দিকে চেয়ে চেয়ে শুধু ভেবেছিল, ঐ দেহটার স্নায়ুতে স্নায়ুতে, রসের প্রতিটি বিন্দুতে যে দুর্নিবার লালসা ছিল, ওদরিক ঐন্দ্রিয়ক, সাম্পত্তিক তারই বীজ বপন করে গেল কী, হিল্‌বিলে ব্যাঙাচির মত

ভ্রূণের জীবনরন্ধ্রে? ভূতোটা তো দেখতে তার বাপেরই মত, দিদিমার পেছু-পেছু ন্যাং-ন্যাং করে ফেরে, দু-হাতে গুড় মাখা, ক্ষুধার নিবৃত্তি নেই, যতটুকু মুখ চলা বন্ধ থাকে ততটুকুও বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল চোষে চক্‌চকিয়ে। ছেলেটার কথা মনে করে ব্রজর গা সির্-সির্ করে ওঠে। উলঙ্গ, কালো, একরত্তি বাচ্ছাটার ওপর যেন তার এতটুকু মায়া নেই। আজ যদি সে শোনে, ভূতো হঠাৎ ওলাউঠায় মারা গেছে, তাহলে হয়তো সে একটুও কাঁদবে না। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই না। সে ভাবতে চেষ্টা করে, বলাৎকার-জ শিশুর ওপর মায়ের টান থাকে কী? যে-পুরুষকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করা যায় তারই অংশ নারী ধারণ করে কী করে, আপন সত্তা দিয়ে তার পুষ্টিসাধন করে কেমন করে? তাদের গাঁয়ের নিধে দুলের মেয়ের ওপর হরিবোল বাগদি যে অত্যাচার করেছিল, তার ফসলও ফলেলো। হেবোটার বয়েস আজ পনেরো, তার জন্মের কথা আজকাল আর কেউ তোলে না। তার মাও ছেলে বলতে অজ্ঞান। আশ্চর্য!

—দিদিমণিরা কিন্তু বেশ আচে। বড়দিমণির বয়েস বচর বাইশ নয়? বড়দি, মেজদি, সেজদি কেমন সব নেকাপড়া করে, মোটা মোটা বইপত্তর নে পিটের উপরে বিনুনী দুইলে সাতসকাল দশটায় সেই যে বেরোয়, বাড়ী ফেরে সন্দে বরাবর। এক আস্তা নোকের ভিদ্‌রে টেরামার না কি বলে সেই গাড়ী করে গড় গড় করে চলে যায়। সমস্ত মেয়েগুনোর কী হলো না হলো, কেউ একবার খবরও নেয় না। মেয়েগুনোর ধন্যি সুকও বাবা, শুদোক্ দিকি, এত দেরী হলো কেন? তিন বোনে ছাগলের খুরের মতন উঁচু খুর ওলা জুতোর ওপর বন্‌বন্ করে দু-পাক খেয়ে চোক না কপালে তুলে বলবে, আচ্ছা মা, সব কতা কি তোমাদের না জানলেই নয়? সারাদিন গায়ের অক্ত জল করে খাটো তারপর বাড়ী এলেই কৈফেত দাও।—মুকের তোড়ে সামনে দাঁড়ায় কার সাদ্দি! বড়দিমণি তো ঘরে ফিরেই "কোঁচ" না কী বলে সেইটের ওব্‌রে ধপাস্ করে বসে পড়ে মাতার উব্‌রে চার হাত-ওলা কলটারে বন্‌বন্ শব্দে ঘুইরে দেয়। উঃ, সে কী হাওয়া! যেন কাল বোশেকীর ঝড় উটেচে। ঐ দেলের উব্‌রে কী একটা খটাস্ করে টেনে দিলে, অমনি মাতার উব্‌রি কলটো পাঁই-পাঁই শব্দে হাত ঘুরোতে নাগলো! তার পাশেই আর একটা কী টিপে

দেও, ওমা, যেন হাজরটে মশাল জ্বলে উঠলো!—সুইচের সঙ্গে স্তনবৃন্তের উপমা মনে আসে, একটু হেসে ব্রজেশ্বরী উপমাটাকে এড়িয়ে যায়। সাদে কি আর বলে কলকেতার শওর। শনিবার শনিবার শশী বাড়ী যাবার সময়ে মদে চুর হয়ে যেতো। বলতো, বেরজ, বেরজয় যাবি তো চল্ কালী কলকাত্তা-ওয়ালীর বেরজয়, মাইরী, এক-একদিন ইচ্ছে হয়, তোরে নে গে সব দেকিয়ে শুনিয়ে নে'সি। আহা, মনে পড়চে না, কী যে গানের কলিটে গাইতো, কী বলে, হ্যাঁ,—

কী মায়ায় রচিলি কলকেতা, বল্ মা কালী,
যেন তার ধানের রস আর কাট্‌লেসেতে দেয় তোরে ডালী।
সেতায় অসি ছাড়ি—ধরিলি মা তারিণী, বাঁশী।
আর এই গোঁসাইদাস বষ্টুমেরে পেষাদ দিলি খাসী॥

হারমোনিয়া না কি সেই প্যাক্‌পেঁকে যন্তরটো বাজিয়ে গাইতো। মিন্সের বেহায়াপনায় ব্রজ লজ্জায় মরে যেতো।...দর্মার বেড়ার ওপাশ থেকে হরিধন মাজির বৌটো গান শুনে খিল্‌খিলিয়ে হাঁসতো। বে'র ঘোঁটে শশীর ডাক পড়তো সবার আগে। তারপর ঘোঁট হয়ে গেলে সারারাত চলতো শশীর কলকেতার গান। পাড়ার লোকে তারিপ্ করে বলতো, যাই বলো, শশের যে একটু-আধটু ইয়ে দোষ আচে তা সাথক বৈকি। ইয়েদের ঠেঁয়ে কেমন খাসা গানগুলি শিকেচে বলো তো! মাগো মা, এক একটা ইয়েকে হাতের কাচে পেলে সে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতো না! উল্টোপান্সী না কোতায় সারা হপ্তা, সাতটি দিন ইয়েদের বাড়ী কাটিয়ে শনিবার গাঁয়ে যেতো, তারপর রবিবার সকালটি হতে না হতেই ভোঁ দৌড়। একবার উল্টোপান্সীতে যেতে পাল্লে মাগীদের বিষদাঁত ভেঙে দে আসতো! এই কলকেতাতেই তো গা সেই উল্টোপানসী, চুপি চুপি একদিন ঠাকুট্টোরে শুদোতে হবে। একদিন টেরামারে চেপে চলে গেলেই তো হয়। অবিশ্যি, সঙ্গে একজন পুরুষমানুষ থাকা চাই। ঐ গাড়ীগুলো চাপতে যা ভয় করে! গরু নেই ঘোঁড়া নেই, যেন ভূতি ঠেলে নে চলেচে! এল্‌গাড়ী চেপে কলকেতায় আসার কতা কি সে জীবনে ভুলবে? বাবা! নিদে তো গাড়ীতে চইড়ে দে গেল। বলে, নিবারণ খুড়ো বালিগঞ্জোয় নাবিয়ে নেবে। বলে, দেকচো মাসী, হোই হোতা

যে নোয়ার গাড়ীখেনা থেকে ধোঁ বেরুচ্চে, ঐখেনাই নাকি আর সব গাড়ী-গুনোরে হুস্‌হুসিয়ে টেনে নে যাবে। তারপর, মা, গাড়ীখেনা তো চলতি নাগলো। নিদে বলে তো দিলে, কিচু হবে না, বালিগঞ্জোয় নিবারণ মাইতি নাবিয়ে নেবে। আর উদিকে, নিদেও চোকের আড়াল হওয়া আর গাড়ীখেনাও ঝুপ্ করে থেমে যাওয়া। ওমা তারপর দেকি, এই দু-পাশের যতো গাচ-পালা, বাড়ীঘদ্দোর সব পাঁই পাঁই শব্দে ছুটতেচে। ঠকঠকিয়ে মা কেঁপে মরি, বলি নিদে হারামজাদা কি সড় করে ভূতপেরেতের হাতে ছেড়ে দে গেল! ওর বাপ্ আবার যুগী ছেলো কি না, পিচেশসেদ্দ না কি বলে তাই। বলি, ও হারামজাদা, তোর দুটি হাত ধত্তিচি, ক্ষমা দে। বলতে বলতে একটু বাদেই দেকি, গাচপালাগুলো আস্তে আস্তে থেমে আসতেচে। ওমা, তারপর দেকি, আমরা কী একটা অজানা অচেনা জায়গায় এসে পড়িচি। মনে মনে বলি, কতায় যে বলে গাচ-চালা, এ সেই গাচ-চালা, ভূতুড়ে কাণ্ড দেখে ভয়ে মরি মা। কোতায় নিবারণ, কেউ কোথাও নেই! তারপর মা, দেকি কিনা, গাচ-পালাগুলো আবার ছুটতেচে। তাদের দিকে তাকায় কার সাদ্দি! মাতাটা বনবন্ শব্দে ঘুত্তি নেগেচে! ভাগ্যিস্, গাড়ীর কাদেঘরের একটি গিন্নী বয়েছেলো। বলে, হ্যাঁগা, তোমার অসুকবিসুক কিচু করেচে নাকি? বলি, না মা, আমার মাতাটা কেমন ঘুত্তেচে। তারপর মা, গিন্নীটি এট্টা পান দেয়, তাই খেয়ে মাতাটা থির হয়। সেই গিন্নীটিই মা, আহা মায়ার শরীল নোকটোর, বালিগঞ্জোয় নাবিয়ে দিলে। তারপর দেকি, মা, সত্যিই নিবারণ মাইতি দাঁত বের করে হাঁসতেচে!—ব্রজেশ্বরীর কলকেতা যাত্রার বিবরণ শুনে বাড়ীশুদ্ধ সে কী হাসি!—সেজদিমণি তো হাঁসতে হাঁসতে বিষম নেগে যায় আর কী! সেজদিমণি বলে, এই দেক্, বেরজ, দেকচিস তো এই বাস্কটোর ভিদ্‌রেও ভূত পোরা আচে। বলে, ওমা, কী এট্টা ঘুইরে দিলে, আর নাকি সুরে হিঁহিঁ করে সে কী গানের ছিরি!

...বুদে বুদে আটদিন হয়ে গেল। সে আর কী কী দেকালে গা? হ্যাঁ, সেই মটর না কি বলে গাড়ীখেনা, আর ছেকল টানলে জল পড়া, আর কত্তাবাবুর নেকবার কলটো, আর সেই যে গো পেতলের উনুনটো, যাতে কয়লাও নেই, কঞ্চীও নেই, অতচ সোঁ সোঁ শব্দে জ্বলতে থাকে। নোয়ার উব্‌রে আগুনটো

জ্বলতেচে, অতচ তলায় কিচ্ছু নেই। উনুনটোয় বড়দিমণি নুচি ভাজে আর মাংস আঁদে। নুচি আর পাঁটা। এই এক টুগ্‌রো নুচি ছিঁড়ে একখেনা মাংস সাপটে নে গালে পুরনু। আচ্ছা, কতখেনি মাংস পাওয়া গেচে? ধরো এই খোরা-দেয়া বাট্‌টের একবাটি মাংস, হাড়, ফুকো হাড়, চর্বি, বেশ গর্‌গরে ঝোল আলু, পেঁজ, হাত ডুব্‌লে তোমার এই মুটোটা পর্জ্জন্ত ডুবে যাবে। আর নুচি! বড় থালাখেনার একথালা হবে। একেবারে নুচির পব্বত! আর এক টুগ্‌রো নুচি ছিঁড়ে নেয়া গেলো, আর একখেনা মাংস, তার খানিকটে আবার তুলতুলে চুপ্‌চুপে চর্বি। মুকে দেচ কি নেই! আর একখেনা নুচি, আর একটুগ্‌রো মাংস, আর একখেনা, আর একখেনা···গর্‌গরে করে তেল আর ঝাল। ওমা, দেক, দেক, বোলতার চাকটো চোকের সামনে কত বড্ডা হয়ে উটেচে। কী ভয়ঙ্কর গরম, গায়ে কাপড়খেনা অবদি সইচে না। সরষে ফোড়ন দে আঁবের ঝোলটা কিন্তু বেশ হয়েছেলো! ঠাকুটো আঁদে বেশ। কিন্তু ওর যা হাতটান! গিন্নীর কাচে ধরা না পড়ে! অব্বিশ্যি আমার তরেই চুরি করে। সিদ্‌নের কতা মনে করো, এমন এমন চারখেনা ডিমের বড়া। ভাতের ভিদ্‌রে দেচে! ভাগ্যিস্, ভাত দেবার সময় চুপি চুপি বলে দেয়! না হলে ভাত মাকতে গে গিন্নীর চোকে পড়তোই। আর চিংড়ীমাচগুনোরে এমন মেকে জুকে দেবে যেন বাবুদের পাতকুড়ুনো তরকারী, ধরে কার সাদ্দি! কাল আবার বলে, ব্রজঅ, তুম্মাকে প্রেমঅ করি। বলে ঠিক এই কেনটে চেপে ধরেচে। যাই আর কী! যেতো বলি ছাড়্, তেতোই জোরে চাপ দেয়। বলে, ব্রজঅ, তু মোকঅ প্রেমঅ কর নি? ছাড়্ আগে।—আগে বল, প্রেমঅ কর কি না। —হ্যাঁ, হ্যাঁ করি।—আজঅ করিবি?—না।—কবে? —কাল।—কখনঅ?—ছুকুরে।—আজ সে ঠিক আসবে। নোকটো কিন্তু ভারী মায়াবী। ওরে বেশ নাগে, ওর গায়ে ভীষণ জোর। বাবা, এমন জইড়ে ধরেছেলো! ভূতোর বাপ্‌ও অমন করে মাজে মাজে চেপে ধত্তো। কিন্তু এ কী যেন মন্তর জানে। সারা গাটা একেবারে যেন শিউরে উটবে। এখনো এলো না কেন কে জানে? ভুলে গেছে নাকি? না ভোলবার পাত্তর সে নয়। ভারী নজ্জাকরবে কিন্তু আমার।

···আচ্ছা, দিদিমণিদের তো এখনো বে' থা' হয় নি, অতচ কেউ এট্টি কথাও বলে না। ওরা বাহারে কাপড় আর জুতো পরে, চুল এলিয়ে কেমন সব

জায়গায় যায় আসে, সব্বার সঙ্গে কথা কয়, ছাতের উপর সমস্ত ছেলেমেয়েদের সাতে হুল্লোড় করে ঠাণ্ডা ক্ষীর খায়, যন্তর বাজিয়ে সব্বার সামনে গান গায়। আহা কী গানের কলিটে গো, মেজদিমণি গায়? হ্যাঁ কী বলে—আঁচলখানি পাতি পতের ধারে।—অডগুলো পুরুষমানুষের সামনে গাইলে তো! একটুও লজ্জাও কল্লো না! এরা সারাটি দিন বাড়ী থাকলে কেবল গানই গায়। গান গাইতে ওঠে, দাঁত মাজে, চ্যান করে। তারপর সব ছেলেমেয়েরা বড় টেবুল-টোর চার পাশে গে বসে। ঠাকুট্টোরে তেকোন দেকলে পারে হাঁসি পায়। শাদা লম্বা জামা গায়, মাতায় শাদা টুপী, এককোন কাটের চৌকো বারকোশে করে চা সাজিয়ে নে খাবার ঘরে হাজির হয়। দিদিমণিদের ডিম খাবার ঢং দেখে হেঁসে বাঁচি নে। ডিমগুলোরে ক্ষুদে ক্ষুদে বাটির উব্‌রে বসিয়ে খানিকটে কেটে ফেলে দে তারপর নুন ছিটিয়ে ছিটিয়ে চামচে দে কুরে কুরে খায়। ম্যাগো! ঘেন্নাপিত্তিও নেই ওদের। ঐ হদ্দ কাঁচা ডিমগুনোরে টুকে টুকে খায়! ওরা ভাতও টেবুলে খায় দেখচি। টেবুলের উব্‌রে বিচেনার চাদর পেতে তার উব্‌রে কাঁচের থালায় ভাত খায় এরা। তাও কী ছাই হাত দে? তিরশূলের মতন কী একটা অস্তর দে খটাখট্ করে খাবার মুকে তুলবে, আবার তার সাথে এই সব বড় বড় এক-একখেনা ছোরা!

···আচ্ছা, ধরো যদি এদের বাড়ীতে জন্মানো যেতো। ধরো যদি বেরজ না হয়ে হওয়া যেতো বড়দিমণি। কী নামটি গা বড়দির? সাগরিকে। কেউ ডাকে সাগু, কেউ ডাকে সাবু। ধরো সুদু আজগের দিনটির তরে সাগরিকে হওয়া গেলো। কেমন? সকাল আটটায় ঘুম ভাঙলো, বিচেনায় শুয়ে শুয়েই চোক মুদে ডাকতিচি, ব্রজ, ও ব্রজ, শুনে যাতো রে।—ব্রজ মানে আমিই তো, কি অন্য কেউ ধরা যাক্, তার নামও বেরজ। বেরজ কোঁচরের মুড়ী-গুলো তাড়াতাড়িতে মুকে ফেলতে না পেরে জানলা গইলে বাইরে ফেলে দে ছুটে উব্‌রে গেলো। আমি বনমু দেক্ তো রে বেরজ, আজকের দিনটে কেমন? খুব গরম নাকি? আচ্ছা দে ঐ তেলের বোতলটো, ঐ ছোট সবুজটো, আজ যা গরম, এই বেশী ঠাণ্ডাটোই মাকি, ওমা, সে কী ফুলোল তেল গা, গন্ধেই মাতার ভিদ্‌রে ঝিম্‌ঝিম্ কত্তে লাগে। দে বেরজ, মাতায় তেলটো ঘসে দে, আমি এট্টা গান গাই। কী গাইবো ছাই, মনেও পড়ে না। 'পরাণ পিয়

তুমি কবে আসিবে ?' গুন্‌গুনিয়ে গাইতে গাইতে এশমের নম্বা জমাটে গায়ে দে চ্যান কত্তে চলিচি। ফুলোল তেলে চাদ্দিক একেবারে ভরভর কত্তেচে। আচ্ছা, এব্‌রে ঝারার তলায় দাঁইড়ে দাঁইড়ে অনেকখন ধরে চ্যান করা গেলো। একোন একখেনা কাপড় পরা যাক্। সাগরিকের আলমারী ভরা শাড়ী। একোন করে পত্তেচি আর খুলে ফেলতিচি। বেরজ কুইড়ে নে সেগুলোরে আবার পাট করে আকতেচে। আচ্ছা, এইখেনা চল্‌তে পারে, কচি কলা-পাতার অঙটি, নাল টুকটুকে পাড়। মকমলের চটিজুটো পায়ে দে নীচোয় খাবার ঘরে নেবে এনু। বড়দাদাবাবু বললে, আরে সাবু যে, তোর ডিম জুইড়ে জল হয়ে গেচে, আর চাও হয়েচে আজ একেবারে জলসাবু। আমি দু-চুমুক চা খেয়ে এগে ঠাকুট্টোরে ডাকনু, ঠাকুর, নে যাও তোমার খাবার। ঠাকুট্টো মুখকেনা কাঁচু-মাচু করে বলতেচে, দিদিমণি, মোড়অ দোষঅ কঁড় ? চুপ্ করো ঠাকুর, তোমার বড্ড মুক হয়েচে আজকাল। এ আমি খাবো না। নে'স আমার তরে—হ্যাঁ, কী আনতে বলি ? হ্যাঁ, নে'স চিঁড়ে, দই আর জিলিপি, গরম জিলিপি ! বুদোয়াকে পাটিয়ে দাও খাবার নে'সতে। পারে তো কিচু মেটাই মোণ্ডাও আনে যেন। বোঁদে আর দরবেশ পেলে যেন নে'সতে ভোলে না।

...বড়দিমণি, মানে আমি এব্‌রে চুল বেঁদে আর একখেনা কাপড় পরে বই নে বের হবো। বেরজ, জুতোজোড়া ঝেড়ে দেতো, যেন আয়নার মতন চক্‌চক্ করে, যেন তোর মুক দেখা যায় তাতে বুইলি ? তোর কাজ বাবু বড্ড নোংরা। আর খয়ের অঙের জরি পাড় শাড্ডে কুঁচিয়ে আকিস্ নি কেন ? কতার জবাব দে ! আর শোন্, আজগে একটি ভদ্দরনোক আসবে, বিকেলে চা খেতে। ছাডটো যেন ঝাঁট্‌দে পোচ্ছের করা থাকে। খয়ের অঙের শাড্ডেতে আমার কী সুন্দর দেখাচ্ছে ! বড় দেল-আয়নাটোর সাম্‌নে দাঁইড়ে দাঁইড়ে চুলে বিনুনী কত্তিচি, কেন চুলের কি খাঁকতি আমার ? অমন পিট-ভরা চেউ-খেলানো চুল এ বাড়ীতে কার আচে দেকি ! বিনুনীর ডগায় গোলাপী অঙের চওড়া ফিতেটো বাঁদনু। তারপর ঐ টুকটুকে নাল জুতো-জোড্ডা পরে মোটা মোটা বইগুলো দু-হাত দে ধরে খটাখট খটাখট করে সিঁড়ি দে নেবে গেনু। ঠাকুট্টো মুচকে মুচকে হাঁসতেছে, না ? তারে এক ধমক দিনু, ঠাকুর, তুমি এব্‌রে থেকে মুক সামলে হাঁসবে। দূর পাগলী,

ঠাকুট্টো আবার হাঁসতে যাবে কেন ? আমি তো আর বেরজ নই, আমি যে সাগরিকে ! না, না, সে হাঁসে নে। তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দে বললে, দিদিমণির খিদে পাবে আজ। বলনু, নাঃ, খিদে কী ! কল্‌জে না কি বলে, সেকেনে আমি চপ্-কাট্‌লেসে পুষিয়ে নেবো।—ওরা তো ওগুলো খুব খায়। দিদিমণিদেঘর ইয়ারবক্সি এলে পরেই ঠাকুর বেচারীকে চপ্ আর কাট্‌লেস্ আঁদতে হয়। আমায় সিদ্‌নের দুকোন দেছলো, মা, যেন তোমার অমেরতো ! দিদিমণিরো যিদ্‌নের দুকুরে বাড়ীতে খায় না, সিদ্‌নের কল্‌জের দোকানে কেবল চপ্ কাট্‌লেস সাঁটে। তারপর সারাদিন আমি ঐ বইগুনোর ছবি দেকচি, অব্বিশ্যি পড়্‌চিও একটু-আদটু। ঐ হিজিবিজি নেকাগুনোরে বুইতে পাল্লে হয়। সেজদিমণি সিদ্‌নের নিজের বই থেকে কী এট্টা গল্প শোনাচ্ছেলো ছোড়দারে। আড়ালে দাঁইড়ে দাঁইড়ে শুনন্থ। এমন ভালো নাগছেলো শুনতে ! বড়দির বইয়ে নিশ্চই সব ভূতের গল্প, একখেনা মোটা বইয়ে সিদ্‌নের তো দেকনু, হাড় জিজ্জিরে একটা মানুষের ছবি। মাগো, ভাবলে পরেও গাটা শিউরে ওঠে !

...সারাটি দিন ধরে চপ্ কাট্‌লেস্ খেনু। আচ্ছা, এব্‌রে বাড়ী ফেরা যাক্। মাতার উপরে কলটোরে ঘুইরে দে কোচটোয় ধপাস করে বসে পড়নু। ওটার ভিদ্‌রে কী আচে, কে জানে, বসোচো কি তোমায় অমনি ওপর দিকে ঠেলে দেচে ! একটু নড়োচো-চড়োচো কি অমনি গুপুস্-গাপুস্, যেন ঘোঁড়ায় চেপে চলোচো ! অ বেরজ, বেরজ, জুতোজোড্ডা খুলে দেতো রে। বিনুনীটোরে খুলে ফেলি, আজগের আবার ভদ্দরনোকটি আসবে। এট্টু ফুলোল তেল মেকে আর একবার চ্যান করে নি। আচ্ছা, এব্‌রে চ্যান করা হলো। মা, কী সুন্দর সুবাস ! তা ছাই মাকবার জো আচে কী ? গন্দে ধরা পড়ে যেতে কতক্ষণ ! সিদ্‌নের ভজুয়াটা মেখেছেলো একটু, কী বকুনিটাই খেলে। না বাছা আমার ফুলোল তেলে কাজ নেই। অ আমার কপাল, আমি কি বেরজ, আমি যে সাগরিকে ! চ্যান করে কী কাপড্ডো পরা যায় একোন ? ঐ নাল অঙেরটোই পন্নু। আজগের আবার ভদ্দরনোকটি আসবে কিনা। আয়নায় আমার ছবি পড়েচে। কার সাদ্দি বলুক দিকি বেরজর উপ নেই ! চুলটোরে বিনুনী করে বেশ বাঁদা হয়েচে। বেরজর অঙটো অব্বিশ্যি কালো-

কালো, কিন্তু অমন মুকের ছিরিটি কার আচে দেকি? ঠাকুট্টো এই চিবুকটো তুলে ধরে এই মুকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বলে, ব্রজঅ তু বড় সুন্দর অছি। ভূতোর বাপের ওসব দিকে নজর ছেলো না, ছুটো আদরের কতাও বলতো না, কী বিচ্ছিরি হ্যাংলামি, ম্যাগো! আচ্ছা, সাজা-গোজা তো হলো, এব্‌রে নিশ্চই ভদ্দারলোকটি নীচোয় এসে বসে আচে। বাবুটি কি সুন্দর একখানি নাল অঙের মটর চড়ে এয়েচে গা! ওনার পাশের বসবার জ্যায়গাটি হচ্চে সাগরিকের একেবারে ধরাবাঁদা। আচ্চা ঠাকুট্টো যদি বাবু হতো, আর আমি সাগরিকে, থাঁলে কী হতো! থাঁলে তুজনে তু-ডিবে পান নে হুস্ করে উড়ে চলে যেতুম, হোই হোতা ঝেতায় সুজ্জিদেব পাটে বসেচেন। কনে-দেকা মেগে আমার অঙটি কেমন সোণা-সোণা দেকাতো, নয়? অ বেরজ, বেরজ, বাবুটিরে উব্‌রে ডেকে নে আয় তো! হাহাহা, হিহিহি! ওঃ, এই জো আব্‌নি! আব্‌নের কিন্তু খুব দেরী হয়ে গেচে। ঠাকুর খাবার দে যাও। ছাতের উব্‌রে টেবুলটোয় কী খাবারটাই না সাজানো হয়েচে! চপ্-কাট্‌লেস্, ছোলার ডাল ভাজা, ঠাণ্ডা ক্ষীর, তারপর তোমার কী বলে ঐগুনোরে, কোঁক না কী, মিষ্টি মিষ্টি খেতে, নতা-পাতা কাটা। তুত্তোর, আর বাপু আমার খেতে ভাল্ নাগচে না। এব্‌রে একটু মটরে চেপে বেইরে আসা যাক্, বাবুটির পাশে বসে। বাবুটি এট্টি চুমো খেয়েছেলো নাকি? না, আমার ভারী নজ্জা করবে। অ মা, আরে, আমি যে সাগরিকে! আচ্ছা, ওরা চুমো-আসটে খায় নাকি? অতবড় সমত্ত মেয়েটো একলা কী করে যায় গো ঐ পুরুষমানুষটোর সাতে? এ বেশ কিন্তু। ঝেকোন যা খুসী করো, ঝাত্তার সাতে জেকেনে-সেকেনে চলে যাও। আচ্ছা, এব্‌রে বেড়াতে যাই। নাল অঙের শাড্ডে কিন্তু বেশ মানিয়েচে। তারপর গে তোমার কালো চুলের বিনুনী, আর এই মাতার সিঁতি বেয়ে কেমন উঁপোর সিঁতিটি গা! কানে ছুটি ঝুমকো, আর হোই সেই কাণ পর্য্যন্ত নতের টানা। ছুটি হাত-ভরা উঁপো আর সোনার চুড়ী, বালা, অনন্ত, গলায় কতগুলো হার গো, কাঁকে বিচে, খাঁটি উঁপোর, আর তোমার কি বলে, পায়ে অবিশ্যি জুতো পরিচি, আর তার উব্‌রে ছুখানি মল বাজতেচে ঝুমুর-ঝুমুর, ঝুমুর-ঝুমুর, আর তার সাতে জুতোর শব্দ খটাখট্ মশ্‌মশ্, খটাখট্ মশ্‌মশ্! বাবুটির নামটি কী গা! কী

যে বড়দিমণি বলে? মিষ্টি কী একটা বোস না কী, হ্যাঁ হ্যাঁ, মিষ্টি বোস্, নয়? চুলোয় যাগ্‌গে। বাবুটির নাম, ধরো, আচ্ছা, জমীদারদের মেজছেলের নামটি কী ছেলো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেরজ বিলেস, আমার সাতে বেশ মিলবে, বেরজবিলেস। কি গা, বেরজবিলেস বাবু, হিহিহি, চলো না বেইড়ে আসি, পানের ডিবেটা সঙ্গে নিচি তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, এইবেরে হুস্ করে আমরা উড়ে গেনু, হোই হোতা, আস্তা, ঘাট, মাট সব ছাইড়ে। অনেক ধূর চলে গেনু, আর গাঁ দেকা যাচ্চে নে, কলকেতা কত ধূরে তার ঠিক নেই। একোন অব্বিশ্যি আর গাচগুলো ছু-পাশ দে বাঁই বাঁই করে দৌড়য় না। যেতে যেতে পতের ছু-ধারে কত ফুলের গাচ, যেন সগ্‌গো! এব্‌রে বেরজবিলেস বাবু ক্যাচ করে গাড়টোরে হ্যাঁচকা মেরে থামিয়ে ফেললে। তারপর পেল্লায় একটা কদম গাচের তলায় বাবুটি আমার হাত ধরে নে গেলো। কী ফুলটোই ফুটেচে। অব্বিশ্যি, একোন চোতমাস, কদমগাচে ফুল কোতা গো? তা হোগ্‌গে, অনেক ফুল। কী সবুজ নধর-নধর পাতাগুলি! বেরজবিলেস বাবু আমার গলায় তেনার হাতখানি জইড়ে দেচে। আবার "বাবু" ক্যান্‌রে বাপু? আমি যে সাগরিকে! মানুষটো ভারী সোঁদর সুপুরুষ। অঙটি একেবারে ছুদের মতন, গোরাদের চে'ও ফস্‌সা, কী ফস্‌সা ওনার কাপড়-জামা! হাতের নোকগুলি পজ্জন্ত কী পোক্কের! সরু সরু লম্বা লম্বা আঙুলগুলি দে আমার মুকখানি তুলে ধরে বলতেচে—ও আমার পরাণ-পিয়ারী বিনোদিনী রাই লো, কিসের অবিমান গা তোমার! দাঁড়াও না তোমার মান আমি ভেঙে দিচ্চি, তোমার মান আমি সাঁতরাগাছির ওলের মতন গইলে দেবো।—হিহিহি, কী জানি বাপু, ওনারা কেমন ধারা কতা কয়? ঐ, ঐ অকমই বোধায়। বেরজবিলেসবাবু আমারে ছুটি হাত দে জইড়ে ধরেচে। আমি আর পাচ্চি না বাপু। মাতাটা যেন চরকির মতন ঘুত্তেচে। এক্ষুনি যদি বলে—? না বাপু আমার ভারী নজ্জা করবে। পায়ে সুস্‌সুড়ি দিচ্চে নাকি? ওমা গো! কেরে ওটা? বেরাল-ছেনাটা বুজি? যাঃ, দূরহ, দূরহ, বের! আবার? কেরে ওটা? ওমা, তুই আবার এয়েচিস্? তুই না বামনের পুত! যা, যা, ফের বলচি। না হলে এই নাতি মেরে ঘর থেকে বের করে দেবো। হ্যাঁ, চুপ্ করবে? কেন, চুপ্ করবো কেন? নিত্যি আমারে জ্বালাবে বামুনটো! বড্ড বাড়িয়েচে মিন্সেটা।

নিত্যি আমারে কেন অমন করিস্। তোর না দেশে মাগ-ছেলে আচে? নজ্জা করে না, হাড়-হাবাদে, আঁটকুড়ির ব্যাটা! বের বলচি, দূরহ, দূরহ, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়বো, জানিস্! এই মারনু নাতি! বের, বের, দূরহ, দূরহঃ।

ব্রজেশ্বরী বুকের ওপর আঁচলটা টেনে দিয়ে উঠে বসলো।···আস্পদ্দা কম নয় বামনাটার, আবার চেপে ধরেছেলো! কোঁস্তা দে বিষ ঝাড়তে হয় অমন লোকের!—ঠাকুরের ওপর হঠাৎ কেন রাগ হলো তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।—ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়বো না, হতচ্ছাড়া মিন্সে···। ঘুম-থম্‌থমে মুখে বসে বসে সে আপন মনে গজ্‌রাতে লাগলো।

ওপরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বেজে গেল। গিন্নী ধরা গলায় চেঁচাচ্ছেন—অ বেরজ, বলি, বেরজ, সন্ধ্যে হয়ে গেল যে! ওঠ, উঠে উনুনে আগুন—টাগুন দে···

ছোট ছোট ঝিনুকের মত দু-সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে লাল টুকটুকে জিভের এতটুকু বের করে আপন মনে ভেংচি কেটে ব্রজ উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হিরণ্ময় ঘোষাল।

বন্দরে মিলন

কুকুরটা হাঁপিয়ে চলে।
প্রাণ বলে
পারি না···পারি না···পারি না।
মন বলে,
কার-ও ধার ধারি না।
ঘণ্টা বাজ্‌লো,
জাহাজ ঘাটে ভেড়্‌বার বাদ্যি।
সা রে···গা···মা···

সমস্ত স্বরগ্রাম মাড়িয়ে সে এলো,
আবার হাতে হাত দি।
যাদু কি লাগে?
দুরন্ত প্রান্তরে এসে পা দুটো ঠেকে।
উজ্জ্বল, নিঃশঙ্ক একটি যৌবন।
রৌদ্রে ঝলোমল করে
কিমাশ্চর্য্য ক্ষণ।

হরপ্রসাদ মিত্র

বিজ্ঞান ও রাস্তার লোক

বৈজ্ঞানিক উৎপাদন-পদ্ধতিকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে আদিম চরখা-লাঙলের উৎপাদন পদ্ধতিতে ফিরে যাবার বাসনা সেবাগ্রামের বাইরে কেউ পোষণ করেন কিনা সন্দেহ। তবু এ-কথাও সত্য যে বৈজ্ঞানিক উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করলেও, বা করতে উদ্যত এবং উৎসুক হলেও, বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত সাধারণের জীবনের যোগ একান্তই কৃত্রিম ও আল্‌গা ধরণের। অল্পদিন পূর্বে দেশের জনৈক বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক পথিকৃৎ বলেছিলেন যে তাঁর পঞ্চাশ বছর ধরে বিজ্ঞান শেখানো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে মনে হয় যখন তিনি স্মরণ করেন তাঁরই সব উচ্চতম বৈজ্ঞানিক ডিগ্রিধারী ছাত্রের বাড়িতে আজও গ্রহণের পরদিন হাঁড়ি কুঁড়ি ফেলার নিয়ম উঠে যায় নি। আসলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ি শুধু একটা ডিগ্রি নিয়ে চাকরি যোগাড় করবার জন্য; এবং তারপর চাকরি একবার যোগাড় হ'লে ঠিক ততটুকু বিজ্ঞানই মনে রাখি যতটুকু নইলে চাকরি বজায় থাকবে না। ওটা আমাদের বাইরের জিনিষ, সাহেবি পোষাকের মতোই। শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ কখনই হয় না।

বিদ্যালয়ে পড়ি বা পড়াই যে চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়লে গ্রহণ হয়, অথচ বাড়িতে বিশ্বাস করি রাহুকেতুর উপাখ্যান—এটা আমাদের জাতীয় চারিত্রিক হয়ে উঠেছে। এমনতর অদ্ভুত আত্ম-প্রবঞ্চনা শিক্ষিত লোকে-ও কেমন ক'রে করে তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। ডাক্তার স্বয়ং শীতলা পূজা করাচ্ছেন, পদার্থবিজ্ঞানী প্রেততত্ত্বের প্রবন্ধ লিখে নিজের বৈজ্ঞানিক উপাধির parade করছেন, রাসায়নিক বলেছেন 'ভিটামিন' একটী মিথ্যা হুজুগ—এমন ধারা ব্যাপার আমাদের সর্বদাই দেখতে হয়। সাধারণত ধীর স্থির উপযুক্ত ভদ্রলোককে যখন এমনতর দায়িত্ববোধহীন ধারণা পোষণ ও প্রচার করতে দেখি তখন বুঝি যে সমাজের মগ্ন চৈতন্যের কোনও গভীর স্তরে এর কারণ অনুসন্ধেয়।

এর কারণ অনুসন্ধানের পূর্বে অন্যদিকটা দেখা যাক। অন্যদিকে আছেন আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সম্প্রদায়। তাঁদের

জীবন যদিও বিজ্ঞানের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে না—কারণ, ডাক্তারি ঔষধ থেকে আরম্ভ ক'রে বিজলী বাতি অবধি কোনটাই তাঁরা ত্যাগ করে চলেন না—তবু মনে মনে কিন্তু এ ছোঁয়াচ তাঁরা সম্পূর্ণ বাঁচান। কারণ, তাঁদের কাছে বিজ্ঞান আর টেকনীক্ একই বস্তু; যে-ব্যক্তি বৈদ্যুতিক প্রবাহ-বাহী তারের সংলগ্ন safety fuse-এর ব্যবহার জানে এবং fuse-এর তত্ত্বটী মোটামুটি বাংলাতে পারে সেই তাঁদের কাছে বৈজ্ঞানিক। অর্থাৎ তাঁদের কাছে কৌশল ও পটুতার নামান্তর হচ্ছে বিজ্ঞান। ফলত হের্টজ্-এর চেয়ে মার্কনি তাঁদের চোখে বড়ো বৈজ্ঞানিক। তবু তাঁরা বোধ হয় প্রথমোক্তদের চেয়ে বিজ্ঞানকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করেন, যদিও সে শ্রদ্ধা ভ্রান্তের শ্রদ্ধা। হাওড়ার সেতু বা সুলভ বেতার-গ্রাহকযন্ত্র, এক্স্-রশ্মি বা সবাক-চিত্রের জন্য তাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। যদিও এ-কৃতজ্ঞতা বহুলাংশেই অস্থানপ্রযুক্ত এবং নিরর্থক।

এঁদের অনাহাকে দোষ দেওয়া যেমনই সহজ তেমনই নিষ্ফল। কারণ, এঁদের ভ্রান্তি শিক্ষার অভাবজাত বলে স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা এদেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব'লে আত্মপ্রচার ও জীবিকার্জন করেছেন তাঁদের কোনই যুক্তি নেই আত্মসমর্থনের। তাঁদের যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁরা বিজ্ঞানের ব্যাপক দৃষ্টিভংগীটা গ্রহণ করেন নি, শুধু নিয়েছেন কতকগুলো প্রয়োজনীয় তথ্যের জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে কাজে খাটিয়ে অর্থোপার্জনের কৌশল। বিজ্ঞানের পদ্ধতি তাঁরা শিখেছেন বটে, কিন্তু সে-শুধুই প্রত্যেকের নিজস্ব বিশেষ ক্ষেত্রের সুপরিমিত সীমার মধ্যে সে-পদ্ধতির প্রয়োগ করবার জন্য। সেই বিশেষ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরে যে জগৎ—যার কতকাংশ প্রকৃতি, কতকাংশ সমাজ, কতকাংশ এতদুভয়ের সংযোগস্থল মানুষের চিত্ত—সেখানে তাঁরা তাঁদের আদিম বাল্যশিক্ষার অন্ধ সংস্কার দ্বারাই চালিত; এবং সময় সময় অন্ধতম কুসংস্কারের পোষক। জীবনের সেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে অশিক্ষিত সাধারণের কোনই প্রভেদ দেখা যায় না। সেখানে তাঁরা বিজ্ঞানী ন'ন, সেখানে তাঁরা গড্ডলিকাপ্রবাহের অংশ।

এখন, রাস্তার লোকেরও একটা জীবনদর্শন থাকে। নামান্তরে তাকে আমরা বিশ্ববীক্ষাও বলতে পারি। পেশাদার দার্শনিকের বিশ্ববীক্ষার মতো তা হয়তো অতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মসমঞ্জস, এবং সর্বতোমুখ নয়; তবু তার

অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। জীবন তথা বিশ্বকে দেখবার একটা বিশেষ ভংগী, বিশ্বের সম্বন্ধে জ্ঞানকে গ্রথিত করে একটা বিশেষ শৃঙ্খলায় আনবার প্রচেষ্টা (তা হয়তো খুব সজ্ঞান বা স-চিন্ত ভাবে হয় না), বিশ্বের মধ্যে ব্যক্তির স্থানও মূল্য সম্বন্ধে একটা ধারণা খাড়া করবার চেষ্টা, এবং এই সামগ্রের সংগে যথাসম্ভব সংগতি রেখে নিজের জীবনযাত্রাপ্রণালী নির্ধারণ—এই হচ্ছে সেই ব্যাপক কিন্তু অস্পষ্ট বিশ্ববীক্ষার লক্ষণ। মোটামুটি এ সবই অবশ্য পেশাদার দার্শনিকেরও কাজ। কিন্তু তিনি যেখানে অত্যন্ত সজাগ চিত্তে, অত্যন্ত সচিন্ত ভাবে প্রচুর পরিশ্রম ক'রে জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন ক'রে একটা শৃঙ্খলা আবিষ্কারের চেষ্টা করেন সেখানে আমরা পথের লোকেরা সেই কাজটাই প্রধানত সহজ বুদ্ধির দ্বারা সারবার চেষ্টা করি।

এবং "সহজ বুদ্ধি" ব্যাপারটা আসলে যতটা সহজাত তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণে শিশুকালের শিক্ষালব্ধ। কাজে কাজেই, শিশুকালে অজ্ঞ বা অশিক্ষিত গুরু বা গুরুজনের কাছে যা শেখা গেছে, যার ফল মনের গভীর ও গোপন মূল পর্যন্ত প্রবেশ করেছে এবং এমনই গোপন ও নিঃসংশয়ে তার ক্রিয়া চলে যে পরবর্তীকালের শিক্ষাকে বহুলাংশেই তা নাকচ করে দেয়। অর্থাৎ, যে দুরন্ত ছেলেকে ছোট বেলায় ভূতের ভয় দেখিয়ে শান্ত করা হয়েছে, উত্তরকালে সে যদি কোন যুক্তিবাদী শিক্ষকের হাতে পড়ে বুদ্ধি দ্বারা বোঝে যে ভূতপ্রেতের সত্য অস্তিত্ব নেই, তবু তার পক্ষে অন্তরে অন্তরে ভূতের ভয় কাটানো সহজ হবে না। এমনি অনেক বিষয়ে শৈশবকালীন শিক্ষার প্রচণ্ড প্রভাব মানুষের উত্তর জীবনে দেখা যায়। বাইরে সাধারণ শিক্ষিত লোকের মতো ব্যবহার করলেও অন্তরে গভীর কুসংস্কার পোষণ করে এমন দৃষ্টান্ত সর্বত্রই সুলভ। বুদ্ধিগত শিক্ষা এসব ক্ষেত্রে প্রায় কিছুই করতে পারে না। বুদ্ধির বিশ্বাস উৎপন্ন হলেও মনের গভীর তলায় অন্য রকম বালসুলভ বিশ্বাস ক্রিয়া করতে থাকে এবং তার ফল সংকট মুহূর্তে প্রকাশ পাবেই—হয়তো সে-ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে।

এই যে শৈশবলব্ধ যুক্তিহীন বিশ্বাস মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসে থাকে, সাধারণ লোকের বিশ্ববীক্ষায় স্বভাবতই তার প্রভাব দেখা যায়। যেমন—ভূত-প্রেত ও অন্যান্য অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে প্রশ্নহীন আস্থা। শুধু

বুদ্ধিগত আস্থা হিসেবে যদি বিচার করা যায়, তো যতোই হাস্যকর বা যুক্তিহীন মনে হোক, এগুলোকে খুব দোষের মনে না করা যেতে পারে। কিন্তু আস্থা কখনও আস্থা-তেই শেষ হয় না। মানুষের আচরণ তার আস্থাকে অনুসরণ করে। ফলত, অতিপ্রাকৃতের উপর নির্ভরশীল মানুষ যখন মহামারীর সময়, কলেরা বা বসন্তের টিকা না নিয়ে, শীতলা বা ওলাবিবির পূজা দেয় তখন যে ট্রাজিডির সুরু হয় তার শেষ অকথ্য যন্ত্রণা ও অসংখ্য মৃত্যুতে। এ সবই অবশ্য একটা বিশেষ বিশ্ববীক্ষার ফলাফল; এবং বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ কী বিশ্বাস করে তার উপর শুধু মানুষের মনের আনন্দ নির্ভর করে না, তার জীবনের সবরকম সুখ দুঃখ শুধু নয়, এমন কি তার অস্তিত্ব পর্যন্ত নির্ভর করে।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে বিজ্ঞান কি ভাবে সাধারণ মানুষের সাহায্যে আসতে পারে তা দেখা যাক। প্রথমত, শীতলা পূজা ছেড়ে সকলকে টিকা দিতে হবে, সমস্ত দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ও খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, রুগ্ন ব্যক্তিদের সঙ্গরোধ (Quarantine) করতে হবে, সংক্রমণ যাতে ছড়াতে না পারে তার জন্য উন্নততর স্বাস্থ্যবিধান-সম্মত ব্যবস্থা করতে হবে। বসন্ত প্রভৃতি বায়ুবাহিত রোগের সংক্রমণ নিরোধ করতে হলে সর্বসাধারণের সহযোগিতা চাই। কাজেই এ সম্বন্ধে জনমতকে শিক্ষিত করতে হবে। সেই শিক্ষার ব্যাপারে অন্যতম প্রধান ব্যাপার হবে অতিপ্রাকৃতের উপর নির্ভরশীলতা দূর করা এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা। ফলে মূলগত বিশ্বাসগুলোতে আঘাত লাগবে, শুধু ডাক্তার নিয়োগ করলেই শেষ হবে না। তাই হবে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। কিন্তু এ ব্যবস্থা না হয়ে সাধারণত আমাদের দেশে একটা আপোষ ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ ডাক্তারও থাকুন এবং ওলাবিবি-ও। এবং এ ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষেরও মনঃপূত। কারণ, তা নইলে লোকশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের সম্বন্ধে একবার লোকমত জাগ্রত হলে সেটা এমন খরচের ব্যাপার হয়ে উঠবে যাতে হয়তো আইন ও শৃংখলার বাজেটে ঘাটতি পড়ে যাবে। তার চাইতে যা হচ্ছে তাই ভালো। এবং একান্ত বশংবদ আমাদের ডাক্তাররা তাই টিকে দেবার সংগেই টিকের ব্যর্থতা ও ভাগ্যফলের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকেন এবং শীতলাপূজার চেয়ে বসন্তের

আর যে দ্বিতীয় কোন প্রতিবিধান নেই তাও বুঝিয়ে দেন। পূর্বেই বলেছি, এ সব তাঁরা সচিন্ত ভাবে করেন না, করব বলে কোমর বেঁধে করেন না।

কিন্তু এতক্ষণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে-ভাবে কথা বললাম তাতে হয়তো এমন ধারণা করা যেতে পারে যে আমি বিজ্ঞানকে ত্রৈলোক্যচিন্তামণি মনে করি; যা চাইব তাই পাওয়া যাবে। যদিও বিজ্ঞানের বহু অসম্পূর্ণতা আছে—এবং থাকবে—তবু বিজ্ঞানের প্রয়োগে আমাদের জীবন এতোই উন্নততর হতে পারে যে তাকে বিপ্লবই বলা যায়। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ফলে এই মুহূর্তেই মানুষের হাতে এতোটা জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চিত হয়েছে যার প্রয়োগে পৃথিবীর অর্ধেক দুঃখকষ্ট দূর করা সম্ভব; কারণ সে-জন্য প্রয়োজনীয় টেকনিক উদ্ভাবিত হয়ে গেছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয়।

জ্ঞানের অধিগমের সংগে সংগে দায়িত্বের উদ্ভব হয়। যতদিন একথা জানা ছিল না যে দূষিত জল থেকে টাইফয়েড কলেরা প্রভৃতি রোগ হয় ততদিন পর্যন্ত সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলসরবরাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে দায়িত্ব ছিল না। আমাদের আচরণের অজ্ঞাতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে বিজ্ঞান আমাদের জন্য নতুন নতুন দায়িত্ব সৃষ্টি করে। আবার দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা সৃষ্টি করে-ও নতুন নতুন দায়িত্বের সৃষ্টি হয়। যেমন, প্রাচীন-কালে দূরদেশের দুর্ভিক্ষ মহামারীর সংবাদও পৌঁছত না বা পৌঁছালে-ও সাহায্য প্রেরণ করায় কোন উপায় না থাকাতে এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন দায়িত্ব না-ও বোধ করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমান কালে রেল, ষ্টীমার, বিমান, তার ইত্যাদির জন্য পরিস্থিতি ঠিক বিপরীত হয়ে উঠেছে। এখন হাজার মাইল দূরের মানুষের দুঃখের সংবাদ অচিরে পৌঁছচ্ছে এবং সাহায্য পাঠাবার উপায় থাকতে নিশ্চেষ্ট থাকা মানুষের বিবেকে বাধছে।

শুধু এই নয়। বিজ্ঞান যে শুধু জ্ঞানই তা তো নয়, বিজ্ঞান একটা পদ্ধতিও বটে। এখানে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে এই পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ নিরপেক্ষভাবে তথ্যের সন্ধান এবং তারপর তথ্যের মধ্যকার সম্বন্ধের সন্ধান এবং সম্বন্ধ-যুক্ত তথ্যগুলোকে কোন একটা সরল শৃংখলায় আনবার চেষ্টা। এই চেষ্টায় প্রতিপদে বিজ্ঞানীর নিজের মনের বাইরের কোনও বিনির্ণায়কের নিকষে তথ্য ও তত্ত্বকে পরীক্ষা করেন এবং কোথাও নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা

পছন্দ-অপছন্দকে এই সব ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করতে দেন না। উদ্দেশ্য-বিরহিত নিরপেক্ষতা, যেমন জে. বি. এস. হল্‌ডেন বলেছেন :—"a rose and a tape-worm must be studied by the same methods and viewed from the same angle, even if the work is ultimately to lead to the killing of the tape-worms and the propagation of the roses."

উপরন্তু বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য সত্যানুসন্ধান বলে এমন একটা চিন্তারীতি তার আশ্রয় এবং এমন ভাষা তার বাহন যা তার প্রত্যেকটি কাজকে সার্বিক স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী। অর্থাৎ বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান কোন একটা বিশেষ দেশের কি শ্রেণীর জন্য valid, অন্য কারোর জন্য নয়, এমন কখনই হয় না। ফলত, বিজ্ঞান সর্বদাই জাতি বর্ণের গণ্ডি থেকে মুক্ত এবং তার শিক্ষা ও সুফল দুইই সর্বজনীন।

আবার আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। দেখা গেল যে বিজ্ঞান বলে আমরা পথের লোকরা যে শুধু প্রচুরতর স্বাস্থ্য ও সুখের অধিকারী হতে পারি তাই নয়, এ যে আমাদের আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু দিতে পারে তাই নয়, এ আমাদের উপর কিছু দায়-ও চাপায়। এই দায় নিয়েই মানুষের সমাজ। এই দায়িত্ববোধের উদ্বোধনের উপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যত সমাজের রূপ। সমাজের কর্তব্য এই দায়িত্বের উদ্বোধন ও প্রসার। আমাদের কর্তব্য এই দায়িত্বের স্বীকার। পথের লোক অবশ্য দায়িত্বকে ভয় পায় না। দায়িত্বের ভারটা তাদের উপর চিরকালই আছে, যদিও অধিকারগুলো তাদের জন্য নয়।

কিন্তু এ দায়িত্ব শুধু কারোর প্রতিবেশীর প্রতিই নয়। তার নিজের প্রতি-ও বটে। সেই দায়িত্বের স্বীকারেই তার সত্যকারের স্বাধীনতা। অন্ধ-বিশ্বাসের অধীনতা, প্রাচীনকালের ভূতের উপদ্রব নিবারণ না করলে তার মুক্তি নেই। সেই মুক্তি দিতে পারে শুধু বৈজ্ঞানিক মনন-পদ্ধতি। এর অন্যতম মূলকথা হচ্ছে স্বীকারের সাহস এবং যেখানে বিশ্বাসের হেতু নেই সেখানে অবিশ্বাস। তথ্যকে স্বীকার শুধু নয়, মননপদ্ধতির পরিবর্তন চাই। তবেই নতুন আলো ফুটবে।

সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ্মীছাড়ী

(২)

সন্ধ্যে হয়ে আসে। চাঁপা তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে টগরকে কোলে তুলে নেয়। টগর তাড়াতাড়ি বলে, কৈ দিদি, আজকে 'মুখটি পোড়ে ছ্যাঁক' হবে না? চাঁপা বলে, ওমা, তাইত, ভুলে গেছি। প্রদীপটা তুলে নেয়। দেয়ালের কাছে ঘেঁসে আসে। প্রদীপের শিখটা দেয়ালের গা ঘেঁসিয়ে চাকাপানা করে ঘুরোতে ঘুরোতে বলে,

সাঁঝের বাতি নড়েচড়ে,
যে আমার টগরকে খোঁড়ে,
তার মুখটি পোড়ে ছ্যাঁক্।

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের গায়ে শিখা ছোঁয়ায়। আরও দুবার। তিনবার নিয়ম যে। তবে তো টগরের শত্তুর মরবে!

কিন্তু টগর তবুও বলবে, দিদিভাই আবার। চাঁপা দিদি আবার হাত ঘুরোয়।

এইবার হয় রান্না সুরু। তার আয়োজনের ঘটা আছে। চাঁপা কলসীটা কাঁখে তুলে নেয়। টগর সঙ্গে চলে। হাতে তার কাঁচঘেরা চৌকো লণ্ঠন। আজ আর সৎমা নেই। কাজেই কাপড় কাচা না কাচা চাঁপার ইচ্ছে। চাঁপা বলে, কাজ নেই। অতো দেরী সইবে না। চাঁপা বাট্‌না বাট্‌তে বসে। শিলনোড়ার শব্দ হয়, ঘটাঘট্। টগর দেয় উনুনে আগুন। শুকনো ডুটো নারকেল পাতা দুমড়ে নিয়ে আগায় আগুন ধরায়। তারপর সেটা উনুনে গোঁজে, আশে পাশে চ্যালাকাঠ ছোবড়া নারকেল মালা সাজিয়ে নিয়ে হেঁট হয়ে ফুঁ দিতে থাকে। ফুঁ দিতে দিতে আগুনটা হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। ভয়ে ভয়ে টগর একটুখানি সরে আসে। চাঁপা বলে, সর। এইবার ও আপনি ধরবে। উনুন আপনি ধ'রে ওঠে। চাঁপা নোড়া রগড়ে চলে ঘস্ ঘস্ ঘস্ ঘস্।

টগর বলে, দিদি, হাঁড়িটা আজ আমি বসিয়ে দি। চাঁপা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে সেই হাতেই টগর গিয়ে কলসী ছুঁয়ে ফেলে।

চাঁপা হেই হেই করে তেড়ে আসে। বলে, ও মুখপুড়ী, ছিষ্টি খেলি তো!

টগর ভড়্কে যায়। তাড়াতাড়ি হাতের চেটোচুটো নিজের গায়ে পুঁছে ফেলে।

চাঁপা চোখ কপালে তুলে বলে, ওমা, রাক্কুসীটা ওই সক্‌ড়ি হাত গায়ে মাখচে। এই রাতের বেলায় চান করবি নাকি!

টগর বলে, দিদি, গঙ্গাজল দেনা। তাহলেই তো সব শুদ্ধু।

চাঁপা হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে তবু ভাল। তোর বুদ্ধি আছে।

গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে আর মাথা পেতে গঙ্গাজলের ছিটে নিয়ে, টগর জলের বড় ঘটিটা দুহাতে ধরে নিয়ে চলে। ছলাক্ ছলাক্ করে ঘটির জল কানা ছাপিয়ে পড়তে থাকে। জলটা ভাতের হাঁড়িতে ঢেলে দিয়ে ঘটিটা একপাশে নাবিয়ে রাখে। তারপর হাততালি দিতে দিতে নিজে নিজেই হেসে একে বারে কুরিয়ে যায়। হীঃ.... হীঃ—হাঃ—ঈ—ঈ—ঈ।

দিদি বলে, কিরে? কি হল?

টগর বলে, সব সক্‌ড়ি করে দিলুম তো? য়্যাঁ? মা কিচ্ছুটি জানতে পারবে না। কী মজা!

চাঁপা বলে, ও মুখপুড়ী, অকম্মো করে আবার অতো হাসি।

চাল ধুয়ে হাঁড়িতে ফেলে দেয়। টগর ততক্ষণ একটুক্‌রো ন্যাকড়ায় সজনে পাতাগুলো ছোট্টো পুটুলী করে বাঁধে। বলে, তুমি দিদি সরো। আমি দোরো।

তারপর বঁটী পেতে চাট্টি ছাই নিয়ে দাবার কোণে চাঁপা মাছ কুট্‌তে বসে। লোভে লোভে মেনি বেরালটা কোথা থেকে এসে জুটে যায়। পা মুড়ে টগরের গা ঘেঁসে বসে। আর আস্তে আস্তে মিঁউ মিঁউ করে।

টগর ব্যস্ত হোয়ে বলে, আ মর্! আমরা ছুটি বোনে—কোথা খানাখন্দ বনবাদাড় ঢুঁড়ে ছুটো মাছ ধরে আনলুম, আর, রাক্কুসী, উনুনমুখী, ইয়্যাও ইয়্যাও কত্তে এলেন। চুপ করে বোস। শেষকালে কাঁটাপোঁটা পাবি এখোন। আর রান্না হলে, দিদি, য়্যাঁ? একখানা মাছ খাবেখোন। কেমন?

দিদি মাথা নাড়ে। আবার মাছ ধুতে যেতে হয়, সেই পুকুরঘাটে। টগর আলো নিয়ে আগে আগে চল্লে। চাঁপা আঁশ চুপড়ীতে মাছগুলো নিয়ে যায়। কাঁটাপোঁটাগুলো পড়ে থাকে। মেনি বেরালটা খেতে লেগে যায়।

ঘাটে যেতে যেতে টগর চুপি চুপি বলে দিদি, এই বাগে দ্যাখ্। দুখানা মাছ ফেলে দে। আমার ভয় কোচ্চে।

চাঁপা আগুন হয়ে ওঠে। বলে, আ মোলো যা। নেকি খুকি। চল্ চল্, খরো খরো চল্। এখেনে ওসব আছে বুঝি। ভয় করে যদি রাম নাম কর্ না। তা নয়, দিদি, দিদি।

দিদি কি করবে।

আসলে কথাটা এই, চাঁপারও বুক্‌টা একটুখানি ছম্‌ছম করে এলো। যদিও ওর ভয় নেই মোটেই। ও বলে, যা যাঃ–

ভুত
আমার পুত
শাঁখচুন্নি আমার ঝি
রামলক্ষ্মণ বুকে আছে
ভয়টা আমার কি?

ব্যস্। আর চাঁপার ভয় থাকে না। ও তাড়াতাড়ি টগরের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের আগাটা একটু কামড়ে দেয়। আর ওর বুকে দেয় একটু থুতকুড়ি। বলে, ব্যস্। আর বাতাস লাগতে পারবে না।

এসব ও জানে।

মাছগুলোয় তেল নুন লঙ্কা হলুদ মাখে। তাতে খুব একটুখানি জল দিয়ে একটা বাটী ভর্ত্তি করে। উনুনের মুখের দিক্‌টা যেখানে আগুন নেই, অথচ তাত আছে, বাটীটা আস্তে আস্তে সেখানে বসিয়ে দেয়। আর তার মুখে একটা বাটী চাপা দেয়। মাছগুলো বাট্‌নার জলে মিশে গুমে ভাপে সেদ্ধ হতে থাকে। এই ওদের বাটি-চচ্চড়ী। খেতে কিন্তু খুব তার হয়। হাঁড়ি-কড়ায় রান্নার চেয়ে।

তারপর আমরুল পাতাগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে। কচি কলাপাতে আমরুল শাক্ মোড়ে। ওপোরটায় কলাপাতার ডাঁটা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেঁধে। দেয় সেটা আগুনের মধ্যে ফেলে।

টগর বলে, দিদি, এইবার একটু খেলতে হবে। বলে নিজেই দুহাতের আঙুলগুলো দাবায় বিছিয়ে রাখে। চাঁপা জিজ্ঞেস করে কোন্‌টা? ডাঁশ-

কোঁশ ফিঙে বুলবুলি, মেছম্‌মেস্তা, না, ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম্‌ চিক্‌ড়ি, চামে কাটা মজুমদার, ধেয়ে এল দামোদর ? সেইটে টগর বলে, দিদি, ছুটোই।

চাঁপা বলে, সর দিকি। ভাত বোধ হয় ধরে গেলো। তাড়াতাড়ি খুন্তি নাড়ে। বেশী করে জল দেয় ভাতে। বলে, নাঃ তলা ধরেনি। চাঁপা ফিরে এসে দাবায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

টগর বলে, দিদি, কত দেরী দেরী হচ্চে বলতো ? চাঁপা বলে, তুই ততোক্ষণ একটা গান গা না। টগর গান ধরে।

আমরা ছুটি ভাই
শিবের গাজন গাই
ঠাক্‌মা গেছে কাশী-গয়া, ডুগডুগী বাজাই।

চাঁপা বলে, বাঃ বেশ। টগরমনি উনুনের জালটা একটু ঠেলে দিয়ে এসো না। দেখো বাটি-চচ্চোড়ি আর আমরুলশাকে ঠোকা লাগে না যেন।

ভাত নাবে। টগর তাড়াতাড়ি ওদের সানকি, একঘটি জল, নুন তেল, কাঁচালঙ্কা সব জোগাড় কোরে নিয়ে বসে। চাঁপা উনুনের ভেতর থেকে বাটি-চচ্চড়ি আর আমরুল পোড়া বার করে। সান্‌কিতে ভাত বেড়ে নিয়ে চাঁপা হাঁড়িকুঁড়ি তোলে। উনুন নিকোয়। টগর দুহাতে পেট্‌ চাপড়ায় আর বলে, দিদি শীগ্‌গির।

চাঁপা গলাবাজি করে বলে, হ্যাঁ। তা আর নয়। আমার কথানা হাত রে রাক্কুসী।

ওরা ছুটি বোন খেতে বসে। টগর বলে, দিদিরে বেশী করে তেল নুন লঙ্কা না দিলে কি ভাতেভাত মজে।

চাঁপা ওর মুখে গরাস তোলে। তারপর নিজের গালে। ভাতেভাত দিয়ে খেতে খেতেই টগর বাটিচচ্চড়ীর দিকে হাত বাড়ায়। একটু চাখ্‌বে।

চাঁপা ধমক দেয়, নোলাদাগা মেয়ে কোথাকার, তোমার আর তর সইচে না বুঝি। মা থাক্‌লে, তোমার নোলায় গরম খুন্তি ছ্যাঁকা দিতো।

টগর কাতরভাবে বলে, দিদিরে, মোটে তো ঐটুকুন। আচ্ছা আর করবো না। কিন্তু একটুখানি সময় কাটতে না কাটতেই টগর আমরুল পোড়ার দিকে হাত বাড়ায়।

চাঁপা হাসতে হাসতে বলে, নাঃ, তুই দেখ্‌চি ছোঁচা বেরাল। অতো হ্যাংলাপনা করিস কেন বলতো ? তোকে কি আমি খেতে দেবনা।

টগর গাল ফুলোয়। এটা তার অভিমানের ভাণ। বলে, আমি ছোট্টো ছেলে। তবে ? ভুলে ভুলে খেয়ে ফেলবো না বুঝি এক একবার, বাহারে!

চাঁপা হাসতে হাসতে ককিয়ে যায়। বলে, তাইতো ? ভুলে গেছিলুম। ও ছোট্টো ছেলেমানুষটি, আমি চোখ বুজোচ্চি। তুমি ভুলে ভুলে একবার সবটা আমরুল পোড়া খেয়ে ফ্যালো তো।

টগর বলে, ও মা গো। ইচ্ছে করে বুঝি আবার ভুলে ভুলে খাওয়া যায়।

ওর মুখে ভাত গুঁজে দিয়ে চাঁপা বলে, অতো বকোর বকোর করতে হবে না, গেলো তাড়াতাড়ি। দেখ দিকিনি, বাটি-চচ্চড়িটা কি রকম হয়েচে ?

টগর মুখে একবার পাক্‌লে নেড়ে চিবিয়ে ভুরু কুঁচকে, চোখদুটো ডাগর করে বলে, উঃ—দিদিরে, জন্মেও এ রকম খাইনি। ঠিক যেন মিষ্টি গুড়।

চাঁপা বলে, হ্যাঁ, ভারি তার হয়েচে। মা এরকম পারে ?

টগর ঠোঁট উল্‌টে বুড়ো আঙুল তুলে বলে, কলাটি।

মাছের কাঁটাগুলো ওরা খুব চুষে চুষে খায়। তারই শব্দ হয়। মেনি বেরালটা অমনি মুখের দিকে চাইবে। যেন ওকে এইবার দেওয়া হবে। টগরের ভারি রাগ হয় মেনির ওপর। ওটা ভারি হ্যাংলা। হাতে করে যদি কিছু মুখে তোলো, ও-ও ওম্‌নি সেই সঙ্গে চোখ তুলবে। মেনির চোখ যেন সক্‌ড়ি হাতের সঙ্গে বাঁধা। যেদিকে টানবে সেইদিকে ফিরবে। এটা টগরের সহ্য হয় না। ওর ল্যাজ ধরে, টান মারে। মাথায় চাঁটি মারে। বলে, দিদি, দে ভাই ওকে। যাহোক্‌ একটুখানি। রাক্কুসীটা যা দিষ্টি দিচ্চে, আমাদের পেটে আর কিচ্ছু তলাবে না।

চিবোন মুড়ো একটা ছুড়ে দেয় ওর দিকে। চুপ করে বসে থাকা বেরালটা ওম্‌নি ঘুঁড়ির মতন গোঁৎ খেয়ে জেগে ওঠে। কাঁটা চিবোন সুরু করে। কাঁটাগুলো গালে ফুটে ফুটে যায়। তবুও ঘাড় কাৎ করে, কতক্‌টা পাক্‌লে, বাকিটা চিবিয়ে, ও খাবেই। সাধে কি আর টগরমণি বলে, মেনি-রাক্কুসী।

তারপর ওদের গপ্প করতে করতে ঘুমোবার পালা। টগর সুরু করে। বলে, জানিস দিদি, কায়েতদিদি বললে সেদিনকে, ওর কানাচে যে আশ্যাওড়া গাছ আছে না? তার মাথায় একটা পা, আর একটা পা ঐ কালো দিঘির ওপারের তালগাছের মাথায়। সত্যি ভাই?

চাঁপা চটে কাঁই। বলে, আকৃখুটি লক্ষ্মীছাড়ীর যতসব অনাসিষ্টি।

ভ্যাংচানোর সুরে বলে, সত্যি ভাই? সত্যি কি মিথ্যে, যানা দ্যাখ্ না, ওই বকুলতলার পাঁদাড়ে গিয়ে। বাঁশের মতো লম্বা হাত বাড়িয়ে তোর গলা-টিপে নিয়ে গিয়ে, ঝুলিয়ে রেখে দেবে হোই—নাচ্ নাগাছার গোভাগাড়ে। যা। খুব তো ভুতের গপ্প। একে মা নেই। আমরা দুজন একা। আর হতো-চ্ছাড়ীর যতো সব ওই। তোকে ধরে নিয়ে যায় যদি আমি একপাও বাড়াবো না। দোরে খিল দিয়ে বসে থাকবো। তুই কেঁদে কেঁদে মরবি। কত রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর রয়েচে, ঘুঁটেকুড়ুনি দাসী রয়েচে, তেপান্তরের মাঠ, গয়লাদিদির বাড়ী চোর ঢুকলো। এসবে ওঁর মন ওঠে না। আ গ্যালো যা!

টগর কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, দিদি আর বলিস নি ভাই। ভয় করচে। চাঁপা বলে, ঘুমো। অত ভয়ে আর কাজ নেই।

এমনি করে ওদের দু'বোনের অনেকগুলো দিন কেটে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে—ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক ব্যবস্থা কি? সাধারণতঃ শোনা যায় যে ইসলামীয় সমাজে সব মুসলমানই ভাই-ভাই; ইহার মধ্যে কৌম, শ্রেণী ও জাতিগত বিভেদ নাই; আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ মনে হয় বটে কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায় যে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের সমাজের ন্যায় ইহার মধ্যে নানাপ্রকারের বিভেদ আছে। হয়ত ইসলামের প্রথম যুগে চরমপন্থীয় উদারতার ফলে এই প্রকারের সমাজব্যবস্থা ছিল; কিন্তু পরে শনৈঃ শনৈঃ মূল-জাতীয় বিভিন্নতা আসিয়া সমাজ-শরীরকে আচ্ছন্ন করে। আরব, পারসিক, তুর্ক, বার্ব্বার (মুর) জাতিগুলি মিশ্রিত হইয়া একটা নূতন জাতিতে পরিণত হয় নাই *। তৎপর ধনগত বৈষম্যের উদয় হওয়ায় শ্রেণী-বিভাগ উদ্ভূত হয়। মুস্‌লিম স্পেনে খৃষ্টীয় ইউরোপের ন্যায় সামন্ত-তন্ত্রীয় শ্রেণী-বিভাগ বিবর্ত্তিত হয় (†)। উম্মিয়াদ খলিফাদের সময় সমাজে চারিটি সামাজিক শ্রেণী বিবর্ত্তিত হয়, আব্বাসিদ্‌দের যুগেও অর্থনীতিক ভিত্তিতে নানা সামাজিক শ্রেণী উদ্ভূত হয় (‡)। সর্ব্বত্রই ধনের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়, বংশাভিমান উদ্ভূত হয় এবং বিভিন্ন কৌমের মধ্যে বিবাহ অপ্রচলিত হইয়া সমাজ-শরীরে endogamy প্রচলিত হয়। এইজন্যই পশ্চিম-এশিয়ায় তুর্ক, পারসীক ও আরব কৌমগুলিকে পৃথকভাবে থাকিতে দেখা যায়; মধ্য-এশিয়ায় তুর্কমান, তাজিক, উজ্‌বেক, খিরগিজ্ প্রভৃতি জাতিগুলিকে পৃথক ও স্বতন্ত্র-ভাবে থাকিতে দেখা যায়। উত্তর আফ্রিকার শ্বেতবর্ণীয় বার্ব্বার জাতীয় মুর, শ্যামবর্ণীয় (brown) আরব ও কৃষ্ণবর্ণের নিগ্রো ইসলাম ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও একজাতিতে পরিণত হয় নাই। মধ্য-আফ্রিকাতেও এই জাতিগুলি পৃথকভাবে পাশাপাশি বসবাস করে (১)। অবশ্য ইসলাম ধর্ম্মে পারস্পারিক

* হিট্টিও ইহা স্বীকার করেন; vide Hitti—"History of the Arabs", P. 485।
(†) The Cambridge Mediaeval History, Vol. III, Pp. 428-429. (‡) Hitti.—op. cit. P. 232, 343 (১) Barth—Travels.

বিবাহে আপত্তি নেই, কিন্তু মূলজাতীয় অথবা কৌমগত ভাষা, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির পার্থক্যবশতঃ সাধারণত রক্ত-সংমিশ্রণ সম্ভব হয় না।

একবার লেখক জনৈক মিশর দেশীয় ন্যাশনালিষ্ট যুবককে জিজ্ঞাসা করেন যে, যখন মরক্কো হইতে মিশর (ঈজিপ্ত) পর্য্যন্ত উত্তর আফ্রিকা ভূভাগে এক-ধর্ম্ম ও এক ভাষাভাষী লোকের বাস আছে তখন কেন তাহারা সকলে মিলিত হইয়া একরাষ্ট্র সংগঠনে প্রয়াস পান না? এ-প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিলেন, "তাহারা যে সকলে বিভিন্ন কৌমের (different tribes) লোক!" লেখক বিদেশে একবার বার্ব্বার জাতীয় কাবিলদের (Kabyles) তাহাদের মধ্যস্থিত কৃষ্ণকায় লোকদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"ইঁহারা কাঁহারা?" ইহার উত্তরে শ্বেতকায় লোকেরা বলিল, "আমরা কাবিল, আর উহারা সেনেগলের কৃষ্ণকায় জাতি" (নিগ্রো)। নরতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক এই বিভিন্নতার ফলে আজ মুসলমান জগতে পৃথবীকৃত জাতীয়তাভাব (nationalism) উদ্ভূত হইতেছে। আজ মরক্কোর মুর, আল্‌জেরিয়ার বার্ব্বার, ত্রিপোলি ও মিশরের লোকরা নিজেদের মধ্যে পৃথক জাতীয়তাভাব উদ্ভূত করিতেছে। ইসলাম-জগতের সর্ব্বত্র যে জাতীয়তার উন্মেষ দেখা যাইতেছে তাহার ভিত্তি হইতেছে racialism (মূল-জাতিগত পার্থক্যভাব) ও tribalism (কৌমগত পার্থক্যের ভাব)।

এই প্রসঙ্গে এ-অনুষ্ঠানটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে-সব অ-আরব মুসলমান দেশে জাতীয়তাভাব উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তথায় আরব-অপ্রীতিও সৃষ্টি হইয়াছে। উদাহরণতঃ মুসলমান-ইরাণে মধ্যযুগেই ইরাণী জাতীয় ভাবের অভ্যুদয় কাল হইতেই আরব-বিদ্বেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে (২)। আর ওসমানলী তুর্কদের মধ্যে আরবদের প্রতি ঘৃণা বরাবরই জাগ্রত ছিল। একজন বড় প্যান-ইসলামীয় তুর্ক ভদ্রলোকের মুখ হইতেই লেখক শ্রবণ করিয়াছেন যে আরবেরা নিজেদের শাসন করিতে পারে না; তাহারা অকেজো জাতি এবং ইসলামী ইতিহাসের পশ্চাতে বরাবরই তুর্কজাতি রহিয়াছে ("At the back of the Istamic History are the Turks")। আজ কামালের তুর্কি

২। Browne—"A Literary History of Persia"; Hitti—"History of the Arabs."

আরব কৃষ্টির সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই সকল দেশে ইসলামকে নিজেদের বর্ত্তমান প্রয়োজনানুযায়ী গড়িয়া তোলা হইতেছে।

এই প্রকারে ইসলাম যখন বিভিন্নদেশে দেশানুযায়ী বিশিষ্ট রূপধারণ করিতেছে তখন ভারতে ইহার কি অবস্থা তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। এদেশে মধ্যে মধ্যে "ভারতীয় ইসলাম" নাম শোনা যায়। বস্তুতঃ বৈদেশিক অনুসন্ধানকারীরা এই দেশের ইসলামকে "ভারতীয় ইসলাম" নামে অভিহিত করিতেছেন (৩)। আজকালকার অনুসন্ধানকারী ও নিরপেক্ষ মুসলমানদের অভিমত এই যে ভারতের প্রাচীন কৃষ্টি, আচার ব্যবহার, রীতি প্রভৃতি ইসলামীয় সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। অবশ্য ইসলামধর্ম্মের সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য উহাদের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীয় মুসলমানদের আচার ব্যবহার এবং অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম্মবিশ্বাসও সেই শ্রেণীয় হিন্দুর সহিত পৃথক নহে। বাঙ্গলার 'ওলাবিবি' ও 'বনবিবি' (সুন্দর-বনের দেবী) মুসলমানদেরই দেবতা এবং ইহাদের পূজার পৌরহিত্য মুসলমান-দেরই একচেটিয়া। অনেক হিন্দু মুসলমান পীর সাধুদের পূজা ও শ্রদ্ধা করেন (Census Report, 1891, XVI. 1,217, 244)। পুনঃ অনেক পীর (Saint) আছেন যাঁহাদের সহিত মুসলমানধর্ম্মের সম্পর্ক খুবই কম। টাইটাস্ বলেন, "However they should be mentioned, as showing the manner in which saint-worship among Muslims gradually shades off until it is scarcely distinguishable from some of the animistic phases of primitive religious life." যাহাই হউক, ইহারা উল্লেখযোগ্য; কারণ এতদ্বারা দেখা যায় যে কি প্রকারে মুসলমানদের মধ্যে পীর পূজা ক্রমশঃ আদিম জাতীয় ধর্ম্ম-জীবনের "অ্যানিমিষ্টিক" স্তরের (tribal religion) অর্থাৎ আদিম কৌমগত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। এই প্রকারের পীরদের নাম হইতেছে—গুগাপীর, লালবেগ, পঞ্চপীর, প্রভৃতি। নিম্নশ্রেণীয় হিন্দুরা ইহাদের পূজা দিয়া থাকেন (৪)। "নাগোসী" নামক আর একটি সম্প্রদায় আছে; ইহার লোকেরা মাংস খাওয়া পাপ বলিয়া মনে করেন (৫)। পশ্চিম

৩। M. Titus—"Indian Islam."
৪। M. Titus—op. cit., P. 139
৫। Ibid, P. 99

এশিয়ার, মধ্যযুগ প্রসূত "ইসমায়েলী" নামক heterodox সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বোম্বাই-এর বোরা সম্প্রদায় অনেকস্থলে হিন্দু রীতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। ইহারা এখনও দায়াধিকার ব্যাপারে মিতাক্ষরা আইন দ্বারা শাসিত হয়েন। পাঞ্জাব, সিন্ধু, কচ্ছ, কাঠিয়াওয়ার এবং পশ্চিম ভারতের অন্যান্য স্থানের খোজা সম্প্রদায় ইসমায়েলী সম্প্রদায়ভুক্ত। মধ্যযুগে ইতিহাসে ইহাদিগকেই 'the sect of the Assasins' বলিয়া অভিহিত করা হইত। মঙ্গোলরাজ হালাকু যখন ইহাদিগেরই "আলামুত" নামক দুর্গ ধ্বংস করিয়া দেয় তখন মুসলমান জগত খুব খুসী হয় (৬)। ভারতে ইহাদের ধর্ম্মপ্রচারকেরা ("Dias") তাহাদের গুহ্য ধর্ম্ম উপদেশকে ("Batini") হিন্দুবিশ্বাসের সহিত খাপ খাওয়াইবার প্রয়াস পান। ইহাদের একজন বড় প্রচারক সদরুদ্দীন (খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দী) "দশ অবতার" পুস্তক তাঁহার সিন্ধুদেশীয় চেলাদের ব্যবহারের জন্য লিপিবদ্ধ করেন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে "আলীই হিন্দুদের যথার্থ দশম অবতার! আজ পর্য্যন্ত খোজাদের নিকট (৭)। এই পুস্তক পবিত্র পুস্তক বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ অনুমিত হয় যে এবম্প্রকারের একটি সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "অল্লোপনিষদ" লিখিত হয়। কিন্তু বৈয়াকরণিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে উহা অথর্ব্ববেদের সহিত সংশ্লিষ্ট উপনিষদরূপে পরিগণিত হয় এবং কোন কোন মৌলবীর কাছে ইহা আবার ভগবান প্রদত্ত "পয়গম" যাহা হিন্দুরা অমান্য করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয় (মৌলানা আক্রাম খাঁ কর্ত্তৃক তর্জ্জমাকৃত কোরাণ সরিফের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। এই পুস্তক হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল।

হ্যয়ামি মিত্রো ইল্লাং কবর ইল্লাং
রসুল মহমদরকং বরস্য
অল্লে অল্লো পুনর্দধুঃ ॥৯

* * *

অসুর সংহারিণীং হ্রীং অল্লোহরসুর মহমদরকং বরস্য
অল্লো অল্লাঃ ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ।১০

৬। Brown,—op. cit. দ্রষ্টব্য।
৭। Titus—op. cit., Pp. 97-98.

['অথর্ব্ববেদীয় অল্লোপনিষৎ'—বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্ত্তৃক প্রকাশিত]

বৈয়াকরণিকেরা ইহার যে বৈদিক ব্যাখ্যাই করুন না কেন, হিন্দুর মুখ হইতে প্রকারান্তরে ইসলামের কলমা বাহির করাই এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। বৈয়াকরণিক পণ্ডিতেরা 'দশ অবতার' বিষয়ে কি মত প্রকাশ করেন? অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈদিক ছন্দে খৃষ্টীয় 'নিউ টেষ্টামেন্ট' অনুদিত করিয়া হিন্দুর নিকট খৃষ্টান মিশনারী প্রচার করিতেন এবং এরূপ জনশ্রুতিও আছে যে মাদ্রাজে মিশনারী Schwartz যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া হিন্দুর নিকট নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং উক্ত সংস্কৃত ছন্দে বাইবেল প্রচার করিতেন। উপরি উক্ত উপনিষদ্ এই প্রকারের একটা প্রচেষ্টা বলিয়া মনে হয়।

অনেক বিদেশীয় ও ভারতীয় মুসলমান লেখক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, ইসলাম ভারতীয় সামাজিক ধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। অনেক সামাজিক রীতি রেওয়াজ, গল্প, আচার ব্যবহার ইসলামীয় আকারে মুসলমান সমাজে আজও প্রচলিত আছে। উদাহরণতঃ, বিহার প্রদেশে প্রচলিত "আল্লামিঞার গান" বিশ্লেষণ করিলে এই তথ্যই আবিষ্কৃত হইবে। কোন সামাজিক ক্রিয়া অথবা পর্ব্ব উপলক্ষে মুসলমান স্ত্রীলোকেরা এই সকল গান গাহিয়া থাকেন। একটি গানের নমুনা—

"চলে আইয়ো বড়ে পীর-মহজদ (মসজিদ) মেঁ।
সোনে কী থালী মেঁ পরোসা
খইয়ো খইয়ো বড়ে পীর-মহজদ মেঁ।
চাঁদীকা গড়ুয়া গঙ্গাজল পানী
পিও পিও বড়ে পীর-মহজদ মেঁ।
চলে অইয়ো বড়ে পীর-মহজদ মেঁ" ॥

এই বিষয়ে লেখিকা শ্রীমতী হাজরহ বেগম বলিতেছেন যে, এই প্রকারে পুরান জিনিষের উপর নূতন কলাই করা হইয়াছে মাত্র; কৃষ্ণ কনহাই—'বড়েপীর সাহেব', রাম লক্ষণ—'হাসান হুসেন', সীতা—'বিবি ফতিমা' হইয়া গিয়াছেন মাত্র (৮)।

৮। হাজরহ বেগম—"আল্লা মিঞাকে গীত", বিশ্ববাণী (হিন্দী), মার্চ্চ—১৯৪১।

একবার জার্ম্মানীতে ভারতীয়দের মধ্যে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধানরত দুইজন অধ্যাপককে সাহায্যকালে লেখক মুসলমান বাঙ্গালীদের মধ্যে মুসলমানী গল্পের নমুনা সংগ্রহকালে এই তথ্য আবিষ্কার করেন যে একটি গল্প 'বেতাল পঞ্চ-বিংশতি' হইতে গৃহীত হইয়াছে। (এইটি প্রসিদ্ধ গল্প—এক ভূত একজনের রূপ ধারণ করিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। রাজা এতদুভয়ের মধ্যে কোন লোকটি আসল তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য দুইজনকে কলসীর মধ্যে প্রবেশ করিতে বলে। ভূত উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধরা পড়ে।)

কেবল রাজা বিক্রমাদিত্যের পরিবর্ত্তে "নবীর জামাতা মেদিনার রাজা আলী" এবং অকুস্থল ভারতবর্ষ না হইয়া মেদিনায় স্থানান্তরিত হইয়াছে!

এই প্রকারে পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত এবং নবাবিষ্কৃত "রসুল-বিজয়" (৯) পুস্তক গুণরাজ খাঁ লিখিত "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" পুস্তকেরই নামান্তর মাত্র। একই ভাব তরঙ্গ উভয়েতে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই জন্যই মজাহার-উল-হক্ সাহেব বলিয়াছেন যে জন্মের সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মুসলমানদের যে সব অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদিত হয় তাহা হিন্দুদের ঐ সকল ক্রিয়াকাণ্ড হইতেই গৃহীত অথবা রূপান্তরিত করা মাত্র (১০)।

পূর্ব্ব-ভারতের অনেকস্থলেই সধবা মুসলমান মহিলাদের মধ্যে কপালে সিন্দুর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। এমন কি, কোন কোন গোষ্ঠিতে বিধবাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ হিন্দু আচারও পালিত হয় বলিয়া শোনা যায়। হিন্দুদের কৌলিন্যের ন্যায় বিশিষ্ট বংশে বিবাহ বিষয়ে "খানদানী" প্রশ্ন বড়ই কঠোর! পুনশ্চ ভারতের মুসলমান সমাজে সর্ব্বত্র হিন্দুদের ন্যায় endogamy প্রচলিত আছে। ফলে মুসলমান রাজপুত (রঙ্গড়) অন্য জাতির সহিত বিবাহ করিবে না। রোহিল্লা বা পাঠানেরা নিজেদের মধ্যেই বিবাহ করেন—সেখের সহিত পাঠানের বিবাহ হয় না; জাঠ এবং গুজারের বেলায়ও তদ্রূপ।

৯। মুহম্মদ এনামুল হক, "কবি সেখচন্দ", সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৩ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

১০। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন "History of Bengalee Literature" পুস্তকে হক্ সাহেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আবার হিন্দুর ন্যায় hypergamyও স্থানে স্থানে রহিয়াছে; সৈয়দ-কন্যা সেখের সহিত বিবাহিতা হইবে না। অবশ্য ইহা ধর্ম্মের অনুশাসন নহে; ব্যক্তিগত ভাবে আবার কেহ কেহ এই প্রথা ভাঙ্গিয়াও থাকেন। এইসব প্রথা "লোকাচার" বা "কুলাচার"। এই রীতি হিন্দুর ন্যায় মুসলমান সমাজেও জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়া আছে।

ইহার পর অস্পৃশ্যতা দোষও যে মুসলমান সমাজে নাই তাহা নহে। অনেক শ্রেণীর মুসলমান আছেন যাঁহারা সমাজে 'পতিত' বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। অবশ্য হিন্দুর ন্যায় 'ছুঁৎমার্গ' মুসলমান সমাজে নাই; তথাপি অনেক শ্রেণীর মুসলমান আছেন যাঁহাদের সহিত তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা আহারাদি-ই করেন না—বিবাহ ত দূরের কথা। বাঙ্গলায়ও অনেক যায়গায় আস্‌রাফ্ ও মোমিন (জোলা) শ্রেণীর লোকেরা একত্রে বসিয়া আহার পর্য্যন্ত করেন না। লেখকের পশ্চিমবঙ্গীয় কোন মুসলমান বন্ধু লেখককে বলিয়াছেন যে নিমন্ত্রিত হইলে মোমিনদের খাওয়ার জন্য আলাদা বিছানা করা হয়। মোমিনদের সহিত আসরাফদের বিবাহ চলে না। মোমিন আন্দোলনের জনৈক নেতাই লেখককে স্বয়ং একথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে পশ্চিমে উভয় শ্রেণী একত্রে আহার বিহার করেন। বাঙ্গলার পশ্চিমাংশে এমন শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহাদের untouchable বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলার শ্রীহট্ট জেলার (বর্ত্তমানে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত) 'জলকর' ও 'নানখানা' নামক দুই দল মৎস্যজীবী শ্রেণীর মুসলমান আছেন। ইহারা পতিত; ইহাদের সহিত অন্যান্য মুসলমানেরা আহারাদি করেন না। 'নিকরি' নামক মৎস্যজীবী মুসলমানগণ নিম্নশ্রেণীর লোক। বাঙ্গলার আবদাল, বেদিয়া, যুক্তপ্রদেশের লালবেগীগণ অস্পৃশ্য। বাঙ্গলার ত্রিপুরা জেলায় একশ্রেণীর মুসলমান আছেন; ইহারা পাল্কি বেহারার কাজ করিয়া থাকেন। ইহাদের সহিত অন্য শ্রেণীর মুসলমানদের একত্র বসিয়া আহারাদি কিম্বা অন্য কোন প্রকার সামাজিকতা অথবা কোন প্রকার লৌকিকতা চলে না (১০ক)। এই শ্রেণীর মুসলমানদের "আরজাল" বলা হয়, তাঁহাদিগকে উচ্চশ্রেণীয় মুসলমানদের মসজিদে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এমন কি, তাঁহাদের

১০ক। Gait—Census Report, 1901

গোরস্থান পর্য্যন্ত পৃথক (গেট্, পৃঃ ৪৩৯)। ভারতীয় আদম সুমারীর কয়েক-বারের রিপোর্ট হইতে এই প্রকারের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই স্থলে আমাদের রিসলীর (People of India দ্রষ্টব্য) কথা স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতের বাতাবরণের মধ্যে জাতিভেদ বাতাসকে আশ্রয় করিয়া চারিদিকে সঞ্চালিত হইতেছে—ইসলামীয় সমাজেও তাহার প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে। অনেক হিন্দু-শিল্পীজাতি (artisan class) হইতে যেসব জাতি মুসলমান হইয়াছেন তাঁহারা নিজেদের পূর্ব্বের "জাতি (caste) পঞ্চায়েৎ" অটুট রাখিয়াছেন। 'কলু' মুসলমান হইয়া 'খালু' (Khalu) হইয়াছে, 'যোগী' জোলহা হইয়াছে কিন্তু তাহাদের 'জাতি পঞ্চায়েৎ' আছে। এই প্রকারে কুঞ্জরা, দাই, দর্জ্জী, ধুনিয়া প্রভৃতি শ্রেণীগুলি নিজেদের সমাজ পঞ্চায়েৎ আঁকড়াইয়া আছেন (১১)।

মুসলমান সমাজে শ্রেণীভেদ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মুসলমান কাঞ্চন-কৌলিন্য অনেকদিন হইতেই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ভারতে 'গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া'-র ন্যায়, জাতিভেদের উপর শ্রেণীভেদ সঞ্চারিত হইয়াছে। এতদ্বারা ভারতীয় সর্ব্বদিকে বিভক্ত হইয়া আছে। এই বিষয়ে হিন্দুরও যে-দশা মুসলমানেরও সেই দশা! মুসলমান সমাজের মধ্যে এই শ্রেণীভেদ ভারতে মুসলমান শাসন স্থাপনের প্রথম যুগেই পরিলক্ষিত হয়। দিল্লীর সম্রাট বলবন এবং তাহার বংশধরদের রাজত্বকালে কোনও লোকের নিম্নজাতীয় লোকের ঘরে জন্ম হইলে সরকারী (government) কার্য্যের পদের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত (Low birth was the greast disqualification for public offices) এবং উচ্চ ঘরের (well born) লোক না হইলে ওমরাহ এবং কর্ম্মচারীরা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের চাকুরীর জন্য সুপারিশ করিতে সাহস করিত না (১২)। সম্রাট আকবর লোকের শ্রেণীগত মর্য্যাদা এবং জীবনের অবস্থা (পদ) অনুযায়ী করুণা

১১। Bengal Census Report—1901, p. 439

১২। I. Prasad—"History of Mediaeval India", p. 191

বিতরণ করিতেন (Our wise monarch bestows different favours upon men according to their ranks and situation in life.)। (১৩) ইতিহাস হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে বহলুল লোডির পর যখন সিকেন্দর লোডি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন বহলুলের খুল্লতাত পুত্র (first cousin) এই অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই, কারণ "একজন স্বর্ণকার কন্যার পুত্র কি করিয়া সম্রাটের মুকুট পরিধান করিতে পারে!" (A goldsmith's daughter's son was unfitted to wear the imperial diadem)! (১৪) এই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায়, যে-সমাজ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে পরে বংশাভিমান এবং শ্রেণীভেদ উদ্ভূত হয়। এই শ্রেণীভেদ ও বংশ-কৌলিন্য অনেক স্থলে "খানদানী" প্রশ্নরূপে কঠোরভাবে বিরাজ করে!

মুসলমান সমাজে যে জাতিভেদ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। গেট্ মুসলমানদের ভিতর অন্ততঃ ৫৫টি জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১৫)। যখন দুইটি পৃথক সামাজিক সমষ্টির মধ্যে বিবাহ ও আহারাদি বন্ধ হয় তখন তাহারা শ্রেণী (class) হইতে জাতিতে (caste) পরিণত হয়। এই তথ্যের ধারা ধরিলে মুসলমান সমাজে জাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তবে নিজেদের মধ্যে বিবাহরত সমষ্টিগুলির (endogamous groups) বেশির-ভাগের মধ্যে পরস্পরের হাতে জল খাওয়া বা আহার করা বেশীরভাগ স্থলেই প্রচলিত আছে। মুসলমান সমাজের এই বিভেদ বিষয়ে ১৯২১ খৃঃ বাঙ্গলার সেন্সাস সুপারিণ্টেডেণ্ট্ বলিয়াছেন, "হিন্দুদের ভিতর যেরূপ জাতিভেদ আছে মুসলমানদের ভিতর সেরূপ জাতিভেদ স্বীকৃত হয় না এবং যদিও মুসলমানদের ভিতর এতগুলি শ্রেণী-বিভাগ আছে, তথাপি হিন্দুদের মত সুচিহ্নিত জাতি-বিভাগ তাহাদের ভিতর নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে একজন সেখ একজন কুলুকে বিবাহ করিবে না এবং কোন কোন স্থানে এক শ্রেণীর মুসলমান আর

১৩। "Ayeen Akbery", transtaled by F. Gladwin, Pt. II., p. 186

১৪। I. Prasad—op. cit. P. 479.

১৫। Gait—Bengal Census Report, 1901, P. 443.

এক শ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে আহার করেন না (১৬)। মনে হয়, এই লক্ষণ-গুলি জাতিভেদের অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

মুসলমান সমাজে এত endogamous সমষ্টির প্রাদুর্ভাবের একটি কারণ এই মনে হয় যে, হিন্দুর জাত্যাভিমান-সংস্কার মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যায় নাই! ইতিহাসে দেখা যায় যে লোকে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করে কিন্তু তাহার সামাজিক পদ পরিবর্ত্তন করে না। ভারতেও তদ্রূপ হইয়াছে। যাহাদের জাতি এবং বংশ বিষয়ে গর্ব্ব করিবার আছে তাহা তাহারা পরিত্যাগ করিবে কেন? পারস্যে অনেক লোকই মুসলমান হইয়াও প্রাচীন শাসানীয় যুগের অভিজাতদের বংশধর বলিয়া গর্ব্ব করিত। ভারতে বিখ্যাত উর্দ্দু কবি 'গালিব' সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব হইয়াও নিজেকে প্রাচীন পারসিক জনশ্রুতির রাজা ফরিদূনের সন্ততি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন! লেখক জানেন এই বাঙ্গলায়ই কতকগুলি মুসলমান জমিদার বংশ নিজেদের ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন; আর কোন এক পুরাতন মুসলমান জমিদার বংশীয় লোক লেখকের নিকট সগর্ব্বে নিজেকে "চন্দ্রবংশীয়" এক রাজগোষ্ঠির জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! পশ্চিমের রাজপুত-মুসলমানবংশীয় অনেকে নিজদিগের নামের পশ্চাতে "ঠাকুর" পদবীটি ব্যবহার করেন (১৭)। মুসলমান সমাজের "আসরাফ্" নামীয় উচ্চশ্রেণী উচ্চ জাতীয় হিন্দু, সৈয়দ, মোগল ও পাঠানের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলার বিখ্যাত জনৈক মৌলানা সাহেব লেখককে বিশ্লেষণ করিয়া এই তথ্যটি বুঝাইয়া দিয়াছেন। জগতের সর্ব্বত্রই বিজিত জাতির অভিজাতবর্গ বিজেতৃদের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

এই জাত্যাভিমানের জন্যই বোধ হয় অনেক মুসলমান নিজেদের জাতি এবং কৌম বলিবার সময় পূর্ব্ব পুরুষের জাতি ও কৌমের নাম উল্লেখপূর্ব্বক নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন। ১৯২১ খৃঃ আদম সুমারীতে মুসলমানদের জাতি ও কৌমের তালিকা মধ্যে যে সব নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইতে

১৬। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত—"বাঙ্গলায় মুসলমান সমাজে অস্পৃশ্যতা", হিন্দুমিশন পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ—৯ম সংখ্যা।

১৭। M. Titus—op. cit., P. 171.

দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোটাকতক এখানে উদ্ধৃত করা গেল: আহির, আরাইন, আড়োড়া, আওয়ান, বানজাড়া অথবা লাম্বাডি, বড়হোই, ভঙ্গি, ব্রাহ্মণ, ভিল, চামার, চারণ, চূড়া, ধোবি, গুজার, হাজাম বানাই, জাঠ, যোগী, জোলাহা, কালওয়ার (১৮), কামরো, কোরুড়, কুমহার, কুঞ্জড়া, লোহার, মুচি, রাজপুত বা ছত্রি, সোনার, সূত্রধর, তেলী। যে সব জাতির এখানে নামোল্লেখ করা হইল তাহাদের আর এক অংশ হিন্দু সমাজে বর্ত্তমান আছে। ফলে যে স্থলে কৌমগত বা জাতিগত জ্ঞান বা স্পর্দ্ধা অত্যধিক সেখানে একই জাতি বা কৌমের এই দুই সমাজভুক্ত লোকেরা নিজেদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে নাই। পাঞ্জাবের দুইজন শিখ ভদ্রলোক লেখককে বলিয়াছেন যে তাঁহাদের কুলের (clan) মুসলমান অংশের সহিত তাঁহারা সামাজিকতা রক্ষা করেন। বাঙ্গলায় কোন কোন বংশের সম্পর্কেও এই প্রকার কথা শ্রুত হওয়া যায়।

এই জাতিগত সংস্কারের ফলেই অনেক মুসলমান বাড়ীতে এখনও হিন্দুর পঞ্জিকা দেখিয়া কোন কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। পশ্চিমের অনেক মুসলমান জাতি বা বংশে কোন কোন ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া কর্ম্ম করা হয় (১৯)। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব-সংস্কার জনিত এমন অনেক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান বহু ভারতীয়-মুসলমানদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে যাহার তালিকা এক বৃহদাকার ধারণ করে। কচ্ছের মোমিন সম্প্রদায় সুন্নৎ (circumcision) করেন না এবং গো-মাংসও ভক্ষণ করে না (২০)। সিন্ধু-উপত্যকার উত্তরে (গিল্‌গিট্ প্রভৃতি পর্ব্বতে) সিন্ জাতি গোমাংস ভক্ষণ করে না (২১)। মহীশূরের গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী যৌথ-পরিবার পদ্ধতি" (joint family system) প্রচলিত আছে (২২)।

এই প্রকারে দেখা যায় যে হিন্দু সমাজের ছায়া মুসলমান সমাজের উপরও আসিয়া পতিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, হিন্দু সমাজের একাংশ ভাঙ্গিয়াই

১৮। উত্তর ভারতে 'কলাল' নামেও একটা জাতি আছে; ইহারা ধর্ম্মের নিষেধ-বিধি সত্ত্বেও মদ বিক্রয় করে (M. Titus—পৃঃ ১৭১)।

১৯। Bains, "Ethnography, P. 44; C. I. R. U. P. 1911, Pt. 1, P. 141.

২০। C. I. R, 1911, vol. VII, Bombay, P. 59.

২১। Titus—op. cit. pp. 166—167.

২২। C. I. R—Mysore, 1911. p 61, quoted by Titus, p. 168

ভারতীয় মুসলমান সমাজ গঠিত হইয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় আবহাওয়ায় মুসলমান সমাজ অন্য প্রকারে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এইজন্যই হিন্দু সমাজের দ্বিজ ও শূদ্র-এর পার্থক্যের ন্যায় মুসলমান সমাজেও 'আস্‌রাফ্' ও 'আতরাফ্' বা 'আজলাফ' শ্রেণীদ্বয় উদ্ভূত হইয়াছে (২৩)। ইহার বাহিরে যেসব মুসলমান শ্রেণীদের পতিত বা অনাচারণীয় বলা হয় তাহারা কার্য্যতঃ হিন্দুর 'অন্ত্যজ' বা অসৎ শূদ্রের ন্যায় (homologous)। আবার সৈয়দেরা ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান পাইয়া থাকে ; হিন্দু-রীতি অনুসারী তাহারা পা জড়াইয়া ধরিয়া ভক্তি দেখায় (হিন্দুর "গোড় বা পাও লাগা" ন্যায়), পুনঃ জনশ্রুতি বলে যে অনেক ব্রাহ্মণ সৈয়দ হইয়াছেন এবং ইহা সম্রাট আকবর কর্তৃক অনুমোদিতও হইয়াছিল (২৪)। আবার কেহ কেহ বলেন, হিন্দুর চতুর্ব্বর্ণের সহিত সম-প্রতিষ্ঠান (analogous in stitutions) মুসলমানের চারিশ্রেণী সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান ! অবশ্য এই বিষয়ে হিন্দুর বর্ণ-বিভাগের সহিত কোন সাদৃশ্য (homology) নাই।

এই সকল বৈষম্যের ফলে মুসলমান সমাজে অসন্তোষ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে ! বর্ত্তমানের শিক্ষার দ্বারা জন-সমূহের মধ্যে চৈতন্য সঞ্চারের ফলে হিন্দু সমাজের মধ্য হইতে যে-প্রকারের শ্রেণী-দ্বন্দ্বের আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায় মুসলমান সমাজেও তদ্রূপ। আজ মোমিন আন্দোলন এই বৈষম্যের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চশ্রেণীয়দের দম্ভের প্রতিবাদ করিতে সুরু করিয়াছেন। ইহা সাহিত্য ও আন্দোলনের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

হিন্দু সমাজের সমাজ-সেবী নেতারা যে-প্রকারে নিজের সমাজ সম্বন্ধে সচেতন হইতেছেন, মুসলমান নেতারাও তদ্রূপ স্বীয় সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইতেছেন। এই বিষয়ে উর্দ্দু কবি সার মহম্মদ ইকবালের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : Is the organic unity of Islam intact in this land ? Religious adventurers set up different sects and fraternities, were ever quarrelling with one another ; and there are castes and sub

২৩। Risley,—'People of India' ; Titus—op. cit. p. 169

২৪। Bains—op. cit. p. 140 ; Titus—op. cit. p. 171

castes like the Hindus ! Surely we have out-Hindued the Hindu himself ; we are suffering from a double caste-system—the religious caste-system, sectarianism, and the social caste-system, which we have either learned or inherited from the Hindus. This is one of the quiet ways in which conquered nations revenge themselves on their conquerors." (এই দেশে কি ইসলামের অঙ্গাঙ্গিক একত্ব রক্ষিত হইয়াছে ? ভুঁইফোড় ধর্ম্মপ্রচারকের দল কেবল বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায় সৃষ্টি ও স্থাপন করিয়াছে ; ইহারা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া-বিবাদ করে, এবং হিন্দুদের ন্যায় ইহাদের মধ্যে জাতি এবং উপজাতি সমূহও আছে। এই বিষয়ে আমরা হিন্দুকে হার মানাইয়াছি ; আমরা দ্বিগুণ জাতিভেদ পদ্ধতি দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছি : ধর্ম্মগত জাতিভেদ—সাম্প্রদায়িকতা এবং সামাজিক জাতিভেদ—যাহা আমরা হয় হিন্দুদের নিকট হইতে শিখিয়াছি অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রকারের নীরব উপায়েই বিজিত জাতি বিজেতৃগণের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।) (২৫)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

২৫। Sir Md. Iqbal in Hindusthan Review, quoted in C. I. R, 1911, XIV.

ইংলণ্ডের সমরকালীন অর্থনীতি

একালে মহাযুদ্ধগুলি ক্রমশঃই এত বিরাট আকারের হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে তার খরচ মেটাতে যুযুধান দেশগুলি প্রাণান্ত। তার জন্য গভর্ণমেণ্ট দেশের সমস্ত সম্বল সংগ্রহ ও একত্রীভূত করতে বাধ্য। এর ফলে কয়েকটী সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। এই রকম একত্রীকরণের ফলে দেশের যে সম্পদ দেশের লোকের হাতে ছড়িয়ে থাকে যুদ্ধের সময় সেই সম্পদ সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে প্রায়ই দেখা যায় যে সরকার এক শ্রেণীর কাছ হতে অর্থ সংগ্রহ করে আর এক শ্রেণীকে দিচ্ছেন, অর্থবান্‌দের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে যারা যুদ্ধের কাজ করছে তাদের পাওনা মেটানো হচ্ছে। আর যেহেতু এইরকম যুদ্ধের সময় উন্নতিশীল দেশগুলিতে সমস্ত জাতটাই যুদ্ধোদ্যমে মেতে ওঠে, সে কারণে সরকার কি ভাবে টাকা খরচ করলেন তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। প্রথমতঃ, যুদ্ধের সময় অর্থনৈতিক জীবনে সরকারী প্রভাব এত বৃদ্ধি পায় যে সরকার ভুল পদ্ধতিতে টাকা খরচ করলে দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা অনিবার্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমাদের দেশে সম্প্রতি নানারকম আর্থিক গোলমাল দেখা যাচ্ছে তার জন্য সরকারী কুনীতি এবং অক্ষমতা অনেকাংশেই দায়ী। কিন্তু এই সাম্প্রতিক ব্যাপার ছাড়াও এর মধ্যে আরও একটী বিবেচ্য আছে। সরকার কি ভাবে অর্থ সংগ্রহ করছেন এবং অর্থব্যয় করছেন তার উপর শুধু যে সাম্প্রতিক সুবিধা-অসুবিধাই নির্ভর করে তা নয়, ভবিষ্যৎ মঙ্গল-অমঙ্গলও নির্ভর করে। কথাটী অর্থনীতি ছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ, কোন শ্রেণীর কাছ হতে অর্থ সংগৃহীত হল এবং কোন শ্রেণীর স্বার্থে তা ব্যয়িত হল তা হতে শ্রেণী বিপর্যয়ের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। তা ছাড়াও সরকারী নীতির ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংস্থানের যদি পরিবর্তন হয় তাহলেও শ্রেণীবিপর্যয়ের সম্ভাবনা। যেমন দেখা যাচ্ছে, যে ব্যবসাদারেরা ইংলণ্ডে বর্ত্তমানের করভারেও দুর্দ্দণাগ্রস্ত হন নি যদি যুদ্ধোত্তর বহির্বাণিজ্য কমে যায় তাহলে তাঁদেরও দুর্দ্দশা ঘটবে। সুতরাং যুদ্ধকালে সরকারী অর্থনীতির গুরুত্ব খুব বেশী, কারণ তার উপরেই দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বহুল

পরিমাণে নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, গভর্ণমেণ্টের চেহারার তারতম্য অনুসারে ঐ গুরুত্বের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। দেশের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত যোগ যত কম হবে সরকারের পক্ষে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ব্যাপক অনিষ্টসাধন ততই সহজ হবে এবং মঙ্গলসাধন ততই দুরূহ হবে।

ভারতবর্ষের পাশাপাশি ইংলণ্ডের সমরকালীন অর্থনীতি আলোচনা করলে কথাটা বোঝা যায়। ইংলণ্ডের সমরকালীন ব্যয়ের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। সম্প্রতি ভারত সরকার (১) এবং ওদেশের সরকার (২) কর্ত্তৃক এবিষয়ে কতকগুলি কৌতূহলজনক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যুদ্ধকালে যে আর্থিক অসুবিধাগুলি অনিবার্য বলেই ধারণা থাকে, ইংলণ্ডে অনেক সময় সেগুলির হাত হতেও নিষ্কৃতি মিলেছে। যেমন, জিনিষপত্রের দাম বাড়া। ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে আর্থিক মন্ত্রণাদাতার হিসেবে ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হতে ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্যন্ত দাম দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছে—যা ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ১০০·৩ ছিল ১৯৪৩ সালের মার্চ্চে তাই ২২০·১ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইংলণ্ডে দাম ঐ সময়ের মধ্যে ৮৬ হতে ১৪২ হয়েছে—বৃদ্ধির হার অনেক কম। কিন্তু শুধু এইটেই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক জিনিষের গুরুত্ব সমান নয়, খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়লে সমগ্র দেশের যে কষ্ট হবে, বিলাসিতার জিনিষের দাম বাড়লে নিশ্চয়ই তা হবে না। (মনঃকষ্টের কথা বলছি না!) এদেশে দেখা যাচ্ছে যুদ্ধের মধ্যে খাবার জিনিষের দাম ভয়ানক বেড়েছে। খাবার সম্বন্ধে আর্থিক মন্ত্রণাদাতার সংখ্যা ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ১০০·৩ ছিল, গত মার্চ্চ মাসে তা ২৭১·০ এসে দাঁড়িয়েছে। এ অবশ্য সরকারী দামের হিসেবে। বাজারে দাম এর চেয়ে অনেক বেশী। আরও মনে রাখতে হবে, শুধু যে জিনিষের দামই বেড়েছে তা নয়, জিনিষপত্র দুষ্প্রাপ্যও হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডে এ দুটীর কোনোটীই বিশেষ হয় নি। ইকনমিষ্ট পত্রিকার হিসাব (৩) হতে দেখা যায় খুচরা বিক্রির খাদ্যদ্রব্যের দাম

১। Currency & Finance Report of the Reserve Bank of India, 1942-43 দ্রষ্টব্য।

২। An Analysis of the Sources of War Finance and an Estimate of the National Income and Expenditure in 1938, 1940, 1941 and 1942, (C.m.d. 6438, 6d. net) H. M. S. Office.

৩। Economist, March 13, 1943.

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছিল ১০০, ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে তা মাত্র ১১৯ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, জিনিষপত্রের অভাবও বিশেষ ঘটে নি। নীচের হিসেবটী কৌতুকাবহ :—

Average daily value of retail sales and stocks in Great Britain compared with a year ago.

Percentage changes.

	Sales year ended January, 1943	Stocks (at cost) End of January, 1943
Non-food merchandise :—	%	%
Piece goods ...	−0·7	−8·6
Women's wear ...	+0·5	+20·7
Men's & boy's wear ...	−4·8	+2·5
Footwear ...	+3·1	−28·3
Furnishing departments ...	+3·3	+10·1
Hardware ...	−10·8	+6·6
Fancy departments ...	+0·2	+38·1
Sports and travel requisits	−17·3	+29·4
Miscellaneous ...	+6·0	+10·0
Total ...	−0·1	+3·7
Food and Perishables ...	+3·5	+19·0
All departments ...	+1·9	+5·5

দেখা যাচ্ছে, খাবার জিনিষের খুচরা বিকিকিনি বেড়েছে। আর মজুত খাবারের পরিমাণও বেড়েছে। তা ছাড়া, যদিও পুরুষরা এবং ছেলেরা জামা-কাপড় কম পরছে, মেয়েদের পোষাক বেড়েই চলেছে, ফ্যান্সি জিনিষের বিক্রিও কমে নি! এরকম সৌভাগ্য আমাদের দেশে এখন কল্পনার অতীত। খাবার জিনিষের দাম যেরকম বেড়েছে এবং জিনিষ পাওয়া যেরকম দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে তাতে প্রাণধারণই অনেক সময় কঠিন হয়ে উঠেছে—শখের জিনিষ কেনা দূরের কথা। অবশ্য দু চারজন অর্থবানদের কথা বলছি না।

এই ব্যাপারটী কি করে ইংলণ্ডে সম্ভব হলো অনুসন্ধান করলে জানা যায় সরকারী আর্থিক নীতিই এর প্রধান কারণ। ওদেশী সরকার যে সব তথ্য প্রকাশ করেছেন তা হতে দেখা যাচ্ছে যে বেসরকারী সুখ সুবিধা কিছু কমেছে বটে, কিন্তু বেশী কমে নি তার কারণ সরকার অন্যান্য দিক্ থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ করছেন। বিদেশে যে সমস্ত টাকা লগ্নী ছিল, যে সমস্ত মূলধনের কার-বার ছিল, সেই টাকা বা মূলধন হতে খরচ সংগ্রহ এর অন্যতম পদ্ধতি। দেশের মধ্যের মূলধনও অনেক সময় খরচ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার পুনঃ পূরণ হচ্ছে না। এক্ষেত্রে অবশ্য অভিযোগ করা চলে, দেশের স্থায়ী এবং বড় সম্বলগুলি খরচ করে দেশের লোকদের আপাত-কষ্টের হাত থেকে কিছু রেহাই দেওয়ার প্রকৃত সার্থকতা কি? সেখানে ইংলণ্ডের ধারণা সম্ভবতঃ এই যে, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সময় তার কিছু স্থায়ী ক্ষতি যদি বা হয় তার নতুন জিনিষ তৈরী করার ক্ষমতা ও সুযোগ থাকার ফলে সে ক্ষতি অনেকটা পূরণ হবে,—আর যদি সুবিধেমত পুনর্গঠন পরিকল্পনা সম্ভব হয় তাহলে তার মধ্য দিয়ে আমেরিকা ও ইংলণ্ড জগতের বাণিজ্য ভাগাভাগি করে নেবে। সম্প্রতি মুদ্রানীতি সম্বন্ধে 'ব্যাঙ্কার' ও 'ইউনিটাস' নামে যে দুটী পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যেও এর আভাস আছে। কিন্তু সে কথা এখানে আলোচ্য নয়। এখানে লক্ষ্য করার কথা, ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ দেশের সাধারণ লোকের উপর কতটুকু ভার চাপিয়েছেন; অর্থাৎ ধনিকেরা জনসাধারণের উপর কতটা চাপ দিতে সাহস করেছেন এবং কতটুকু চাপ নিজেরা নিতে বাধ্য হয়েছেন। নীচের হিসেব থেকে তার একটা আন্দাজ মেলে :—

	১৯৩৮ সালের পাউণ্ডের হিসেবে (দশলক্ষ পাউণ্ড)	শতকরা হিসেব
১৯৪২ সালে যুদ্ধের খরচ (অর্থাৎ সরকারী খরচের বৃদ্ধির পরিমাণ)	২৭০০	১০০%
সেই খরচ কোথা হতে সংগৃহীত :—		
উৎপাদন বৃদ্ধি	১১১৩	৪১·০২%
জনসাধারণের ব্যবহৃত জিনিষপত্রের কমতি ...	৬২৭	২৩·০২%
আভ্যন্তরীণ মূলধনের ক্ষয় পরিপূরণে ঘাটতি ...	৫৩০	১৯·৬৩%
বিদেশে নিযুক্ত মূলধনের ক্ষয় ...	৪৩০	১৫·৯২%
...	২৭০০	৯৯·৫৯%

মোটামুটি শেষ দুটীর চাপ ধনিকদের উপরে এবং দ্বিতীয়টীর চাপ বেশীর ভাগই জনসাধারণের উপর, এরকম সিদ্ধান্ত করলে দেখা যায় এবার ধনিকদের ঘাড়েই চাপ বেশী। অবশ্য এ হিসেব এত সহজ নয়, এর মধ্যে আরও নানা জিনিষ বিচার্য, তবুও মোটামুটি আন্দাজে দেখা যাচ্ছে জনসাধারণের উপরই সব প্রধান চাপ দেওয়া এবার সম্ভব হয় নি।

উক্ত সিদ্ধান্তের আরও কয়েকটী প্রমাণ আছে। কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত একটী পুস্তকে (৪) যে সংখ্যাগুলি সংকলিত হয়েছে তা হতে দেখা যায় অর্থ ও দেশে এখন অনর্থেরই মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন না বেশী টাকা রোজগার হলেই বেশী ট্যাকস দিতে হচ্ছে। সম্প্রতি ওদেশে সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ করের পরিমাণ খুব বেড়েছে। যাঁদের আয় ৫০,০০০ পাউণ্ড ১৯০০-৪ সালে তাঁদের সাক্ষাৎ এবং অসাক্ষাৎ কর মিলিয়ে আয়ের শতকরা ৪·৮% ভাগ দিতে হতো, ১৯১৮-১৯ সালে সেটী দাঁড়ায় শতকরা ৫০·৬% ভাগ। আর ১৯৪১-৪২ সালে সেটী দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯০·৭%। অর্থাৎ ৫০,০০০ পাউণ্ড আয় হলে এখন ৪,৫০০ পাউণ্ডের বেশী থাকে না। এটীও অবশ্য স্বকৃত উপার্জনের বেলায়। ঐ আয় যদি স্বকৃত উপার্জনের ফল না হয় তাহলে ট্যাক্সের হার অনেক বেশী, সেক্ষেত্রে ৫০,০০০ পাউণ্ডের বেশী আর কিছু থাকে না। অথচ যাঁদের আয় বছরে মাত্র ২০০ পাউণ্ড তাঁদের সাক্ষাৎ এবং অসাক্ষাৎ কর মিলিয়েও ১৯৪১-৪২ সালে আয়ের শতকরা ১৪·৮% অংশের বেশী দিতে হয় নি। বৃটিশ প্রগতি-বাদীরা (অন্য কেউ নয়) বলবেন, সোস্যালিজমের আর বাকী কি, মিছে বিপ্লবের বুলি ছেড়ে এইরকম কেজো সোস্যালিজম করলেই জগৎ উদ্ধার হয়ে যাবে! ঠাট্টা থাক, কিন্তু ধনিকতন্ত্রের মুখ্য কুলীনের বংশে এইরকম মেল ভাঙবে এ কি কোনও ঘটকে ভেবেছিল? এখন দায়ে পড়ে ঐ দুই শ্রেণীর অসবর্ণ বিবাহ এঁদের গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে, কালক্রমে হয়তো দেখা যাবে চাকা ঘুরেছে এবং চণ্ডালরাই দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে!

কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। আপাততঃ ইংলণ্ডে যে সব লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে তার কোনও সন্ধান নেই, বরং তার বিপরীত লক্ষণগুলিই

৪। Shirras & Rostas: The Burden of British Taxation, Cambridge University Press.

প্রবল হয়ে উঠছে। অন্যত্র বলবার চেষ্টা করেছি (৫) যে ভারতের সমরকালীন আর্থিক নীতির বিশেষত্বই এই যে তার প্রধান চাপ প্রধানদের উপর না পড়ে অপ্রধানদের উপরেই বেশী পড়েছে। সাধারণ লোকের কষ্ট আপেক্ষিক হিসেবে অত্যন্ত বেশী। ইংলণ্ডে ঠিক এর উলটো। অবশ্য এ হতে যেন কেউ মনে না করেন যে ইংলণ্ড বর্তমান ভূ-স্বর্গ। এমন দেশ আরও আছে, (যথা আমেরিকা) যার সঙ্গে তুলনায় ইংলণ্ডের খ্যাতিপ্রতিপত্তি ম্লান হয়ে আসে। কিন্তু চাঁদের জন্য উদ্বাহু আপাততঃ হচ্ছি নে। যে নীতি ইংলণ্ডে চলতে পারে সে নীতি ইংলণ্ডের জমিদারীতে অচল এই কঠোর সত্যটা আমাদের আশাবাদীদের আর একবার মনে করিয়ে দেবার দরকার ঘটেছে। যদি কেউ বলেন দুয়ের অবস্থা এক নয়, তখন আমাদের অবস্থা এরকম থাকার কারণ কি সেই প্রশ্নই তুলতে হয়। এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের আর্থিক সম্বন্ধ কি তার আলোচনা দরকার। আর সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের অন্য জমিদারীর সঙ্গে ভারতবর্ষের অবস্থার তুলনা করলে ব্যাপারটী আরও স্পষ্ট হয়। ভবিষ্যতে এই দ্বিবিধ আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

বিমলচন্দ্র সিংহ

৫। ক্যালকাটা রিভিয়ু-র ১৯৪৩ সালের জুন সংখ্যায় War Finance, Inflation and the Economic Structure: the Indian Case প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রাসঙ্গিক

সাহিত্য মানুষের কোন্ প্রয়োজনে লাগে, আমার এক উগ্রপন্থী রাজনৈতিক বন্ধু সেদিন তর্ক প্রসঙ্গে আমাকে এই চূড়ান্ত প্রশ্ন ক'রে কোণ ঠাসা করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সজ্ঞানে কি অজ্ঞানে কোনোভাবেই আমি তাঁকে এমন মনে করবার সুযোগ দেই নি যে রাজনীতি সাহিত্যের চেয়ে হেয়, কিম্বা সাহিত্যিকের মর্য্যাদা রাষ্ট্রনায়কের চেয়ে বেশী। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন এই-ভাবে উত্যক্ত হলাম, তখন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বলতেই হ'ল, মানুষের যে অংশটা পশুর থেকে পৃথক এবং বড়, সাহিত্যের কারবার সেই মহল নিয়ে; সুতরাং আহার নিদ্রা ইত্যাদি জৈবিক প্রয়োজনই যদি মানুষের একমাত্র তাগিদ না হয় তবে সাহিত্যের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী।

আমার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক চেতনায় যত বিজ্ঞানপন্থীই হন, মনে মনে মানুষটি ছিলেন রীতিমত সেকেলে এবং সেই কারণে সংস্কারবদ্ধ জীব। তাই এতবড় একটা উচ্চাঙ্গের প্রত্যুত্তরে হেটমুণ্ড হ'তে বাধ্য হ'লেন। সম্মুখ যুদ্ধে সেদিনের মত আমিই বিজয়ী হ'য়ে ঘরে ফিরলাম।

কিন্তু মনে শান্তি নেই। আসল যুদ্ধ শুরু হ'ল সেইখান থেকে। কারণ শুধু যদি মানবতা বা রসবোধের লালন ও উন্নতিবিধানই সাহিত্যের প্রকৃত উপকারিতা হয় তবে স্বীকার করতেই হবে, এ যুগে তার প্রয়োজন রীতিমত সঙ্কুচিত হ'য়ে গেছে। প্রথমত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখার এত বেশী অবলম্বন আজকাল মানুষ জন্মাবার পর থেকেই পায় যে, মনের পরিপুষ্টির জন্য এখন সাহিত্যকে গৌণ ক'রেও এই বিরাট সংসার-অরণ্যে কোনো-না-কোনো ডালে সে আশ্রয় পায়ই, একেবারে সর্প ও কণ্টক সঙ্কুল ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয় না। আর দ্বিতীয়ত, যেকালে জীবনরক্ষার তাগিদেই বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম সময় ব্যাপৃত হ'য়ে থাকে, এবং ক্রমাগত পাশ কাটিয়েও পায়ের নিচের টলায়মান ধরণীর চিড়লাগা হাঁ-গুলো থেকে আত্মরক্ষা করা কঠিন হ'য়ে ওঠে, তখন মানবতা কি রসবোধের কথাটা শেষ পর্য্যন্ত নিছক রসিকতারই সামিল, তাতে মানবতার কিছুমাত্র পরিচয় মেলে না।

তবে কি মেনে নিতে হবে, সাহিত্য মানুষের কোনোই প্রয়োজনে লাগে না—শুধু খেয়ালখুশির উপকরণ মাত্র? না, তা নয়। তবে উক্ত আততায়ী বন্ধুকে যে উত্তরজালে ব্যাহত করেছিলাম, তার ভাবে ও ভাষায় কিছু গলদ ছিল, সেইজন্যই এই বিপাক। কারণ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করবার জন্য আবেগের তাড়নায় আশ্রয় নিয়েছিলাম নীতিবোধের চূড়ায়, ভালোমন্দের গোলকধাঁধায়—যার মূল্যজ্ঞান আপেক্ষিক ও চিরপরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু তা না ক'রে যদি মাটির পৃথিবীতে নেমে রাজনীতির আসল ঘাঁটি মানব জীবনের ভৌতিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের মানদণ্ডকেই সাহিত্যের রাজদণ্ড ব'লে মেনে নিতাম তবে এই মানসিক তর্কগতি কেবলমাত্র চক্রগতিতে আত্মনির্য্যাতন করত না।

অবশ্য, এইখানে আর একদল বন্ধু বিলক্ষণ অস্বস্তিবোধ করতে সুরু করেছেন বুঝতে পারছি। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে প্রপাগাণ্ডা আদৌ সৎসাহিত্য হতে পারে। এক্ষেত্রে আসল আপত্তিটা স্পষ্টতই সৎসাহিত্য হওয়া এবং না হওয়া নিয়ে অর্থাৎ মাপকাঠি হ'চ্ছে রসোত্তীর্ণতা। আমার নিজের তাতে কোনো অসম্মতি নেই; বরং কবুল ক'রে বলাই ভাল এই বিষয়ে আমিও তাঁদের সঙ্গে ঘোরতর একমত। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমি জুড়ে দিতে চাই, রসোত্তীর্ণ হ'লে প্রপাগাণ্ডাও রীতিমত সৎসাহিত্য বলে নাম কিনতে পারে। কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যুগ এবং দেশ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর রসস্রষ্টাই কিছু না কিছু প্রচার করতে চান,—তদানীন্তন সমাজব্যবস্থা, ঐতিহাসিক ঘটনা বা জাতীয় প্রবণতাগুলির আন্তরিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মধ্যে ধরা পড়ে তাঁদের সমালোচনার ইঙ্গিত, অর্থাৎ বর্ত্তমানের বিচারে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। বাল্মিকী, হোমার থেকে শেকস্‌পীয়র, কালিদাস, মায় রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, কেউই এ তালিকা থেকে বাদ যান না। আর এইটেই অনিবার্য্য, নতুবা একটা সাহিত্য দিয়েই বা একটা জাতির ইতিহাস তৈরী করতে পারি আমরা কোন ভরসায়? এবং তার ভবিষ্যৎ-কেই বা আন্দাজ করতে পারি কেমন ক'রে?

সুতরাং প্রচারকর্ম্মের বাহন হওয়া সাহিত্যের পক্ষে তো অগৌরবের নয়ই, বরং যে সাহিত্যের মধ্যে কোনো সন্দর্ভের সন্ধান না মেলে এবং যে

সাহিত্যিকের মধ্যে তদানীন্তন পারিপার্শ্বিকের প্রতি সজাগ বৃত্তির পরিচয় অনুপস্থিত থাকে, সে সাহিত্য বা সে সাহিত্যিক নিশ্চয়ই অসার্থক।

এক কথায়, সাহিত্য ভাল করতে বাঁচতে শেখায়, তাই সাহিত্য মানুষের অপ্রয়োজনীয় নয়। জীবনের সঙ্গে তার নাড়ীর সম্বন্ধ, জীবনের পরিপূর্ণতায় তার সার্থকতা।

—পরীক্ষিৎ—

কোন নায়িকার প্রতি

জনতার মাঝে তোমাকে পেয়েছি একা,
এ কী শালীনতা এনেছ তোমার মনে!
আত্মাকে খোঁজো, তবু পেয়েছ কি দেখা
আত্মীয় কোনো, জনতার এ গহনে?
আমি জানি দূরে রয়েছে বালুর চর,
তোমার এ পথ নিয়ে যাবে কোন্ কূপে।
যদিও পেয়েছ নির্ভীক স্বাক্ষর
কোনো হৃদয়ের, দেহাতীত কোনো রূপে।
চলে এসো আজ শত-পথ-সঙ্গমে
প্রাণ-সম্মত জৈব উপনিবেশে।
আমাকেও পাবে সঙ্গীর অঙ্গনে
কর্ম্মে ঘর্ম্মে দৃপ্ত দীপ্ত বেশে।
প্রাণ সমুদ্র ডাকে মরুদ্বীপচারিণী
ফিরায়ো না মুখ, জনগণমনোহারিণী॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

পুস্তক-পরিচয়

সমসাময়িক কবিতায় প্রতিক্রিয়া ও প্রগতি

THE WELL OF THE PEOPLE. ভারতী সারাবাই।
প্রকাশক: বিশ্বভারতী। দাম ২৲ টাকা।

এই শারাদ্ জাতীয় রচনাটির সমস্যা-গ্রাফের রেখা দুটি: মানুষের ভেতরে বর্ণগত ব্যবহার বৈষম্য, আর আনুষ্ঠানিক বিধিনিষেধে স্বার্থ-অতিরিক্ত কল্যাণবোধের বিকার। যে আদর্শের নির্দেশে এ রেখা দুইটির সংযোগ-বিন্দু বিলম্বিত হয়েছে তার মূল কথা হ'ল, প্রীতির দ্বারা বিভেদকে অস্বীকার করে মানুষের সেবার ভেতরেই এই বৈষম্যের বিনাশ, বিকারের বিয়োগ; তার ভেতরেই মানুষ নিজের কল্যাণ খুঁজে পাবে। বিশ্লেষণী বিচারের মার্গে নেতি নেতি; মানুষের মুখোমুখি হয়ে বুদ্ধির তুঙ্গ স্বাতন্ত্র্য গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে ভেঙে যায়।

The single human face fits no theory
Hard to face the simple fact face to face.
Your spirit is eddy-split but a dying woman
Cannot wait—cannot wait your reason's gradual
Compulsory eliminations, for your nice—
Filtered decision. (পৃঃ ৪৫)

অপরপক্ষে ধর্ম-তীর্থ-শাস্ত্র-অনুষ্ঠানে সত্যের সন্ধান মেলেনা: যে চেতন সে তাই শুনতে পায়:.

Why do you go to Kasi, to Haridwar, O my soul when I am within? (পৃঃ ২২)

এই পরিকল্পনাটিকে রূপ দেবার জন্য শ্রীমতী সারাবাই হরিজনে প্রকাশিত একটি ঘটনাকে গল্প হিসেবে ব্যবহার করেছেন। একটি গ্রাম্য সম্বলহীনা ব্রাহ্মণ বৃদ্ধা চরকা কেটে দৈনিক চার আনা রোজগার করত। তার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বারাণসীতে তীর্থ করতে যায়, কিন্তু কেউ তাকে সাথে করে নিয়ে গেল না। তখন তার ধর্মবোধ মোড় ঘুরল নিজের গ্রামের দরিদ্র সাধারণের সেবায়, তার তীর্থ রূপ নিল সমাজ-পরিত্যক্ত হরিজনদের জন্য একটি কূপ খোঁড়ার প্রচেষ্টায়। প্রকাশক জানাচ্ছেন, সেই গ্রামে আজ সেই কূপ নির্মিত হয়েছে, খরচা পড়েছে একশ' পঞ্চাশ টাকা।

রচনাটির ভেতরে এই আখ্যায়িকা বৃদ্ধার পরিচয়প্রসঙ্গে গ্রাম্য তীর্থ-যাত্রীদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। পেছনে আছে কুম্ভমেলার সময়কার হরিদ্বার, মানুষের নিঃশ্বাসে গাঢ় বাতাস, ভয়ঙ্কর পিঙ্গল শ্মশ্রুর সারি, পঞ্জাব হতে আসা যুবতী জননীরা পথের ধারে উদাস মনে ব'সে গলা-নামান কলসির মত নিঃশেষে ঢালছে তাদের বুক তাদের ভেলভেট-কোমর ছেলেদের মুখে—শুভ মুহূর্তে জলে ডুব দিচ্ছে যাত্রীরা, আর মেয়েদের লাল সাড়ী আর লাল সিঁথির আর ঢিলে নীবিবন্ধের ওপরে রূপোলি চাঁদ উঠবে—এই পরিপূর্ণ সার্থকতার ছবির ওপরে চেতন-কল্পনায় নেমে এসেছে সেই ব্যর্থকাম বৃদ্ধার ছায়া।

Fixed in aloofness she is—an aged woman
Holding her own in day's trumpeting crowds,
Herself an island truncated and edged
By blinding forks of pilgrim torrents,
She is by night a pebble forgotten, safe,
Left on the side. (পৃঃ ১৩)

ধীরে ধীরে এই ছায়া তার একান্ত সত্যে অনিবার্য হয়ে উঠল, তার অস্তিত্ব রূপান্তর ঘটাল তীর্থের, যে মূক ভারতধর্ম বিভেদ বিচারের ভেতরে চাপা পড়েছিল, এই সহায় সম্বলহীনা বৃদ্ধার ভেতরে তা' প্রকাশ পেল।

আখ্যায়িকাটির ঘটনাগত কোন গতি নেই। তীর্থাগত কৃষক-মজুর ঘরের মিলিত প্রশ্নের সিল্যুট পড়েছে কুম্ভমেলার তিনটি আগন্তুকের বোধে। হিমালয়ের বিশাল বুকে গঙ্গার মুক্ত স্রোতে চেতন-বিচিত্রা দেখেছে সেই নিঃসম্বলা বৃদ্ধার তীর্থযাত্রী আত্মা। পথচারী নৃত্যের ছন্দে অর্থ অলঙ্কার- সন্তান জীবন সবকিছু সঙ্কীর্ণ মোহ শক্তিহীন। তবু এদের ফিরতে হবে তীর্থ শেষে তাদের সেই সঙ্কীর্ণ গ্রাম বা কুঁড়ে ঘরের জীবনযাত্রায়। চেতনের ভাববিলাসী মনে প্রশ্ন ওঠে :

And I saw them return from Haridwar,
And I cried, God, how can they bear it,
This fine elation from the far pilgrimage ?
For when they came back, it was blindingly clear

The slums, the village hovels, had not changed
And would not change. From the myriad year
Sojourn to drop sheer on this age, this here.
God, what a bang, what a bargain !

পরের দৃশ্যে কোন দূর পূর্বভারতীয় গ্রামে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক রূপে কাজ করতে করতে চেতন-বিচিত্রা-সনাতন এ প্রশ্নের জবাব পায়। চাষীদের কাছে তারা শুনতে পায় গ্রাম্য জীবনের নিষ্ঠুর ইতিবৃত্ত, চাষীর জীবন কথা :

If he's not there, he's pot-bellied;
Generations crushed him, bullied
Helpless in his mother's stomach.
You saw him gasp, dazed at the luck.
Which came not his way ; saw him break
Like blades of flower before a mower.

নিষ্ঠুর নিয়তির সামনে চাষীদের অপরিসীম ধৈর্যে চেতনের বিদ্রোহ ফেটে পড়ে। কর্মবাদের বিশ্বাস তাদের আত্মাকে নির্বীর্য করেছে ; যখন অনেক বলি পেয়ে অবশেষে দেবতার দান-বর্ষা নেমে আসে তখন চাষীর ধানের ক্ষেত বিধ্বস্ত হয়ে জেগে ওঠে ধনীর বিলাস-সরোবর আর উদ্যান !

I damned, I damned
Your anger slow to blaze.

মূক চাষীরা অবতারের প্রতীক্ষা করে, উদারপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতায় তারা ভাঙে না, গান্ধির স্বপ্নবিদ্রোহে তারা নিজেদের সত্তার সন্ধান পায়। সেই আত্ম-আবিষ্কারের অন্যতম ফুল এই সহায়সম্বলহীনা বৃদ্ধার কূপ খননের সার্থক প্রয়াস। সে হরিদ্বারে যেতে পারেনি, বারাণসীর স্বর্ণপ্রাকারে সে পৌঁছাতে পারল না : আজ সে তার সামান্য সামর্থ্য আর পথযাত্রী আত্মা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সবার সামনে সেই কূপ খননে সাহায্য পাবার আশায়, যেখানে বঞ্চিত ভারতের হরিজন সবার সাথে জলপানের সমান অধিকার পাবে। ভারতের তারুণ্যশক্তির সামনে বঞ্চিত ভারতের প্রতীক এই বৃদ্ধা হাত পেতেছে :

Would you make me wait ? Wait ? How can I wait ?

সে আবেদনের সামনে চেতনের বিশ্লেষণ-বিলাসী মাথা নীচু করল, মেনে নিল সে তার দায়িত্ব, দীক্ষা নিল মানবতার ধর্মে।

শ্রীমতী সারাবাইয়ের রচনায় পরিবেশ-সৃষ্টি দক্ষতার পরিচায়ক। কিন্তু সমস্যা ও আদর্শের কাঠামো নিতান্ত দুর্বল। গান্ধিবাদের সমাজতান্ত্রিক বিচার ছেড়ে দিলেও পরিকল্পনাগত যে ত্রুটী চোখে পড়ে সেটি হল এই যে মূক ভারতের বেদনার সাথে এই পথযাত্রী মানবতা নিতান্তই সমান্তরাল। পাঠান মহাজন, জমীদার আর ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর শোষণ (যার কথা চাষীদের কোরাস উল্লেখ করেছে, পৃঃ ২৪-২৫) 'আত্মানং বিদ্ধির' বিধানে অতিক্রম করা যায় না, না আছে তার কোন স্থায়ী সমাধান ব্যক্তিনির্ভর মানবতায়। শ্রীমতী সারাবাইয়ের রচনায় তাই গতির অবশ্যম্ভাবিত্ব নেই, আছে ব্যক্তিচেতনায় নিষ্ক্রিয় বোধের বিকাশ। ঘটনার দ্বারা কাঠামোর সত্যতার প্রমাণ হয় নি, পরিবেশ সৃষ্টি দিয়ে অবিশ্বাসকে মুক্ত করার প্রয়াস আছে। জ্যাকেটে ছাপান প্রশংসাপত্রগুলো তাই ব্যঞ্জনা, আবহাওয়া-সৃষ্টি, বর্ণবৈচিত্র্যের উল্লেখে মুখর। কিন্তু ভাববস্তুর সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ রইল।

শ্রীমতী সারাবাই-এর রচনার ঢং চমৎকার, ধ্বনির কান বিস্ময়কর, আঙ্গিকে প্রতীকী নাট্যের রীতি অনুসৃত হয়েছে। জ্যাকেটের ওপরের ছবিখানি মূল বক্তব্যকে ফুটিয়েছে। মোটের ওপর বলতে পারি এ যুদ্ধের বাজারেও নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বইখানি কিনে পড়বার মত: এমন কি যাঁরা আমার মতই লেখিকার মূল বক্তব্যের সাথে একমত নন তাঁরাও বইখানি পড়ে আনন্দ পাবেন

শিবনারায়ণ রায়

পূর্বলেখ—বিষ্ণু দে। কবিতাভবন। দাম—এক টাকা বারো আনা।

রবীন্দ্রনাথের পর সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের চাপে কবিতার ধর্ম্মান্তর ও রূপান্তর ঘটেছে, এ তথ্য একাধিক বিদগ্ধজনের রচনাপ্রসাদে আমরা জানতে পেরেছি। তারপর বণিকসভ্যতার ঔপনিবেশিক অসম্পূর্ণতা ও অবক্ষয়ের জরাজীর্ণ গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে কী ক'রে ক্রমজাগ্রত সমাজ-

চৈতন্যের ইঙ্গিতে ধীরে ধীরে কাব্যের মধ্যে একটি আশা আশঙ্কায় ভরা আদর্শ-নিষ্ঠ বলিষ্ঠতার উদ্ভব হয়েছে তারও ধারা অন্বেষণ একাধিক সত্যসন্ধানী করেছেন। এবং সম্প্রতি কয়েক বছর হ'ল শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সাহিত্যরসিক-দের মধ্যে এমর্য্যাদা সাধারণস্বীকৃতি লাভ করেছে যে এই নতুন কাব্যাদর্শের নির্ম্মাতাগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে একজন প্রধান কর্ম্মী।

তিনি সদাপরিবর্ত্তনশীল, অথচ নিজের পূর্বতন অস্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য নষ্ট করেন নি। পুরাতনকে চিরনতুন রাখার যে যাদু কবিসুলভ, বিষ্ণু দে সেখানে সর্বগ। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিও ভাবগত নবনবোন্মেষের বিস্ময়কর প্রতি-ভার পরিচয় দিয়ে চলেছে। নিজের স্বভাব অক্ষুণ্ণ রেখে কালধর্ম্মকে কাব্যে প্রতিফলিত করার দুঃসাধ্য সাধনা বিষ্ণু দে-র বেলায় এত সহজ মনে হয় যে নিরপেক্ষ স্বাভাবিক কবিত্বের স্থলে যখন তিনি দস্তুরমত কোনো একটি মত-বাদের সমর্থক হ'য়ে লেখনী গ্রহণ করলেন, তখনও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হ'ল না। মনে হ'ল, এই তো স্বাভাবিক পরিণতি! 'উর্ব্বশী ও আর্টেমিস্'-এ মোটামুটি যে বিদ্রোহ কাব্যধর্ম্মী, 'চোরাবালি'-তে তার জ্বালা সামাজিক তুচ্ছতাচিত্রণে তীক্ষ্ণ, কখনও আত্মকরুণায় অস্থির, কিন্তু 'পূর্বলেখ' অনেক শান্ত, 'শিখণ্ডীর গান' ও নাগরিক সুরেশ-অলকার দুষ্টচক্র থেকে কবির মন বরং সহরতলীর কারখানা ও আরো দূরের খনিক্ষেতখামারের দিকেই বেশী আকৃষ্ট,—মোটামুটি একটা আস্থারও বর্দ্ধিষ্ণু আভাস লক্ষ্য করা যায়; '২২-শে জুন' মুক্তকণ্ঠ, স্বনামপ্রতিষ্ঠ।

এ বিশ্লেষণ কেবল কাব্যের নয়, ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাসও বটে। কাব্যের মতই কবির ব্যক্তিসত্তাও আজ পূর্ণাঙ্গ। আমার কাছে এই ব্যগ্রবাহু অন্বেষণের তাগিদ এবং সে তাগিদে দীর্ঘ পথ অতিক্রমের ক্লেশস্বীকার, তারপর বাঞ্ছিতলাভের প্রক্রিয়াটি প্রায় ঈশ্বর অন্বেষণের মতই গম্ভীর ও পবিত্র বলে মনে হয়

যাঁরা বিষ্ণু দে-র কবিতা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর বাক্যরচনার ঢংটি ঠিক আমাদের মুখের ভাষার অনুরূপ নয়।

আধুনিক আরো দুএকজন কবির রচনাতেও আমরা বাক্যরচনার কিছু ভিন্ন সুরের আভাষ পাই। কিন্তু একমাত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া

তাঁদের প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর বিদেশীয় Syntax-কে বাঙলায় সুসমঞ্জস ক'রে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করেছেন। এ দলের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক উদাহরণ শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু বিষ্ণু দে-র বৈচিত্র্য বলা যায়, এদিক থেকে নিতান্তই বঙ্গজ,—বাঙালী ঐতিহ্যপুষ্ট। মনে রাখা দরকার, আমি এ যাবৎ কেবল বাক্যবিন্যাসের কথাই বলছি, তাও প্রায় ৪৭./· ভাগ ব্যতিক্রম বাদ দিয়েই। সুতরাং শব্দপরম্পরাযোগের য়ুরোপীয় প্রতীকী দুর্ব্বোধ্যতা বা উপমাবিরলতা ও উৎপ্রেক্ষাপ্রাধান্য ইত্যাদির কথা তুলে আশা করি কেউ আমাকে লজ্জিত করবেন না।

বলাবাহুল্য, বাক্যনির্ম্মাণের এই বাঙালী ঐতিহ্যের অনুসরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দনির্ভর, কারণ বাক্যের কাঠামোই হ'চ্ছে শব্দ। তাই বিষ্ণু দের Syntactical রকমফেরও প্রাকরবীন্দ্র যুগের প্রচলিত শব্দাবলীর আকস্মিক প্রয়োগের অভিভাব (association) থেকেই উৎপন্ন। কয়েটা দৃষ্টান্ত দিই। বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব না, কারণ style আসলে লেখকেরই বাণীরূপ, তাকে ব্যাখ্যা করা হাস্যকর।—

১। হিরণ মধ্যাহ্নে যদি খুঁজে পাই সোনা,
গায়ত্রী স্মরণ ক'রে ভরি তবে ঝুলি।

(টিপ্পনী : 'যদি' আর 'তবে' কথা দুটির ব্যবহায় লক্ষ্যণীয়।)

২। বিধি বিরূপাক্ষ হ'লে কি থাকে কাণার ?

(টিপ্পনী : উপমা প্রয়োগ ও জিজ্ঞাসা করার দেশজ ঢং।)

৩। লাগে বুঝি উচ্চে নিচে সজ্ঘর্ষ টঙ্কার !
জলস্থল দ্বন্দ্বে মাতে বাদীপ্রতিবাদী।

(টিপ্পনী : উপমা আর পয়ারের চাল যুগপৎ কাশীরাম দাস ও মুকুন্দরামের স্মারক।)

৪। মাতলির বেগে আসে শিরস্ত্রাণ মেঘ।

(টিপ্পনী : মাতলির উপমা কৃত্তিবাসের অনুষঙ্গ আনে। 'শিরস্ত্রাণ' কথার প্রয়োগও অপ্রচলিত অর্থে। অন্যত্র 'অত্যন্ত মাথুর' এই বাক্যদ্বয়ের 'অত্যন্ত' শব্দের অর্থও সাংখ্য ঘেঁষা। এ সব প্রয়োগচাতুর্য্যে মনে পড়ে সুধীন্দ্র দত্তের 'অনেকান্ত সঙ্গতি'র কথা, যে 'অনেকান্ত' শেষ পর্য্যন্ত 'একান্ত' শব্দেরও মৌলিক অর্থ নিয়ে মাথা ঘামাতে বাধ্য করে।)

৫। সহে না দুর্বহ এই নিঃসঙ্গ মাথুরে।
বুঝি বা ভূকম্পে আসে কংসের স্যন্দন।

(টিপ্পনী : 'সহেনা' আর 'বুঝি বা'-র সহজ প্রয়োগ অত্যন্ত সবল; 'সহে না' কীর্ত্তনীয়ার সারল্যদ্যোতক।)

৬। নিঃসঙ্গের অনুচর স্বপ্নজাগানিয়া
ঈশ্বর পাকড়ি, যদি পাই পাপক্ষয়ে।

(টিপ্পনী : 'ঈশ্বর পাকড়ি' অত্যন্ত চেনা, মঙ্গল কাব্যের কথা মনে আনে। 'বিভীষণের গান'-এও 'সসাগর পিতারেই পাকড়ি' বাক্যে 'পাকড়ি' আশ্চর্য্য অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেছে।)

৭। দলে দলে চলে, যেন পালায় সওয়ার।

(টিপ্পনী : উপমা নিখুঁত কাশীরাম দাসী। অন্যত্র 'দলে দলে'র বদলে 'কাতারে কাতারে'র প্রয়োগ আছে। এ কথা দুটি আরো বেশী আবহবর্দ্ধক।)

৮। বজ্রপাণি উদাসীন,
স্বয়ম্বশ অমরার শাতকম্ভ ফরাসে আসীন।
দয়াহীন ইরম্মদ ! ... ...
... ... সম্বরো সম্বরো পুরোভাগ
হে পূষণ ! বধো বৃত্রে বধো শাত্র বিশ্বলোপ হয়,
দম্ভোলি নিক্ষেপি বধো, গ্রীষ্মের পৈশুন্য নাহি সয়।
কালিদাসী স্বর্ণযুগ জীয়াইয়া আতাম্র সহরে ... ...

(টিপ্পনীর : মধুসূদনের কথা প্রথমেই মনে পড়ে।—'ইরম্মদ' আর 'দম্ভোলি' তো আছেই, 'জীয়াইয়া' 'নাহি সয়'গুলিও কম প্রাচীনগন্ধী নয়। তাছাড়া সমস্ত বাক্যবিন্যাসটির আবেগও অমিত্রাক্ষর কৃষ্টির সহচর। 'ফরাস' কথাটি সমগ্র স্বর্গের দেবসভায় মোঘলযুগের বাদশাহ্‌দের দরবারের আবহ আরোপ করেছে।)

৯। তবু চিত্ত মম চিত্তে মুমূর্ষায় করিল প্রয়াণ।

(টিপ্পনি : 'তবু' ও 'করিল প্রয়াণ' আশ্চর্য্য অনাড়ম্বর, অথচ চূড়ান্ত ব্যঞ্জনাময়। সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্র সেনের 'তবু ভরিল না চিত্ত' পর্য্যন্ত মনে পড়ে।)

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা। আমি আলোচনার অনুরোধে এই বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতিতে বিষ্ণু দে-র ঐতিহ্যবোধের প্রমাণ দিচ্ছি ব'লে কেউ যেন আবার এমন-

তর মনে ক'রে বসবেন না, বিষ্ণু দের কবিতায় এগুলি সঙ্গতিহীন বা প্রক্ষিপ্ত-ভাবে আছে। বরং যাঁরা বিশেষভাবে খুঁটিয়ে না পড়বেন তাঁদের কাছে এই রকমই মনে হবে, এগুলি বিষ্ণু দে-র একেবারে স্বজাত অভিব্যক্তি, এতই স্বাভাবিকভাবে খাপ খেয়ে আছে এই ঢঙটি। তাছাড়া কবির মনের আবেগ-উত্তাপও এত তীব্র যে তা কেবল এই সব প্রাচীন কবিদেরই নয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চিত্র ও পংক্তিকে পর্য্যন্ত অনায়াসে কবিতার মধ্যে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। এ বইতে তার যথেষ্ট উদাহরণই মিলবে।

বাক্যের বলিষ্ঠতা আনতে বিষ্ণু দে সর্ব্বদাই সচেতন। একদিকে সংস্কৃত কথা, আর একদিকে একেবারে বিংশ শতাব্দীর ইতরজনের কথা, কিছুই তাঁর কাব্যোপকরণে অপ্রয়োজনীয় নয়। বাক্য ঢিলে হয়ে পড়েছে, সচেতন হওয়া মাত্রেই কবি সমাসের শরণ নিয়েছেন, এবং সে কেবল সাধুভাষাতেই নয়, কথ্য ভাষাতেও। যথা,—'চাতালফাটানো' 'কচুরিপুকুর' 'পাটনীখেয়া' বা 'আলোক-কাড়ায়-নাকাড়ায়'। এ ছাড়া যেখানেই 'ও' 'র' 'তে' 'দ্বারা' দরকার, বা যেখানে আলাদা লিখতে গেলে ক্রিয়ার বাহুল্য ঘটবার সম্ভাবনা সেখানেই সমাস করা হ'য়েছে। দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। কয়েকটা দেখাই,—'জীবযাত্রা-কাকলীমুখর' 'আসন্নশরৎউষা' 'যক্ষপ্রশ্নকণ্টকিত' 'আসন্নমুমূর্ষাক্ষুব্ধ' 'দেশকাল-সন্ততির' 'স্বপ্নসাগরকিনারে' 'মেরুবিন্দুশীতে'। অনেক সময় এ সব শৈলীগত প্রয়োজন ছাড়াও অতিরিক্ত ব্যঞ্জনাসৃষ্টির জন্যও দুটি শব্দকে সমাজবদ্ধ করেন কবি,—যথা, 'নীলবিহার' 'মেঘরজনী' 'মরীয়াপ্রহরে' 'কৈলাসসাধনা' 'স্বপ্নইসারা' 'বজ্রআবেগ' 'নীড়আকাশ' 'বিদ্যুৎঅঙ্গারে' 'কমলপুটে'। সেইজন্য অধিকাংশ জায়গাতেই সমাস ভেঙে প্রত্যেক কথার ওপর জোর দিয়ে গদ্যভাষ্য রচনা ক'রলে আমার মনে হয় বিষ্ণু দে-র কবিতার অনেক বেশী অর্থবোধ হওয়া সম্ভব। এবং এজন্য সবচেয়ে যা বেশী দরকারী সে হচ্ছে ধীর মস্তিষ্কে বারবার প'ড়ে যাওয়া।

ব্যাপার কঠিন, সন্দেহ নেই। কারণ তিনমাত্রা অঙ্গের কবিতাগুলির যতিপাতের এমন কৌশল বিষ্ণু দে করেন যে ছন্দের খাতিরে একটা বাক্যকে অনেক সময়েই উচ্চারণের স্বাভাবিক চালে পড়া যায় না। 'পূর্বলেখ'-এর প্রথম কবিতার প্রথম স্তবক ধরুন। কবিতার মত ক'রে প'ড়ে গেলে যতটা

অর্থবোধ হয় তার চেয়ে গদ্যভাষ্য অনেক বেশী উপকারী। বিভীষণ রামকে বলছেন,—'আহা আজ যদি (তুমি) অগ্রচক্রঘর্ঘরে পুষ্পকে নীল (আকাশ) মন্থিয়া অগ্নিবাণ হানো, (তবুও আমরা) কেউ প্রাকার ছায়ার গহ্বরে লুকাব না। (কারণ) নাচার (হ'য়ে) স্বগতে দীর্ঘকাল স্বাগত গেয়েছি। হে বজ্রপাণি! স্বধর্ম্মে (তো) মোরা সন্দিহান (এখন)। অর্থাৎ, রূপকটার অর্থভেদ ক'রলে দাঁড়ায় এই যে, বিভীষণের মতই কবি পরস্বাপহারী অভিজাত রাক্ষস দল ত্যাগ ক'রে অন্ত্যজ বানরদলের সেনাপতি রামের শরণ নিয়ে বলছেন, আজ যদি তুমি এরোপ্লেনের প্রপেলারে আকাশ মথিত ক'রে আগুনে-বোমাও ছোঁড়ো তাহ'লেও আর ব্যাফ্‌ল্-ওয়াল বা স্লিট-ট্রেঞ্চের আড়ালে লুকাব না। কারণ এতোদিন রক্তপায়ী পরস্বশোষণের দায়ে নিজেদের বুর্জোআ কৃতকর্ম্মের খুব সুখ্যাতি করেছি, কিন্তু আজ আর সে সহজ বিশ্বাস নেই।···

এ' তো গেল তিনমাত্রার কথা। পয়ারে আবার কবি অন্য রকম কৌশল অবলম্বন করেন। সমাসবদ্ধ কথাগুলিকে পাশাপাশি রেখে মাত্রাবন্টনে ও পর্ব্বান্ত-মিলে এমন কায়দা করেন যাতে হুহু ক'রে প'ড়ে যেতে হয়, অথচ ভালো করে অর্থবোধের জন্য প্রত্যেকটি শব্দে মনোযোগ দেওয়া দরকার। যথা,—

স্বারস্বত মুহূর্ত্তের কালাতীত স্তম্ভিত লীলায়
জাগ্রতস্বপ্নের ভেদ বুঝি আর নেই। মর্ম্মভেদী কলের চোঙাও
নীরব, স্তম্ভিত ভীত মিলের ধোঁয়াও,
তাই পরিব্রজবাসী সন্ধ্যাভাষী এই অবধূত
আত্মীয় প্রহরে যতো ভূত—
বিশেষ সত্ত্বের ক্ষিপ্র পাল
হে দ্রংষ্ট্রা করাল!
গুহাহিত সমাহিত অন্তরের শূন্যে নীল মহাশূন্য মাঝে।

অথবা,—

এ রাত্রি প্রয়াণে
সংহত সত্তার বাল্য এই গোধূলিতে ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায়
মহাকাল প্রশান্ত অম্বরে

স্মিতওষ্ঠাধরে
কূলপ্লাবী বর্ণহারা আকাশগঙ্গায়।
ধ্যানমৌন সান্নিধ্য বিলায়
ছায়াতপহীন।

গদ্যভাষ্য না করলে প্রথম দৃষ্টান্তের 'হে দ্রংষ্ট্রা করাল!' ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'ছায়াতপহীন' নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হবে। মিলের কায়দাও লক্ষ্যণীয়, বিশেষ ভাবে প্রথম দৃষ্টান্তে।

আর এক উপায়ে বিষ্ণু দে কবিতাকে নির্বাহুল্য অথচ আবেগময় ও নাট্যধর্ম্মী করার চেষ্টা ক'রে থাকেন। ব্রাউনিঙের মত আগাগোড়া নিখুঁত নাটকীয় স্বগতোক্তির (Dramatic monologue-এর) কবিতা বিষ্ণু দে হয়ত সত্যই লেখেন নি, কিন্তু গীতি কবিতাকে যতটা নাট্যরসান্বিত করা যায়, তার কোনো কসুর তিনি করেন নি। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা হ'য়েছে কোনো একটি নাম বা সম্বোধন প্রয়োগের কৌশল গুণে।

উদাহরণ :

দয়াহীন ইরম্মদ! ইন্দ্র হিম কুলিশকঠিন—
অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি'! হায়! হে পিতৃপ্রতিম
হে কালের অধিশ্বর! দানধর্ম্মে দম্য তব রাগ।
হিরণ্ময় হে আদিত্য সম্বরো সম্বরো পুরোভাগ
হে পূষণ! বধো বৃত্রে ·····ইত্যাদি।

কিম্বা, 'যামিনী রায়ের একটি ছবি' একটি কবিতায় 'বিহঙ্গম' সম্বোধনের তিনবার প্রয়োগে ; 'বিভীষণের গান' কবিতায়—

হে বজ্রপাণি! স্বধর্ম্মে মোরা সন্দিহান।
... ...
ভর্গে তোমার বরেণ্য। করো খড়্গাহত
মুক্তির আশা শ্যামজলধর।···
নয়নাভিরাম! প্রবল মরণে এ রোগ হানো।

এবং 'পদধ্বনি' কবিতায় বারম্বার 'হে ভদ্রা', 'হে ভদ্রা আমার' সম্বোধন ক'রে স্থানকাল পাত্র সম্বন্ধে সচেতন করতে করতে শেষ পর্য্যন্ত সুন্দর সম্বোধন

দুটির প্রসাদেই কি বেগবান ও ঋজুগত নাটকীয় স্তব্ধতায় এসে কবি পৌঁছাতে পেরেছেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বীর অর্জ্জুন যুগপরিবর্ত্তনকালে দস্যুদলের হাতে পরাজিত। প্রাণাধিকা পত্নী সুভদ্রার সম্ভ্রম পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হবার উপক্রম, অথচ সব্যসাচীর হাতে সে অক্ষয় গাণ্ডীব আজ ব্যর্থ। আর এই পরাজয়ের সাক্ষী সঞ্জয়, যে সঞ্জয় অর্জ্জুনের পূর্ব্বতন পরাক্রমের প্রামাণ্য দর্শক। কি বিরাট ভাগ্যের পরিহাস! আর রূপকটার আবরণ উন্মোচন করলে একশ্রেণীর লোকের পক্ষে এত গভীরভাবে সত্য!

প্রত্যেক প্রধান কবিরই একটা বিশিষ্ট মনোরাজ্যের খোঁজ পাওয়া যায়। সেখানে অজস্র ছবির মিছিল, সেইগুলিকে অপরের ইন্দ্রিয়গম্য করতে গিয়ে ধ্বনি বা সুরের উৎপত্তি হয়, যার থেকে কথার উৎপত্তি। সুতরাং গভীর অর্থে কাব্যে ব্যবহৃত কথাগুলি কবির মানসলোকের চিত্রপরম্পরার প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথক পৃথক কবিতায় বিভিন্ন ছন্দ ও কথা ব্যবহৃত হয়, তার কারণ—মনের সে পৃথিবীতেও ষড়ঋতুর লীলা আমাদের এই বাস্তব পৃথিবীর মতোই সমান প্রবল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবির মন যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন বিচ্ছিন্ন এই চিত্রগুলিকে জোড়া দিয়ে মোটামুটি কবির মনের একটি প্রাকৃতিক ও স্বভাবগত মানচিত্র রচনা করা দুঃসাধ্য হয় না। আমার নিজের কাছে বিষ্ণু দে-র মানসলোকের ছবিটা যে ধরণের তার কিছুটা আভাস দিই।—

সমস্ত চিত্তের আকাশ গভীর নীল। সেই উধাও নীলে সমাজরূপ বটের সহস্রবাহু প্রসারিত। সেখানে পাখীর মেলা ; আশ্রয়ের নীড়। আকাশ খরসূর্য্যজ্বলা, কখনো সন্ধ্যার দিকে কিম্বা সকালে, হিরণ্ময়। মাঝে মাঝে কল্পনার সোনালী ঈগল সে আকাশে পক্ষবিস্তার করে, চকিতে আবার প্রাচীন বটের নীড়ে ফিরে আসে। কিন্তু একটি পাখী আছে, সে আর ফেরে না, নিরুদ্দেশ যাত্রায় সে চলেছে সমস্ত মহাশূন্য বিধুনিত ক'রে দূর হ'তে দূরে,—সে মানসবলাকা : কৈলাসযাত্রী, 'অতীতকৈলাস' নয়,—চৈতন্যের অখণ্ডতার কৈলাস। নিচে আমাদের পৃথিবী, সেখানে 'ছিন্নভিন্ন শবমাত্র বিরাট পুরুষ', সেখানে 'দুই হাটে মারামারি', 'মেলা নিয়ে বোর্ডের ব্যবসায়', শূন্য খামার,

সহরতলীতে উল্টোডাঙ্গা আর পাটকলের ভিড়ে কেরাণী-মজুর-ধর্ম্মঘট, 'ফাগুয়াসর্দ্দার' 'ভাংচি' দেয়; কর্পরেশানের আওতায় 'স্ক্যাভাঞ্জোরের অকাল ধর্ম্মঘট' (অকাল মানে 'অসুবিধাজনক' নয় 'অপক্ক') ধামাচাপা পড়ে, ফাট্‌কা, পার্টি, ফ্ল্যাশ, ট্র্যাফিকের ভিড়, মধ্যবিত্ত জীবনে 'বধিরমূক সন্তান' বা লটারী-রেস-ক্রসওয়ার্ড নিয়ে দৈববিশ্বাস, এদিকে 'প্রেমে চিড় লাগে', 'মনোকোকোনদ কচুরীপানার পাঁকে মজে',—দেখে শুনে মাঝে মাঝে মনে হয়, 'বৃঝি বা ভূকম্পে আসে কংসের স্পন্দন', কারণ আবহাওয়াটা সেই রকম, 'বীরদল চলে লাখো কৃষাণ', যুগান্তিক হেষায় দিগন্ত কম্পিত হয়,···কবি সমস্ত কিছুর সম্বন্ধেই রীতিমত সচেতন, কিন্তু ইতিমধ্যে সেই প্রাণবিহঙ্গম কিন্তু সর্ব্বদাই চলেছে! তার সমস্ত পশ্চাদ্‌পট নীল, গাঢ় নীল, তার লক্ষ্যস্থান পূর্ণতার তুষারনীল কৈলাস।

ছবির কথা গেল। ছন্দের দিক দিয়েও বিষ্ণু দের নৈপুণ্য বিস্ময়কর। তিনমাত্রা বা তদঙ্গীয় ছন্দেই যদিও তিনি বেশী লেখেন, তথাপি 'পদধ্বনি' বা 'জন্মাষ্টমী'র মত সুদীর্ঘ পয়ারপ্রধান কবিতাতেও তিনি যথেষ্ট ছন্দোবৈচিত্র্য আনতে পেরেছেন। তাঁর অভিনব মাত্রাবণ্টন ও পর্ব্বান্ত মিলের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হ'য়েছে, তাছাড়া বহু অন্তর্লীন মিল, চতুর অনুপ্রাস ও নানা-বর্ণায় অক্ষরের রকমফেরজনিত বক্তব্যানুগামী সুরসৃষ্টি (যেমন, ঝংকার, গম্ভীর বা নিশ্বাস প্রবাহের সুর)—এ সমস্তও তাঁর পয়ারজাতীয় রচনায় হামেশাই চোখে পড়ে। উদাহরণ দিলাম না, মনোযোগ দিলে পাঠক নিজেই বের করতে পারবেন।

আরও একটা জিনিষ এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়, সে হ'চ্ছে সমস্ত কবিতা জুড়ে একটা সাঙ্গীতিক বিভঙ্গের উত্থান-অবস্থান-ও-পতন। 'যামিনী রায়ের একটি ছবি' ধরণের কবিতায় এই সঙ্গীত একযন্ত্রপ্রধান; কিন্তু 'চতুরঙ্গ' 'সপ্তপদী' 'বৈকালী' এবং বিশেষ ভাবে 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় বিভিন্ন সুরের আলোছায়া-কম্পনে এক বিরাট ঐক্যতানের সৃষ্টি হ'য়েছে। এ ঐক্যতান কন্‌সার্ট নয়, অর্কেষ্ট্রা—আমাদের বিদেশী সঙ্গীত অনভিজ্ঞ কানে যার সবটা আবেদন সার্থক হওয়া সহজ নয়। তথাপি চটুল-গম্ভীর, হাল্‌কা-গভীর, কখনো শ্লেষদগ্ধ কখনো বা আত্মকরুণায় বিষণ্ণ এই বিভিন্ন পরিব্রাজক অভিজ্ঞতার

শোভাযাত্রাতে যে অপূর্ব্ব ভাবসমন্বয় ও সুরসঙ্গতি থাকে সেটা অশিক্ষিত মনকেও মন্ত্রমুগ্ধ করবে, সন্দেহ নেই।

এ ছাড়া গদ্যছন্দ নিয়েও বিষ্ণু দে নানারকম মূল্যবান পরীক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মত : free verse কখনো কোনো বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য নয়, কারণ তাতে 'free'dom থাকে না। পয়ার বা অন্য ছন্দের প্রভাবকে এড়িয়ে চলতেই হবে free verse-এর এরকম কোনো সংকল্প থাকলে তা নিজের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করবে। প্রয়োজনের তাগিদ ও বক্তব্যের চাপই যেখানে প্রধান, সেখানে মনকে বিধিনিরপেক্ষ ছন্দ-অনুবর্ত্তিতার স্বাধীনতা দেওয়াই সম্পূর্ণ উচিত। সেইজন্য বিষ্ণু দে-র গদ্য কবিতার যেখানে সেখানে যে-রকম সে-রকম ছন্দের সাক্ষাৎ মেলে,—কখনো বিশুদ্ধ পয়ারের কাপ্‌লেট, কখনো ভঙ্গপয়ার, কখনো তিন মাত্রা, কখনো ছড়ার চাল, কখনো বা অন্য নানারূপ মিশ্রিত ছন্দ। তা ছাড়া গদ্য কবিতায় মিল দেবার যে-রীতিকে অনেকে নব-উদ্ভাবিত ব'লে মনে করেন তাও বিষ্ণু দে-র কবিতায় অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।—এই সমস্ত লক্ষণই 'আবির্ভাব' বা 'বৈকালী' কবিতায় পাওয়া যাবে। উদ্ধৃতির লোভ সম্বরণ করলাম।

এ যুগে দলনিরপেক্ষ প্রসংশা দুর্ঘট। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশংসা করতে নিজেরও রুচি হয় না, যাঁরা শোনেন তাঁরাও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমি এতক্ষণ যে কবির রচনা নিয়ে আলোচনা করলাম তাঁর কবিপ্রতিষ্ঠা আমার মুখাপেক্ষী নয়।

আশা করি আমার ত্রুটিবিচ্যুতিকে কেন্দ্র ক'রে বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্বন্ধে আরো অনেক আলোচনা চলবে। কারণ, আমার বিশ্বাস বহুবিধ প্রবন্ধ-নির্ম্মাণের মতো মালমসলা তাঁর কাব্যদেহে বর্ত্তমান আছে। আমার এ অক্ষম প্রচেষ্টায় যদি যোগ্যতর ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি সে সব দিকে আকৃষ্ট হয় তবেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক।

মণীন্দ্র রায়

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। পাবলিশিং সিণ্ডিকেট, কলিকাতা। মূল্য—আড়াই টাকা।

বিশ্বকবির বিভিন্ন দেশের পূর্ব্বাপর ভ্রমণ কাহিনী বর্ষানুক্রমে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত গ্রন্থ, তাঁর ভ্রমণ-সঙ্গীদের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা ও তাঁদের মুখশ্রুত বিবরণ এই গ্রন্থকারকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ইহা ব্যতীত এরূপ গ্রন্থ রচনা যে সম্ভব নয় তা সহজে অনুমান করা যায়। কারণ, সাহিত্যে ভ্রমণবৃত্তান্ত একটি এমন বস্তু যা ঠিক অপরের মারফৎ শ্রুত হয়ে লেখা সম্ভব নয়, তা ছাড়া সকল ভ্রমণকারীর পক্ষেও কাজটি সহজসাধ্য নয়, যদি তিনি নিজে না সাহিত্যরসিক হন।

ভ্রমণবৃত্তান্ত শুধু দেশান্তরের ভৌগোলিক ব্যাখ্যা নয় বা যাত্রাপথের অবিকল বর্ণনা নয়—এতদুপলক্ষে অন্যান্য বহু জিনিস ইহার মধ্যগত। পর্য্যটিত দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, চারিত্রিক বৈচিত্র্য—প্রাকৃতিক আবেষ্টনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ প্রভৃতি উক্ত দেশের এমন অনেক অন্তরের বস্তু আছে যা ভ্রমণবৃত্তান্তকে জীবন্ত চলচ্ছবিতে পরিণত ক'রে উঁচু দরের সাহিত্যে স্থান দেয়। ভ্রাম্যমাণের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতির শুদ্ধতার উপর এর যথাযথ বর্ণনা ও রসোত্তীর্ণতা নির্ভর করে। সেদিক থেকে অন্য সকল রচনার কথা উহ্য রেখেও রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-কাহিনীগুলি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

উপর্য্যুক্ত গ্রন্থ সঙ্কলনকারীর এ-সকল দায়ীত্ব নেই। তিনি সংক্ষেপে কবির পর্য্যটনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্থান বিশেষে তা এতই সংক্ষিপ্ত হয়েছে যে, পাঠকের অসন্তুষ্টির কারণ ঘটে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ঘটনারও কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবুও একত্রে কবির বিশ্বভ্রমণের এরূপ একটি সঙ্কলন থাকা বাঞ্ছনীয়। সঙ্কলনকারী সেদিক থেকে সাধারণের যথেষ্ট সুবিধা করেছেন বলে দাবি করতে পারেন।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

শ্রীকুন্দভূষণ ভাহড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৫০

পরিচয়

চতুর্দশপদীর পদসঞ্চার

একজন বিদেশী সমালোচক 'চতুর্দশপদী' কবিতার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে ব'সে লিখেছেন, সবেগ সঞ্চরণ ও ঘূর্ণনের জন্য চাতক পাখীর ডানায় প্রকৃতির যে কারুকার্য দেখা যায়, চিলের বা য়্যাল্‌বাট্রসের পাখায় ঠিক তেমনটি নেই। এই শেষোক্ত পাখীদের জীবনযাত্রায় একটানা অনেক-ক্ষণের জন্য আকাশে ভেসে থাকবার প্রয়োজন হয়; তাই তাদের ডানায় প্রকৃতি আর এক রকম শক্তি দিয়েছেন।

সব পাখীর ডানা এক রকম নয়, কারণ সব পাখীর প্রয়োজন এক জাতের নয়। মানুষের দিগন্তবিহীন মনের আকাশ এতো বিস্তৃত,—এতো দুরতিক্রম্য তার ব্যাপ্তি, যে এক জোড়া ডানায় ভর ক'রে থাকলে তা'র চলে না। মানুষের শিল্প-সাধনার ইতিহাস মানে এই ডানা-বদলের ইতিহাস। একই যুগে একজন কবির রচনায় বিভিন্ন প্রকৃতির কাব্যরূপের প্রকাশ দেখলে তাই বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই। যিনি গল্প লিখে নাম ক'রেছেন, তিনি কবিতা লিখে-ও খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, এমন দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে-ও বিরল নয়।

সাহিত্যের যে কোনো রূপ নিয়েই আলোচনা করা যাক্ না কেন,—কাব্য-রূপমাত্রেই কোনো না কোনো প্রকার সংযমবিধি। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ একটি কাব্যরূপ যতো মুক্তি-র প্রতিশ্রুতিই বহন করুক্ না কেন নতুনতরো সংযমের স্বীকৃতিতেই তার প্রতিষ্ঠা। একই মানুষের একাধিক সত্তাবোধ আধুনিক মনোবিজ্ঞানেও স্বীকৃত হ'য়েছে। 'জেকিল ও হাইড্'-এর কাহিনী সত্যনিরপেক্ষ রূপকথা নয়। ওর মধ্যে সব না হোক্, কিছু সত্য আছে। গণিতের অধ্যাপক, ভারিক্কি চালের লোক

লিয়ুইস্ ক্যারল্ সাহেব-ই শিশুমনোহারী "Alice in Wonderland"-এর লেখক ছিলেন। মানুষ হিসেবে মধুসূদন দত্ত কতোগুলি বিভিন্ন সত্তার সমাহারের ফল সে সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। তবে, সাহিত্য যে-হেতু চিত্তবিশেষের পরিচয় বহন করে এবং চিত্তবিশেষ যে-হেতু সমাজের অন্তর্গত ভাবপ্রবাহের উচ্ছ্রিত ফেনপুঞ্জের সঙ্গে কিয়দংশে তুলনীয়, সেজন্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' আলোচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের বাংলা দেশের এবং বাঙালি সমাজের অবস্থা-ও বিচার্য। প্রমথ বিশী ভালোই ব'লেছেন, "রাম-মোহন নূতন বাংলার প্রথম মানুষ আর মধুসূদন নূতন বাংলার প্রথম কবি।" মুর্শিদাবাদ থেকে ক'লকাতায় রাজসরকারের দপ্তর বদলিতেই মোগলের তিরোভাব এবং ইংরেজের আবির্ভাব পর্যবসিত হয় নি। ভাবান্তরেই যুগান্তর। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ভাবাবর্তে যে চাঞ্চল্য ও অসন্তোষের সূত্রপাত, যে বিরক্তি ও আকাঙ্ক্ষার গুঞ্জন—সেই ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী রূপে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিচয়। অমিত্রাক্ষরের মুক্তি এবং 'সনেট্'-এর বন্ধন এক-ই লেখকের হাত দিয়ে আমাদের সাহিত্যে বোধ হয় এই কারণেই পরি-বেশিত হ'তে পারলো। মধুসূদন-ই আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ সাহিত্যে প্রথম বিদগ্ধ রসিক। তবু যথোচিত সতর্ক হবার তাগিদ তাঁর ছিলো না। কথাটা বাড়াবাড়ি শোনালেও, বলা যায়, তিনি যেন রাজনৈতিক ইতিহাসের সেই সব নিষ্ক্রিয় নায়কের-ই কতোকটা স্বগোত্র, যাদের অবলম্বন ক'রে বৃহৎ মানব-সভ্যতা নতুন পথ খুঁজে নেয়। নানা অবস্থার সমাবেশে-ই নতুন আদর্শের জন্ম হয়। আদর্শ সামাজিক অবস্থা-নির্ভরশীল। ভৌগোলিক চৌহদ্দি মেনে চলবার দায় তা'র নেই। জার্মাণীর মার্ক্সবাদ এই কারণেই রাশ্যায় আত্মবিকাশের অবকাশ পেলো। ইতিহাসের গতি আপাত-দৃষ্টিতে স্ত্রী-চরিত্রের মতোই দুজ্ঞেয়। তবে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের কল্যাণে স্ত্রী-চরিত্র যেমন বহুকাল-প্রতিহত পুরুষের অনুসন্ধিৎসায় উদ্ঘাটিত হ'চ্ছে, সমাজতাত্ত্বিক দার্শনিকদের প্রসাদে ইতিহাসের গতিপথের একটা ঝাপসা ধারণা-ও আজকাল তেমনি আমাদের জ্ঞানগম্য হ'য়েছে। মানুষের শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি, যুদ্ধ-মিলন-শান্তি—এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি অত্যন্ত ধীর নৈপুণ্যে মানব জাতিকে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে পার

করছেন। প্রকৃতির ব্যবস্থায় আকস্মিকতা নেই,—আছে মন্থর অতিক্রান্তি। ফরাসী-বিদ্রোহের অনেক আগে থেকেই ফরাসী-বিপ্লবের কারণগুলো জমা হ'চ্ছিলো। রাম না হ'তেই রামায়ণ লেখার সম্ভাবনা অলৌকিক মনে করবার সত্যই কি কোনো হেতু আছে?

মধুসূদন দত্তের সম্বন্ধে 'নিষ্ক্রিয়'-শব্দ ব্যবহার হঠাৎ দেখলে আপত্তিকর মনে হওয়া স্বাভাবিক। ছাত্রের মতো সারা জীবন যিনি লেখাপড়া ক'রে গেছেন,—বন্ধু বান্ধবের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে যাঁর অক্লান্ত সাহিত্যাভিনিবেশের খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেই বহুভাষাবিদ্, বহুসাহিত্যাভিজ্ঞ মাইকেল মধুসূদন দত্ত-কে নিষ্ক্রিয় মনে করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু নিষ্ক্রিয়ের উল্টো শব্দটা যদি কোনো কবির প্রসঙ্গে ব্যবহার ক'রতে হয়, তা'হলে একমাত্র সেই কবির সম্বন্ধেই তা' প্রযোজ্য, যিনি শুধু জ্ঞান অর্জনের দ্বারা এক দেশের রীতি-কে অন্য দেশে চালান করেন না, অস্পষ্ট অসন্তোষের ফলে অমার্জিত হীরক লাভ ক'রে খুশি থাকবার প্রবৃত্তি-ও যাঁর নেই,—যিনি নবলব্ধ ঐশ্বর্যের উৎকর্ষসাধনে বিমুখ হতে পারেন না, যিনি হীরকের মূল্য বিচারেও সমান পটু। মধুসূদন ব্রেজিলের মাটিতে বিচরণকালে হঠাৎ যেন বৃহৎ এক হীরকখণ্ড হোঁচট খেয়ে-ছিলেন। কিন্তু মণিকারের বৃত্তি তাঁর অভ্যাসবিরুদ্ধ। তাই মাটি-পাথরের পিণ্ড থেকে সেই অমূল্য রত্ন উদ্ধার ক'রে, ঘসে মেজে বীণাপাণির আভরণ সৃষ্টি করবার ধৈর্যের পরিচয় "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে নেই। অমিত্রাক্ষর ছন্দ-সৃষ্টি সম্বন্ধেও এই মন্তব্যটি খাটে। অমিত্রাক্ষরের আসল জোর যে তার যতি ও ছেদের বৈষম্যে,—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় যেমন বলেছেন, অমিত্রাক্ষর যে অমিতাক্ষর এ-কথাটা বেশ স্পষ্ট ক'রে মধুসূদন তাঁর কোনো বন্ধুকে লেখা কোনো চিঠিতে-ও লেখেন নি। "মিত্রাক্ষর" নামের একটি চতুর্দশপদীতে তিনি বাংলা কাব্যে মিত্রাক্ষর প্রয়োগরীতি দেখে দুঃখ ক'রেছেন, "চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ ফাঁসে?" Blank verse এর অনুকরণে সৃষ্ট নতুন ছন্দ বাংলা কাব্য-কে লৌহ-ফাঁস থেকে যে মুক্তি দিলো, সে মুক্তি যে কতো বড় মুক্তি, তা'র কিছু ধারণা তাঁর ছিলো কিন্তু লৌহ-ফাঁস যে যতি ও ছেদের একত্রোপস্থিতির অনিবার্য-তা—এ-কথাটা আরও স্পষ্ট ক'রে ব'লে যাওয়া তাঁর মতো বুদ্ধিমান বিদগ্ধ লেখকের কর্তব্য ছিলো।

"চতুর্দশপদী কবিতাবলী" প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬৫-১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রবাস-যাপনের সময় একশোটি 'সনেট্' লেখা হয়। মেঘনাদ-বধ-কাব্য রচনার সময় একদিন সকালে মধুসূদন একটি কবিতা লেখেন, তার নাম 'কবি মাতৃভাষা'। আট, ছ'য়ের যোগে চোদ্দ মাত্রা এবং চোদ্দ চরণের এই কবিতাটির অন্ত্যানুপ্রাসের প্রকৃতি সূত্রাকারে প্রকাশ করা যায় এই ভাবে :—"কখকখ কখকখ গঘঘ গঘগ"। স্পষ্ট-ই দেখা যায়, খাঁটি ইটালিয়ান সনেটের ঢঙে এই কবিতাটি লেখা হয় নি। রাজ নারায়ণ বসুর কাছে একটি চিঠিতে এই কবিতাটি পাঠিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "I want to introduce the sonnet into our language." পরবর্তীকালে 'বঙ্গভাষা' শিরোনামায় পরিবর্তিত আকারে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। স্বরে-প্রবর্তিত সনেটের অষ্টকের অন্ত্যানুপ্রাস-রীতির সঙ্গেও আলোচ্য রীতি-র মিল নেই।

এর পরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশ থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা তাঁর আর একখানি চিঠি থেকে জানা যায় পেত্রার্কার সনেট্ প'ড়ে তিনি মুগ্ধ হ'য়েছেন এবং শুধু তাই নয়,—"I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some "sonnets" after his manner." 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' 'উপক্রমে-'ও মধুসূদন ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি'-কে স্মরণ ক'রেছেন। তাসো এবং পেত্রার্কা-র কাব্য মূল ভাষায় তাঁর পড়া ছিল। 'কবিগুরু দান্তে'—এই শিরোনামায় তিনি আর একটি 'সনেট্' লিখে গেছেন। তা'তে 'Inferno'-র কবি-র উদ্দেশে প্রণাম সঞ্চিত আছে বিয়াত্রিচে-র উপাসকের কোনো উল্লেখই নেই। ইটালিয়ন সনেট্-এর জন্ম-দাতা ছিলেন পেত্রার্কা—এই ভ্রান্ত মত আজকাল অনেকে পোষণ করেন, দেখা গেছে। পেত্রার্কা ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর লোক, তাঁর আয়ুষ্কাল ১৩০৪ থেকে ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। দান্তে তাঁর পূর্বগামী। ১২৬৫ থেকে ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। বিয়াত্রিচের উদ্দেশে দান্তে এবং লরা-র উদ্দেশে পেত্রার্কা প্রেম ও সৌন্দর্যোপাসনার যে চতুর্দশপদীগুলি লিখে গেছেন, সেই-গুলিই ইটালিয়ন সনেটের গৌরবময় আদি স্তর গ'ড়ে তুলেছে। তাঁদের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন মিকায়েলেঞ্জেলো এবং ভিটোরিয়া কলোনা। তাঁরা-ও ইটালীর অধিবাসী এবং তাঁরা-ও সনেট্ লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সনেট্

এর গঠন-নির্দেশ দান্তের দ্বারাই প্রথম স্পষ্ট ও সার্থকভাবে সম্ভব হয়। পরবর্তী কবি-রা দান্তের আদর্শ অনুসরণ ক'রেই এগিয়েছেন,—একথা বিশেষ ভুল নয়। কিন্তু দান্তে-র আগেও সনেটের একটা ইতিহাস খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য নয়। তবে সে অঞ্চলে নানা মুনির নানা মত পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-পরায়ণ। অধুনা-লুপ্ত 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর লেখা একটি সুখপাঠ্য, তথ্যবহুল প্রবন্ধ থেকে চতুর্দশপদী কবিতার আদি যুগের এই ইতিবৃত্ত এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে :—

অনেকে গ্রীক কবিতার epigram-এর সঙ্গে ইতালীয় সনেটের বিলক্ষণ মিল দেখতে পান; এবং কোনো কোনো প্রাচীন কবি নাকি সনেট্ লিখে এপিগ্রাম নামে চালিয়েছেন। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে গ্রীক্ কাল্চার ইতালিতে অজ্ঞাত ছিলো; কাজেই দান্তের পূর্বপুরুষগণ নিশ্চয়ই গ্রীক্ নন্। কেউ কেউ বলে থাকেন যে প্রভঁস-প্রদেশের ত্রবাদূর (troubadour) গণ তাদের মাতৃভাষায় যে-সব গান ও ছড়া বেঁধে মুখে মুখে ছড়িয়ে বেড়াতো, তারি প্রভাবে ইতালীয় সনেট্ এর আবির্ভাব। অন্য দলের মতে (দান্তে ও পেত্রার্কা দু'জনেই নাকি এ-মতের পরিপোষক ছিলেন) সিসিলিতে আরবদের সংস্পর্শে এসেই ইতালীয়নরা সনেট্ লিখতে শেখে। প্রাচীনতম ইতালিয়ন্ কবিতায় আর্‌বিয়ানা খুব বেশি বলে আজকাল এ মতই অভ্রান্ত ব'লে দাঁড়িয়ে গেছে।"

মধুসূদন পেত্রার্কার কাছেই তাঁর পাঠ নিয়েছিলেন কিন্তু চতুর্দশপদীর আত্মা তাঁর চোখে পড়ে নি। Theodore Watts Dunton একটি সনেট্ লিখেছেন—সনেটের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করাই তাঁর লক্ষ্য। সেই পদের 'ষড়ক'-টি এমনি—

A sonnet is a wave of melody
From heaving waters of the impassioned soul
A billow of tidal music one and whole
Flows in the "Octave" ; then returning free ;
Its ebbing surges in the "Sestet" roll
Back to the deeps of Life's tumultuous sea.

অষ্টকের উচ্ছ্বাস ষড়কের অবরোহণে সম্পূর্ণ হয় কিন্তু এই দুই অংশের অন্তর্নিহিত ঐক্য সত্ত্বেও, এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন—এই তত্ত্বটি মধুসূদন সম্যক্ উপলব্ধি করেন নি। নিরপেক্ষ অথচ সহানুভূতিশীল পাঠকের চোখে এ-কথা সহজেই ধরা পড়ে, যে এই কবির মনে দু' একটি স্থলে ছাড়া অন্য কোথাও প্রকৃত সনেট্ লেখবার তাগিদ ছিলো না। আত্মবৈদ্রিকতা গীতি-কাব্যের সহজ

ধর্ম। সনেট্ মানেই আত্মকেন্দ্রিক কবিতা কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক কবিতা মানেই সনেট্ নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শক্তিমান ইংরেজ কবিদের মধ্যেও অনেকে সার্থক সনেট্ লিখতে পারেন নি, অথচ সুন্দর কবিতার রচয়িতা হিসেবে তাঁদের খ্যাতি বিদ্বজ্জনস্বীকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কোল্‌রিজের' নাম করা যায়। বহিরাবয়ব-টি নিখুঁৎ হবে, অন্তর-টি খাঁটি হবে—এই দু'য়ে মিলিয়ে চতুর্দশপদী-র সার্থকতা। শেলীর কবিতা "Ozymandias"-এর ধর্ম সনেটের কিন্তু ওর পরিচ্ছদে ত্রুটি আছে। তাই 'সনেট্' ওকে বলে না। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে প্রশান্ত সংযমের উদ্বাহ-বন্ধনেই সনেটের সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য-সৃষ্টির কৌশল আয়ত্ত করবার ধৈর্য্য অসংযত প্রতিভার পক্ষে অসম্ভব। রসিক মধুসূদন বিদেশী ভাষায় লেখা চতুর্দশপদী কবিতার মাধুর্যে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন, দেশপ্রেমিক মধুসূদন মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনের তাগিদে য়ুরোপের কাব্যকানন থেকে সনেট্ আহরণ ক'রেছিলেন, কবিত্বশক্তি-গর্বিত মধুসূদন সনেটের ছাঁচে ঢেলে কিছু কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু তা'র মধ্যে মাত্র কয়েকটি কবিতার জন্মলগ্নে আবেগ-স্পন্দিত, সংযম-শাসিত কবিচিত্তের হিমাংশুকিরণপাত সম্ভব হ'য়েছে। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' অথবা 'বসন্তে একটি পাখীর প্রতি' এই ধরণের সার্থক চতুর্দশপদী কবিতা। "শ্রীমন্তের টোপর" শিরোনামায় তিনি যে কবিতাটি লিখেছেন বিষয়বস্তুর প্রকৃতির জন্য মধুসূদন দত্তের কাব্যালোচনায় তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু রসিক এবং বিদগ্ধ হ'লেও অসতর্কতার অভিযোগে তিনি যে সত্যই অভিযুক্ত হ'তে পারেন, তা'র নজির এই কবিতাটির সর্বাঙ্গে লিপ্ত। এর 'অষ্টকে' প্রথম 'চৌপদ'-এর (quartrain) সঙ্গে দ্বিতীয় চৌপদের অতিরিক্ত গা ঘেঁষাঘেঁষি-ই যে শুধু পীড়াকর, তাই নয়, এই কবিতায় অষ্টম পংক্তি নবম পংক্তির মধ্যে ভিড়ে গেছে। Theodore Watts Dunton—লিখিত পূর্বোধৃত কবিতায় 'সনেটের' প্রথম আট পংক্তি-তে ভাবের যে পরিপূর্ণ সুসংহতি-র কথা বলা হ'য়েছে, সেই খাঁটি আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে মধুসূদন দত্তের চতুর্দশপদী কবিতাগুলির বিচার ক'রতে ব'সলে বিশেষ সাধুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুধু বাক্যগত অর্থ সম্বন্ধেই তো এই কথা। কবিতা তখনই মহৎ হয় যখন বাচ্যার্থ-কে ছাড়িয়ে আরো এক অন্যতর ধ্বনির আভাষ মেলে। নিরলঙ্কৃত বাক্য-ও কাব্য হ'তে পারে কিন্তু বাচ্যার্থের অতিক্রান্তি যেখানে নেই,

কাব্যের রসোত্তীর্ণ সার্থকতাও সেখানে নেই। আলোচ্য 'সনেট্'-টি একবার স্মরণ করা যাক :—

শ্রীমন্তের টোপর

হেরি যথা সফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক, ভেদি সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে,
উজলি চৌদিক শত রতনের করে,
দ্রুতগতি! মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে
আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর স্বরে,
পদ্মারে, কহিলা—"দেখ, দেখ, লো, নয়নে,
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর. সখি! রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লনার ধন আমি।"—আশু মায়াবলে
স্বর্ণ-ক্ষেমঙ্করী রূপ লইলা জননী।
বজ্র-নখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর, মা ধরিলা তেমনি।

বলা বাহুল্য সনেটের আঙ্গিকে এই গুরুতর ত্রুটি দুঃসহ। 'অষ্টকে' অর্থের প্রাথমিক সমাপ্তি যদি না ঘটে, তা'হলে অষ্টকের ভাগটাই যে অলীক প্রতিপন্ন হয়। "সমাপ্তে" নামক কবিতাটিতেও এই জাতের বিচ্যুতি ঘটেছে। এ-ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করা অযৌক্তিক নয়, যে, মধুসূদন বোধ হয় সনেটের আঙ্গিকের সূক্ষ্ম আইন-কানুনের দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবকাশ পেয়ে ওঠেন নি। বাংলা ভাষায় ঢিলেমি এবং কোমলতার আতিশয্য নিবারণের জন্য যিনি গুরু আয়তনের তৎসম শব্দ ব্যবহারে কার্পণ্য করেন নি, সনেটের আইন জেনে শুনেও চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় আঙ্গিকের ব্যাপারে এমন ঢিলেমির প্রশ্রয় তিনি কেনই বা দিলেন? চোদ্দ চরণে সম্পূর্ণ কবিতা-ই যে চতুর্দশপদী সনেট্ নয়, এ কথা তিনি কি জানতেন না? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য প্রকাশিত চর্যাপদের সম্পাদক চর্যা-র চৌদ্দপদী কবিতার প্রসঙ্গে মাইকেল মধুসূদন প্রণীত সনেট্-এর কথা স্মরণ ক'রেছেন এবং বেশ স্পষ্ট ক'রে না

ব'ললেও এই দুই জাতের রচনার মধ্যে একটা যোগসূত্রের অস্তিত্বের আভাষ দিয়েছেন। প্রাজ্ঞ দত্ত-কবিরও কি এই ধরণের অস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল? 'অষ্টক'-'ষড়কের' ভাগ যে 'চতুর্দশপদী' কবিতার একটি অবশ্যপালনীয় বৈশিষ্ট্য,—এ কথা বাংলা-সাহিত্যে সনেট্-আবিষ্কারকের অবিদিত ছিল, এমন একটি ধারণা পোষণ করাও অসঙ্গত। বরং এই বিশ্বাসের দিকেই পাঠকের অভিরুচি সহজ হয়, যে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দস্রষ্টা এবং প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা-রচয়িতা, মধুসূদন দত্ত, উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত রচয়িতা নবীন সেনের মতোই অসতর্ক। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রে একদা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মধুসূদনের সনেট্ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদে নিরস্ত ছিলেন। তার কারণ মধুসূদন-রচিত এই কবিতাগুলির অন্তর্লীন ত্রুটি সম্বন্ধে বঙ্কিম অবহিত ছিলেন। আঙ্গিকের দোষ ছাড়া আর এক রকম দোষ এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীর বৈশিষ্ট্য। মধুসূদনের একটি মুদ্রাদোষ 'সু' শব্দের বহুল ব্যবহার। পরবর্তী চতুর্দশপদী-রচয়িতা দেবেন্দ্রনাথ সেনেরও এই দোষ ছিল। বুদ্ধদেব বসু তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক'রেছেন। সু-রাজ্য, সু-হাসিনী, সু-বদনা, সু-প্রবাহ প্রভৃতি শব্দে এই সব কবিতা কণ্টকিত। বুদ্ধদেব বাবু 'সু-সুন্দরী' শব্দটিরও উল্লেখ ক'রেছেন। 'বটবৃক্ষের' দুহিতা হ'চ্ছে তার ছায়া। এই কবি-কল্পনা সত্যই আনন্দদায়ক। কিন্তু একটি শব্দের দোষে একটি চমৎকার উপমা-ও যে কি ভাবে হাস্যোদ্দীপক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তার দৃষ্টান্ত আছে 'বটবৃক্ষ' নামের চতুর্দশপদী কবিতাটিতে। আস্তো ছবিটিই তুলে দেখা যাক :—

"প্রত্যক্ষতঃ ভারত সংসারে
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি!
জীবকুল হিতৈষিনী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু!"

'আশ্বিন মাস' সম্বন্ধে কবিতাটির প্রথম পংক্তিতেই দেখা যায়: "সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।" আশ্বিন মাস শুনলেই তো আমাদের চোখের সামনে শ্যামের গায়ে শুভ্র কাশ ফুলের শুচিতা ভেসে ওঠে, কিংবা শুনতে পাই শানাই-এর আলাপ। মধুসূদনের

কবিতায় বানেশ্বরী, মহিষ-মর্দ্দিনী, শিখিধ্বজ, গণদেব—সকলের কথাই আছে; শুধু কাশফুল সেখান থেকে নির্বাসিত এবং সূর্যকিরণ সেখানে অনিমন্ত্রিত। রসেটি লিখেছিলেন "A sonnet is a moment's monument."। 'সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ' চতুর্দশপদী-র একটি চরণে সঙ্কীর্ণ একটু জায়গা পেয়েই ধন্য হ'য়েছে, মুহূর্তের বিস্ময়ের স্মৃতিস্তম্ভ রচনার মালমশলা মধুসূদন সেখানে খুঁজে পান নি। এ-ছাড়া আর একটি দোষ, 'স্বরভক্তি'-র দ্বারা হাস্যোদ্দীপক ভাবে শব্দভঙ্গ। 'বরিষায়' (<বর্ষায়), 'গরজিলা' (<গর্জিল), প্রভৃতি রূপান্তর আমাদের স'য়ে গেছে কিন্তু "দগধে আগ্নেয় তাপে" অথবা "শবদে-শবদে বিয়া" নিঃসন্দেহে শ্রুতিনিপীড়ক।

এই আলোচনায় ধরা পড়ে, যে, কাব্যরূপের বহিরাবয়ব সম্বন্ধে অতি মনোযোগের ঝোঁক ভারতচন্দ্রের কাল থেকে আরম্ভ করে কবিওয়ালার রচনা এবং তদীয় উত্তরাধিকারী ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হ'য়ে মধুসূদনের প্রতিভাকেও সংক্রামিত ক'রেছে। "কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে"—এই রকম অনুপ্রাস ব্যবহারের দ্বারা প্রথমোক্ত কবি কাব্য-শরীরে সৌন্দর্য উৎপাদনের প্রয়াস ক'রেছেন। কবিওয়ালারা প্রায় সকলেই অনুপ্রাস-সিদ্ধ, ঈশ্বর গুপ্তের আধ্যাত্মিক কবিতা অনুপ্রাস-বাহুল্যেই কলুষিত। এই সব কবিরা নতুন পথ খুঁজেছেন কিন্তু বাংলা এবং সংস্কৃতের প্রাচীরে ঘেরা ছোটো ক্ষেত্রটিতে বারে বারে যে বসন্তের পদচিহ্ন প'ড়েছে সে বসন্ত দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ। তার সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ ছিন্ন, অন্তর্লোকের যৌবন তখন সামাজিক, এবং রাজনৈতিক জড়তায় শ্রান্ত। উনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই রাজনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে। পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী আড়াল হ'য়েছে অপসারিত। বন্যার প্রথম ঝোঁকে মিল্, স্পেন্সর, বেন্থাম যেমন অনিবার্য ভাবে এ-দেশের চতুঃসীমানার মধ্যে ঢুকে প'ড়েছেন, তেমনি বিদেশের সাহিত্য-ও এসেছে এবং তার সঙ্গে এসেছে সাহিত্যের বিভিন্ন অবয়ব Blank verse, sonnet, উপন্যাস, নাটক। কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে বাংলা ভাষার প্রতি মধুসূদনের যে তীব্র বিরাগ দেখা যায়, সে বিরাগের জন্ম বাধাপ্রাপ্ত যৌবনের বৈফল্য-বোধে। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে,—অর্থাৎ মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে কোথায় সেই উন্মথিত

যৌবন, যা' সত্যিকার একটি যুবকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে? হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদন Richardson এর হাতের লেখা পর্যন্ত নকল করতে চাইতেন। তারপর সুবিস্তীর্ণ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমুদ্রে যখন তিনি পাড়ি দিলেন তখন, —তখন আর সেই "যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে"? সেই ব্যাকুলতার দিনে সতর্কতার শাসন ছিলো না। হৃদয় তখন উদ্দাম, বুদ্ধি তখন অস্থির। পশ্চিমের সাহিত্যে যা কিছু তাঁর ভালো লেগেছে, বাংলা সাহিত্যে তাড়া-তাড়ি তাই নিয়ে এসেছেন। সেই সঙ্গে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সম্পদের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করবার শিক্ষাও তিনি পেয়েছেন। রামায়ণ, মহাভারত অবশ্য বাল্যকালেই তাঁর প্রিয় ছিল। ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্যের অসার্থক অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণব কাব্যের অনুকরণ করেছেন। কিন্তু 'ভানুসিংহের পদাবলী' ছাড়িয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত কোন্ অলক্ষ্য গিরিশৃঙ্গেই না উপস্থিত হ'লেন। পক্ষান্তরে, মধুসূদনের ব্যাপক প্রয়াস কোনোদিনই গভীর ধ্যানের পথ খুঁজে পেলো না। 'অমিত্রাক্ষরে' তিনি ছন্দের মুক্তি দিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন দিয়েছেন, তেমন কোনো বৃহৎ জীবনবেদ তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি; ব্রজাঙ্গনা-বীরাঙ্গনা-তেও বহিরাবয়ব নির্মাণের সিদ্ধি। নির্মিতি বা craft তাঁর হাতে কলা বা art হ'য়ে ওঠে নি। এই একই মানুষ মধুসূদন আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে ফ্রান্সের ভার্সাই নগর থেকে এক গোছা সনেট্ লিখে বাংলা দেশে পাঠিয়ে-ছিলেন। সেই কবিতাগুলি যদিও ফ্রান্সের ভার্সাই সহরে লেখা হয়েছিল, তবু তা'র শিকড় একদিকে যেমন ভারতবর্ষের কাব্য-শিল্প-সাধনার ঐতিহ্যে,—বাংলা দেশেরআর্দ্রগন্ধ মাটিতে,—অন্যদিকে তেমনি এর মূল য়ুরোপের সূর্যকরোজ্জ্বল সেই প্রদেশে, দূর ইটালিতে। যা'র সম্বন্ধে মধুসূদন লিখেছেন :—

"ইতালী বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহু বিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে।"

এ দেশের সাহিত্যে চতুর্দশপদীর সেই প্রথম অপটু পদসঞ্চার। তারপর সেই পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে কতো ঘাসের ঘ্রাণ এবং সূর্যালোকের প্লাবনে, কতো তারকা-খচিত আকাশের স্তব্ধতায়ই না আমরা স্নান ক'রে এলাম!

হরপ্রসাদ মিত্র

বহ্নিলতা

নদীর ধারে ধারে ছায়া পড়েছে, জলেও ছায়া। নদীর নাম শ্রীমতী, এ-দেশের লোকে বলে—শিরমাই। বর্ষায় সে দুরন্ত, অন্য সময় বুকে শুধুই সরু এক ফালি স্রোত।

স্রোতের এপারে রয়েছে যারা, তাদের অনেকেই দরিদ্র। ওপারে প্রায় সকলে অবস্থাপন্ন। কিন্তু দুই পারের কেউ কারো অপরিচিত নয়।

ওই যে মেয়েটি আসছে, ওকেও সবাই চেনে। দুষ্টু বলেই আরো চেনে। নামটি ওর শান্তা, অপভ্রংশে দাঁড়িয়েছে শন্টি।

পারাপারের জন্যে শিরমাইয়ের যেদিকে সাঁকো বাঁধা, শন্টি সে পথে যায় না। ওর মনের গতি যদি সহজিয়াই হত, ঘুরে এদিক না এসে ঘণ্টাখানেক আগেই সহজে নদী পার হতে পারত। তবু ঘুরেই ওর আসা চাই। বলেছি তো, মেয়েটি দুরন্ত, বর্ষার শিরমাইর মতনই। অভিসারও তাই ওর বক্রপন্থা।

এপারের যে বাড়িতে ওর গতিবিধি, তারও যেন সহজের সঙ্গে লেনদেন চুকে গেছে অনেক কাল। চারিদিকে পূর্ব গৌরবের বিশেষ ছাপ, তবু জরা ও জীর্ণতা সর্বত্রই প্রকট।

শন্টি দুপুরের প্রচণ্ড রোদে এতখানি পথ হেঁটে এসেছে। কে ওর প্রত্যাশায় ছিল জানি না, কিন্তু দুয়ার খোলাই ছিল। মুক্ত দ্বারপথে অনেকক্ষণ উঁকি-ঝুঁকি মেরে কাউকে দেখতে না পেয়ে, অন্দরের দিকে একটু এগিয়ে উচ্চকণ্ঠে শন্টি ডাকলে, "কেশর!"

মিনিটখানেক কারো কোনো সাড়া শব্দ নেই।

তার পরের দৃশ্যের বর্ণনা কেবল কবির কলমেই সম্ভব। দোর খুলে যে মেয়েটি বেরিয়ে এলো, সে—উর্বশী বা শকুন্তলা কি? না, চৌদ্দবছরের নূরজাহান। অঙ্গে পাড়াগাঁয়ের তাঁতির বোনা মোটা কালো শাড়ী, নিরাভরণ দেহ, দুই হাতে শুধু কয়েকগাছি কাঁচের চুড়ি। তবু সেই সাম্রাজ্ঞী, অধরকোণে সেই তারই অপূর্ব ভঙ্গিমা, সকল অবয়বে অন্তর্লীন আভিজাত্যের সেই অবর্ণনীয় মহিমা। বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, নূরজাহানের ছবি কি সারা জগত দেখেনি!

কিন্তু যার কথা বলছি সে তো শুধু ছবি নয়, এ যে জীবন্ত।

প্রতিমার মুখে আত্মার উদ্ভাসনে ভক্তের মুখখানিতে যেমন হয়, ওকে দেখে তেমনি আলো জ্বলে উঠল শন্টির চোখে মুখে। জীর্ণ বাড়ি রূপকথার অট্টালিকায় রূপান্তরিত হল না বটে, কিন্তু শন্টির মনে হল এই জরা ও জীর্ণতা মিথ্যা, দারিদ্র্যের কঙ্কালমূর্তিখানি শুধু এর ছদ্মবেশ। অন্দরে যার কোহিনূর লুকানো, প্রাঙ্গণে তার দৈন্য কেন!

মনের ভাব প্রকাশ করতে ভাষার দরকার। পাড়াগাঁয়ের শন্টির কণ্ঠে সেই ভাষা ফুটল না। সে শুধু দুই হাতে ওই রূপবতীর দুখানি হাত চেপে ধরল, বললে, "কেশর!"

মোহন মুখে অপূর্ব হেসে কিশোরী বললে, "কতক্ষণ এসেছিস্?"

"অনেকক্ষণ।"

নদীর দিকে তাকিয়ে কিশোরী হাসিমুখে আবার বললে, "ঘুরে আর লুকিয়ে তো?"

"নিশ্চয়ই।"

"এরকম চলবে কতদিন?"

"যতদিন আমার খুসি।"

"বড় হয়েছিস যে! বাড়িতে বকে না?"

"বকেই তো।"

"তবে?"

"তবে আবার কি! কার কাছে আসি তা ওরা জানে, মা আর দাদা—"

কিশোরীর রক্তিম গণ্ডদ্বয় আরো রঞ্জিত হয়ে উঠল, কিছু বলল না, নীরবে ঘরের ভিতর থেকে দুটি পেয়ারা এনে শন্টির হাতে দিল।

শন্টি বললে, "মা তোকে দেখতে চেয়েছেন। যাবি তো?"

কিশোরী উত্তর দিল না। দিলেও সেই উত্তর শন্টি মানবে না। সে বোঝে না। না বুঝলে কে তাকে বোঝাবে কেশর কাদের ঘরের মেয়ে? শন্টি তো জানে না এই জীর্ণ গৃহের প্রতি কক্ষে এখনো কোন্ অভিজাত নিশ্বাস সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ সে রাজকন্যা নয় বটে, কিন্তু বছর পঞ্চাশেক আগে জন্মালে শুধু রাজার মেয়েরাই ওর সখী হত—শন্টি নয়। প্রাচীন অভিজাত্যের নিগড়ে বন্দিনী কুলীনের কুমারী সে, উদরে অন্ন জুটুক বা না জুটুক।

কিশোরী তাই চুপ করে আছে। এ নীরবতায় অপমান নেই, অহংকারের কাঁটাও না, শুধু বেদনা। শন্টিও তা অনুভব করছে। সঙ্কুচিতমুখে বললে, "যাবিনে তাহলে?"

"পিসীকে বলব। যদি রাজি হন, রাত্তিরে। মাকে বলিস।"

"ভাগ্যিস এই ঘরে জন্মাইনি, কেশর! না, তুই আর ওপারে যাসনে, আমাদের বাড়ি তোর পা ফেলবার যুগ্যি নয়।"

কিশোরী নিরুত্তরে ঘাড় হেঁট করল, চোখের জল তাই শন্টি দেখল না। ভ্রূকুটি করে বললে, "সত্যিই তুই মানী ঘরের মেয়ে হলে আমার মাকে অপমান করতিস না!"

এবার উত্তরে নূরজাহানের মরাল গ্রীবার উদ্ধত ভঙ্গি। ক্রুদ্ধ শন্টি তাও অগ্রাহ্য করে বললে, "দাদা তোর এই অহংকার জানে, ওর কথা শুনলে আমি আসতাম না। কিন্তু মা—"

কুপিতা ফণিনীর মতো ঘাড় তুলে কিশোরী বললে, "ঝগড়াঝাঁটির ভেতর মাকে টেনে আনা কেন শন্টি?"

"কেশর, শিরমাই থেকে তুই দূর হবি কবে? তোর এত অহংকার, তোর প্রত্যেক কথা বিষাক্ত।"

"শন্টি, তোর পায়ে পড়ি তুই চলে যা। এসব কথা কে তোকে শেখালো? যা শন্টি, চলে যা!"

"যাই, আর আসব না, আর দেখা হবে না, কেশর। যাই।"

"শন্টি!"

"না, আর ডাকিসনে, বড় দেমাক তোর।"

নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল কিশোরী। অনেকবার তো ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু এতখানি তিক্ততা কখনো প্রকাশ পায়নি। দিনান্তে যাদের পরিপূর্ণ আহার জোটে না, তাদের মর্য্যাদাজ্ঞান অপরের চোখে বাড়াবাড়ি, শন্টি নির্মমভাবে আজ সেকথাই বলে গেল।

কিন্তু ওই যে পাঠান পাড়ার ওপারে শিরমাইয়ের শীর্ণ রেখা, তারই চিহ্ন ধরে স্মৃতি চলে যায় দূরে, বহুদূরে, নদীরেখা যেখানে শীর্ণতর কিন্তু অনবলুপ্ত, যেখানে প্রকাণ্ড প্রাসাদ—ধ্বংসের হাত যার অঙ্গের সর্বত্র প্রসারিত,

তবু অতীতের যে স্তব্ধ সাক্ষী। একদিন ওই প্রাসাদেরই মালিক ছিলেন কিশোরীর মায়ের জ্যেঠামশায়। আজও সেই বংশের সেই শাখার ছেলে বেঁচে থাকলে এদের জীবনের ইতিহাস হত অন্যরকম। কিন্তু ছেলে নেই, আছে শুধু একটি মেয়ে, কিশোরীর সমবয়সী। সেই দুলালী কোন্ বড় সহরে মানুষ হচ্ছে, দুদিন পরে হবে রাজার ঘরের বউ।

এদিকে ধীরে ধীরে ধ্বসে পড়ছে প্রাসাদ, তবু রয়েছে তার চিহ্ন, তার মর্যাদা। সেই মর্যাদা কিশোরী কি ভুলতে পারে।

মানুষ কি কেবলই ধূলো আর মাটি? দারিদ্র্য কতদূর যায়? বড় জোর এই রক্তমাংসের দেহ পর্যন্ত। তার বেশি যারা যেতে দেয়, তারা তো ভিক্ষুক, তারা নগণ্য, তাদের সুখদুঃখ জীবন ও মরণ এই মাটিতেই লুপ্ত হওয়া ভালো। কিন্তু আকাশ, সে যে সুউচ্চ, সে মহান, তার গৌরব কি কোনোদিনই লুপ্ত হয়েছে? কিশোরী সে কথা কি করে ভুলবে!·····

নদীর বাঁকে শল্টির আঁচলের রঙটুকুও অদৃশ্য হল।·····নিশ্বাস ফেলে কিশোরী সরে আসে। ঘরের ভিতর জীর্ণতা, ঘরের বাইরে ছায়া। ছায়া প্রগাঢ়তর ওরই মনে। অতীতের স্মৃতি গৌরবের, কিন্তু স্মৃতিই যে সব নয়, সে তা জানে। শিরমাই—শীর্ণা শিরমাই, এই অঞ্চলের একদা প্রাণময়ী ওই নদী, আজ আপন ক্ষীণতার প্রতীক শুধু নয়, সুবিস্তীর্ণ বালুকার সমাধিশয্যায় ওযে চৌধুরীবংশেরই মৃতপ্রায় প্রাণস্রোত। ওর এপারে দারিদ্র্য। ওপারে কি? ধনবান নবীন?

ভাবলে কিশোরীর চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে। এপারে ধ্বংস ও প্রাচীন। ওপারে কী? আহার ও অপমান?

ভয়ে কিশোরী লুকিয়ে থাকে ঘরের কোণে; ওর বুকেও উদ্দীপ্ত নবীন, তবু নবীনকেই ওর ভয়। স্মৃতির পুরানো তাজমহল নিয়েই অন্তরে ওর লীলা, অতুলনীয় তাজমহল, হোক না তা ভগ্নপ্রায়—নতুন ইমারত কিছুই কি তার পাশে দাঁড়াতে পারে?

এমনি অদ্ভুত মন নিয়ে কিশোরী যেন আকাশ ছুঁয়েছে। তরুণ দেহখানি তপস্বিনীর মতো। প্রতি মুহূর্তে সেই দেহ স্পর্শ ক'রে চলে মর্ত্যের কঠিনতাকে।

তারই বেদনা যখন অতি দুঃসহ হয়ে ওঠে, তখন ওকে আশ্রয় নিতে হয় অভিজাতের আন্তর অভিমানে।

দরিদ্রের কি বিয়ে হয় না? কিন্তু কিশোরী যে অভিজাতকুমারী! শির-মাইয়ের দুই কূলে এমন যুবক কেউ নেই, সহজপথে ওর প্রার্থী হবার মতো দুঃসাহস যার আছে। পাণিপ্রার্থনার সহজ পথ নেই বলেই ওর পথে চলা দায়, বাইরে বিপদ, ঘরে উপবাস।

এই জীবন্ময়ী নূরজাহানের পদতলে পৃথিবীর বাসনা যখন আকুল হয়ে লুটাতে চায়, তখন সে নিভৃতে আপন অপরূপ রূপের মরণ কামনাই করে।

কিশোরী যখন নদীর ঘাটে যায়, সঙ্গে কেউ থাকে না। পরিচারিকা রাখবার মতন অবস্থা ওদের নয়। সুন্দরী মেয়ে একাকিনী নদীতে যায়—বিপদের সম্ভাবনা কখনো যে ওর পিসীর মনকে বিচলিত করেনি, তা নয়। তবে এটা পল্লীগ্রাম। ঘাটে যাওয়া প্রত্যেকের প্রতিদিনের অভ্যাস। সেই অভ্যাস থেকে হঠাৎ বিচ্যুত হওয়া সাধারণ পল্লীবাসির পক্ষে সম্ভব নয়। পিসীমা জানেন, যুবক ছেলেরা ওকে ঘাটে দেখবার জন্য লুকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে শুনতেও পান, "নীল শাড়িখানি নিঙাড়ি নিঙাড়ি", ইত্যাদি। শুনে দুঃখ যতই হোক, ভয় হয় আরো বেশি। কারণ কিশোরীর উজ্জ্বল ললাট দিনের মধ্যে কতবার যে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে—অপমানে! আঘাতকে প্রতিঘাতরূপে ফিরিয়ে সে দিতে পারে না, তাই বাজেও বেশি। ফলে, ওর অন্তরের আভি-জাত্য এই নোঙরামির মধ্যে কঠিন পাষাণের রূপ ধরতে লাগল। ওর মুখে যেন তাজমহলের ধবল গরিমা, অন্তরে যেন ভালোবাসা আর বেঁচে নাই—আছে গৌরবের সমাধি। গ্রামের তরুণরা ওর এই কঠোর পবিত্রতায় বশ না হয়ে বাইরের রূপেই শুধু বিবশ হতে শিখল; এবং কিশোরীও ক্রমে ভুলতে লাগল যে, মানুষের ভালোবাসায় 'ভালো' কিছুই কখনো থাকতে পারে। ওর দেহের প্রতি ভীত রক্তকণা পুরুষের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে; ও বুঝতে পারে না যে অনেকের গোপন সহানুভূতি ওরই কঠিন দৃষ্টির আঘাতে কখন শুকিয়ে গেছে, প্রেমের আলো সহানুভবের অভাবে কখন নিছক স্থূল, বন্য আসক্তির পর্যায়ে নেমে এসেছে।

শন্টির দাদা যামিনীকান্ত এমনই একজন। কিশোরীকে দেখেছে সে এতটুকু থেকে। চোখের উপর, ফুটফুটে মেয়েটি যেন হঠাৎ ফুটে উঠল; কালো শাড়ির বেড়ে তার মোহন রূপ ঢাকা পড়ে না, মোহনতর হয়। এই দেহের প্রতি লোভ হবে না, এমন অসাধারণ পুরুষ যামিনী নয়। অসাধারণত্ব শুধু ওর আসক্তির স্থির শিখায়। কবি ঔপন্যাসিকেরা এই নিয়েই কাব্য রচনা করে। কিন্তু কিশোরী ধনী প্রতিবেশীর এই অনুরাগের ভিতর কোনো মহৎ কাব্যের সন্ধান পায় না। যেখানে দুজনের মধ্যে সমস্তই অসম, অনুরাগ সেখানে কখনোই স্বচ্ছন্দ হয়ে ফুটতে পারে না। এর জন্যে সামাজিক ব্যবস্থা দায়ী, না মানুষেরই মন, সে আলোচনা বৃথা। তবে, ভালোবাসাকে যদি ফুলের মতন ফোটাতে হয়, তাহলে ফুল-ফোটাবার উপকরণও তো সব চাই। যারা আপনার ও পরের প্রকৃতিকে নেহাত স্থূল উপভোগের পাত্রে ঢেলে উপহাস করে না, তারাই বুঝবে—সূক্ষ্মপ্রকৃতির সক্রিয় মন নিয়ে কিশোরী কেন রইল সুদূরচারিণী; আর সেই মনস্বিনীর উজ্জ্বল আঘাতে জ্বলে পুড়েও যামিনীর স্নেহ ছাই হল না, হল অধিকতর বহ্নিপ্রয়াসী।

শিরমাইয়ের ওপারে যাওয়ার পথ তাই কিশোরী নিজের হাতেই রুদ্ধ করেছে। কেউ জানত না, এই আসল কারণ যামিনী ছাড়া কেউ নয়।

কচ ও দেবযানীর মাঝে ছিল এক অলঙ্ঘ্য ব্যবধান। তবু একদা তারা স্বর্গ সৃষ্টি করেছিল নিজেদের মনে। এই স্বর্গ প্রেমের। এই স্বর্গ থাকতে পারত, কিন্তু রইল না। কেন? কারণ প্রেমকে উপেক্ষার আঘাতে দীর্ণ ক'রে, একজন উঠতে গেল মর্ত্যমানবের অতি অগম্য ঊর্ধ্বে; আর শক্তিহীন হয়ে অন্য জন নামল একেবারে অতল গহ্বরে, বাসনার অন্ধকার শূন্যতায়। দুটিই চরম। সহজ মানুষ এই দুইটির কোনোটাই চায় না। তার জীবনে মেদিনীর মোহও আছে, আরো আছে ঊর্ধ্বদেশের আবেশ। সে এই মাটিতে ফুলও ফোটায়, আবার আকাশের তারার স্বপ্নও দেখে।

এমনি সহজ মানুষই ছিল যামিনী।

দয়া বা দানের সাহায্যে কিশোরীর মন পাবার দুরাশা ওর নাই। নিজের মনও ওর নিজের কাছে প্রহেলিকা নয়। দেহে ও মনে নিজের বাসনার স্পষ্ট প্রকাশ সে বুঝতে পারে, চিনতে কখনো ভুল করে না। সেই জন্য ওর মোহা-

বেশের মধ্যেও একটা করুণ নম্রতা ছিল। কিশোরীর উদ্ধত অভিমান এই নম্রতাকে কোনোদিনই চিনতে পারেনি। শিরমাইয়ের তরুণ যুবকদের লুব্ধ অত্যাচারে অত্যধিক নিপীড়িত হলে, ওর প্রতিশোধবাসনা এই যামিনীকান্তের প্রতিই দণ্ড উদ্যত করে রাখত। অবচেতন মনকে বুঝবার শক্তি থাকলে, এর কারণটা ওর মনে ধরা পড়ত। বুঝতে পারত, অন্তত ওর কাছে, যামিনী শির-মাইকূলের অপর সাধারণ যুবকদের একজন নয়। সে শন্টির ভাই, কিশোরীর শৈশবসাথি, ওর স্বর্গগতা জননীর স্মৃতিবাহিকা ইন্দ্রাণী দেবীর একমাত্র ছেলে। তাই যামিনীর কাছে ওর সূক্ষ্ম প্রত্যাশাও বেশি। সেই আশা যেদিন প্রথম ভাঙল—বেশি কিছু নয়, নদীর ঘাটে সামান্য একটু মুগ্ধ দৃষ্টির খোঁচায়—সেদিন কিশোরী যামিনীকে "পশু" নামে চিহ্নিত করেছিল, ক্ষমা করেনি। নিজে সে যে বিদ্যুৎ, আকর্ষণও করে ধাক্কাও মারে, এসত্য কিশোরী বুঝতে পারে না। তাই মানুষের সাধারণ দুর্বলতাকে সে কঠোরভাবে বিচার ক'রে অত্যন্ত ঘৃণা করল। সেই থেকে যামিনীর পরিবর্তন। লজ্জাকর পরিবর্তন।

কিশোরী মনে করেছিল যামিনী আর এদিকে আসবে না। ভুল বুঝেছিল। যামিনী আরো বেশিই আসে। ওর প্রীতির বুকে এতদিন যে লাজুক তরুণটি ছিল, নির্দয় অপবাদের অকরুণ আঘাতে তার সকল মাধুর্যের অপমৃত্যু হল। বেঁচে যে রইল সে বাস্তবিকই পশু।

ওই পশুর স্থূল প্রতিশোধের আবর্জনা বুকে নিয়ে শিরমাই প্রতিদিন পঙ্কিলতর হয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। তখন কিশোরীর হঠাৎ মনে হল পায়ের নীচে যেন মাটি নেই, আশ্রয় বা আশার কোনো দৃঢ় ভিত্তিই যেন নেই। যেন আকাশের সব সুন্দর তারা উল্কার মতন খসে বিশাল শূন্যে নিরাশ্রয় হয়ে চলছে। ও যতটুকু দেখল, ততটুকুই শুধু বিশ্বাস করল। বাকি যেটুকু যামিনীর মর্মের মধ্যে অগোচরে রইল, ওর মন তার মর্মগ্রহণ করতে পারল না। ফলে বিরোধ বেড়ে চলল, প্রকাশ্যে ও নিঃশব্দে।

দেখে শুনে পিসিমা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এই পিতৃমাতৃহীনা মেয়ের তিনিই একমাত্র অভিভাবিকা। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তার জন্য দায়ী তিনিই; অনেক ভেবে একটিমাত্র উপায় দেখতে পেলেন এই বিপদ

থেকে উদ্ধারের—বাঙলার হিন্দুমুসলমানের ঘরে ঘরে, নারীর আত্মরক্ষার ও নারীকে রক্ষার সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় উপায়, বিবাহ।

ওরা দুই আলাদা জগতের মানুষ, কিশোরী আর ওর পিসিমা। কিন্তু একটা জায়গায় ওদের স্বভাবে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সেটা হচ্ছে জেদ, নিজের ইচ্ছার প্রাধান্য অপরকে মানতে হবে, শাসক জাতের এই দুর্জ্জয় প্রত্যাশা। তাই এখন কথায় কথায় পিসিমা কাহিনী রচনা করেন যৌবনের নানা বিপদ সম্বন্ধে। কিশোরীকে জ্বালাতন করা নয়, সচেতন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু কিশোরী ভাবল পিসিমা ওকেই সন্দেহ করছেন। অভিমানিনী নিজের মধ্যে জ্বলে পুড়ে মরে।

এদিকে দেখতে দেখতে বর্ষা এসে পড়ল। দিগন্তে কালো রেখা। শিরমাইতে এবার ঝড় উঠবে। শিরমাই আর শীর্ণা নয়, দোহাজারির * শৈল মালার অসংখ্য গিরিনির্ঝর অফুরন্ত কলনিস্যন্দনে যার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এই সেই শিরমাই—পরিপুষ্ট অঙ্গ, প্রবল স্রোত, প্রমত্ত প্রাণ। এখন দুরন্ত মেয়ে শর্টি আসে না এর তীর বেয়ে, আসে গেরুয়া বন্যা, শৈলজ স্বপ্ন। দূরে রাজপুরের কেল্লার তিন পাশে মেখলার মত দুলছে এর গৈরিক স্রোত। প্রাচীন দুর্গ, শত্রুর হাতে শতবার বিধ্বস্ত, তবু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নি। পতনোন্মুখ অনেক ভগ্ন অংশ বাদ দিয়েও ব্যবহারের উপযুক্ত বহু কক্ষ পাওয়া যায়। চৌধুরীদের বর্তমান নায়েব আজকাল অধিকাংশ সময় এখানেই থাকেন। লোকে জানে তিনিই দুর্গপতি এবং বলে যে, এই উপাধিতে তাঁর অধিকারও আছে। পিতামহ নাকি এই বাড়িরই জামাই ছিলেন। তখনকার দিনের অনেক বনিয়াদী রক্ত-স্রোত এক হয়ে একদা প্রবল ভাবে রাজত্ব করেছিল এই রাজপুরের কেল্লায়। মগ ও ফিরিঙ্গির প্রতাপ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুর অধিবাসীরা দূর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। করবারই কথা, কারণ আক্রমণকারীরা শুধু যে রাজপুরের দৌলতের লোভে আসত তা নয়, দুর্গ-অঞ্চলের অলোকসামান্য রূপও তাদের এক প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল।

চৌধুরীরা নগরবাসী হবার বছরকয়েক পরেই রাজপুরের প্রবল প্রতাপ কমতে আরম্ভ করে। কিন্তু ওই যে চিরবসন্তময় শঙ্খ-উপত্যকার সমস্ত উর্বর

* চট্টগ্রামে, শঙ্খনদীর উপকূলে।

মাটি যেন সন্তানবতী হবার উদগ্র কামনায় চারিদিকের আকাশে সহস্র গাছের ফলন্ত ও ফুলন্ত প্রদীপশিখা তুলে ধরেছে, সারা বছর এখানে প্রকৃতির এই যে আরতি যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত, চোখে দেখে নায়ের মন্মথ যে নূতনভাবে এই রূপময় জন্মস্থানের মায়ার পড়বেন, তাতে আশ্চর্য কি।

কিন্তু লোকে বলে, সম্প্রতি রাজপুর দুর্গাধিপতির মন ভোলাবার আসল দৌলত রয়েছে শিরমাইকূলের এক জীর্ণ অট্টালিকার জীর্ণতর অন্দরে। কেল্লার এদিকে নবাবী আমলের ঝিলিমিল দেওয়া বহু গবাক্ষ এখনো অভগ্ন অবস্থায় শঙ্খকন্যা শিরমাইর বুকে আপন প্রতিবিম্ব দেখে। কোনো চাঁদিনী রজনীতে চকিত পদ্মের মতো কোনো একখানি মুখ শিরমাইর জলকেলিতে ফুটে ওঠে কিনা জানি না, তবে চৌধুরীদের ঘরের মেয়ের জীবনস্রোতে যে স্বচ্ছন্দবিহার নেই, তা সকলেই জানে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, পিসিমাই কোনো যাদু জানেন।

সে যাই হোক না কেন, জীবনকে কিশোরী যেভাবে চেয়েছিল, জীবন আজ ওকে সেই ভাবেই ধরা দিতে এসেছে—মানে সম্মানে আভিজাত্যে। রোমান্সকে পেয়েও যে পায় না, একটা বিরাট ক্ষতি তার অন্তর্জীবনকে হয়ত ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে, সেই ক্ষতি নিভৃতের। কিন্তু মানুষের যে অংশটা নিভৃতের নয়, সেখানে রোমান্সের নিঃশব্দচারী ফুল ঝরে যায়, উদ্ভট কবি-কল্পনা বলে মন তাকে প্রত্যাখ্যান করে। কিশোরী এখন সেই সন্ধিক্ষণে।

এবার যেন শিরমাইয়ের ইতিহাসের ধারা উল্টো স্রোতে বইতে লাগল—কিশোরীর সূক্ষ্ম অত্যাচার আর যামিনীর নিরাশার নিশ্বাস বুকে নিয়ে। কিশোরীর মনে হল, এইবার সে স্বচ্ছন্দে ওপারে যেতে পারে।

পিসীর হাত ধরে অন্ধকার রাতে—সুনীল বোরখাপরা আকাশের মতো—মুখ ঢেকে কিশোরী চলল ধরণীকান্ত রায়ের বাড়ি। গুণ্ঠনের ফাঁকে দেখা যায় দুটি উজ্জ্বল চোখ, তারার মতনই জ্বলছে।

দেউরীতে দরোয়ান; কিশোরী ওদিকে না গিয়ে ঘুরে অন্দরের পথে চলল। এবাড়ির অলিগলি সমস্তই ওর জানা। ওদিকে ধরণী রায়ের ঘর, হাওয়ায় জোরালো কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। এদিকে একটা বাতাবী লেবুর গাছ, তার পাশেই ইন্দ্রাণী দেবীর ঘরের জানলা। কিশোরী ওখানে গিয়ে তাঁকে ডাকবে।

প্রদীপের আলোর একটু কম্পমান আভাস, ঘরে নিশ্চয়ই তিনি আছেন।

কিন্তু না, এ কার কণ্ঠ ?

কিশোরী ও পিসিমা স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল·····"শন্টি, আমি ওকে অপমান করিনি, কোনোদিন না। কিন্তু ওর আমার উপরেই যত রাগ। ছেলেরা কি করে, তার জন্যে আমায় কেন দায়ী করবে ও ?"

"তুমি যে দলপতি, দাদা।" শন্টি বলছে।

"মিথ্যে কথা।"

"কিন্তু কেশর মনে করে, তুমি ইচ্ছা করলেই তাদের থামাতেও পারতে।··· দুজনেই তোমরা রাগী। আসল কথা দাদা, তুমি ওকে ভালোবাস।···তেমন ক্ষেত্রে হার মানতে হয়।·····যাই হোক, এ নিয়ে আর ভেবো না ; ওরা হ'ল ব্রাহ্মণ, আমরা তা নই, তোমার ভালোবাসাকে ওরা সন্দেহ করবেই, বিশেষতঃ কেশর নিজে।"

"ওকে বলিস," অত্যন্ত শান্ত অতি দুঃখিত সুরে যামিনী বললে, "'আমি বর দিনু দেবি, তুমি সুখী হবে'!·····শন্টি, যদি বোঝাতে পারতাম যে আমি বাস্তবিক কোনোদিন ওর অমঙ্গল চাইনি!"

"বুঝবে দাদা, বুঝবে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন।"·····

* * * *

বাতাবী লেবুর ফুলের গন্ধে আকাশ যেন মদির হয়ে উঠেছে। কিশোরীর অদ্ভুত লাগল সব, এই রাত্রি এই অন্ধকার, অপরিচিত এক ব্যথা। এরা দুই ভাইবোনও কি আজ নতুন হল ?

কিশোরীর চিরদিনের গর্বিত চিত্ত অনুরাগে ও অনুকম্পায় পরিপূর্ণ হয়ে আজ প্রথম দেখল, ওর একই হৃদয়ে রয়েছে দুই নারী, একজন মাধুরী অন্যজন মহীয়সী। একজন স্নেহের বাণী শুনতে লালায়িত, অপরা সগর্বে শির উঁচু করে দাঁড়ায় স্নেহপিপাসার ঊর্ধ্বে।

পিসিমা বিরক্ত হয়ে বললেন, "হল কি তোর ? ফিরে যাই চল্।"

ফিরে চলল—জয় করতে এসে যেন ওরা পরাজিত হয়ে ফিরে চলল।

এর পরে কি হ'ল কে জানে ; কিন্তু সেই রাতের অভিসারকে ভুলে যাওয়া পিসিমার পক্ষে সহজ হল না। কিশোরীর মুখের ভাবে, চোখের স্বপ্নময় দৃষ্টিতে এখন তিনি প্রতিদিনই নতুন কিছু দেখেন। এই নূতনত্ব তাঁকে অনুক্ষণ পীড়া দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কল্পনাও যেন সহস্রচক্ষু হয়ে উঠল। যে কথা মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করা যায় না, তাঁর চোখের জ্বালাতেই তা জ্বলতে থাকে। এই নীরব অত্যাচার যে নীরবেই কত প্রবল হতে পারে, তা বলবার নয়।

সেই রাত্রের ব্যাপার কিশোরীও ভুলতে পারে নি। ওর যৌবনারম্ভ থেকে শিরমাইয়ের দুই তীরের পুরুষেরা ওর উপর কেবলই অসংযত কটাক্ষের দস্যুতা করে এসেছে। তবু এত লোকের মধ্যেও, যামিনীর মতন বেপরোয়া কেউই ছিল না। অতএব সব দিক থেকেই সে কিশোরীর একান্ত ঘৃণার পাত্র। ওর কোনো লোভ কোনো কাপুরুষতা এই মেয়েটির মনকে জয় করতে পারেনি। কিন্তু দুটি মিষ্ট কথা, কণ্ঠস্বরে একটু অশ্রুর আভাস, কিশোরীর অনভিজ্ঞ মনে এক আশ্চর্য রোমান্স সৃষ্টি করল।

তা বুঝে পিসিমা যখন তখন অন্যায় আক্রোশ দেখিয়ে বলেন, "ধরণী রায়ও কি জেগে ঘুমায় ?"

শুনে কিশোরী অবাক হয়। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পাঁচ খানা গ্রামের কেউ ধরণীকান্তকে এমন অপবাদ দেয়নি। কিন্তু এরকম রসাল গালাগাল পাড়াগাঁয়ে অতি সত্বর ডালপালা ছড়ায়। যামিনীর মা সেকথা শুনে মনে মনে ভাবলেন, "কেন এরকম হল ? পরের মেয়েকে নিজের বোনের মতো ভাবতে আমি কি শেখাইনি ওকে ? এমনি কুপুত্রের মা হলাম আমি!"

ধীরে ধীরে, একাধিক লোকের ছোট ছোট আবেগ, ছোট ছোট প্রাণবেগ থেকে, উৎসারিত হতে চলল বড় ঘটনা।

কথাটা ইন্দ্রাণী দেবীও না শুনলে আরো কিছুদিন দেরি হ'ত। কিন্তু যে দিন শুনলেন সেদিন দুপুরে তিনি খেলেন না। সারাদিন ঘরে দোর বন্ধ করে রইলেন। ধরণীকান্ত অনেক কষ্টে তাঁকে শান্ত করে বললেন, "এমন করছ কেন ?"

"তুমিই বা সব শুনেও চুপ করে আছ কেন ?"

"কি করতে বলো ?"

ইন্দ্রাণীর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়ে উঠল, "জানো না কি করতে হয় ?"

"ইন্দ্রাণী, আমি জেগে নিদ্রা দিই একথা সত্য নয়। কিন্তু শাসন করতে বলো কাকে ? একটি যুবক, আর একজন যুবতী। তারও চেয়ে বড় কথা এই, কি দেহে কি মনে, কি রূপে, কি গুণে, কেশর সামান্য নয়। ওর এই অসামান্যতা যে আমার ছেলেকে আকর্ষণ করে, তাতে আমি একটুও আশ্চর্য হইনি। আশ্চর্য হচ্ছি তোমারই ছেলেমানুষিতে। শাসন করতে বলে তুমি কি আমাকে ওদের সর্বনাশ করতে বলো ?"

"বলো কি তুমি ? অনাচার চুপ করে সহ্য করবে ?"

"অনাচার কোথায় দেখলে ? ভালোবাসা তো অনাচার নয়, ইন্দ্রাণী। তোমার মনে আছে, কেশর আমাদের শন্টির সই ? ওরা দুটি বোনের মতো খেলা করত, তোমাকে মা বলত, যামিনী ছিল ওদের ভাই।"

"কিন্তু—"

"জানি ইন্দ্রাণী, জানি। কিন্তু তুমিও শোনো—মানুষের মনের এই কিন্তুই ভালোবাসার পতনের কারণ। তোমরা মানুষকে যেমন দেখতে চাও, সে তেমনিই হয়। যামিনী যা হয়েছে, তা তোমাদের দোষেই হয়েছে। তুমি কি আরো ছোট করতে চাও ওকে ? তবে যাও—শাসন করো, সন্দেহ করো, অপবাদ দাও, নিন্দা রটাও—যা খুসি করো।"

অনেক ভেবে ইন্দ্রাণী বললেন, "কেশরের সঙ্গে আমি একবার দেখা করব ?"

"বেশ তো।"

পরদিনই ইন্দ্রাণী ওপারে গেলেন।

পিসিমা বাড়িতে ছিলেন না। কিশোরী ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে বললে, "মা, তুমি কেন এলে ? আমাকে কেন হুকুম করলে না ?"

"চুপ কর্ কেশর। না, আসন আনতে হবে না। তুই বরং আর একটু কাছে আয়।.....কী সুন্দর হয়েছিস দেখতে! একেবারে মায়ের ছবিখানি। মাকে তোর মনে পড়ে ? তোর মাসিরাও সুন্দরী ; বড় মাসিমার বাড়ি ঢাকায়। জানিস তো ?"

"জানি।"

মৃদুকণ্ঠে ইন্দ্রাণী বললেন, "যাবি মা সেখানে ? আমি নিজে গিয়ে রেখে আসব।"

ইন্দ্রাণী দেবী সমস্ত জেনে শুনেই এসেছেন তাহলে! এতক্ষণ বোঝা উচিত ছিল কিশোরীর।

দুজনেরই লজ্জা করছিল, দুজনেই দুজনের মনের কথা বুঝতে পারছিল। তবু কেউ কাউকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল না।

হঠাৎ কিশোরী চমকিত হয়ে বললে, "মা, তুমি কাঁদছ কেন ?"

"কাঁদি কেন ? অপমানে। কেশর, ছেলেকে যদি কোনোদিন ক্ষমাও করি, তোকে ক্ষমা আমি করব না।"

"মা !"

"ওনামে আর ডাকিসনে। আমার মেয়ে হলে আজ বলে দিতে হত না—ভালো যারা বাসে, শাস্তি নেবার অধিকার তাদেরই। যা, সরে যা আমার কাছ থেকে। নিজের সম্মান নিজে রাখতে না জানলে ও মুখ আর দেখাসনে।"

দলিতা ফণিনীর মতো বেগে কিশোরী উঠে দাঁড়াল, মুখে কথা নেই, চোখে তীব্র জ্বালা ; তবু যামিনীর মার দয়া হল না, নির্মমভাবে বললেন, "আমি জানি তুই ওকে ভালোবাসিস। সমাজের উপর অভিমানে, নিজের দুর্ভাগ্যের ব্যথায়, তোর বুকের ভিতরটা পুড়ে যায়। যামিনী পায় তারই শাস্তি। আরো পাবে—মন্মথ রাজপুরে এসেছে যে! মেয়েদের জন্যে পুরুষ পুরুষও হয়, বয়স্ক শিশুও সাজে, বুড়ো বামুন নির্লজ্জ। তাঁর কথা আমি ভাবি না। কিন্তু ওঁর গলায় মালা দিয়ে যেদিন তুই মরবি, সেই দিন যামিনীও অন্তরে মরে যাবে। এই তোর প্রতিহিংসা, না কেশর ?"

কিশোরী কথা বলতে গেল, ইন্দ্রাণী বাধা দিয়ে বললেন, "কিন্তু তোর ভালোবাসা যদি এতই প্রতিহিংসা খুঁজে না বেড়াত, শাস্তি যামিনীকে না দিয়ে, নিজেই তুই নিজের বিচার করতিস। ছি কেশর, কাঁদিসনে, মনে রাখিস আমি তোর মা।"

"তবে শাস্তিও মায়ের হাত থেকেই আসুক—বলে যাও কি করব !"

"বড় হবি, সুখী হবি—মায়ের হাতের শাসন আর কী দিতে পারে ? বাকিটুকু তোরাই বুঝে নিবি, আমি চললাম।"

ইন্দ্রাণী এসেছিলেন—কথাটা শোনামাত্র পিসিমা ভয়ানক সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। এরা সকলে মিলে কেন যে তাঁর সুন্দরী ভাইঝিকে নিয়ে এতখানি মাতামাতি করছে, পিসিমা অনেক ভেবেও তার কোনো কারণ খুঁজে পান না। কিন্তু এইটা তিনি বুঝতে পারলেন, আর বেশি দেরি করলে রাজপুরের নায়েবের মতো বড় কুলীনের সঙ্গে ওর বিবাহের আশা একান্ত দুরাশা হয়ে দাঁড়াবে। মন্মথ নিঃসন্তান, পুরুষজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কিশোরী তাঁর কাছে অপরূপ, একমাত্র আশার কারণই এই। কিন্তু মেয়েদের সুনাম ? সে তো পদ্মপাতায় জলবিন্দু।

ভাবনায় পিসী আকুল হয়ে উঠলেন এবং ইজ্জত রক্ষার অন্য উপায় নাই ভেবে, কিশোরীকে তিনি আপন গৃহেই প্রায় কারাবন্দিনী করলেন। নিজে ছোট কাজে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু দুঃসংবাদবাহী নানা ভগ্নদূতের আবির্ভাবে রায়বাড়ীতে ইন্দ্রাণীরও দুপুরের স্বল্প অবসরটুকু পরিক্লান্ত হয়ে উঠতে লাগল। বিরক্ত হয়ে ইন্দ্রাণী ভাবলেন, কেন পিসীর এই অত্যাচার ? বড় ঘরে কত কুলীনকুমারী আজীবন শুদ্ধাচারিণী অবিবাহিতা থাকে, সে অনেক বেশি গৌরবের। কিশোরী নিজে এই বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে, এই বিশ্বাস ইন্দ্রাণীর এতই দৃঢ়মূল ছিল যে, শর্টির কোনো হুতাশে তিনি কর্ণপাত করলেন না। কিন্তু বুঝতে পারলেন, যামিনীকে নির্বাসনে না পাঠালে শিরমাই কূলের এই অশান্তি মিটবে না।

ধরণীকান্ত বললেন, "কোথায় পাঠাবে ছেলেকে ?"

ইন্দ্রাণী সংক্ষেপে বললেন, "কেন ? কলকাতায়। আমিও সঙ্গে যাবো।"

যাত্রার আয়োজন চলতে লাগল।

শিরমাই-উপত্যকা যেখানে শেষ হয়েছে, সেই দিগন্তপ্রসারিত সমভূমিতে সেরপুর গ্রামের আরম্ভ। সেখানেই বিখ্যাত খাঁয়ের দীঘি, রাজপুরের চৌধুরী পরিবারের সমাধিচত্বরও সেখানে। অতীতের ভগ্নস্তূপ সামলাবার জন্য, খাজনা আদায়ের জন্যও, নায়েবকে প্রায়ই এদিকে আসতে হয়। এক দিন হঠাৎ শোনা

গেল, সেরপুরের প্রজারা তাঁকে খাজনা দিতে অস্বীকার করে বলেছে—রাজপুরের প্রকৃত মালিক তিনি নন। চৌধুরীদের বিরাট জমিদারী পাঁচ ভূতে খায়, সত্য হলেও এতদিন পরে কথাটা অত্যন্ত অদ্ভুত শোনালো। মন্মথ ব্যঙ্গভরে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, প্রকৃত জমিদার কে ? উত্তরে প্রজারা বললে, গবর্ণমেণ্ট। নায়েব আরো ব্যঙ্গ করে উত্তর দিলেন, "গবর্ণমেণ্ট, না রায়পুরের ধরণীকান্ত রায় ?"

কথাটা পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। শুনে ইন্দ্রাণী স্তম্ভিত হয়ে বললেন, "এর অর্থ ?"

ধরণীকান্ত হেসে বললেন, "বুঝতে পারছ না ? অনর্থই এর অর্থ। দেখছ কি ইন্দ্রাণী, শিরমাইয়ের শান্ত হাওয়ায় এবার যে রাজনৈতিক ঝড় ঢুকল, কেশর রাজপুরের দুর্গবাসিনী না হওয়া পর্যন্ত সে ঝঞ্ঝা আর থামবে না।"

"কিন্তু তার সঙ্গে রায়পুরের কি সম্পর্ক ?"

"সম্পর্ক নেই ? রায়পুরের রায় কি যামিনীর পিতা নয় ? কেশরের পিসী বাস্তবিকই শাহজাদী।···শাহজাদী হলে তুমিও বুঝতে পারতে, শত্রুদমনের জন্যে রাজরাজড়াদের কতরকম কূটনীতির আশ্রয় নিতে হয়।"

"তবে তোমার এখানে থেকে কাজ নেই, কলকাতায় চলো।"

"তা হয় না। রাজপুরের মতো রায়পুরও সাহসের স্পর্দ্ধা রাখে, একথা মন্মথকে ভালো করে বোঝানো দরকার।"

"তাহলে আমিও রইলাম তোমার পাশে, শর্টিকে নিয়ে যামিনী যাক কলকাতায়।"

দুইদিন না যেতে, কিশোরীও সমস্তই শুনল। ওর সূক্ষ্ম বুদ্ধি রাজপুর ও রায়পুরের বিরোধের অন্তস্তলে প্রবেশ ক'রে, প্রকৃত রহস্য ভেদ করল অনায়াসেই।

সামান্য একটা বীজ, তার থেকে প্রকাণ্ড মহীরুহের উদ্ভব। ছোট্ট এই শিরমাই, তার চারিপাশে একি বৃহৎ রোমাঞ্চকর বিপ্লব !

কিন্তু, কেন ? নারীর জন্য !

নররক্তলোলুপ এই দুর্গ্রহ এখানে ঢুকল কোথা দিয়ে ? নারীর রূপে ?

* * *

বৈশাখী সন্ধ্যায় সেদিন ঝড় উঠেছে।

রায়বাড়ির সম্মুখের জলাশয়ের নাম পদ্মদীঘি। অতল-তল কালো জলে এখন পদ্মফুলের চিহ্নমাত্র নেই, কোনো এক সময়ে হয়ত ছিল, পুকুরটা নামে আজও সেই গৌরব বহন করে চলেছে। অতি উঁচু বৃহৎ পাড়, বিপুল জলরাশি আকাশের নীচে নগ্ন, হাওয়ার দোলে তরঙ্গকুটিল।

দূরে সেই দুর্গ।···প্রবাদ এই, রাজপুরের গৌরবের দিনে, শঙ্খনদীর সঙ্গে যেমন শিরমাইর, তেমনি শিরমাইয়ের সঙ্গে দুর্গপরিখার, আবার তারও সঙ্গে এই দীঘির জলের গোপন যোগাযোগ ছিল। হতে পারে এসবই বাড়ানো কথা, প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে লৌকিক মনের গল্পরচনা। কিন্তু এসব প্রবাদ যারা রটনা করে, তারা কে? দরিদ্র নিরক্ষর সরল চাষী, পাহাড় জঙ্গল ও নদীসমাচ্ছন্ন দেশের অনাগরিক অধিবাসী; এদের পৌরুষে বনের শ্রী, বীর্যে বনানীর বন্ধুরতা; এরা একদিকে কোমল অন্যদিকে কঠোর; এদের ঝোপেঝাড়ে পরীর নৃত্য, কল্পনায় কল্পকল্পান্তরের গল্প। কাগজের পৃষ্ঠায় এরা উপন্যাস রচনা করে না; প্রকৃতির লতায় লতায় পাতায় পাতায়, ফুলে ও ফলে, মৌমাছি ও ভ্রমরে, যে আনন্দ নিত্য নূতন রূপে বিকশিত, এদের ক্ষুধাতুর মন পিপাসার্ত হৃদয় বুভুক্ষিত প্রাণ জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সর্বদাই তারই থেকে সঙ্কলন করে যুগবাহন রোমাঞ্চকর রোমান্স।

এদের কাছেই শুনেছি, এক সময়ে আরাকানীরা মুসলমানদের সঙ্গে এই খানে কোথাও ঘোরতর যুদ্ধ করেছিল। ধরণীকান্ত রায় রায়বাড়ির চারিদিকের গড়কে গভীরতর করে কাটাতে গিয়ে, ভূগর্ভ-উত্থিত এত নরমুণ্ডের মালিক হয়েছিলেন যে, ভয়ে অগত্যা তাঁকে ক্ষান্ত হতে হয়। এবিষয়ে ছোট মেয়ে ওই শনুটিকেও একটি বৃহৎ গল্পসংগ্রহ বলা যেতে পারে।

সত্য-মিথ্যা জানি না, কিন্তু পদ্মদীঘির পাড় রণনিহত অসংখ্য অভাগার কবরস্তূপ তো বটেই, তাছাড়া তার উত্তরপূর্ব ও পূর্বদক্ষিণ দুই কোণে যে দুইটি বিরাট বট ও অশ্বত্থ বিশাল ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, তারাও নাকি এক প্রাচীন অনৈতিহাসিক যুগের সাক্ষী। এই বাড়ির অন্তঃপুরিকারা আজও ঐ দুই বৃক্ষদেবতার উদ্দেশে সন্ধ্যায় ঘিয়ের প্রদীপের পূজারতি পাঠিয়ে দেয়। সকালে সুগন্ধ ফুলও কারা ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

অসংখ্য পেয়ারাগাছের জঙ্গলে এদিকটা এতই অস্বচ্ছ ও অন্ধকার যে, বৃক্ষতলে প্রদীপ জ্বললেও দূর থেকে তার কোনো আভাসই পাওয়া যায় না। ঝড়ের প্রকোপে আজ বোধ হয় একেবারেই নিভে গেছে।

প্রবল ঝড়, একটানা কি ভয়ঙ্কর শব্দ! অদূরে শঙ্খ নিশ্চয়ই আজ উন্মত্ত, এখানে দীঘির বুক ফুলে ফুলে উঠেছে, কখনো বা তরঙ্গের মত্ততা একান্ত কিনারের অপরিসর ও শৈবালাকীর্ণ নলখাগড়ার বনে প্রতিহত হয়ে দুর্দমবেগে মধ্যভাগে ফিরে যাচ্ছে।

এমন অসময়ে যামিনী এখানে। বৈশাখীর কালী-নৃত্য বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখছিল, হাতে বন্দুক—যামিনী ভালো শিকারী।

হঠাৎ বিদ্যুত ঝলকে পাশের পেয়ারাজঙ্গল ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হতেই মনে হল ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে। রায়েদের শত্রুর অভাব নেই, কাছে গিয়ে ভালো করে দেখবে কিনা ভাবছে—অত্যন্ত মৃদুস্বরে কাণের কাছে কে বললে, "শোনো!"

চমকিত যামিনী দুই পা পিছু হঠে গিয়ে বললে, "কিশোরী!"

আবার তেমনি মৃদুকণ্ঠে কিশোরী বললে, "চলে যাও, দেরি কোরো না।"

বাইরে প্রকৃতির তেমনি দাপাদাপি, কিন্তু ঝড়ের আন্দোলন শান্ত হল—যামিনীর বুকে। বন্দুক নামিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, "কেন?"

দূরে রাজপুরের কেল্লার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোরী, কিছুই বলল না।

তখন অনেক কথাই মনে পড়ল যামিনীর, মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল, শ্লেষ করলে, "কেশর কি আজ আমাকে নতুন জানলে?"

অস্পষ্ট আলোকে, আয়ত চোখ দুটি ফিরিয়ে কিশোরী যামিনীকে ভালো করে দেখল, দেখতে দেখতে যামিনীর চেয়েও কঠিনতর কণ্ঠে বললে, "আজ কেন? অনেকদিন থেকেই জানি। কিন্তু আমাকেও তো তুমি চেনো?···যদি চলে না যাও, যদি কথা না শোন—"

"যদিই না শুনি? কি করবে তুমি কেশর?"

উত্তরে, আর একবার রাজপুরের দিকে তাকিয়ে, কিশোরী ধীরে ধীরে ফিরে চলল। যামিনীর বুকে ঝড় মুহূর্তের মধ্যে আবার উদ্দাম হয়ে উঠল, কম্পিত কণ্ঠে বললে, "রায়েরা কি কাপুরুষ? কেশর।"

পাশের পেয়ারাজঙ্গলের ঘন অন্ধকার আবার যেন নড়ে উঠল, কিন্তু ওরা কেউ তা দেখল না। যামিনী কেবল শুনল, কিশোরী বলছে, "মাকে বোলো, ব্রাহ্মণের মেয়ে নিজের সম্মান নিজেই রাখতে জানে, বিয়ে সেজন্যে নয়।"

"তবে কিসের জন্যে ?"

ফিরে দাঁড়িয়ে কিশোরী বললে, "রক্তমাংসের এই দেহ, কী ই বা তার মূল্য !"

যামিনী চোখ সরিয়ে নিলো, কত নররক্তের প্লাবনে যে যাচাই হয়ে গেছে অমূল্য কোহিনূর, কত সের খাঁর লুণ্ঠিত শির রঞ্জিত করেছে সম্রাটের বিবাহ-বাসরকে—দেহ নাকি মূল্যহীন !

অশ্রুর একটি বিন্দু—কিশোরী তা ঝরতে দিল না, বহুদূর-দিগন্তের ভয়ঙ্কর মেঘের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল।

যামিনীই প্রথম কথা বললে, "ক্ষমা কোরো আমাকে, দুদিন পরেই চলে যাবো, কোনো ভয় নেই তোমার।"

কিশোরী একটু হাসল—নিজের মনকে ছাড়া ভয় কা'কে ? কিন্তু ওকথা যামিনীকে বলা কেন ?···ফিরে চলল।

"কেশর, কথা দিয়ে যাও !"

অক্ষম আবেগে দাঁত দিয়ে অধর চেপে ধরল কিশোরী, উত্তর দিল না।

আবার যামিনীর আর্ত্ত অনুরোধ···"মায়ের সঙ্গে ঢাকায় যাও, নিজের উপযুক্ত পাত্র খুঁজে বিয়ে করো, রাজপুরে নয়, কেশর ! এমন কঠিন শাস্তি দিও না আমার অপরাধের !"

আবার কিশোরী ফিরে দাঁড়াল—এবার পেয়ারাজঙ্গলের অত্যন্ত কাছে—অপলক চোখে যামিনীকে দেখতে দেখতে বললে, "এর চেয়ে বড় শাস্তি কি তোমার নেই ?"

"না, নেই।"

"তবে—"

আশার বিদ্যুত ফুটল যামিনীর চোখে। কিশোরীর চোখেও শাণিত ইস্পাতের মতো বিদ্যুত ঝক ঝক করে উঠল—আশার নয়, আত্মহত্যার।

যন্ত্রচালিতের মতো বললে, "শপথ ছিল—"

"কি ? কী শপথ ছিল, কেশর ?···শাস্তি দিতে হবে—এই শাস্তি ?"

কিশোরী তেমনি ভাবে চেয়ে রইল।

বুকের স্তম্ভিত বেদনাকে সবলে নিপীড়ন করে যামিনী আরো কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কাছেই পরুষ কণ্ঠে কে বললে, "চমৎকার, রাজকুমারি ! রাজপুরের সঙ্গেও এইটে ঠাট্টাই তা হলে ?···"

বলতে না বলতে, যামিনীর হাত থেকে বন্দুকটা কি পড়ে গেল, না কেউ কেড়ে নিলো—ঝড়ের দাপটের সঙ্গে মিশে গেল যে ভীষণ গর্জন তা ঐ আগ্নেয়াস্ত্রের না বজ্রপাতের, কিছুই যামিনী ঠিক বুঝতে পারল না। ঝড় ও অন্ধকার দীর্ণ করে ওর দুই কাণে বাজল শুধু মৃত্যুযন্ত্রণাবিদ্ধ এক নারীকণ্ঠ, তারপর মুহূর্ত্তের বিদ্যুতালোকে দেখতে পেলো অদূরে ভূলুণ্ঠিত রুধির রঞ্জিত বহ্নিলতা···দুই হাত যামিনীর সিক্ত হল প্রিয়তমার বুকের বিক্ষত রক্তপুষ্পের অনিবার্য স্রোতে··

তারপর ?

তারপর, সেই দরিদ্র নিরক্ষর সরল চাষীদের মুখেই শুনেছি···কত যোদ্ধা ও কত বীরের মরণস্মৃতি বুকে নিয়ে পদ্মদীঘির বহু শতাব্দীর অস্থিজর্জর মাটি আবার মৌন, আবার স্তব্ধ হল।

শ্রীজ্যোতির্মালা দেবী

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মুসলমান সমাজে 'লোকাচার'

এই প্রকারের ইসলামীয় সমাজে লোকাচার (custom) বিশেষভাবে বলবৎ হইয়া আছে। অনেকস্থলে আইন বিষয়ে শরিয়ৎ (ধর্ম্ম-আইন) প্রয়োগ হয় না, জাতিগত আচার বা রেওয়াজ-রীতিই প্রয়োগ হয়। এই জন্য লোকাচার এবং তৎপ্রসূত আইন আদালতে গ্রাহ্য হয় (১)। এই বিষয়ে আদালতের অভিমত এই যে একটি বিশিষ্ট মুসলমান জাতি তাহার জাতির আচারাদি (rules) মানিয়া চলিতেই বাধ্য ("The courts have held that Muslims of a particular caste must be bound by the rules of that caste.")

এই প্রকারে লোকাচার বা দেশাচার হিন্দু-সমাজের ন্যায় মুসলমান সমাজের অনেক জায়গায় ঘাড়ে চাপিয়া আছে। মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও এই সকল লোক প্রাচীন লোকাচার-বিমুক্ত হইতে পারে নাই।

উভয়ধর্ম্মের ভাব-বিনিময়

এক্ষণে অনুসন্ধানের বিষয়, উভয় সমাজের ধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাতে কি নূতন বিবর্ত্তন হইয়াছে। একথা সত্য যে তুর্কি-মুসলমান আক্রমণের পর হিন্দু-সমাজ তাহার পুরাতন খুঁটি ধরিয়া বসিয়া থাকে নাই। হিন্দু সমাজে বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; বাহিরের আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ কমঠাবস্থা সঞ্জাত সংরক্ষণশীলতার ফলে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই-যুগে ব্রাহ্মণদের রচিত 'নিবন্ধ'গুলিই উক্ত পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং বিজ্ঞানেশ্বর ও রঘুনন্দন প্রভৃতির নিবন্ধাদিই উহার প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। এই কমঠ-বৃত্তির ফলে একদিকে যেমন হিন্দুর গোঁড়ামি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি একটা উদার মতের আন্দোলন সর্ব্বত্র উদ্ভূত হয়। ভারতে ধর্ম্ম

১। S. Roy, 'Customs and Customary Law in British India, pp. 379-80.

সংস্কারকেরা উদয় হইয়া হিন্দু ও মুসলমানদের একত্রিত করিবার জন্য প্রযত্ন করেন। উত্তর ভারতে এই প্রকারের আন্দোলনগুলিকে "সন্তমত" বলা হয়। এক্ষণে দেখা যায় যে এই আন্দোলনগুলি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই গোঁড়ামি ও ধর্ম্মান্ধতার নিন্দা করে এবং তাঁহাদের ধর্ম্মভাবকে এক নূতন খাতে প্রবাহিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। ইহারা উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে একতা ও মৈত্রীভাব আনয়ন মানসে সবিশেষ তৎপর। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সুফীগণ হিন্দীভাষায় ধর্ম্মভাবাত্মক গল্পাদি দ্বারা তাঁহাদের মত প্রচার করিতে থাকেন। কাশ্মীরে মহিলা সাধু লালা বাক্যাণির (১৪শ খৃঃ) উপদেশ সমূহ মধ্যে উভয়ধর্ম্মের ভাবধারাই বিদ্যমান (২)। জয়েসীর 'পদ্মাবৎ' কাব্য ঐরূপ আরেকটি প্রমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অনেকে বলেন, সুফীমত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই হিন্দুর সংস্কার-আন্দোলন প্রবুদ্ধ হয়। কোন মুসলমান লেখক বলিয়াছেন, ইসলাম সুফী আর্য্যভাবধারার মধ্য দিয়া প্রচারিত হওয়ার ফলেই ভারত উহা এত সহজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় (৩)। ইসলাম বা ইসলামীয় সুফীধর্ম্ম হিন্দু-সমাজে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় যে "সন্ত" আন্দোলনের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান এরূপ অজস্র ধর্ম্মসম্প্রদায় (৪) সমুদ্ভূত হয়। এইসকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামীয় ভাব, আচার-ব্যবহার নানাভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার কতকগুলি সম্প্রদায়ে হিন্দু ও মুসলমান ভক্ত আছেন।

এরূপ অনেক সম্প্রদায় আছে যেগুলি হিন্দুর দ্বারা স্থাপিত অথচ উহার মধ্যে অনেক মুসলমান, ভক্তও আছে, আবার ঐরূপ মুসলমান প্রতিষ্ঠিত

২। Op. cit—p. 401.

Lala Vakyani—Grierson and Burneth in Royal Asiatic Society Monographs, XVII, 1920.

৩। আবদুল কাদের—বিচিত্রা, 'বাঙ্গলার পল্লীগানে বৌদ্ধ-সাধনা ও ইসলাম'।

৪। M. Titus' "Indian Islam" Pp. 174-175; ইনি ১৬টি সম্প্রদায়ের নাম করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র ভারতে ইহার সংখ্যা আরও অনেক বেশী।

সম্প্রদায়ে হিন্দুভক্ত আছেন। বাঙ্গলার নদীয়া জেলার 'সাহেবধনী' সম্প্রদায় ইহার প্রমাণ (৫)। পুনঃ মুসলমান ফকীরের হিন্দু শিষ্য এবং হিন্দু সাধুর মুসলমান মুরিদ (শিষ্য) আছে (৬)। আবার অনেক মুসলমান ফকির গেরুয়া আলখাল্লা পরিধান করেন এবং কেহ কেহ গাত্রে ছাইও মাখেন (৭)। পুনরায় বাঙ্গলায় 'সত্যপীর' বা 'সত্যনারায়ণ' পূজাতে উভয়ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টার ভাবটিই ধরা পড়ে। সত্যনারায়ণ ব্রতকথায় আছে : অতঃপর বন্দিব রহিম রামরূপ।···কোরাণ কেতাব আর কালিমা সংহতি। সুবিখাঁ পীরের পায় প্রচুর প্রণতি। জয় জয় সতপীর, সনাতন দস্তগীর, দেবদেব জগতের নাথ। পূর্ব্বে হয়ে দশমূর্ত্তি, করিলে আপন কীর্ত্তি, সত্যপীর হইলে ইদানী।" মনু ও যাজ্ঞবল্ক সংহিতার সহিত শরিয়ৎ বিধানের অমিল থাকিতে পারে, কিন্তু বাস্তব ধর্ম্মসাধনাক্ষেত্রে উভয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালের সুফী কবি নাজির বলিয়াছেন "জুন্নার গলে আউর বগল বীচ্‌মে কোর্‌আন। আশিক হ্যায় জলান্দার না হিন্দু না মুসলমান॥"

ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে পীর, ফকির ও তাহাদের কবরকে সম্মান বা পূজা করা বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। অশিক্ষিতদের মধ্যে ইহা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য, যদিও নৈষ্ঠিক মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞানের নিকট ইহা খুবই হেয়! অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ-মন্দির বা স্তূপগুলির স্থানে এই পীর পূজা চলিতেছে! কাশ্মীরের জীয়ারৎ-গুলির মধ্যে অনেকগুলিই এই প্রকারের স্থান (৮)! প্রত্নতত্ত্ববিদ পি. মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, বিহার প্রদেশে অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় পীরস্থান দেখিলে মনশ্চক্ষে তাহা একটি বোধিসত্ত্বের স্তূপ বলিয়াই নিরীক্ষণ করিতে হইবে।

৫। কুমুদবিহারী মল্লিক, "নদীয়া কাহিনী", পৃঃ ২৪০।

৬। বাঙ্গলার যশোহর জেলায় ৺ কেশবানন্দ স্বামী লেখক ও অন্যান্য বন্ধুদের বলিয়াছিলেন যে এই জেলায় তাঁহার ২,০০০ মুসলমান মন্ত্রশিষ্য আছে।

৭। এই অনুষ্ঠানটি একটু সন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে; M. Titus op. cit. Pp. 166-167

৮। M. Titus—Op. cit. P. 252.

বিহারে সাঁওতাল পরগণায় লেখক এই কথারই প্রমাণ পাইয়াছেন। একই অশ্বত্থবৃক্ষতলে মুসলমানের পীরস্থল আছে, সেখানে হিন্দুও গিয়া পূজা দেয় এবং সাঁওতালও আসিয়া তাঁহার 'বোং' দেবতার পূজা করেন।

ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইরাণের অন্তর্গত 'সীস্তান' (প্রাচীন শকস্তান) হইতে পূর্ব্বভারতের চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ ভূখণ্ডে মহাযানী বৌদ্ধ সিদ্ধগণ ভ্রমণ করিয়া লোকদের অলৌকিক ক্রিয়াদি দেখাইতেন, 'আল-কেমী'র সাহায্যে পিতলকে সোনা করিতে পারিতেন বলিয়া দাবী করিতেন, 'অমৃত' (Elixir of life) লাভ করিতেন, নানা প্রকারের তান্ত্রিক তুক্‌তাক্ দেখাইতেন, লোকদের ঔষধ বিতরণ করিতেন, আকাশপথে একস্থান হইতে অন্য একস্থানে যাইতেন ইত্যাদি (৯)। ভক্তেরা বলিতেন, ইহারা অণিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া এইসব কর্ম্ম করিতে পারগ হইতেন এবং সিদ্ধির ক্ষমতাবলে অনেকের কাল পূর্ণ হইলে আকাশে অন্তর্হিত হইতেন, অর্থাৎ সশরীরে স্বর্গে যাইতেন। ইহাদের একটা মস্ত বড় কেন্দ্র ছিল "উড্যান" বা "ওড়িয়ান" (বর্ত্তমান কাবুল ও সোয়াট্ উপত্যকা)। কিন্তু বিস্তৃত ভূখণ্ডে ইসলামের প্রচার ও বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্দ্ধানের পর পীরদের আবির্ভূত হইতে দেখা যায় এবং মুসলমান ফকিরদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি করিতে দেখা যায়। তাঁহাদিগকেও কিমিতি বা কিমিয়াবিদ্যা অর্থাৎ রাসায়নিক বিদ্যার প্রয়োগে পিত্তলকে সোণায় পরিণত করিয়া ভক্তদের বিমুগ্ধ করিতে দেখা যায়; আর ব্রাহ্মণ্য যোগী সাধু মহাপুরুষগণ বরাবরই 'কিমিয়াবিদ্যায়' পারদর্শিতা তাঁহাদের সাধনার উচ্চাবস্থার লক্ষণ বা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন!

এই পারস্পরিক ভাববিনিময় সম্পর্কে টাইটাস বলেন, এই ব্যাপারে ইসলাম হিন্দুধর্ম্মের উপর যে-প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তদপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার হিন্দুধর্ম্ম ইসলামের উপর করিয়াছে (১০)। সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দ্বারা বিভিন্নস্থান হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে পুরাতন নবরূপে পুনরাগমন করিয়া থাকে। গ্রীস ও রোমের Paganism, গ্রীক্ Orthodox Church

৯। লামা তারানাথের 'Edelsteine mine' tr. into German by Gruenweld.

১০। M. Titus—Op. cit. p. 175.

এবং রোমান Catholic Churchএ পুনরাবির্ভূত হইয়াছে (১১), ভারতেও তদ্রূপ। বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরাতন বিশ্বাস ও প্রথা-সমূহ উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র কিন্তু লোকের মনস্তত্ত্ব পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

মুসলমান জাতিতত্ত্ব

মুসলমান সমাজের সভ্যদের ও অন্যান্য ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম্মে কোন পার্থক্য নাই। তথাপি এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ভিতর পার্থক্যের কথা কেন বলা হয়? ইহার একটি কারণ মনে হয় এই যে, অতীতযুগের কতকগুলি বাহ্যিক জাতিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাকে ধর্ম্মক্ষেত্রে স্থান দিয়া কিত্রিম বিভিন্নতার সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া উক্ত আপাত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মরক্কো হইতে মধ্য-এশিয়ার তুর্কিস্থান পর্য্যন্ত যেসব মুসলমান জাতি আছে সেই সকল জাতীয় খুব ভাল সংখ্যক লোকদের সহিতই লেখকের বন্ধুত্ব ও মেশামেশি হইয়াছে; এই আলাপের ফলে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে ভারতীয় মুসলমানদের বেশভূষা, আচার-ব্যবহার ও মনস্তত্ত্ব তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র, বরঞ্চ হিন্দুদের সহিতই ভারতীয় মুসলমানদের মিলও সাদৃশ্যের নৈকট্য রহিয়াছে এবং অন্যদেশীয় মুসলমানরাও ভারতীয় মুসলমানদের অপরাপর সকল ভারতীয়দের সহিত একজাতীয় বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট সকলেই "হিন্দী" বা "হিন্দলী"।

কিন্তু যেসব আপাতঃ পার্থক্য ও প্রভেদ দৃষ্ট হয় তাহা প্রাচীন জাতিতাত্ত্বিক ব্যবস্থা প্রসূত। মস্তকে শিখা ধারণ করা বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণদের গোত্র-পরিচায়ক ছিল। গোত্রানুসারে ১ হইতে ৫ টি পর্য্যন্ত শিখা রাখা একটি কুলের লক্ষণ ছিল, কিন্তু আজ 'টিকি' হিন্দুত্বের পরিচায়ক হইয়াছে! প্রাচীনকালে বিভিন্ন কৌম বাহ্যিক বেশভূষা ও পৃথক দেবতাদের দ্বারা পরস্পর বিভিন্নীকৃত হইত। দৃষ্টান্তস্বতঃ, গ্রীকেরা মস্তকমুণ্ডন করিত, শকেরা মাথার অর্দ্ধেক কামাইত (১২), পারদেরা স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত মাথার চুল রাখিত,

১১। Sayce, 'Hibbert Lectures' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

১২। E. W. Hopkins—"Origin and Evolution of Religion", Pp. 124-125.

পারসীকেরা লম্বা দাঁড়ী রাখিত, কার্থেজিয়গণ লম্বা চুল রাখিত, আর মেগাস্থিনীসের মতে প্রাচীন ভারতীয়েরা মাথায় লম্বা চুল রাখিত। প্রাচীন ঈজিপ্তের সভ্যতার (১৩) যে ইতিহাস লিখিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় সর্ব্বপ্রথম যে-এশিয়াবাসীদের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় প্রস্তরে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চাঁচা গোঁপ ও দাঁড়ি খোদিত রহিয়াছে; দেখিলেই ইহা একটি 'সেমিটিক জাতীয় লোক বলিয়া প্রতীত হয়। অতঃপর ফ্যারোর সৈন্যদল যখন দ্বিগ্বিজয় উপলক্ষে ফিনিশীয়াতে আগমন করে তখন তাহাদের গোঁপ কামান ও দাঁড়িযুক্ত মুখ দেখিয়াছিল। ইহা ফিনিশীয়দের জাতিতাত্ত্বিক লক্ষণ বলিতে হইবে। পুনঃ প্রাচীন সকল সেমিটিক জাতি শূকরের মাংস ভক্ষণ করিত না। হয়ত এই সকল অনুষ্ঠানের পশ্চাতে জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন টটেমিষ্টিক বা অন্য কারণ নিহিত ছিল যাহা আজ ধরিতে পারা অসম্ভব। কিন্তু এইসব সেমিটিক জাতিতত্ত্বগত অনুষ্ঠান আজ মুসলমানধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

বিভিন্ন জাতির জাতিতাত্ত্বিক আচার-ব্যবহার আজ ভারতে ধর্ম্মের বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা মনোমালিন্যও সৃষ্ট হইতেছে। মুসলমানেরা বলেন "ধুতিপরা হিন্দু", কিন্তু 'ইজার' ত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নহে। দক্ষিণ আরবের লোকেরা দক্ষিণ-এশিয়ার লোকের ন্যায় lion coth (কোমরে জড়ান হাটু পর্য্যন্ত কাপড়) পরিধান করেন। দক্ষিণ 'হাকামিনি' বংশীয় সম্রাট দারায়ুসের যে-প্রস্তর-আলেখ্য "বেহিস্থানলিপিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার ইজার পরিহিত নাই। ডাঃ ধাল্লা (১৪) বলেন যে পারসিকেরা উত্তরের মেডীয় জাতীর নিকট হইতে ইজার ও লম্বা জামা (Tunic) পরিধান করিতে শিক্ষা করেন এবং উত্তরের আরবেরা পারসীকদের নিকট হইতে 'আব্বাসীয়' যুগে ইজার ব্যবহার করিতে শিখেন (১৫)। অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে 'বরুণ' দেবতার পশমী (fur) কোট পরিধানের বর্ণনা আছে। মেগাস্থিনিস্ বলিয়াছেন, ভারতীয় ক্ষত্রিয়েরা পা পর্য্যন্ত লম্বা কোট পরিধান করিত। পুনঃ

১৩। Moret 'From tribes to Empire; Hitti, 'History of the Arabs', P. 33.

১৪। Dr. Dhalla, "Zoroastrian Civilisation", P. 258

১৫। Hitti, op. cit. P. 334; Jahiz, "Bayan", Vol. III, P. 9; Dozy, "Nomsdes vitements", Pp. 203—204.

'ইজারের' সংস্কৃত নাম 'চালনস্' (Chalans) (১৬), এই 'ইজার' মালয়-দ্বীপপুঞ্জেও (যেখানে এককালে হিন্দুর কৃষ্টি ও রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল) 'ইজার' নামেই পরিচিত। আবার সমুদ্রগুপ্ত ও ২য় চন্দ্রগুপ্তের আবিষ্কৃত মুদ্রায়ও অঙ্কিত মূর্ত্তির পরিধানে 'ইজার' আছে বলিয়া অনুমিত হয়। আল বেরুণী ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, হিন্দু অভিজাতেরা এমন ঢিলা পায়জামা পরিধান করে যে তাহাদের পা দেখা যায় না (১৬ক)। ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে প্রথমযুগের আরব ঔপনিবেশিকগণ ভারতীয় ফ্যাসানের ইজার পরিধান করিতেন।

ইজার ও চাপকান হিন্দুর পোষাক। ভারতীয় পোষাক বিভিন্নযুগে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহণ করিয়াছে (১৭)। এই প্রকারে দেখা যাইবে যে মাদুরে বা বিছানায় খাওয়া ইসলামীয় লক্ষণ নহে। প্রাচীন (১৮) গরীব পারসীকেরা (১৭ক) খাদ্যদ্রব্য মাদুরে এবং ধনী পারসীকেরা টেবিলে খাইতেন, আর প্রাচীন হিন্দুরা জলচৌকিতে (tripod) খাদ্য রাখিয়া খাইতেন। রাজপুতনা, পাঞ্জাবের পার্ব্বত্যাঞ্চল, আসাম এবং মণিপুরেও এই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা নাই ; বোধ হয় বৈষ্ণবধর্ম্ম দ্বারা ছুঁৎমার্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরাণে (৩।১১।৮০) কাষ্ঠনির্ম্মিত ত্রিপদাদির উপরিস্থিত পাত্রে···ভোজন করিবেনা বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতি 'হরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থে তিন পায়া জলচৌকির উপর খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া আহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে (উক্ত পুস্তক গৌরাঙ্গদেবের অনুজ্ঞায় তদীয় শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক লিখিত হয়)।

সাধারণতঃ হিন্দুদের ধারণা আছে যে শিককাবাব, পোলাও, হালুয়া প্রভৃতি খাদ্য মুসলমানদের দ্বারা এদেশে আনীত ও প্রচলিত হইয়াছে। অধ্যাপক আজাদ শেষোক্ত দুই প্রকারের খাদ্য মুসলমানদের দান বলিয়াছেন, কিন্তু আরবে চাউল

১৬। Hastings, "Encyclopaedia of Ethics and Religion", Vol. V. P. 47.

১৬ক। Alberuni—tr. by Sachan, p. 180-181

১৭। প্রাচীন ভারতীয় পোষাক সম্পর্কে Rajendralal Mitra "The Indo-Aryans" দ্রষ্টব্য।

১৭ক। Dr. Dhalla—Zoroastrian Civilization, P. 188.

উৎপন্ন হয় না এবং সভ্য হওয়ার পূর্ব্বে চাউলকে বিষাক্ত খাদ্য বলিয়া মনে করিত (১৮) ; চাউল প্রাচীন ইরাণেও অজ্ঞাত ছিল। অন্যপক্ষে 'হেন' নামক এক জার্ম্মান পণ্ডিত (১৯) অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে ম্যাসিডোনীয়েরা ভারত হইতে পারস্যে চাউল আমদানী করিত, তথা হইতে উহা আবার গ্রীসে আনীত হইত। তিনি বলেন, সংস্কৃত ভাষায় চাউলের নাম ছিল 'ব্রীহি', এই শব্দ পারস্য এবং পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য ভাষায় Birinj, Vrize, Brinj প্রভৃতি রূপ ধারণ করে এবং গ্রীসে গিয়া উহা আবার aruza রূপ ধারণ করে (ইংরেজী Rice, ফরাশী Riz, জার্ম্মাণ Reis)। অন্যপক্ষে, 'পোলাও'-এর সংস্কৃত নাম ছিল 'পলান্ন' (কোন কোন পুস্তকে আবার 'মাংসোদন' বলা হইয়াছে)। বাঙ্গলা কাশীরাম দাসের মহাভারতেও এই শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় "পলান্নে মিষ্টান্নে তারে করায় ভোজন"। সংস্কৃত 'পলান্ন' ফার্শী 'পোলাও', তুর্কি 'পিলাফ্' (অর্থ 'সাদা ভাত') রূপ ধারণ করিয়াছে। 'আইন-আকবরীতে যে-কয়েক প্রকারের পোলাও-এর উল্লেখ আছে তন্মধ্যে আট প্রকারের ভারতীয় পোলাও বলা হইয়াছে। তদ্রূপ সংস্কৃত 'শূল্য-মাংস' হালের 'শিক কাবাব' হইয়াছে।

এই প্রকারে দেখা যায় যে হালুয়ারও একটা সংস্কৃত নাম আছে। হিন্দুরা ইহাকে 'মোহনভোগ' বলেন। তবে হালুয়া নামটি বৈদেশিক, যদিও বিভিন্নদেশে ইহার মাল (contents) বিভিন্ন আকার ধারণ করে। পুনরায় কেহ কেহ বলিতেছেন 'রুটি' শব্দটি আরবদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে, আবার কেহ কেহ দাবী করিতেছেন যে ইহা পর্ত্তুগাল হইতে আমদানীকৃত। কিন্তু লেখক কন্সটাটিনোপলে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে উক্ত শব্দটি আরবি, ফার্শী অথবা তুর্কী নয়। পশ্চিম এশিয়ার লোকেরা খাম্বিরা (yeast) দ্বারা প্রস্তুত রুটি (loaf) আহার করেন, ইউরোপে ও তদ্রূপ। কেবল 'Passover' পর্ব্ব উপলক্ষে ইহুদিরা unleavened bread (বিনা খাম্বিরায় প্রস্তুত রুটি) ব্যবহার করেন, কিন্তু ভারতে বিনা খাম্বিরায় প্রস্তুত রুটি বা চাপাটি

১৮। Ibn-al-Faqih—Pp. 181—182 ; Hitti—Op. cit. P. 335.

১৯। Hehn, 'Kultur pflanzen···aus Asien', P. 485 ff ; O. Schrader, "Real lexicon der Indogermanischen Altertuemerkunde"—P. 668.

চিরকালই ব্যবহৃত হইতেছে। লেখক অনুমান করেন যে এই শব্দ সংস্কৃত) 'পুরোডাস' হইতে আসিয়াছে ; যথা, 'পুরোডাস্'—পরোটা—রোটি। ফার্শীতে খাস্থির প্রস্তুত রুটিকে 'নান' বলে। পাঞ্জাবের অনেকে তাহা ব্যবহার করেন, আফগানরাও তদ্রূপ ব্যবহার করেন।

এগুলি এস্থলে আলোচনা করিবার কারণ এই যে এবম্প্রকারের অনুষ্ঠান লইয়াই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্নতা প্রদর্শন ও কটাক্ষপাত করা হয়। লেখক দিল্লী ও বাঙ্গলায় হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুদের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিয়াছেন; সেই উপলক্ষে তিনি দেখিয়াছেন যে খাদ্য সম্বন্ধে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে স্থানীয় হিন্দুরই ন্যায় রীতি প্রচলিত আছে। বাঙ্গলার মুসলমানেরা আহারের প্রথমে মিষ্টান্ন পরে পাকৌড়ি আহার করেন না, কিন্তু পাঞ্জাব ও দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুর ন্যায় মুসলমান ও এই প্রথা অনুসরণ করবেন। এখানে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে হিন্দুর সহিত ভারতীয় মুসলমানদের রীতিনীতির যেটুকু প্রভেদ বা পার্থক্য বিদ্যমান আছে তাহা আরবদেশজাত নহে, বরঞ্চ তাহা জারতুষ্ট্র-পারসিক সভ্যতা প্রসূত। ইহার কারণ এই যে ইসলামের অর্দ্ধেক হইতেছে পারস্য দেশ সঞ্জাত।

পারস্পরিক সামাজিক অ-সহযোগ

বর্ত্তমানে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সামাজিক অসহযোগের কথা না বলিলে এদেশের সমাজতত্ত্বের একটি প্রধান তথ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমান কেহ কাহারও বাড়ীতে আহার করেন না, উভয়ের মধ্যে connubium (বিবাহ) নাই এবং commensality ও (একত্র বসিয়া আহার) নাই, সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে হিন্দুই গোঁড়ামী করিয়া বিদেশী অথবা বিধর্ম্মীর সহিত আহার করেন না। এই তথ্যটি বর্ত্তমানযুগে সত্য হইতে পারে, কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি কি বরাবরই এইরূপ ছিল ?

ইহা সত্য বটে যে বৈদেশিক মুসলমানদের দ্বারা ভারত আক্রান্ত হওয়ার পর হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার্থ কুর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিতে থাকে। এই সময়ে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরায় বৌদ্ধ ও তাজিকদের (আরব) সহিত বাক্যালাপ নিষিদ্ধ হইয়াছে, পদ্মপুরাণে তুরস্কের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিতে বলা

হইয়াছে। কিন্তু এইগুলি সদিচ্ছামাত্র (pious wish)! কারণ ইতিহাস বলিতেছে যে বিজ্ঞানেশ্বরের দেশের রাষ্ট্রকূট রাজারা সিন্ধুদেশের আরবদের ক্রমাগত সাহায্য প্রদান করিয়া তাহাদের শত্রু গুর্জ্জর প্রতিহার রাজাদের বিপক্ষতাচারণ করিয়াছিল! তাহাদের কাছে ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় হইয়া দেখা দেয়! তৎপর পদ্মপুরাণে খোদই দুঃখ করিতেছে যে, কলিকালে লোকে তুরস্কদের সহিত মিলিতেছে! ইতিহাস বলে * যে প্রথম হইতেই মগধে একদল বৌদ্ধ-ভিক্ষু তুর্কদের সহিত মিলিয়াছিল এবং বাঙ্গলায় গোড়া হইতেই একদল ব্রাহ্মণ্যবাদীয় লোক ও অভিজাত বক্তিয়ার খিলিজির সহিত মিলিত হয়।

এক্ষণে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হইতেছে, কোন্ সময় হইতে উভয়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়? মুসলমানেরা বলেন, হিন্দুরা 'স্পর্শদোষ' প্রণোদিত হইয়া আগে তাঁহাদের সহিত আহারাদি বন্ধ করেন, পরে মুসলমানরা উহার পাল্টা প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য হিন্দুর হাতে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। এই অভিমত কি কোন ঐতিহাসিক তথ্যের উপর স্থাপিত? সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সেনাপতি খাজাহাম লোডীর আদেশে নিয়ামতুল্লা নামক এক ব্যক্তি দ্বারা 'আফগান জাতির ইতিহাস' নামক একখানা পুস্তক লিখিত হয় (১৯)। উক্ত পুস্তকে দেখা যায় যে ঘোরের একজন রাজপুত্র পলাইয়া আসিয়া দিল্লীর এক মন্দিরের মধ্যে তিন বৎসর লুক্কায়িত থাকেন। এই ঘটনাটি পৃথ্বিরাজের সময়ে সংঘটিত হয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কবি চাঁদের "পৃথ্বিরাজ রাসো" নামক বীর-কাব্যে এই ঘটনাটিই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে চিত্রলেখা এক 'গক্কর' কুমারীকে লইয়া সাহাবুদ্দীন ঘোরীর সহিত ঘোরের এক রাজপুত্রের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং দিল্লীতে সে পৃথ্বিরাজের শরণাগত হয়। ইহা হইতেই পৃথ্বিরাজ ও ঘোরীর মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে যুদ্ধ হয়।

---

* *Lama Taranath,* 'History of Buddhism in India' tr. into German by Schiefner ; বাঙ্গলা বিষয়ে মুসলমানদের লিখিত ফার্সী ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

১৯ক। Neeamatullah, "History of the Afghans", tr. by Dorn.

এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, এই ব্যাপারে হিন্দুর স্পর্শদোষ কোথায় গেল? আর এই মুসলমান রাজকুমার কি হিন্দুর মন্দিরে বা হিন্দুর আশ্রয়ে থাকিয়া হিন্দুর সঙ্গে অথবা তাহাদের হাতে খান নাই? ফার্সী কবি সেখ সাদী তাঁহার "বোস্তাম" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তিনি যখন সোমনাথ মন্দির দর্শনে আসেন তখন পাণ্ডাদের দ্বারা প্রতিমার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শিত হইলে তিনি তাহাতে অবিশ্বাসের হাঁসি হাঁসিয়াছিলেন। এই অবিশ্বাসের হাঁসিতে পাণ্ডারা তাহাদের দেবতার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের পশ্চাতে যে কোনরূপ জুয়াচুরী বা শঠতা নাই তাহা তাহার নিকট সন্দেহাতীতরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে মন্দিরের গর্ভগৃহে একদিন রাখিয়াছিল (তিনি বলেন, এই জুয়াচুরি তিনি ধরিয়া ফেলেন)। এইস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে তখন হিন্দুর স্পর্শদোষ কোথায় ছিল? আর সাদী যখন পশ্চিমভারতে ভ্রমণ করিতেন তখন তিনি আহার করিতেন কোথায়? মুসলমানদের দ্বারা ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে ইবন্ খোরদাদবে প্রভৃতি অনেক আরব-পর্য্যটক ভারত ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভ্রমণকালে তাঁহারা কি তাঁহাদের স্বপাকেই খাইতেন, না হিন্দুর বাড়ীতেই থাকিতেন ও খাইতেন? আল-বেরুণী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। তাঁহার পুস্তকের এক যায়গায় তিনি বলিয়াছেন—তিনি দেখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের আত্মীয়দের সহিত একপাত্রে আহার করেন। অবশ্য অনেক ব্রাহ্মণ ইহা পছন্দ করেন না (২০)। এখানে জিজ্ঞাস্য যে আল বেরুণীর সহিত ব্রাহ্মণদের মিলিবার কালে বরাবরই কি তাঁহারা নিজেদের গা বাঁচাইয়া চলিতেন এবং পারসীক পণ্ডিতকে কেবল স্বপাকে খাইতে হইত? ঐতিহাসিকেরা বলেন যে খৃঃ ১০ম শতাব্দী হইতে তুর্কি-বিজয় পর্য্যন্ত অনেক মুসলমান ফকীর ভারতে আসেন এবং হিন্দু রাজাদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হন। সেখ চিস্তিকে আজমীরের রাজসভায় এবং আরেক সেখকে বাঙ্গলায়

২০। Alberuni—tr. by Sachau: সাক্ষ্য হইতে উক্ত এই তথ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে এক সময়ে হিন্দুরাও অনেকের সহিত এক থালায়ও খাইতেন। কিন্তু এই রীতি আজ মুসলমানী বলিয়া গণ্য হয়!

লক্ষ্মণসেনের সভায় ('সেখ শুভোদয়া' দ্রষ্টব্য) দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে তৎকালের হিন্দুরা বিদেশী বা ভিন্নধর্ম্মিদের হইতে ছুৎমার্গি ও আত্মসঙ্কোচিত হইয়া থাকিতেন না (২১)

অন্যদিকে মুসলমানপক্ষীয় উত্তরের প্রতিবাদে এইসব তথ্য হাজির করিয়া দেখান যায় যে মুসলমানগণ স্বীয় ধর্ম্মানুশাসনের আজ্ঞাধীন হইয়া বিধর্ম্মীর হাতে খাননা। ইবন্ বেটুটা নিজের ভ্রমণবৃত্তান্তে বলিতেছেন যে যবদ্বীপ দর্শনের পর জাহাজের চীনা পরিচালনাধ্যক্ষ (কাপ্তেন) তাঁহাকে তাঁহাদের খাদ্যে সমভাগী হইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অস্বীকার করেন; কারণ তাহারা বিধর্ম্মী, তাহাদের খাদ্য খাওয়া আইন বা ধর্ম্মসঙ্গত নহে (but I declined, because being infidels it is not lawful to eat their food) (২২)

চৈতন্যের সময় ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের বিরুদ্ধে কাজী মুলুকপতির নিকট যখন এই অভিযোগ আনীত হইল যে তিনি মুসলমান হইয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তখন মুলুকপতি হরিদাস ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

আমরা হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত।

তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশজাত "(চৈতন্যভাগবত—আ, ১৬শ অধ্যায়) ইহা হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে মুসলমানধর্ম্মেই বিধর্ম্মীর হস্তে আহার করা নিষিদ্ধ আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেই মুসলমানেরা হিন্দুর সঙ্গে খাইতেন না। তাহা হইলে হিন্দুর ছুৎমার্গের পাল্টা জবাবেই যে মুসলমানেরাও হিন্দুদের হাতে খান না, এই জবাব টিকিতে পারে না।

যদি কোথাও (ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বাদে) মুসলমান হিন্দুর হাতে খান, তাহা হইলে ব্রাহ্মণদের ন্যায় অন্ততঃ বাঙলায় 'কাচ্চী' বা 'পাক্কী' খানার পার্থক্য রক্ষা করেন। এই আহারও গ্রামাঞ্চলে ফকীর, ভিখারী শ্রেণীর মুসলমানদের দ্বারাই

২১। পৌরাণিক গল্পে আছে যে নারদ শ্বেতদ্বীপ গমন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের "Narad's visit to Svetadwip" দ্রষ্টব্য। তন্ত্রেও উল্লিখিত আছে যে বশিষ্ঠ চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তন্ত্রের "চীনাচার" কি এই সংস্রবেরই দ্যোতক?

২২। Selections from the Travels of Ibn Battuta, tr. by H. Gibb", P. 279.

সম্পাদিত হয়। যেখানে মুসলমান চাষী প্রজারা হিন্দু জমিদারের বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে খান সেই স্থলে 'পাক্কী' খানা, অর্থাৎ ফলমূল, লুচি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি খান। এতদ্বারা বুঝা যায় যে এই বিষয়ে মুসলমান সমাজে স্পর্শদোষ প্রবেশ করিয়াছে।

মুসলমানেদের লিখিত ইতিহাস বলে যে সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশ্মীর গমন-কালে পানপুর নামক স্থানে দেখিতে পান যে তথায় মুসলমান রাজাদের 'রাজা' উপাধি আছে; তাঁহারা হিন্দুদের কন্যা বিবাহ দেন। তিনি ইহা বন্ধ করিয়া দেন (২২)। সাজাহানও পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই প্রকারের বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া দেন (২৩)।

পূর্ব্ববঙ্গের একটা প্রবাদ কাহিনী আছে যে সোনারগাঁ-এর একজন মুসলমান হন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তিনি স্বগৃহেই বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার মুসলমান ধর্ম্মগুরু বলেন "আমি তোমার বাড়ী যাওয়ার সময় তাহা কি প্রকারে অন্য হিন্দুদের বাড়ীর মধ্য হইতে চিনিয়া লইব?" তখন ভক্ত বলিলেন, "আমি বাড়ীর সম্মুখে নিশানা (চিহ্ন) স্বরূপ একটা ঝাঁটা বাঁধিয়া রাখিব।" কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর হিন্দুরা গুরুকে হয়রান করিবার জন্য সকলেই নিজ নিজ বাড়ীর সম্মুখে ঝাঁটা বাঁধিয়া রাখে। ইহাতে ভক্তের বাড়ী চিনিয়া লইতে না পারার অজুহাত বা নানা কারণ লইয়া গুরু স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তার নিকট নালিশ করিয়া বলেন যে পল্লীশুদ্ধ হিন্দুদের মুসলমান করা হউক। অবশেষে কার্য্যতঃ তাহাই হওয়ায় সমস্যা মিমাংসিত হয় (২৪)।

আবার ইহারও প্রমাণ আছে যে মুসলমান আক্রমণের সময়ে এবং শাসনের প্রথমযুগে অনেক হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরও পৈতৃক ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আল-বেরুনী একথা স্বয়ংই স্বীকার

২২ক। 'Waqicat-i—Jahangiri', tr. by Elliot & Dowson, Vol. VI, P. 376; Qazvini, 'Badsanama' ff, P. 444—445; quoted by শ্রীরামশর্ম্মা, in মুসলমান রাজত্বে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার', 'হিন্দু মিশন', ৪৮শ সংখ্যা।

২৩। Abdul Hamid Lahari—Quoted in Sarkar's 'History of Aurangazeb'.

২৪। Romance of our Eastern Capital দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন; 'চাকনামা'য় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুনঃ বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদের কুলজীগ্রন্থে দেখা যায় যে কোন কোন বংশে 'যবনদোষ' ঘটিয়াছিল, কোন কোন বংশে মুসলমান রক্তও প্রবেশ করিয়াছিল। কেহ আবার মুসলমান হইয়াও পুনরায় পুরাতন সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, "মেলীকুলীন সমাজে মুসলমান-প্রভাব" হইয়াছিল: "সর্ব্বানন্দস্য আত্তি চট্ট জটাখোড় অত্র দুর্ব্বারখানস্য কন্যা বিবাহ জাতিদোষঃ (কুলপঞ্জিকা, পৃঃ ২৪১); বৃহস্পতিজ গোপাল বন্দ্যোর প্রথমে ত্বকচ্ছেদ দোষ ঘটে (দোষতত্ত্ব প্রকাশ)। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে তিনি একবার মুসলমান হইয়াছিলেন। পুনঃ "কাশীসুত হরিহর ফুলিয়ার মুখোটী। ভাল বিভা হৈল তোমায় জুনিখানের বেটী"॥ (কুলতত্ত্ব-প্রকাশিনী)। আবার 'খড়দহমেল'-এর প্রধান কুলীন মুখটীবংশীয় কামদেব পণ্ডিতের সপ্তপুত্রই নানা দোষাশ্রিত ছিল, তন্মধ্যে তাঁহার শ্রীকণ্ঠ নামক এক পুত্রে যবন পরিবাদ এবং তাঁহার আর এক পুত্র ভাস্করে যবনী-গমন দোষ" (মেলরহস্য) ঘটে (২৫)। বিখ্যাত কুলীন পুরাই গাঙ্গুলীর পুত্র শৌরী যবনদোষে কুলচ্যুত হয়েন। পরে শুভরাজ খান শৌরীর কন্যার রূপে বিমোহিত হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিয়া যবনদোষ প্রাপ্ত হইলেন। প্রবাদ এইরূপ যে শৌরীর স্ত্রীর গর্ভে যবনের ঔরসে ঐ কন্যা জন্মে" (দোষোল্লাস)।

মুসলমান-শাসনের প্রথমযুগের বাঙ্গলার সমাজের অবস্থা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটি হইতে কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে। দোষতত্ত্বপ্রকাশে (২৬) উল্লিখিত আছে:

কাজীর বেটা জাফর আলী নবাই বান্দারে।
নান্দা বন্দ্যো সুতা ঘরে আফিঙ্গ বিহরে"॥

আবার

কাশীশ্বর সুত হরিহর ফুলিয়ার মুখুটি।
ভাল বিভা ছিল তার জুনিখার বেটী॥"

পুনঃ বারেন্দ্র শ্রেণীর "কুল-সম্বন্ধ নির্ণয়—বিশেষ কাণ্ড" গ্রন্থ বলিতেছে,

২৫। নগেন্দ্রনাথ বসু—"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৫৩।

২৬। "নদীয়া-কাহিনী", পৃঃ ২৬৯—২৭০

"ভাদুড়ী প্রচণ্ড খাঁ রোহিলা মহিলা।
বাদসার দেওয়ান হয়ে, সাধে লয়েছিলা।
সেই পত্নীর গর্ভজাত চাঁদ হরি দুভাই।
দেশে আসি মাতা কয় হাম রোহিলা জাই।

পুস্তভাষায় 'জাই' (Zye) শব্দের অর্থ 'পুত্র'। এই দুই ছেলে ঠিকই বলিয়াছে, যে তাহারা রোহিলার পুত্র।

"ওকিকাৎ-ই-মুস্তফী" নামক তৎকালীন মুসলমান ইতিহাস হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে সেরখান মুসলমানদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান শেখ এবং হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত আহার-বিহার করিতে ভালবাসিতেন। (২৭)। বসু মহাশয়ের পুস্তকে উদ্ধৃত এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে অনুমিত হয় যে মুসলমান শাসনের প্রথমযুগে উভয় সমাজের মধ্যে ততটা ব্যবধান ছিল না যতটা আজ নিরীক্ষিত হইতেছে (২৮)। সমাজতত্ত্ব বলে যে যখন দুইটি স্বতন্ত্র পৃথক জাতি একস্থানে বাস করে তখন তাহাদের মধ্যে Domestication of ideas and habits হয়। ভারতবর্ষেও হিন্দু এবং মুসলমান, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাহাই হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা উদ্ভূত হইয়াছিল। তৎপর হিন্দুসমাজের লোকই যখন অন্য ধর্ম্মগ্রহণ করিতে লাগিল তখন এই ব্যবধান আরও কমিয়া যায়, কারণ বিজাতীয় মুসলমান অপেক্ষা স্বজাতীয় মুসলমান আরও নিকট।

যখন মুসলমান শাসকেরা গোঁড়ামীকে আশ্রয় করিয়া Theocratic (ধর্ম্ম-রাষ্ট্রিয়) শাসন আরম্ভ করিলেন (২৯) তখনই হিন্দুর উপর নির্য্যাতন সুরু হইল; কোন কোন হিন্দু মুসলমান পুনঃ পুরাতন ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ইসলাম ধর্ম্মানুযায়ী তাহার মৃত্যুদণ্ড বিধান হইতে লাগিল, যখন নূতন-মুসলমানদের পুরাতন সমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার জন্য ফতোয়া

২৭। নগেন্দ্রনাথ বসু—"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", ব্রাহ্মণকাণ্ড।

২৮। এই বিষয়ে অধুনালুপ্ত "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক প্রবন্ধ সমূহ দ্রষ্টব্য।

২৯। মুসলমানধর্ম্মরাষ্ট্রানুযায়ী শাসনে হিন্দুদের অবস্থা সম্পর্কিত কিছু কিছু সংবাদ Dr. Iswari Prasad "History of Mediaeval India" দ্রষ্টব্য।

জারী করিতে লাগিল, যখন হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে অ-ভারতবাসী করিয়া তোলা চলিতে লাগিল তখনই মনে হয় উভয় সমাজের মধ্যে পার্থক্য ও প্রভেদ বাড়িয়া গেল। আজ যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ব্যবধান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে মুসলমান পুরোহিতেরা মুসলমানদের হিন্দু আচার-ব্যবহার ও পুরাতন স্মৃতি সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিবার জন্য ফতোয়া দিতেছেন (Ahl-i-Hadith, Tabliq, Tanzim—প্রভৃতি আন্দোলনের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়) (৩০)। আজ আফগানীস্থান হইতে বাঙ্গলা পর্য্যন্ত স্থানে মুসলমানদের জাতীয়-পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃত করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা আজ সকলেই পৈতৃক বাসভূমে বিদেশাগত ঔপনিবেশিক বলিয়া নিজেদের মনে করেন! আজ যে এইসকল জাতির মধ্যে কিছু কিছু জাতীয়তাবোধের চেতনার উদ্বোধনের কথা শোনা যাইতেছে তাহা ইউরোপীয় সভ্যতা-প্রসূত জাতীয়তাবাদের (nationalism) নিকট ঋণী। ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে কেবল পশ্চিম-এশিয়ার ওসমানলী-তুর্ক এবং ইরানী জাতি দুইটি। ইহারা নিজেদের মূলজাতিগত (racial) বৈশিষ্ট্য কখনও ভুলেন নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

৩০। পূর্ব্ববঙ্গের একজন মুসলমান শিক্ষক লেখককে বলেন যে তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিরা এখনও আছে; পূর্ব্বে জন্মপত্রিকাতে তাহাদের পূর্ব্ব কুলপরিচয় ও গোত্রাদি উল্লিখিত হইত কিন্তু আজকাল মৌলুবীরা ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

লক্ষ্মীছাড়ী

(৩)

চাঁপা বলে, টগর, চলতো ওপাড়ায় খোঁজ নিয়ে আসি। শুন্‌ছি সাগরের মেলা ভেঙেচে। সবাই ফিরে আসচে। আমাদের মা এলো কিনা ; আর একলা একলা ভাল লাগে না।

দুটো বোন আর পারে না। ওদের সংসার সেই নিত্যিকার গাল-মন্দ, আর ঠোনা খাবার জন্যে প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠেছে যেন। টগর বলে, দিদি, আমার ভাই বড্ড মন কেমন কচ্চে মার জন্যে। চল তাড়াতাড়ি যাই।

যেখানে চুপচাপ করে থাকবার দরকার, ঠিক সেই জায়গায় যে দুটো ফিস্‌ফাস্ করে কথা বলার ইচ্ছে হয়। আর সেই সঙ্গে ফিক্ ফিক্ করে চাপাহাসি আপনিই বেরিয়ে পড়ে। তখন ঐগুলোতে সত্যিকার আমোদ আছে, তা বলতে হবে। অথচ ছেড়ে দাও। বল, 'যত ইচ্ছে গল্প কর, হাসাহাসি কর,' তখন যেন ঠিক তেমন রসটা আর থাকে না। বাধার মধ্যে দিয়ে যে এগোন তাতে বোধ আছে, ভোগ আছে। কিন্তু মুক্তির ভেতর দিয়ে যে অবাধ স্বাধীনতা, তার গতি যেন বিপত্তির ঘা না খেতে পেয়ে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে ওঠে। এই ভাবটা, এই দুটো মেয়ের মনে প্রকারান্তরে লেগেচে। ওরা সেই যে সংসার চোখের আড়ালে দুটো দুষ্টুমি করতে চায় লুকিয়ে লুকিয়ে, তারপর হঠাৎ-বা ধরা পড়ে যাবে। আর তাই নিয়ে খুব খানিকটা হৈ চৈ চলবে। এ না হ'লে ওদের দিনগুলো যেন মাটি হয়ে যায়, রসহীন লাগে।

সে যাই হোক, ওদের বেশীদূর এগিয়ে যেতে হল না। দেখলে, মেলার লোকেরা গাঁয়ের পথ দিয়ে আসচে। ওরা দু'বোন আহ্লাদে দৌড়ে চললো।

পথে হঠাৎ ওদের আগ-বাড়িয়ে আসতে দেখে তীর্থ-ফিরতিরা কথাবার্ত্তা থামিয়ে হঠাৎ চুপ হয়ে পথের পাশে দাঁড়াল।

মেয়ে দুটো দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ঘাড়ে। বললে, আমাদের মা ?

এক বুড়ি পথের পাশেই বসে আকাশ-ফাটান সুর ধরলে কান্নার।

চাঁপা-টগর রীতিমত থতিয়ে গেল। অমনি মুখ কাঁচুমাচু করে একপাশে সরে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ বুঝলে না, ব্যাপার কি ?

যে বুড়ি কান্নার সুর ধরেছিল সে এগিয়ে এসে চাঁপা-টগরের থুতনি ধরে নাকিসুরে বললে, ওরে সোনা চাঁদমণিরা, তোমাদের ফেলে সে আবাগী পালিয়েচে।

চাঁপা পালানো কথার মানে বোঝে। বেচারি ভ্যাঁক্ করে কেঁদে ফেললে, ও মাগো—এই বলে।

টগর দেখলে, দিদি কাঁদচে। খারাপ কিছু একটা ঘটে থাকবে। তাই ভেবে সে-ও দিদির সঙ্গে সঙ্গে ও মাগো, কোথায় গেলে গো, বলে কাঁদতে লাগল।

বুড়িরা বিব্রত হয়ে ওদের মাথায় গায়ে হাত বুলোতে লাগল। বল্‌লে, আর কেঁদে কি করবি মা। চল, ঘরে চল্।

হঠাৎ যেন চাঁপার কি একটা কথা মনে পড়ল। কান্না ও একেবারে গিলে ফেললে। যে বুড়িটা কেঁদে এসে ওর থুতনি ধরেছিলো তার ওপর চাঁপার অনেক দিনকার রাগ। ও ভাবলে বিট্‌লে বুড়ি হয়তো ওর সঙ্গে ন্যাক্‌রা করচে।

দিদিকে হঠাৎ থামতে দেখে টগরও চুপ করে গেল।

চাঁপা রাগে গজ গজ করতে করতে টগরের হাত ধরে টেনে নিয়ে বললে, চল তো যাই—ও পাড়ার গয়লাপিসির কাছে। সত্যিমিথ্যেটা জেনে আসি। বলে খর্‌খর করে চল্‌তে লাগল। পেছনে একবারও ফিরে তাকালে না।

একটুখানি যেতে না যেতেই কথাটা ব্যথা হয়ে চাঁপার বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে তুলতে লাগল। টগরকে কোলে তুলে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ও চলতে লাগল গয়লাপাড়ার দিকে। আর সেই সঙ্গে চাপা-গলায় কাঁদতে লাগল, ওরে মারে, আমরা দুটি বোন একলা কি করে থাকবো! বুঝলি টগর, ও হারামজাদিরা মিশ্চয় মিথ্যে কথা বলচে।

আসলে কথাটা সত্যি। কাজেই চাঁপা-টগরকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরতে হল। গয়লাদিদিকে ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে হল।

চাঁপার সংসার ছিল তেজারতির ব্যবসা। আর সামান্য জায়গা জমি। এইতেই ওদের ছোট্টো সংসার চুক্‌খু-ধাক্কার ভেতর দিয়ে কোনরকমে চলে যেত। চাঁপা ডাগর মেয়ে হলেও স্যায়না সে কোনও দিনও নয়। পয়সা-কড়ির এমন সব ঘোরালো ব্যাপার সে কোনও দিন কানেও শোনে নি। ঘরের কাজকর্ম্ম সেরে, খেয়ে দেয়ে বরঞ্চ বাকি সময়টা গাঁয়ের পথে পথে ঝোপে ঝাড়ে টো টো করে বেড়ালে বিশেষ কাজ হবে। এই ও মনে করে। কাজেই পয়সার এই সব জটিল হিসেব নিকেশ ওর সংসা ওকে কোনও দিন বোঝাবার চেষ্টাও করেনি। তাই টাকায় ক'পয়সা সুদ সে হিসেব চাঁপা জানতো না। কে কতো ধার নিয়েচে তাও তেমনি ওর অবগতির বাইরে।

কাজেই যারা ধার খেয়ে এদেচে আর সুদ বাকি ফেলেচে, তাদের আহ্লাদে আটখানা মন একেবারে চালচিত্তির হয়ে উঠল। এবং আরো কিছু কর্ত্তে পারা যায় একথা জনকয়েক খুব তাড়াতাড়ি বুঝলে। তারা দেখলে, ওদের যাহোক দু'চার বিঘে জায়গা জমি আছে। সেগুলো সময় থাকতে হাতিয়ে নিতে পারলেই লাভ। এই ভেবে আত্মীয়তার দরদ ওদের মন ছাপিয়ে উঠল। ছুটে দৌড়ে এসে মেয়ে দুটোকে কোলে পিঠে করে আদর আপ্যায়নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। বললে, দেখ, আমরা তোদের মা-মাসি-কাকা-পিসে রইচি। তোদের ভাবনা কি। এই সব প্যাঁচালো কথা চাঁপা টগরের ধারণার অতীত। তবে এসময়ে অত আদর আদিখ্যেতা ওদের মুষড়ে পড়া মনকে যেন অনেকটা চাঙ্গা করে তুলল। সেইটুকুই ওদের লাভ। আজ এবাড়ী নেমন্তন্ন। কাল ও বাড়ি। এই করে ওদের কষ্টটার অনেকখানি লাঘব হল।

চাঁপা-টগরের তিনকুলে কেউ ছিল না দেখে যে ক'জন মাতব্বর জুটে ভেতর ভেতর ওদের জায়গা জমি বাগান পুকুর ভিটেটা পর্য্যন্ত লুকোচুরি করে ভাগবাঁটরা করে নিলে, তারাই ভাগে চাঁপা-টগরকে পুষবে এই হ'ল ঠিক।

কিন্তু প্রথমেই ওদের ঘা দিলে চাঁপার বয়েস। চাঁপাকে আর রাখা যায় না। বুড়ো হাতি মেয়ে, ষাঁড়ের মত মদ্দানে চালে যেখানে সেখানে টহল দিয়ে বেড়ায়, এটা ভাল কথা নয়। কাজেই কড়া শাসনে চাঁপাকে বাঁধবার চেষ্টা করলে। কিন্তু অতো সহজে শাসন মানবার মত মেয়ে চাঁপা নয়। ও গাঁয়ের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরতে দিনান্তে অন্ততঃ একটিবার বেরোবেই।

এই নিয়ে ওরা প্রথম দিন চাঁপার জলপান বন্ধ করলে।

চাঁপা ঠোঁট উল্‌টে বললে, যা যাঃ। চুলে পাড়ায় ঢের ঢের কামরাঙা পেকেচে। নাপতেবৌ মুড়ি ভাজে। তার গাছের নোনাগুলো পাখীতে খেয়ে যায়, ও পাড়তে পারে না তাই। আমি বুঝি আর গাছে উঠতে পারি না। চারটে পেড়ে দিলে দুটো আমার ভাগে। জলপান দিবিনাতো বোয়েই গেল।

টগর বলে, চল্ না দিদি ওপাড়ায়। বামনমাসীর ঢেঁকশেলে আমরুলের বন হয়ে আছে। আর নিতাই, আমায় সেদিন ডাকুছিল তো, ওর জরানো আমলকী চাখ্‌তে। আর, বাবাঠাকুরতলায় যেতে যে-চারা তেঁতুলের গাছটা পড়ে? তাতে কি তেঁতুলটাই ধরেচে। দেখিচিস্? একটুখানি নুন কারুর বাড়ী থেকে চেয়ে নিলেই তো হোলো। চল তাই যাই।

দ্বিতীয় দিন ওরা চাঁপাকে মারলে ভাতে। চাঁপা টগরকে কাঁখে তুলে নিয়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে ওর মাকে ডেকে গুন্‌গুনুনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে, সেই ঠিক-দুক্কুরবেলা গাঁয়ের পথে চল্‌তে লাগলো।

রোদের তাতে ওদের গলা শুকিয়ে কাঠ হোয়ে উঠ্‌লো। মিত্তিরদের পুকুরে নেবে দু'বোনে আঁজলা ভরে জল খেলে। তারপর গাঁয়ের শেষ সীমানায় এসে পুরোনো বটের মোটা মোটা ঝুরিতে ঠ্যাসান দিয়ে দু'বোন মনের দুঃখে বিনিয়ে বিনিয়ে, নরম সুরে কাঁদতে লাগলো।

কাছাকাছি মানুষের বসতি নেই। সে পথে কেউ চলাচল করে না। শুধু চাষীরা মাঠে যায়। আর কেউ কোথাও নেই। কে আর ওদের কান্নার, দুঃখের সাক্ষ্যি থাকবে।

টগর বললে, দিদিভাই, ক্ষিধে পায়। কথাটা ব'লে ঐটুকুন মেয়েটা আরো জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

চাঁপা নিজের কান্না থামিয়ে টগরকে কোলে তুলে নিয়ে উঠে পড়ল তখুনি। বাদায় দেখ্‌লে চাষীরা ঘাস নিড়চ্চে।

সেখানে গিয়ে চাঁপা বল্‌লে, নারাণকাকা তোমাদের জলপান থাকে তো চাট্টিখানি দাও না গো। আমাদের ভারি ক্ষিধে লেগেচে। হারামজাদী বিষ্টুগিন্নি আজ আমাদের খেতে দেবে না বলে তাড়িয়ে দিলে। উনুনমুখী বলে, বড় হইচিস্, ঘরে বসে থাক্। হ্যাঁ কাকা, তাই বলে খেতে দেবে না?

চাষিদের মন কেঁদে ওঠে। বলে, আহা, দুধের বাছারা, তোদের কি শাস্তি! ভগবান্!

ওরা কোঁচড়ের চাল ভাজা, নারকেল, কাঁচালঙ্কা, বাতাসা, এইসব ভাগাভাগি করে দেয়।

এই ঠিক দুকুরে চাল ভাজা চিবোতে গিয়ে কচি মেয়েটার গলা আটকে আসে। চোখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা জল। বলে, দিদিরে ভারি শক্ত।

নারাণ সইতে পারে না। কচি ছেলের চোখের জল, তাও দু'মুঠো অন্নের জন্যে। ওদের সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে গেল।

গিন্নিকে ডেকে বল্‌লে, ওরে হারামজাদী, শিগ্‌গীর বেরো। দেখ, গরীবের বাড়ী আজ ভগবানের দয়া হয়েচে। শিগগীর বার কর কোথায় আছে দুধ। এখোগুড়ের মুড়কী ছিল। বড়বাতাসা, চিনির কদ্‌মাগুলো নিয়ে এলুম যে চাঁপদেড়ের হাট থেকে, সত্যনারায়ণের সিন্নি হবে বলে; সে সব দে এনে। ও বৌ!

বৌ বেরিয়ে এল শশব্যস্তে। তাকে দেখে চাঁপা বলে, ওমা! কাকী! এইটে তোমার বাড়ি? তাতো জানতুম না।

কাকী ওদের মুখে তোলে গরম দুধের বাটি। পিঠে মাথায় হাত বুলোয়, মায়ের দরদ মাখা।

খেয়ে দেয়ে চাঁপাটগর সারাদিনমানটা তক্তিপাড়ার মাঠের ধারে ঘেঁটুবনের মধ্যে শুয়ে বসে গল্প করে কাটিয়ে দিলে।

সন্ধ্যে হয়ে আস্‌চে দেখে চাঁপা বল্‌লে, চল, টগর যাই। আমাদের তো ঘর রয়েচে। তবে কেন ওদের বাড়ী খাবো? চল। আমরা তেমনি করে রাঁধিগে।

ওদের সদর দরজায় দেখলে একটা তালা ঝুলচে। দু'বোনে সেটাকে নিয়ে খানিকটা ঝুলঝুলি করলে। কোন উপায় হোলো না। ওদের উঠানের আতাগাছটার দিকে বাঁশের ছ্যাঁচা-বেড়ার গায়ে ঘা লাগালো। শক্ত করে বাঁধা বেড়া কাঁপলো, কিন্তু ভাঙ্‌ল না। ঘুরে খিড়কির দরজার কাছে এসে

দেখলে আগোড়টা ফাঁস দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েচে। ফাঁস টেনে আগড় ঠেলে ওরা দু'বোনে বাড়ি ঢুকল। তখন সন্ধ্যে হয় হয়।

খুঁজে পেতে চাঁপা পিদ্দিম্ জ্বাললো। দেখে জালায় ঢের চাল আছে। অন্য আর কিছু খুঁজে পেলে না। শুধু কলসীভর্ত্তি মুগ কড়াই।

চাঁপা বললে, টগরমণি আজ ভাত আর এই মুগের ঘণ্ট, কি বল? কাল যাহোক জোগাড়-জাগাড় করে, ভাল করে রান্না করবো, কেমন?

পরের দিন সকালে ওরা খোঁজ খবর করে এল। বাবা বাছা করে ডেকে ডুকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। ওরা দেখলে ওদের তেজ আছে। মরবে তবু মর্য্যাদায় হারবে না। মিষ্টিকথায় ওরা চাঁপাকে বোঝাতে চেষ্টা করলে, বড়ো-সড়ো হয়েচো, এখন যেখানে সেখানে অমন ধ্যাঙ্ ধ্যাঙ্ করে ঘুরে বেড়ান কি ঠিক?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

পকেট

নারীর তুলনায় পুরুষের দৈহিক অনুভূতিটা ভোঁতা—নারীদেহের স্পর্শ-কাতরতা তাতে নেই। গায়ে গা ঠেকলে আঁৎকে ওঠে না, সিউরে উঠে সরেও যায় না। অবিশ্যি গা বলতে সভ্যজগতে আচ্ছাদিত অঙ্গই বুঝায়, অঙ্গের সঙ্গে আচ্ছাদনের এখানে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পথ চলতে কোনো মেয়ের হাতে টান পড়লে যতখানি শঙ্কিত কণ্ঠে সে উচ্চকিত হবে, শাড়ির আঁচলে টান পড়লেও হবে ঠিক ততখানিই—শাড়ি থেকে দেহের দূরত্ব বিচার ক'রে শঙ্কা প্রকাশে কোনো মাত্রাভেদ ঘটবে না। দশের ভীড়ে পাঞ্জাবীর খুঁটে প্রিয়ার টানটুকু অঙ্গস্পর্শের মতোই সুখকর—অতএব স্পর্শানুভূতির ক্ষেত্রে পরিচ্ছদেরও একটা অংশ আছে এটা মানতেই হবে।

এ যুক্তি মেনে নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে পুরুষও কম স্পর্শকাতর নয়। যদিও সে-কাতরতার ব্যাপ্তি নারীদেহের তুল্য নয়—কিন্তু যেখানে সে স্পর্শ-কাতর সেখানে মেয়েদের অনুভূতিকেও অতিক্রম করে যায়। মেয়েদের এই কাতরতা কার্য্যকরী শুধু পুরুষ-স্পর্শের বেলায়, স্বজাতীয়াদের মধ্যে তারা পুরুষেরই মতো সহজ। কিন্তু পুরুষের দেহে পকেট ব'লে যে একটি উপাঙ্গ আছে তার অনুভূতির তীক্ষ্ণতা অতুলনীয়—নারী-পুরুষ নির্ব্বিচারে সে স্পর্শ-কাতর। ভীড়ের চাপে হয়তো চেপ্টে যাচ্ছেন, কাছা-কোঁচায় টান লেগে বসন বিস্রস্ত, মাড়ানো জুতোর ভেতর প্রতিমুহূর্ত্তে ক্লিষ্ট-পা কুঁকড়ে যাচ্ছে, পাঞ্জাবীর পিঠটাই বা গেল ফেঁসে—তবু ভ্রূক্ষেপ নেই, কিন্তু পকেটে হাত পড়লেই তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতো চমকে উঠবেন, মুহূর্ত্তের ভগ্নাংশে নিজের হাতটা লাফিয়ে গিয়ে জাপটে ধরবে পকেটটিকে। নারী তার বক্ষাঞ্চলকেও এতখানি শঙ্কিত সচেতনতায় আঁকড়ে ধরতো কিনা সন্দেহ। পকেটে হয়তো একটা আধলাও নেই আপনার, তবু দেখবেন হাতটি কিন্তু ঠিক তেমনি ক'রেই ছুটে যাবে তার রক্ষার্থে। তারপর অনধিকার প্রবিষ্ট সেই হাতখানাকে যদি হাতের মুঠোয় আটকে ফেলতে পারেন তো কথাই নেই—হাতের মালিককে নিয়ে তখন এমন কোলাহল এবং কেলেঙ্কারী বেঁধে যাবে যা হয়তো কোনো নারী তার আঁচলে অবাঞ্ছিত আকর্ষণ নিয়েও জমিয়ে তুলতে পারে না।

পুরুষের দেহে এই অনুভব শক্তি এত তীক্ষ্ণ ও তীব্র হবার কারণটা প্রণিধান-যোগ্য। আমার মনে হয় সভ্যতার বিবর্ত্তনে পুরুষের রূপ-গুণ-পৌরুষ-মান-সম্ভ্রম সবই এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই অঙ্গটিতে, তাই ক্রমে ওখানটা হয়ে উঠেছে এত বেশী অনুভূতিপ্রবণ। সমাজে পকেট দিয়েই তার পরিচয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন তার দেহের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ থাকে না তেমনি 'পকেটত্ব' শুধু পকেট-অঙ্গেই আবদ্ধ নয়; পকেটের মত পকেটের বিদেহী প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে বহুদূর অবধি। বস্তুটির এতখানি প্রতিপত্তি ব'লেই তার উল্লেখ ক'রে নানা ইঙ্গিতপূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দিয়ে থাকি—যেমন পকেট গড়ের মাঠ, পকেটে হাত পড়া, পকেটে কুলোনো, ইত্যাদি—এমন কি কোনো লোকের অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণ করতে হ'লে বলে থাকি, 'ওর মতো দশজনকে পকেটে পুরতে পারি'। পকেটের এত মহিমা—তাই আজ পুরো একটা জামার কাটায় দক্ষতা অর্জ্জনের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কাজ দাঁড়িয়েছে পকেট-কাটার শিল্পকে আয়ত্তে আনা।

উপযুক্ত সময়ে গোঁফদাড়ি না গজালে যেমন পুরুষের মনে একটা অভাব-বোধ জাগে তেমনি তার প্রথম বোধ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই পকেট রূপ উপাঙ্গটির প্রয়োজনীয়তাবোধ জেগে ওঠে। বালক রবীন্দ্রনাথের সকরুণ নালিশ ছিলো নিয়মিৎ খলিফার বিরুদ্ধে—সে তাঁর জামায় জেব জুড়তো না ব'লে। এই খলিফা বাবাজী সামান্য শ্রম ও বস্ত্র বাঁচাতে গিয়ে বহু দুঃখ দিয়েছে মহাপুরুষের সেই বালক-চিত্তে। খলিফারই বা দোষ কি, সে তো না হয় অশিক্ষিত কারিগর মাত্র—পণ্ডিত পিতারাই কি বোঝেন! তুচ্ছ নিত্যপরিচিত ঘটনার অন্তরস্থ গভীর ইঙ্গিতময়তা মনীষীরা এসে চোখের সামনে ধ'রে না দিলে আমাদের নজরেই পড়ে না। একটি বালকের মনে পকেটের অভাববোধটা কতখানি তীক্ষ্ণ হ'তে পারে রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তির সরসতায় সে-সম্পর্কে আমরা সজাগ হই। আমাদের ধারণা, ছোট্ট ছেলের পকেটের প্রয়োজনটা কি! যে সহজাত ঝোঁক নিয়ে মেয়েরা বালিকা বয়সেই হাঁড়ি-কুড়ি উনুন নিয়ে রান্নাঘর সাজিয়ে বসে, সেই সহজাত ঝোঁক নিয়েই বালক তার জামার গায়ে জেব-এর সন্ধান করে। বিবর্ত্তনে লাঙ্গুল খ'সে গিয়ে পশু হলো মানুষ, আবার সেই বিবর্ত্তনেরই কল্যাণে পুরুষ মানুষের মধ্যে উন্নত

হলো পকেট রূপ উপাঙ্গের উদ্ভবে। বিবর্ত্তনে নারী অঙ্গ ত্যাগই করলো, লাভ করতে পারলো না, তাই আজও সে পুরুষের হস্তানত। য়ুরোপীয় নারীর সাধারণ পরিচ্ছদে পকেটের একটা আভাস দেখা দিয়েছে বটে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে অপরিহার্য্য রূপে এঁটে যায়নি। পরিচ্ছদকে আজও পকেট-অঙ্গের অভাবে বিকলাঙ্গ মনে হয় না। পকেটের অনুকরণে আলগা একটা থলেকে ওরা অনুষঙ্গী করেছে—ক্রাচ্ পা না হলেও তা নিয়ে পায়ের কাজ কিছুটা চলে বই কি। এই পকেটের আভাস আর অনুকৃত পকেটের জোরেই য়ুরোপীয় নারী অনেক অধিকার কেড়ে নিয়েছে পুরুষের হাত থেকে—তাই আর প্রতিপদে পুরুষীয় কর্ত্তৃত্ব ও লাঞ্ছনা তাদের সইতে হয় না। আমাদের শাড়িপরিহিতা মেয়েদের অঙ্গে সেই আশার আভাসটুকুও নেই। শুধু নেই নয়, এর কোনো অংশে পকেট ব'লে একটা বস্তু গজাতে পারে যেন কল্পনাও করা যায় না—তাই সখেদে মনে হয় এদের মুক্তি বুঝিবা এখনো বড়ই সুদূর। এই অসংখ্য অসহায়াদের মধ্যে উন্নতশ্রেণীগত গুটিকয় মেয়ে কোনো রকমে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছে য়ুরোপীয়দের সেই আলগা থলেটা। তারই দৌলতে আজ তারা খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে ফুসফুস ভ'রে দু'বার নিশ্বাস নেয়, দুটো দিন হয়তো নিজের খুসিতে সিনেমা দেখে, কালেভদ্রে পুরুষের মুখের ওপর প্রতিবাদ করেও বসে, এমন কি প্রেম ক'রে নিজের পছন্দমতো বিয়েও ক'রে ফেলে।

কেবল নারী কেন, এই উপাঙ্গহীন পুরুষশ্রেণীও প'ড়ে আছে সমাজের নিচু তলায়। এক বিজ্ঞানী যেমন বিবর্ত্তনতত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে দেখিয়ে দিলেন ক্রমবিকশিত পশুই মানুষ তেমনি আর এক বিপ্লবী মনীষা এসে প্রমাণ করলেন সমাজ বিবর্ত্তনে এই উপাঙ্গের উদ্ভব এবং মুষ্টিমেয়র অঙ্গে তার অতিবিকাশই শ্রেণীবিশেষকে করেছে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এবং পরিণতিপ্রয়াসী অঙ্কুরিত উপাঙ্গের সঙ্গে অতি পুষ্ট উপাঙ্গের সঙ্ঘাতের মধ্যে দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হচ্চে সমাজজীবন। নতুন আলোক এসে লাগলো মানুষের চোখে—দমিতের দল জানলো পকেট তাদের গজায় নি কিন্তু গজানোর ক্ষমতা তাদের মধ্যে আছে। তাই সমাজের সকল স্তর থেকে উঠলো এই উপাঙ্গের সমবিকাশের দাবি। সমবিকাশ বলতে ভেবে বসবেন না কোট-পঞ্জাবী-ট্রাউজর-ওভারকোট-

ফতুয়া সবার পকেট ছেঁটে কেটে সমান আর এক রকম ক'রে ফেলা হবে। মানুষের মধ্যে সাম্য বলতে যেমন বুঝায় না প্রত্যেককে পায় মাথায় টেনে আর চেপে একাকার করা, পকেটের বেলায়ও তেমনি—সাম্য আসবে তার অন্তঃসত্তায়।

প্রত্যেক শক্তিমান জীবের ডাকসাইটে একটা অঙ্গ থাকে। যেমন বাঘ-সিংহের থাবা, হাতির শুঁড়, বরাহের দন্ত—তেমনি মানুষের বেলায় উল্লেখযোগ্য তার পকেট। পকেট উপাঙ্গ হয়েও সভ্যমানুষের অপরাপর অঙ্গকে অতিক্রম ক'রে গেছে তার শক্তিমত্তা ও মহিমায়—সকল অঙ্গ তার চালিত হয় এই পকেটাঙ্গটির অভিভাবকতায়।

জ্যোতির্ময় রায়

অন্তিম ক্ষণে

স্বর্ণ ঈগল কোনদিন ছিল জোড়াল,
হেলায় ভ্রমিত বিপুল পৃথ্বি মথিয়া,
কিংখাপে মোড়া নখর তাহার ধারাল
ক্ষেতে বন্দরে ঘুরিত শিকার খুঁজিয়া।
তাহার পক্ষ-তাড়ন-শব্দ অবিরাম
ভ্রূক্ষেপহীন ঝাপটে আকাশ ছিঁড়িত,
ষ্টিলের চক্ষু নিঃসৃত নব স্বরগ্রাম
বিলাসী বীণায় সোনালী স্বপ্ন বুনিত।

সেদিনের সেই মত্ত ঈগল অধুনা
প্রান্তিক চোখে ধূসর মৃত্যু জপিছে,
ঘুন-ধরা তার জীর্ণ পাঁজরে বেদনা
ধমকে ধমকে রক্ত রমন করিছে
চৌদিকে তার বীজাণুর দল ঘনাল
সোনালী পাখীর অণুতে অণুতে শ্মশান-গন্ধ ছড়াল।

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশ

দিগন্তে মৃত্যুর ডাক
পথে ঘাটে দুর্ভিক্ষ-মিছিল
অন্ন-বস্ত্র-মাংসহীন মানুষের ভিড়
বিষাক্ত বাতাস।
হতশ্বাসে ভরা ভোর
ক্লান্ত দীর্ঘ দিন
সন্ধ্যা আশাহীন
রাত্রে আসে চোর।
হাতছানি দিয়ে ডাকে রক্তবর্ণ
আশ্বিনের আকাশ।
হৃদয়ে ক্ষুধার জোয়ার
প্রেমকথা হাওয়ায় উধাও
তোমার তনুর ডাক অনিচ্ছায় ফেরে।

কোটিকণ্ঠে অস্থির আবেগ
রাস্তায় কুষ্ঠের ভিড়
যক্ষ্মা আর সিফিলিসে
মানুষ অস্থির।

সাম্রাজ্যের স্বপ্ন শেষ
মুসোলিনীর মাংসল শরীর
সহ্য করে ঘৃণ্য পরাজয়;
ওদিকে ঘুমন্ত চোখে
ডাউনিং স্ট্রিটে
একে একে জড়ো হয়ে যতো আশাবাদী
ইতালীর ভাগ্য গণে রাত্রি দ্বিপ্রহরে
জোরালো সংবাদ পরে
ইতালির নবজন্ম আত্মসমর্পণে।

প্রাসঙ্গিক

আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা নিয়ে এখনো মাঝে মাঝে কথা উঠছে। আপত্তিকারীদের সকলের অভিযোগ এক ধরণের নয়, তবে আধুনিক কবিতা বুঝতে অসুবিধা হয়, এই মৌলিক ব্যাপারটায় সকলেই তাঁদের একমত। কবিদের উত্তর-ও যে ঠিক এক ধরণের তা বলা যায় না, কিন্তু আধুনিক কবিতা যে কবিতা এটা তাঁরা সকলেই স্বীকার করতে উৎসাহী।

অভিযোক্তাদের ভেতর যাঁরা আধুনিক কবিতাকে কবিতা বলে মানতে চান না তাঁদের সঙ্গে বিবাদ নেই। কারণ কবিরা আর যাই হন সত্যাগ্রহী নন। কিন্তু যাঁরা আধুনিক কবিতাকে কবিতা ব'লে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নন, অথচ শৈলীগত ও ভাবগত অসঙ্গতির জন্য রসোপভোগকে অনাবিল ক'রে তুলতে পারেন না, তাঁদের কথা ন্যায়ত কবিরা শুনতে বাধ্য। কারণ, তাঁরা আধুনিক কবিতার সত্যকার পাঠক, পাঠকহীন হ'য়ে কবিতা লিখে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। বিপুলা পৃথিবী আর নিরবধি কালের আশা অবশ্য অনেক সময় উৎরে না যায় এমন নয়, তবু আমরা যে একটা অভূতপূর্ব যুগসন্ধি সময়ের মানুষ এটা মনে রাখাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ, এবং গ্রীক কবিতা থেকে সুরু ক'রে গত আড়াই হাজার বছরের রূপান্তরগত পরিণতির নজিরে ভবিষ্যতে কোনো একদিন পাঠক পাবেন ব'লে মনে ক'রে কোনো কবি যদি এখনো বর্তমান পাঠকবর্গকে অবহেলা করেন তবে তিনি ইতিহাসকে ভুল বুঝবেন ও আসন্ন ভবিষ্যতের বিপ্লবগত প্রগতির সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলবেন।

সুতরাং যা বলছিলাম, ন্যায়ত কবিরা শুনতে বাধ্য।

আমি নিজে পাঠক বা কবি কারোরই মুখপাত্র হব না, নিরপেক্ষ ভাবে ঘটনাটা দেখবার চেষ্টা করছি।—

পাঠক: আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য, কারণ তাতে ভাবের সামঞ্জস্য নেই। পর পর বাক্যগুলো যে কী নিয়মে আসে তার কোনো পদপ্রকরণ পর্যন্ত নেই। সব যেন ছায়াবাজী।

কবি: তার কারণ, কবিরা সংক্ষেপ চান। কথা কম ক'রে আবেগ ঘনীভূত হোক, মন্ত্রের মতো। কাজ হবে বেশী। ঘটনা পরম্পরার যোগসূত্র

পাঠক—যিনি একাধারে শ্রোতা ও দর্শক—নিজে আবিষ্কার ক'রে নেবেন। কবি ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত। সিনেমার কথা ভাবুন: ট্রেন এল ; (দৃশ্য বদ্‌লালো) ; একটি যুবক সুটকেশ হাতে প্লাটফর্ম থেকে বেরুল ; বুঝলাম, ঐ ট্রেণে এই যুবকটি এল।

পাঠক : কিন্তু ধরুণ এমন যদি হয় রেল লাইনের ওপর দিয়ে একটা টর্পেডো বোট এগিয়ে এল ; (দৃশ্য বদলালো) ; একটা গরু গলায় সুটকেশ ঝুলিয়ে ষ্টেশানের কম্পাউণ্ডে জাবর কাটছে ; কী বুঝব ?

কবি : বুঝবেন, কবি ব্যর্থ হ'য়েছেন। কিন্তু আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে কি আপনার মত এই রকমই ? অর্থাৎ আপনি কি বলতে চান, আধুনিক কবিতা অর্থহীন ? যদি তাই হয় তবে দুর্বোধ্য না ব'লে অবোধ্য বলাই আপনার উচিত ছিল। কিন্তু তা যখন বলেন নি তখন বুঝতে হবে সাধারণভাবে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে এরকম চরম অভিযোগ আপনার নেই, হয়ত কোনো কোনো বিশেষ কবির বিশেষ বিশেষ কবিতার সম্বন্ধে আছে। নয় কি ?

পাঠক : তা বটে। তবে একটা কথা। আপনি কি বলতে চান, আধুনিক কবিতার মধ্যে কিছুই দুর্বোধ্য নেই।

কবি : নোট বইয়ের অর্থের দিক দিয়ে হয়ত আছে। ভাবের দিক দিয়ে নেই। আমি অবশ্য যথার্থ ভালো বা সার্থক কবিতার কথাই বলছি। সে রকম কবিতা প্রাচীন যে কোনো ভালো কবিতার মতোই সুবোধ্য এমন কি আপনারা যাকে দুর্বোধ্য বলেন সে রকম দুর্বোধ্য হ'য়েও সুবোধ্য। দান্তে-র কথা মনে করলে আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। কম পরিসরে রবীন্দ্রনাথ বা যে কোনো বড় কবিই চলতে পারেন। সুতরাং আমার অনুরোধ, কবিতাকে কবিতা ব'লে মানবার পর এ সব তর্ক আর তুলবেন না। বরং ভালো না লাগলে বলবেন, কবিতা হয় নি।.....

পাঠক : তা'হলে আপনারা আমাদের কোনো রকম সাহায্য করতে রাজী নন, এই কি জেনে রাখব ?

কবি : কবি হিসাবে কৈফিয়ৎ দেওয়া জিনিষটা আমার কাছে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় লাগে। তবে সমালোচক হিসাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে পারি।

পাঠক : না হয় তাই করুন। এককালে বাংলাদেশে তান্ত্রিক ধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল। তার মন্ত্র আর প্রকরণের মধ্যে যথেষ্ট দুর্বোধ্যতা ছিল। তান্ত্রিকরা নিজের গণ্ডীতে তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু ইতরজনের কাছে লাগত সবটাই আজগুবি। তেমনি আবার পরবর্তীকালে নব্যন্যায় বহু কুশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিতকে মাতিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতিতে তার দান কতটুকু! এ সব থেকে কি এইটেই প্রতিপন্ন হয় না যে যাকিছু সূক্ষ্ম-বিচারের আনন্দদায়ক তাই সামাজিক মানুষের মঙ্গলবর্দ্ধক নয়? অবিমিশ্র কাব্যরসানুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মার্গে মুক্তিলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে কি ব্যষ্টিগত সমাজজীবনের কথাও কবিদের মনে রাখা উচিত নয়?

কবি : আমি তো মনে করি, উচিত। আর সেইজন্যই এটাও মনে করি যে, কোনো কবির যদি ভাবের অস্পষ্টতার কোনো প্রতিবন্ধক থাকেই তাহ'লেও প্রকৃত কবি অর্থাৎ জীবিত কবি হ'তে হ'লে তাঁকে সে বাধা কাটিয়ে উঠতেই হবে। কারণ কবির সাধনাই হ'চ্ছে, নিজের ব্যক্তিগত বিশেষ অভিজ্ঞতাকে সার্বজনীন নির্বিশেষ অভিজ্ঞতার পর্যায়ে উন্নীত করা। সেটা করতে গেলেই পাঠকের সঙ্গে যোগস্থাপন অবশ্যম্ভাবী ; যে কবি যত তাড়াতাড়ি এই সর্ববোধ্য ভাবের বাহন আবিষ্কার করতে পারেন তিনি তত বেশী সার্থক। এবং এ টা সম্ভব শুধু কবি আর পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গী এক হ'লে। সেইজন্যই গত দু'বছরে বাংলা কবিতার দুর্বোধ্যতা কমে গেছে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিপ্লবের চাপটাই এখানে প্রধান।

পরীক্ষিৎ

পুস্তক-পরিচয়

সাহিত্যে সংঘাত ও সমন্বয়

সাহিত্যের স্বরূপ।—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। ১৷৷০

দুইটি যুধ্যমান শিবিরের মাঝে সঙ্গতি রচনায় উৎসুক হলে সচরাচর উক্ত দৌত্য-প্রয়াসীরই কপালে পড়ে লাঞ্ছনার টুকরোটাকরা ভাগ; রাজনীতির ময়দানে এর পরিসংঘটন তো সুপ্রচুরই, সাম্প্রতিক সাহিত্যের আলোচনাকালেও এ অতি অনুধাবনেয়। কারণ, সামাজিক পরিবেশের রদবদলে আধুনিক সাহিত্যিক দুইটি শিবিরে বিভক্ত। এবং সেই উভয় শিবিরেরই অঙ্গুলি-নির্দেশ মাত্রাতিরিক্ত উদ্ধত; অর্থাৎ তার কোনটি আকাশ-আকাঙ্ক্ষী, কোনটি মৃত্তিকা-লোভী। কিন্তু নিতান্ত সাময়িক তাগিদেই বাংলা সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বে আজ আদর্শিক দ্বন্দ্ব। আমরা রাজনৈতিক শব্দকে পোষাক পালটিয়ে সাহিত্য আলোচনায় ব্যবহারঙ্গম করেছি। বাংলা সাহিত্যের এই দ্বিবিধ দলকে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী নামে অভিহিত করা গেল। ফরাসী ডেকাডেন্সের প্রমত্ত বুলি—রসকৈবল্যে দক্ষিণী দল হৃদয় বিকিয়েছেন, কড়া মার্কসবাদে মৌতাত হয়ে গেছে বামপন্থীর। এহেন সাঙ্কটিক মুহূর্ত্তে মিলনপ্রয়াসীর ভাগ্যে বিরূপ টিপ্পনী অবধারিত। প্রথমোক্ত দল হয়তো তাঁর সাহিত্যবোধ সম্পর্কেই কপাল কুঁচকাবেন, দ্বিতীয় দলের অভ্যন্তর থেকে ধূয়ো উঠবে যে যথেষ্ট পরিমাণে ঐতিহাসিক বিপত্তিতে সচেতন তিনি নন; তিনি আধা বুর্জ্জোয়া। অনুৎসাহিত হবার অসংখ্য কারণ থাকা সত্ত্বেও এ সম্পর্কে দুঃসাহসিক অভিযানের নিদর্শন মিলছে। বলতে বাধা নেই যে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের গ্রন্থটি তারই একটি বিরল নজির।

ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে জীবনপরিধির ক্রমবিস্তৃতির সঙ্গে পা ফেলে কী পরিমাণ দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে মানুষের লেখা। বোধ করি জীবনের পরিপূর্ণ সাহচর্য্য একমাত্র সে-ই সর্ব্বযুগে আহরণে সচেষ্ট, তাই তার নাম সাহিত্য। আবার লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সাহিত্য সৃষ্টির গা-ঘেঁষে চলেছে, সাহিত্য কি সে প্রশ্নও। প্রতিযুগে প্রতিবার এই প্রশ্ন মানুষের বুদ্ধির আয়নায় হয়েছে প্রতিফলিত। উত্তর দিয়েছে সে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতন হয়েই।

একটি পরিচ্ছন্ন বাস্তব দৃষ্টির অনটন কোন দিনই হয়নি তার। আর, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সবিশেষ চেতনা থেকেই তো উদ্ভূত হয়েছে এই বাস্তবতা বোধ। 'বাস্তবতা' শব্দটি সর্ব্বথা পরিবর্ত্তনশীল। তাই সাহিত্যকে যখন বস্তু-নিরপেক্ষ করেও সে-যুগের সমালোচকেরা সাহিত্যের সত্যিকার সংজ্ঞা দেবার স্পর্দ্ধা করেন, তা' দেখে আমরা হতচকিত হই না। কারণ বস্তুনিরপেক্ষ হলেও একটি যুগোপযোগী বাস্তব দৃষ্টিই ছিল তাঁদের।

পরিমিতরূপে সামাজিক আবহাওয়ায় পুষ্ট হলেও আধুনিক সাহিত্যের অনিসন্ধিৎসু পাঠকের চিত্তও অ্যারিষ্টট্‌ল থেকে সুরু করে টল্‌ষ্টয়, এমন কি জৈবিক ধর্ম্মের অকুণ্ঠ লীলাকীর্ত্তনকারী লরেন্সকে পাশ কাটাতে অক্ষম। বস্তুত বিভিন্ন যুগের চঞ্চল পদচিহ্ন এঁদের প্রত্যেকের রচনাবলীর বুকে নিঃসংশয়ে অঙ্কিত। অগ্রাহ্য তাই এদের কোনটিই নয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য-জিজ্ঞাসার প্রধান কথা হল, ঐতিহাসিকবোধ। অপরাপর তত্ত্বের পাশে দাঁড়িয়ে এই নববোধ পরিপূরকের কাজ করবে। এই ক'টি কথাই শ্রীযুক্ত দাসগুপ্ত তাঁর গোটা গ্রন্থে নিঃশেষে বলবার চেষ্টা করেছেন—বলেছেন-ও এবং সেই কারণেই বক্তব্যকে প্রাঞ্জলতর করবার চেষ্টারও তিনি কসুর করেননি। তবু কয়েকটি অভিযোগ থেকে যায়। প্রথমতঃ গ্রন্থটির নাম সম্পর্কে। নামকরণ করেছেন সাহিত্যের স্বরূপ। কিন্তু তার কোন রূপই তিনি দেননি; সাহিত্যের অভ্যুদয় এবং সাহিত্যের পথ ও ধাপ সম্পর্কেই তাঁর যা আলোচনা। দু' একবার 'প্রাণধর্ম্ম' শব্দটির ব্যবহারে সে অসঙ্গতি গোপনের সুচতুর প্রয়াস আছে। এবং টেনে-বুনে মিলও তাই একটা খাড়া করা হয়েছে। মিল বটে, কিন্তু সেটা গোঁজামিল। আপাততঃ একথা বল্‌লে বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সাহিত্যের কোন স্বরূপ নির্দ্ধারণ বিপজ্জনক; বর্ণনা করা গেলেও তার সংজ্ঞাদান অসম্ভব। তাই বর্ত্তমান সাহিত্য ব্যাখ্যায় সেই পৌনঃপুনিক ব্যর্থতার সম্মুখীন না হওয়াটাকেই যুক্তিশাসিত সাহিত্যিক বুদ্ধি বলে প্রতিভাত হয়।

পরবর্ত্তী আপত্তি হল, তাঁর 'প্রাচারীতি প্রবর্ত্তনবাদ' সম্পর্কীয় আলোচনায়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বলতে তিনি যে যুক্তির সঙ্গিন উঁচিয়ে ধরেছেন তা কি প্রকারান্তরে বার্গসঁর elan vital তন্ত্রাশ্রয়ী নয়?

চাঁদ, আকাশ, পাহাড়, নদী চিরকালই থাক্‌বে। কিন্তু তবু যে এদের রূপ যুগে যুগে বদলে গেল, তা না মেনে উপায় কই। একদিন মানুষ প্রকৃতিতে ভয় পেয়েছে; প্রিয়তম ব'লেও সম্বোধন করেছে একদিন,—যেদিন তার রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্ম্মে বাজল তার নিমন্ত্রণ। আরো একটি দিনের কথা আমরা জানি, যেদিন প্রকৃতির পরে মানুষের ভয় আসেনি, ভালবাসা আসেনি, এসেছে বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা। তাই যে-চাঁদকে দেখে আদিম মানব সন্তান তাকে খুসি করবার অভিলাষে স্তোত্র রচেছিল, পরবর্ত্তী-কালের প্রেমবিহ্বল মানব শিশুর কণ্ঠ গদগদ হয়ে প্রশস্তি পাঠিয়েছিল, সেই চাঁদকে দেখেই আধুনিক কবি বলেন, কাস্তে। প্রশ্ন এই, এদের কোন্‌টি অবাস্তব? শ্রীযুক্ত দাসগুপ্তের বক্তব্যে গলদ পাচ্ছি এই কারণে যে এ প্রশ্নের মীমাংসা তিনি খুঁজতে গেছেন মানুষের আদিতম সত্তায়। কিন্তু জানবার কথা এই, যে, মানুষের প্রাণটিই পরিবর্ত্তনশীল; পারিপার্শ্বিকের দুর্মর চাপেই তার স্বাস্থ্যের আহার্য্য আহরণ।

কিন্তু প্রধান আপত্তি আসে দাসগুপ্তের প্রবন্ধকয়টির কাঠামো সম্পর্কে। একথা অনস্বীকার্য্য যে প্রবন্ধ কয়টিতে সর্ব্বত্রই তাঁর মূল ধুয়ো স্পষ্ট, প্রসঙ্গা-লাপ সহজীকৃত, তর্কের পরিশেষে সত্যেরও তিনি খুব কাছাকাছি, তবু তাঁর প্রবন্ধসমষ্টির একটিও যথার্থতঃ পূর্ণাঙ্গ হয়নি। শিথিল গঠনে ও জোলো বিন্যাসে তারা জর্জ্জরিত; উপাদানের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও প্রশংসনীয় আঁটসাট দেহ নয় তাদের। তথ্যবহুল প্রবন্ধ রচনায় আমরা সুধীন্দ্র দত্তের জোর কলম লক্ষ্য করেছি, অন্নদাশঙ্করের বাগ্‌বিভূতি বরদাস্ত করেছি, আবু সইয়দ আয়ুবের মাত্রাজ্ঞানকে তারিফ করেছি, অমিয় চক্রবর্ত্তীর রসিক চিত্তের সুকুমার বিকাশে পুলকিত হয়েছি, গা এলিয়ে দিয়েছি বুদ্ধদেব বসুর কাব্যিক জোয়ারে। কিন্তু সাহিত্যিক মূল্য দিয়েছি তাদের খানিকটা আকারনৈপুণ্যের খাতিরেই। কিন্তু দাসগুপ্ত মহাশয় বারবার তাঁর তর্কের ডিঙ্গাকে কাব্যের, তথা ভাবপ্রবণতার কূল থেকে তথ্যের কূলে ভিড়াবার চেষ্টা করেছেন, সংহতি দানের প্রয়াসে হয়েছেন পরিশ্রান্ত; আবেগ ও যুক্তির টানা-পোড়েনে তাঁর প্রবন্ধকয়টি সাহিত্য সুষমায় মঞ্জুরিত হয়ে উঠল না। অর্থাৎ আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর আধুনিকতম চেষ্টায়ও দ্বন্দ্বের অবসান

ঘটেনি। নাই বা ঘটল, তবু প্রচলিত নন্দনতত্ত্বের সাথে মার্ক্সবাদের সামঞ্জস্য করা অসম্ভব বা যুক্তিহীন নয়, তাঁর স্মরণে ও চিন্তায় এই উপলব্ধি দেখে আমরা খুসী।

সুরেশ মৈত্রেয়

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

বাদশানামা—(লেখকের নাম নেই) গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, কলিকাতা। দাম—চৌদ্দ আনা।

উপন্যাসে ও কবিতায় প্লাবিত বাংলা-সাহিত্যে এই বইখানির মূল্য যে অনেক বেশী—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষে মোগল-সাম্রাজ্যের ব্যাপক ইতিহাস স্বল্পায়তনের মধ্যে এই বইখানিতে কৃতিত্বের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান—এবং ঐ সময়ের বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক আবর্ত্তনের বর্ণনা প্রসঙ্গে মোগল বাদশাহদের চরিত্র ও জীবনী আলোচনা করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য—এবং সেই কারণেই বই-খানির 'বাদশানামা' নামকরণ সার্থক বলা যেতে পারে।

বাঙালির রোমাণ্টিক মন থেকে ঐতিহাসিক চৈতন্য প্রায় বিলুপ্ত হ'তে বসেছে—অতীতের কবর খুঁড়তে তারা নারাজ। এই কারণেই বোধ হয় পাঠ্য-বই ছাড়া সাধারণের পাঠোপযোগী ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাংলা-সাহিত্যে বিরল। 'বাদশানামা'র গ্রন্থকার তাঁর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে—ইতিহাস-রূপায়ণে আমাদের যে অশেষ উপকৃত করেছেন এ কথা বলা বাহুল্য।

লেখকের বর্ণনাভঙ্গীটি চমৎকার। নীরস ঐতিহাসিক তত্ত্বকে উদ্‌ঘাটিত ক'রবার যাদুকরী ক্ষমতা রয়েছে তাঁর ভাষায়। পাঠ্যবই-এর ঐতিহাসিক বর্ণনার মতো এতে শিক্ষকমহাশয়ের তর্জনী-উত্তোলন নেই। মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানকারী মহাবীর বাবর হ'তে আরম্ভ ক'রে—ঔরঙ্গজীব পর্য্যন্ত প্রত্যেক বাদশাহের জীবনী, লেখক এমন সরস ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে বইখানি এক-টানা প'ড়তে মনে কোন ক্লান্তি জাগে না। বাদ্‌শাহদের মুখাঙ্কিত প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই প্রশংসনীয়।

মার্ত্তণ্ডরায়ের খিয়োরী—শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। দাম দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত মৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারীর আলোচ্য বইখানি কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। একমাত্র 'ঝড়ের দোলায়' ছাড়া সবক'টি গল্পই প্রায় সমস্তরের;—আধুনিক

শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের ক্লিন্ন কাহিনীই তাঁর বর্ণনীয়। তথাকথিত 'প্রগতি'র কৈফিয়ৎ দিয়ে বর্তমান সমাজ যে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে—গল্পগুলিতে লেখক তারই নগ্ন বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেছেন।

মৃণালবাবুর ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গী আশাপ্রদ হ'লেও সংলাপের ত্রুটি তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ইংরাজী শব্দে নায়ক-নায়িকার আলাপ-আলোচনা কণ্টকিত করা সত্যই অসঙ্গত। যথোপযুক্ত কারণের নির্দেশ থাকলে অবশ্য তাও সহনীয়। কিন্তু বর্তমান আলোচ্য বইখানিতে তার ব্যতিক্রম দেখা গেছে। প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই চিত্তাকর্ষক।

মন্টুরাণী মিত্র

উলুখড়—বিমলচন্দ্র ঘোষ; এক পয়সার একটি গ্রন্থমালা; কবিতাভবন; দাম চার আনা।

তান বর্জন করে বাংলা ভাষায় কবিতা লিখলে গাম্ভীর্য বজায় রাখা যায় না, চিত্তের আবেগ ব্যাহত হয়, লীলাময়ী, বিক্রীড়িতা কল্পনার ভার দুঃসহ হয়ে ওঠে। বিমলচন্দ্রের কবিতা সচরাচর হাল্কা নয়, যদিও হাল্কা কবিতা তিনি আগে লেখেননি এমন নয়। তাঁর কাব্যের ওজন আছে। গণশক্তির বৈপ্লবিক পৌরুষ সাংস্কৃতিক কল্পনার সাহচর্যে ঘনমন্দ্রিত তানে রূঢ়, বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর কাব্যে।

'উলুখড়'-এ বিমলচন্দ্র হঠাৎ বিবাগী হয়ে বৈরাগ্যের ছড়া কাটতে লেগে গেছেন। ছড়াগুলি স্বল্পভাষিত হলেও সুভাষিত। ছান্দসিক বৈচিত্র্যের ও সিদ্ধির দিক্ থেকে এই ছোট কবিতাগুলি—বিশেষ করে আগের দিকের কয়েকটি—অসামান্য শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। এলোমেলো, ছেঁড়া, রূপালি মেঘের মতো এই কবিতাগুলি পাঠকের মনে অল্প একটু ছোঁয়া দিয়েই পালিয়ে যায়—মেঠো গানের টুক্‌রোর মতো কান ডিঙিয়ে মনে হয়তো পৌঁছতেই পারে না। নানা ছাঁদের ও রঙের কাগজের নৌকো বৈরাগী হাওয়ায় মন্থর হ্রদে ভেসে বেড়াচ্ছে মনে হয়। মোটের উপর ছোট হাল্কা কবিতার যে সব গুণ থাকা দরকার—দমকা, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, লঘু ও সরস প্রাজ্ঞতা, অনুষ্ণ বক্রোক্তি, উড়ো উদাসীন ভাব—প্রথম ছটি পরিচ্ছেদের কবিতায় সেগুলির অভাব হয় নি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের কবিতাগুলি সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করতে পারছি না। পেটি বুর্জোয়া ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীর বিস্তার কাব্যে অনধিকার প্রবেশ করলেও তার মজ্জাগত গদ্যত্ব ঘোচেনি বলে মনে হলো।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

সম্পাদকীয়

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও পরিচয়

গত শ্রাবণ মাস থেকে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে পরিচয়ের সম্পাদক-পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, মলাটে তাঁর নাম না দেখে পাঠকবর্গ তা নিশ্চয়ই অনুমান ক'রে থাকবেন। সম্পাদকীয় যোগসূত্র ছিন্ন হলেও গত বারো বছরে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে পরিচয়ের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে, বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে এই যোগ স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শুধু পরিচয়ের পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন নি, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে ও সাহিত্যিক প্রেরণায় এমন এক লেখকসংঘ তিনি গড়ে তুলেছিলেন যাঁদের সহযোগিতার ফলে পরিচয় বাংলাদেশের পত্রিকা-জগতে নতুন এক ধারার সঞ্চার করেছে ব'লে দাবি করতে পারে।

পরিচয় যে-ধারার প্রবর্তন করেছিল আজ কতদূর সেই ধারা অক্ষুণ্ণ আছে তা অনেকের সন্দেহের কারণ হ'তে পারে। এই রকম সন্দেহ হয়তো অমূলক নয়, কিন্তু এর উত্তরে বর্তমান সম্পাদকের একটি কথা বলবার আছে। গত বারো বছরের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যার প্রভাবে অন্যান্য অগণিত সাধারণ মানুষের মত বহু সাহিত্যিকেরও দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় আমূল বদলে গেছে, ফলে সাহিত্যসেবার উৎসাহে ও তাগিদে একদিকে যেমন ভাঁটা পড়েছে অপরদিকে তেমনি দেখা যাচ্ছে সাহিত্য রচনায় নতুন আদর্শের প্রভাব ও নতুন সৃষ্টির প্রয়াস। বারো বছর আগে পরিচয় যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিল তার মধ্যে দ্বিধা ছিল না, তাই প্রবল গতিতে তা প্রবাহিত হয়েছিল সংখ্যার পর সংখ্যায়। কিন্তু পরিচয়ের নূতনত্বের উপলব্ধি ছিল তখন মুষ্টিমেয় পাঠক ও লেখকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আজকের সাহিত্যে যে নবতর চেতনার সঞ্চার লক্ষ্য করা যায় তার জন্ম জনসাধারণের মর্মে। কিন্তু পেশাদারী সাহিত্যিকদের মন ও জনমন এখনো অন্তরঙ্গ যোগসূত্রে যুক্ত হয়নি, তাই সাহিত্যসৃষ্টিতে আজ দেখা যাচ্ছে দ্বিধা, নতুন চেতনা নতুন সৃষ্টিতে আজো সার্থক হ'য়ে ওঠে নি। এই যুগসন্ধির লক্ষণ যদি আজ এই পত্রিকায় ফুটে ওঠে তা শুধু অনিবার্য নয়,

তাতে প্রমাণ হয় পরিচয় এগিয়ে চলেছে, পেছিয়ে পড়েছেন শুধু তাঁরা যাঁরা ১৯৪৩ সালের পত্রিকায় খোঁজেন ১৯৩১ সালের দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গী।

এই এগিয়ে চলার পথে পরিচয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে এর প্রথম সম্পাদককে। সাহিত্যবোধের যে-ব্যাপক পটভূমিতে তিনি এই পত্রিকাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই ফলে আজ পরিচয় প্রশস্ততর পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে সাহসী হয়েছে। যদি এই প্রয়াস সার্থক না হয় তার কারণ হবে শুধু বর্তমান সম্পাদকের অক্ষমতা ; কিন্তু তাতে এই পত্রিকার সম্পাদনে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে সার্থকতা অর্জন করেছেন তা' বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না।

বর্তমান সম্পাদকের আরো একটি কথা বলার আছে। পরিচয় সম্পাদনার ভার তিনি তাঁর জীবনের মহত্তম উত্তরাধিকারের মধ্যে গণ্য করেন—এই উত্তরাধিকারের সঙ্গে চিরদিন বিজড়িত থাকবে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সাহিত্যিক সাহচর্যের অমূল্য স্মৃতি।

বিশ্বভারতী পত্রিকা ও বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্বভারতী পত্রিকার মাসিক সংস্করণ সম্বন্ধে অনেকেই অভিযোগ করতেন যে বিশ্বভারতীর উপযুক্ত পত্রিকা এটি হয় নি। এই অভিযোগ পুরো না হলেও অনেকটা সংগত, অর্থাৎ মাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রশংসার জিনিষ যথেষ্ট ছিল কিন্তু তবু মনে হ'ত বিশ্বভারতীর কাছ থেকে যেন আরো পাওয়া উচিত। যদি তা না পাওয়া গিয়ে থাকে তার জন্যে অবশ্য পরিচালকবর্গকে দোষী করা চলে না, সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে তো একেবারেই না। কেননা, এই দুর্দিনে সকলকে খুসি করার মতন মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা অসাধ্য ব্যাপার। এই উপলব্ধির ফলেই বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ পত্রিকাটিকে পরিণত করেছেন ত্রৈমাসিকে। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত এর প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে যাঁরা খুসি হবেন না, তাঁদের খুসি করা অসম্ভব, অতএব সে চেষ্টা না করে অনুবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রথম সংখ্যার মান যাতে বজায় থাকে পরিচালকবর্গ যদি সে বিষয়ে সতর্ক থাকেন তাহলে বাংলাদেশের বিস্তৃত সাহিত্যিক সংঘ উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হবে।

ত্রৈমাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রায় প্রত্যেকটি রচনাই উল্লেখযোগ্য। সব চাইতে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে নিশ্চয়ই পত্রিকার একেবারে প্রথমে ছাপা রবীন্দ্রনাথকৃত বেদমন্ত্রানুবাদ (শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন-লিখিত প্রবন্ধসহ) ও পত্রিকাটির আর এক প্রান্তে ছাপা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি। সব প্রবন্ধগুলির নামের তালিকা দিয়ে লাভ নাই, কিন্তু দুটির নাম না করে পারলাম না : শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চক্রবর্তী-লিখিত 'যুগ-সংকটের কবি ইকবাল।' এই দুটি অত্যন্ত সুলিখিত প্রবন্ধ এই ত্রৈমাসিক পত্রিকার ব্যাপক বৈষয়িক পরিসরের পরিচয় দেয়।

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের, বিশেষভাবে গ্রন্থন-বিভাগের, সার্থক উদ্যমের প্রমাণ একমাত্র রূপান্তরিত বিশ্বভারতী পত্রিকা নয়। 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালা বিষয় ও লেখক নির্বাচনে, মুদ্রণের পারিপাট্যে, মলাটের সৌষ্ঠবে যে প্রকাশন-দক্ষতার পরিচয় দেয়, বাংলাদেশে তা' অভূতপূর্ব। এই গ্রন্থমালার প্রথম বই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'সাহিত্যের স্বরূপ' ইতিপূর্বে এই পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। এর পর আরো পাঁচটি বই বেরিয়েছে : ২। কুটির শিল্প (শ্রীরাজশেখর বসু), ৩। ভারতের সংস্কৃতি (শ্রীক্ষিতিমোহন সেন), ৪। বাংলার ব্রত (শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর), ৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য) ও ৬। মায়াবাদ (শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ)। এর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র পরিচয়ের দাবি রাখে ; এই পরিচয় পরে দিব এখানে শুধু এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। কিন্তু আশা করি পাঠকবর্গ এই পরিচয়ের অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। যে-জাতীয় বইর শুধু সমালোচনা পড়েই অনেকে তৃপ্ত হন এই বইগুলি যে সে-জাতীয় নয় তার প্রমাণস্বরূপ এখানে বলা যেতে পারে এই গ্রন্থমালার প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু আগ্রহজনক, রচনা চিত্তাকর্ষক, পরিসর সংক্ষিপ্ত ও সর্বোপরি দাম স্বল্প—মাত্র আট আনা।

দুর্দিনের সাহিত্য

এই ঘনায়মান দুর্দিনে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য কাগজের বাজার উপেক্ষা ক'রে বাংলা সাহিত্যের নবতর প্রসারের ও বিশেষভাবে সাহিত্যসৃষ্টিতে যে নতুন চেতনার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি তার প্রমাণ দিচ্ছে আরো একাধিক গ্রন্থমালা

ও পত্রিকা। 'শতাব্দী গ্রন্থমালা'র পরিচয় পাঠকবর্গ ইতিপূর্বে পেয়েছেন। 'সমবায় পাবলিশার্স'এর 'আজ-ও আগামী কাল' সিরিজ-এর 'ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। লেখক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই ও আর একটি নূতন বই—'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' শুধু স্বতন্ত্র নয় বিস্তৃত আলোচনার যে-দাবি করে পরে তা পালনের ইচ্ছা রইল।

বিশ্বভারতী পত্রিকার খাতে প্রবাহিত হয়েছে যে শাশ্বত সাহিত্যের ধারা তাকেও বিক্ষুব্ধ করেছে 'এ যুগের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা'। শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার-লিখিত এই প্রবন্ধটি যে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ তার প্রকাশ দেখি 'অরণি' (কলকাতা) বা 'প্রগতি' (ঢাকা) প্রভৃতি পত্রিকায়। যুগসংকটের চেতনা আজ আর ইকবালীয় দর্শনে সীমাবদ্ধ নয়, জননমের সঙ্গে ঐক্যসূত্রের সন্ধানে আজ এই চেতনা পরিপূর্ণতর অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ দিকে দিকে প্রবাহিত হয়েছে এই অভিব্যক্তির ধারা। একথা নিশ্চিত, আজ যাঁরা এই ক্ষীণ স্রোতকে অবজ্ঞা করছেন এর অপ্রতিহত প্লাবনে তাঁদের একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেসে যেতে হবে।

শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত সম্পাদিত 'দিগন্ত' হাতে এল একেবারে শেষ মুহূর্তে। সুতরাং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। এটি বার্ষিকী, (প্রথম বর্ষ, ১৩৫০); দাম আড়াই টাকা; পৃষ্ঠা ২৪০; এর লেখক বহু (রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রায় সকলে); লেখিকা মাত্র দু'জন—প্রতিভা বসু ও নীলিমা দেবী। প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটিকার বহুল সমাবেশে সমৃদ্ধ, একাধিক কাঠ খোদাইর ছবিতে অলংকৃত ও রবীন্দ্রনাথের একটি রঙীন ছবিতে গৌরবান্বিত এই বার্ষিকীটির বিচিত্র উপাদানের মধ্যে সুদিনের স্মৃতি ও দুর্দিনের দুঃখ দুই ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে ব্যবসায়ী প্রচেষ্টা অবশ্য আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও যে 'দিগন্ত' সরস সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে আদৃত হবে তা নিঃসন্দেহ।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পরিচয়-বিজ্ঞাপন

এবার পূজোর বাজারে বই কেনাই সবচেয়ে এবং
সকল দিক দিয়ে লাভের ঃ—

ধূর্জটীপ্রসাদের ত্রিরত্ন-উপন্যাস—অন্তঃশীলা ও আবর্তের পর নূতন বই মোহানা ৩৲

কবিতা-উপন্যাস-গল্প ঃ—

নির্মলচন্দ্রের আকাশগঙ্গা ২৲ ও ১॥০
হরপ্রসাদের পৌত্তলিক ১৷০
ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তীর একমুঠো ১৲
খসড়া ১॥০ অভিজ্ঞানবসন্ত ১॥০
বিমলাপ্রসাদের সংক্রান্তি ১৲ সঞ্চারী ১৲
বিষ্ণু দের চোরাবালি ২৲ পূর্ব্বলেখ ১৸০
উর্ব্বশী ও আর্টেমিস ১৲
সুধীন্দ্রনাথের ক্রন্দসী ১৸০ অর্কেস্ট্রা ১৸০
উত্তরফাল্গুনী ১৷০
হেমেন্দ্রলালের তেপান্তর ॥০
জীবনময় রায়ের মানুষের মন ৩৲
নীরেন্দ্রনাথ রায়ের দাবী ১৲
সরোজকুমারের সোমলতা ২৲
কালীপদ সিংহের পরিশোধ ১॥০
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৌ ১॥০
জ্যোতির্ময় রায়ের দৈমন্দিন ১॥০
বিমলাপ্রসাদের পঞ্চমী ১৲
প্রমথ বাবুর অনুকথাসপ্তক ১৲
নীললোহিতের আদিপ্রেম ১৲
ধূর্জটীপ্রসাদের রিয়ালিষ্ট ১৲
অনাথনাথ বসুর মারাবাঈ ১৲

বিশু মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত আলফাঁস দোদের বিখ্যাত বই সাফো (যন্ত্রস্থ) ২৲
বিমলেশ দে প্রণীত জনম-অবধি (নবন্যাস) ১৷০

প্রবন্ধ-ভ্রমণ-পত্র ঃ—

প্রিয়রঞ্জন সেনের সাময়িকী ১৲
বিমলাপ্রসাদের ভারতের ঐতিহ্য ১৲
প্রমথ বাবুর ঘরে বাইরে ১৲
ধূর্জটীপ্রসাদের চিন্তয়সি ১৷০
নবেন্দু বসুর কবিতার প্রকৃতি ২৲
সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের বিচিত্রা ১॥০
কবি বিজয়লালের হে রুদ্রসন্ন্যাসী ॥৵০
রামপদ চট্টোপাধ্যায়ের বেদান্ত প্রবেশ ১॥০
চণ্ডীরহস্য ২৲ গায়ত্রীরহস্য ১॥০
ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর ভারত ও ইন্দোচীন ১৲
ভারত ও মধ্য এশিয়া ১৲
বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য ১৲
রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটীপ্রসাদের সুর ও সঙ্গতি ১৲
নির্মলকুমার বসুর কোণারকের বিবরণ ১৸০
অতুলচন্দ্র গুপ্তের নদীপথে ॥০
ত্রিষ্টুপ্ মুখোপাধ্যায়ের দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রা (২য় সংস্করণ) যন্ত্রস্থ
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—স্বগত ২৸০
সৌরেন্দ্রনাথ খাঁ—প্রেম ১॥০

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের আমাদের সাহিত্য ১॥০ বাংলা পড়ানো (২য় সং) ১॥০

ভারতী গ্রন্থমালার
১ম গ্রন্থ রামকৃষ্ণ কথা, ২য় বিবেকানন্দ চরিত, ও ৩য় গান্ধীজী

ভারতী ভবন
১১ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরিচয়-বিজ্ঞাপন

পড়ে ভুলে যাবার মতো পত্রিকা নয়,

বার বার পড়বার এবং পড়ে' মনে রাখবার মতো অপূর্ব সংগ্রহ

দিগন্ত

অজিত দত্ত সম্পাদিত শ্রেষ্ঠ পূজা-বার্ষিক প্রকাশিত হোলো

এ-সংখ্যায় আছে :

রবীন্দ্র ঠাকুর অঙ্কিত ত্রিবর্ণ ছবি, রবীন্দ্রনাথের দু'টি অপ্রকাশিত কবিতা এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ও শিল্পাচার্যের স্বহস্ত-চিত্রিত একটি সম্পূর্ণ যাত্রার পালা। তা ছাড়া আছে :

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভা বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, মণীন্দ্রলাল বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের **গল্প**; অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অমিয় চক্রবর্ত্তী, লীলাময় রায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের **প্রবন্ধ**; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি সম্পূর্ণ **নাটিকা**; ভূপতি চৌধুরীর স্মৃতিচিত্র 'কল্লোলের দিন' এবং রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ শিল্পীদের পাঁচখানি অপূর্ব কাঠখোদাই।

দাম আড়াই টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স্ লিমিটেড্

১৪ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ও সমস্ত ষ্টল

পরিচয়

পরিচয়-বিজ্ঞাপন

[অভিনব মাসিক পত্রিকা]

নিয়মাবলী

শ্রাবণ হইতে বর্ষ সুরু করিয়া প্রত্যেক মাসের ১লা তারিখে "পরিচয়" বাহির হয়। মূল্য বার্ষিক ৫্, প্রতি সংখ্যা ॥০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। "পরিচয়ে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার। প্রাপ্ত রচনা প্রকাশের,বা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না।

কোন সংখ্যায় পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের জানাইবেন। চিঠিপত্র পাঠাইবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য

প্রবন্ধাদি, বিনিময় পত্রিকাদি, চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, চেক ও বিজ্ঞাপন

ইত্যাদি পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা :—

পরিচালক, "পরিচয়"—**শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী**

৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

১৩শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩৫০

পরিচয়

জনযুদ্ধের গোড়ার কথা

'প্রবাসী' কাগজ সম্প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেছেন। 'প্রবাসী'র কথা আপাতত নাই তুল্‌লাম। বরং যে দুঃসাহসিক কাজ করতে গিয়ে কমিউনিষ্টদের এই 'লাঞ্ছনা', সেই কাজ নিয়েই দুটো চারটে কথা বলি।

এ কথা কে অস্বীকার কর্‌বে যে আজকের জগতে পৃথিবীতে মাত্র দুটি দলই আছে। একটি সম্পত্তির মালিকদের, আর একটি নিঃসম্বল বিত্তহীনের। এই দুই দলের মিল কখনো হতেই পারে না। সমন্বয়, অহিংসা, দান, ধর্ম, আর্ট, কালচার, ইত্যাদি নানা 'সুনীতি'র আশ্রয় নিয়ে সংস্কারকেরা নানা দল গড়েছেন এই গোড়ার কথাটাকে চাপা দিয়ে বিত্তশীলের ও বিত্তহীনের বিরোধকে অবিপ্লবের রূপ দেওয়ার জন্যে। কিন্তু বিত্তের ধর্ম ই হলো বিত্তহীনের জীবনের সমস্ত রস শোষণ করে নিজেকে ফাঁপিয়ে, বাড়িয়ে তোলা। এটা তার অন্তরের ধর্ম; এই ধর্ম পালন না করে সে বাঁচতেই পারে না। অহিংসা, দান, সংস্কার, ইত্যাদি নানাবিধ মুখোস পরেও সে এই ধর্ম পালন করতে কখনো ভোলে না। বাঘের গায়ে যে লম্বা লম্বা ডোরা থাকে তা কি সুন্দর নয়? সুন্দর বই কি! কিন্তু তথাপি বাঘ সংহারই করে। পৃথিবীর ইতিহাসে বাঘকেও পূজো করা হয়েছে, তার সৌন্দর্য ও মহিমা নিয়ে কাব্য রচনা করা হয়েছে, মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে মানবজীবনের সঙ্গে তার একটা নির্বিবাদ সম্পর্ক স্থাপিত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বাঘকে না মেরে মানুষ বাঁচতে পারলো কই?

বিত্তশীলের সংহার-ব্রত এমনি করেই বিপ্লবের দিকে এগিয়ে গিয়ে বিত্ত-শীলকেই সংহার করবে। বিপ্লবই তাই প্রকৃতির চরম করুণা, বিত্তহীনের মহোৎসব। কিন্তু বাঘকে যেমন মন্ত্রের দ্বারা বশ করাও যায় নি, বধ করাও যায়

নি, তেমনি মন্ত্রের দ্বারা বিত্তকে আমরা পোষ মানাতে পারবো না, যতই দান ধর্ম্মের, অনসূয়ার ও আস্তেয়র কথা বলি না কেন? বাঘের ডোরার মতো, বিফলতার রসের মতো, এইগুলি সংহারের বা আত্মরক্ষারই কৌশল। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে—লজিক চাই, ম্যাজিক চাই না। নিশ্চয়ই লজিক চাই। ম্যাজিক সংহারকেরই অঙ্গরাগ যদিও ভীরুতা ও অক্ষমতা মাঝে মাঝে তাকে স্বকীয় সৃষ্টি বলে ভুল করে থাকে। কিন্তু এই লজিক বিপিন পাল আমাদের দিতে পারেন না, গান্ধীজিও না, পণ্ডিত জহরলালও না। কার্‌ল্ মার্কস্ ও লেনিন মাত্র তাঁদের নিজেদের বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও অহমিকার উপরই নির্ভর করলে তাঁরাও দিতে পারতেন না। এই লজিক ঘটনা-পরম্পরার, ইতিহাসের। নদী যদি নটিনীর মতো বাঁকা চালে নেচে চলে, তবে কাল্পনিক সরল রেখায় সোজা বাঁধ বাঁধলে গ্রামও বাঁচবে না, নদীও বাগ মানবে না। বস্তুতান্ত্রিক লজিকের এটা একটা সহজ উদাহরণ। যে লজিক জড়ের বিবর্ত্তন অবজ্ঞা করে রঙীন ফানুসের মতো আকাশে উড়ে চলে তার ওস্তাদি চাল খেলাঘরের মেডেল হয়তো পেতে পারে কিন্তু কাজের বেলায় ভূসঞ্চারী মানবকে চলার ভিতর দিয়েই লজিকের মোড় ফেরাতে হবে। জড়-জগৎ যে-লজিককে আশ্রয় করে মহাকালের স্রোতে বিবর্তিত হচ্ছে তাই একমাত্র সত্য লজিক। তার কাছে তথাকথিত মহাপুরুষের লজিক নিতান্তই ছেলে ভুলানো গান বা প্রাগৈতিহাসিক মন্ত্র।

এই সত্যকার লজিক (dialectical materialism) চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে,—বিশ্বের শ্রমিকেরাই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মালিক। তারাই এ যুগে বিপ্লবের অগ্রদূত। তাদের জাত নেই, চামড়ার ও চুলের রং নিয়ে তারা মারামারি করে না, নাকের গড়ন নিয়ে বা চোয়ালের মাপ নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না,—জন্মভূমির চৌহদ্দীতেই বন্দী ঈশ্বরের কাছে তারা মনুষ্যত্বকে বলি দেয় না। সোভিয়েট রাশিয়া এই বিশ্বশ্রমিকেরই রাষ্ট্র। যে কারণে সব 'জাতে'র শ্রমিকই ফাশিস্ত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে স্পেনে লড়াই করেছিলো ঠিক সেই কারণেই আজ সব দেশের শ্রমিকই, এমন কি জার্মান, জাপানী ও ইতালীয় শ্রমিক জানে সোভিয়েট রাষ্ট্র তাদেরই রাষ্ট্র, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। ভারতীয় শ্রমিকও ঠিক এই

কথাই বুঝেছে এবং বুঝেছে বলেই সে আজ 'জাতীয়' আন্দোলনে মোহান্ধ হয়ে সোভিয়েটের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না কেননা তাতে তার নিজের পায়েই শৃঙ্খল আরো শক্ত করে এঁটে বসবে।

কথাটা আরো পরিষ্কার করে বলা দরকার! শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস কর্মী অভিযোগ করছেন, ভারতীয় শ্রমিক কেবল কি রাশিয়ার স্বার্থই দেখবে, নিজের দেশের স্বার্থ দেখবে না, দেশের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেবে না? ভারত কি পরাধীন নয়? রাশিয়া কি ভারতকে স্বাধীন করবে? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কি জাপানী বা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে অধিকতর বাঞ্ছনীয়? এর উত্তরে আমি বলবো, রাশিয়ার এমন কোন স্বার্থ নেই যা ভারতীয় শ্রমিকের স্বার্থের পরিপন্থী। রাশিয়া রুশ জাতির রাষ্ট্র নয়, আন্তর্জাতিক শ্রমিকেরই রাষ্ট্র। রাশিয়া শুধু ভারতীয় শ্রমিকের কেন, ইংরেজ, আমেরিকান, জার্মান, জাপানী, ইতালীয়, সব দেশের শ্রমিকেরই স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই এই লড়াই, ইংরেজ, জাপানী ও জার্মান, সকল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই। এই যুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রমিক যদি জয়ী হয়, তাহলে শুধু জার্মান বা জাপানী সাম্রাজ্যবাদই ধ্বংস হবে না, সাম্রাজ্যবাদ জিনিসটারই আর বাঁচবার কোন উপায়ই থাকবে না। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শ্রমিক বিপ্লব ধনতন্ত্রের বন্দীশালা থেকে মহাকালকে উদ্ধার করে উদার আকাশের নিচে তার মহিমময় রূপটি দেখবে। যে জীর্ণ ধনতন্ত্রকে জার্মান ও জাপানী সৈনাপত্য বাঁচিয়ে রাখতে পারলো না, বৃটিশ ও আমেরিকান সামরিকগণ তাকে চিরদিন সজীব রাখবে এমন মনে করার কোন সঙ্গত কারণ দেখিনে।

যাতে ধনতন্ত্রের ধ্বংস না হয়, এমন কোনো তথাকথিত 'বিপ্লব'ই প্রকৃত বিপ্লব নয়, এমন কোনো জাতীয় আন্দোলনেরই কিছুমাত্র মূল্য নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় আন্দোলনকে যাচাই করা হোতো সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে সেই আন্দোলন ধনতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করবে কি না। তখন ধনতন্ত্র ছিল প্রগতিশীল। এখন ধনতন্ত্র ধ্বংসমুখী, প্রতিক্রিয়াশীল। কাভুরের নীতি উনবিংশ শতাব্দীর ইতালির পক্ষে ছিল প্রাণসঞ্চারী, মুক্তিধর্মী; কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীতে অন্য কোনো পরাধীন দেশে সেই নীতির যে একই ও সমানই

মূল্য থাকবে এ বিচার ভ্রান্ত। যাঁরা মহাপুরুষতত্ত্বে বিশ্বাস করেন তাঁদের পক্ষেই এই ভুল করা সম্ভব। কোনো পথ, কোনো মত, কোনো কর্মই শাশ্বত ও নির্বিকল্প সত্য নয়। বৈদিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সিদ্ধার্থের অভিযান ছিল বিপ্লবী কেননা জনসাধারণের অন্তর্বিদ্রোহ ও মুক্তিপিপাসাকে গৌতম বুদ্ধ ধর্মান্দোলনে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্যের 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধতা'কে আমরা প্রতিক্রিয়াশীলই বলি। রাজার একাধিপত্য যখন সামন্ত উপরাজগণের শক্তি বিনষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হোতো তখন তা ছিল প্রগতিশীল এবং প্রজারা এই সকল রাজার 'স্বেচ্ছাচার' নিজেদের সকল শক্তি দিয়ে সমর্থন করেছিলো। কিন্তু রাজা যখন নবোত্থিত বণিক শ্রেণীকে দমন করার জন্য একাধিপত্য ব্যবহার করলেন তখন তার বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রয়োজন হোলো। স্থিতিশীল সত্য জগতে কই? বাঁকা পথেই সত্যের অভিযান, দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের নবনবোদ্ভূত বিশ্ব থেকে বিশ্বে তার জয়যাত্রা। এই বাঁকা পথই সত্যানুসন্ধানের সব চেয়ে সোজা পথ হয়ে দাঁড়ায় যদি আমরা মহাপুরুষদের দূর থেকে নমস্কার করে বাস্তব জড় জগতের প্রবাহের সঙ্গে নিজেদেরকে মিলিয়ে দিতে পারি।

তাই বলছিলাম, 'স্বাধীনতা'র জন্য একটা আন্দোলন আরম্ভ করলেই এবং 'জাতীয়' আখ্যায় তাকে বিভূষিত করলেই নির্বিচারে তাকে বিপ্লবাত্মক বলে মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং ন্যায় বিচারে সেটা তার ঠিক উল্টো অর্থাৎ প্রতিবিপ্লবাত্মক বলেও প্রতিপন্ন হতে পারে। ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনকে কমিউনিষ্টরা বরাবর সমর্থনই করে এসেছিলেন। আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদে কৃতসংকল্প হলেও ভারতীয় বুর্জোয়ার ধনবৃদ্ধি ও একাধিপত্যের প্রচেষ্টা তাঁদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করেছিলো। একথা তাঁরা বুঝেছিলেন,—ভারতে জাতীয় আন্দোলন আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের মৃত্যুসংবাদ। সুতরাং ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণীর জয়ে শ্রমিক শ্রেণীই জয়লাভ করবে, ভারতে বুর্জোয়া বিপ্লব শ্রমিক বিপ্লবের পথই প্রশস্ত করবে।

কিন্তু জাতীয় আন্দোলন এক দেশে ও এক সময়ে ভাল জিনিস বলে মনে করা হয়েছে; সুতরাং সব দেশে ও সব সময়ে তাই-ই মনে করতে হবে—এই

স্থিতিশীল ন্যায় ভীরুতা ও মনের একটা মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্যারিবল্ডি ও কাভুর ইতালিতে যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন তা ছিল জাতীয় আন্দোলন; আবার মুসোলিনি যে আন্দোলন আরম্ভ করলেন তাকেও জাতীয় আন্দোলন এই আখ্যাই দিতে হবে। দুইই কি এক, ও সমর্থন-যোগ্য? বৃটীশ জাতীয়তা কি বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদেরই নামান্তর নয়? আমেরিকার চরম জাতীয়তাবাদীরাই চরম প্রতিক্রিয়াশীল। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রগতিশীল বলে পরাধীন সুডেটেন প্রদেশেও কি তাই ছিল?

বর্তমান কালে বিশ্বের ইতিহাসের পটভূমিকা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে বলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরও রূপ তাড়াতাড়ি বদ্‌লাতে পারে। এ যুগকে লেলিন সাধারণভাবে আখ্যা দিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রত্যেক দেশের শ্রমিকেরই কর্ত্তব্য অন্তর্বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের চেষ্টা, দেশীয় ধনতন্ত্রের পরাজয় সাধন। এই নীতি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো এর পিছনে আছে আন্তর্জাতিক শ্রমিকের ঐক্যসাধন ও ধনতান্ত্রিক সঙ্কটকে আরো তীব্র করে তোলা। ১৯৩৯-এর ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১-এর ২২শে জুন পর্য্যন্ত জগতে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই চলেছিলো। তখন ভারতীয় কমিউনিষ্টগণ দেশে অন্তর্বিপ্লব জাগাতেই চেয়েছিলেন এবং তার জন্য যথেষ্ট নির্যাতন সহ্য করেছিলেন একথা সুবিদিত। কংগ্রেস এই সময়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে বিপদের সময়ে খুব বেশী বিব্রত করা উচিত নয়, এই আধ্যাত্মিক সুনীতিই অবলম্বন করেছিলেন—একথা বল্‌লে কি খুব ভুল বলা হবে? আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংঘর্ষ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকের ঐক্য তখন ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সেই পথেই চালিত করতে বলেছিলো যাতে ভারতে বৃটেনের সমরপ্রচেষ্টা ব্যাহত হতে পারতো। সমগ্র জাতির স্বার্থ, বুর্জোয়ার ও শ্রমিকের উভয়েরই, তখন এই ধরণের আন্দোলনের দ্বারাই সমৃদ্ধ হতে পারতো।

জার্মানির সোভিয়েট আক্রমণের ও জাপানের মলয় ও বর্মা আক্রমণের পর থেকে পৃথিবীর চেহারা ও আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংঘর্ষের রূপটি বদ্‌লে গেল। এই নূতন পরিস্থিতিতে ভারতে জাতীয় আন্দোলনকে নূতন পথে পরিচালিত

করার প্রয়োজন উপস্থিত হলো। কেন এমন হোলো, কি করে এই অঘটন ঘটলো, শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস সেবক বারংবার এই প্রশ্ন করছেন। উপহাস করে তিনি বলছেন, এ সব রাশিয়ার চরের কথা, এর সঙ্গে ভারতের জাতীয় মঙ্গলের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি।

ফাশিজ্‌ম্‌ শ্রমিকের ও জনগণের সব চেয়ে বড়ো শত্রু, ফাসিজ্‌মের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের জনসাধারণের একত্র হয়ে সংগ্রাম করা দরকার—এ কথা ১৯৪১-এর ২২শে জুন-এর পর থেকেই 'রাশিয়ান জাতীয়তাবাদী' ষ্টালিন (জঙ্গিয়ান নয় তো ?) হঠাৎ বলতে আরম্ভ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতে 'রাশিয়ায় চরেরা' ওই সুরে গাইতে আরম্ভ করলেন, এ উক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই। মিউনিকের আগের কয়েক বৎসর ষ্টালিন ও কমিন্‌টারন্‌ ফাশিস্ত-বিরোধী জনগণের অখণ্ড ঐক্য স্থাপনের জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেস ও পণ্ডিত নেহেরু সে সময়ে এই প্রচেষ্টাকে বারংবার সমর্থন করেছিলেন। আজ জনযুদ্ধ বলে যাকে আমরা অভিহিত করছি তা তো নূতন কিছুই নয়, সেই পুরাতন ফাসিস্ত-বিরোধী আন্তর্জাতিক জনসজ্ঞা, যা সে সময়ে সফল হয়ে ওঠেনি। স্পেন ও মিউনিক বুঝিয়ে দিলো, গণতান্ত্রিক দেশের তদানীন্তন নেতৃবর্গ হিটলার ও মুসোলিনির তাঁবুতেই নাম লিখিয়েছেন, জনমতের প্রভাব তাঁদের উপর এমন তীব্র ভাবে চাপ দিলো না যাতে ফাশিজমের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ চালাতে তাঁরা বাধ্য হতে পারতেন। এই ঐতিহাসিক কারণেই ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ভ হোলো। ঠিক ওই সময়েই পৃথিবীতে জনযুদ্ধ আরম্ভ হতে পারতো ইতিহাসের ও ঘটনা পরম্পরার গতি যদি অন্যরকম হতো।

শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস কর্মীকে আমি একটা প্রতিপ্রশ্ন করি। ধরুন কংগ্রেস ও পণ্ডিত নেহরু যে সময়ে মুসোলিনির আবিসিনিয়া আক্রমণ বা জাপানের চীন আক্রমণের প্রতিবাদ করছিলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে বলছিলেন, সেই সময়ে জনমতের চাপে বৃটীশ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট স্থির করলেন, ইতালির ও জাপানের বিরুদ্ধে তাঁরা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করবেন। এই সংকল্প নিয়ে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর সহিত পরামর্শ করতে এলেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁকে কি পরামর্শ দিতেন ? তিনি কি

বলতেন—"দেখুন মিষ্টার প্রধান মন্ত্রী, আবিসিনিয়ার ও চীনের জনগণকে বাঁচাবার জন্য আপনারা যুদ্ধ করতে চাইছেন এটা বড়ই সুখের বিষয় ; তবু ভাল, এতদিনে আমার কথা আপনারা শুনলেন ; better late than never ; কিন্তু তাই বলে ভাববেন না, ভারতবর্ষ থেকে একজন সৈনিকও আমরা নিয়ে যেতে দেবো বা এখানে একটি কামান বা এক ছটাক গুলিও আমরা প্রস্তুত হতে দেবো ; আপনারা যেই যুদ্ধ আরম্ভ করবেন অমনি আমি দেশের লোককে বলবো, এটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ; তোমরা অসহযোগিতা করো, ধর্মঘট করো, সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুত কোরো না, রেল লাইন অচল করো, কেননা ভারতবর্ষকে এখনও স্বাধীনতা দেওয়া হয় নি।"

না, একথা তিনি বলতেন না, বলতে পারতেন না। কেন না এই যুদ্ধ তখন জনযুদ্ধই হোতো। বৃটেনের পক্ষে বৃটিশ ধনতান্ত্রিক নেতারাই সম্ভবত তখন এই যুদ্ধের নেতৃত্ব করতেন এবং সাম্রাজ্য-স্বার্থের দিকে নিশ্চয়ই শ্যেনদৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু তথাপি সেটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হোতো না, জনযুদ্ধই হোতো, এবং পণ্ডিত নেহরু ভারতবর্ষকে পরাধীনতা সত্ত্বেও এই যুদ্ধে সহায়তা করতে বলতেন। তিনি নিশ্চয়ই স্বাধীনতা দাবী করতেন, ভারতের সব দলকে একত্র হয়ে জনযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সংঘবদ্ধ হতে বলতেন কিন্তু সমর প্রচেষ্টাকে বাধা দিতেন না। অর্থাৎ কমিউনিষ্টরা এখন যা করছেন তিনি তখন তাই করতেন। এ কথা যদি সত্য না হয় তবে কি মনে করতে হবে, পণ্ডিত নেহরুর মতো শান্তিকামী ও গণতান্ত্রিক নেতা সে সময়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেই বৃটেন ও ফ্রান্সকে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করছিলেন ?

গোঁড়ামি বর্জন করে একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, ঠিক ওই রকমেরই জনযুদ্ধ ১৯৪১-এর ২২শে জুন থেকে বেধেছে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র কোনো দেশে থাকলেই সেই দেশ যে যুদ্ধে লিপ্ত আছে সেই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই হবে, জনযুদ্ধ হতে পারে না—বিশ্লেষণ করে দেখা গেলো, এই যুক্তি ভ্রান্ত। তাহলে জনযুদ্ধের মূল কথাটা কি ? জনগণের রক্ষার জন্য ; শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য, ধনতন্ত্রের বিনাশের জন্য যে যুদ্ধ তারি নাম জনযুদ্ধ। জার্মানির বিরুদ্ধে বা ইতালির অথবা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জনযুদ্ধ নয়। কিন্তু ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জনযুদ্ধ। চরম সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ধনতন্ত্র যে উগ্র,

সামরিক রূপ ধরে তারি নাম ফাশিজম্। ফাশিজম্ কোনো জাতির বিশেষ রাষ্ট্রীয় রূপ নয়, আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রেরই চরম রূপ। ফাশিজমের বিরুদ্ধে কোনো ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি যুদ্ধে নামে তাহলে বুঝতে হবে সেই দেশের ধনতান্ত্রিক দলে ভাঙন ধরেছে, জনগণের চাপেই সেই দেশের নেতারা এই পথে যেতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ জনগণই সেই দেশের প্রকৃত নিয়ন্তা। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে বৃটেন ফাশিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে রাজী হয় নি, জার্মানির ও ইতালির বিরুদ্ধেই লড়াই করতে চেয়েছিলো। ১৯৪১ সালে সোভিয়েটের সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃটেন ফাসিজমের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হোলো। ঠিক সেই জন্যই ১৯৪১ সালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হোলো।

একথা মানছি যে বৃটেন ও আমেরিকার ধনতান্ত্রিক নেতৃবর্গ প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন ও করবেন যাতে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্র সারা জগতে বজায় থাকে। তাঁদের এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করতে হবে জনযুদ্ধে বাধা দিয়ে নয়, জনযুদ্ধ পুরাপুরি চালাতে তাঁদের বাধ্য করে। কেননা এই উপায়েই জনশক্তি জাগ্রত হয়ে তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ করতে পারে। এই জন্যই প্রত্যেক দেশে (জনযুদ্ধের তরফে) জনগণের জাতীয় ঐক্য ও সংঘ চাই। এই জাতীয় ঐক্যের চেষ্টাই বর্তমান মুহূর্তে প্রকৃত জাতীয় আন্দোলন। জাতির শতকরা নব্বই জন শ্রমিক ও কৃষাণের স্বার্থের পরিপন্থী আন্দোলন কেমন করে জাতীয় আন্দোলন হতে পারে? জনগণের প্রকৃত জাতীয় আন্দোলন কোনদিনই আসবে না যতদিন জগতে ধনতন্ত্র থাকবে, সাম্রাজ্যবাদ থাকবে। অনেক কংগ্রেস কর্মীর কথা শুনে মনে হয় যুদ্ধটা থেমে গেলেই জাতীয় আন্দোলনের মহেন্দ্রক্ষণ চিরকালের মতো চলে যাবে। মহাপুরুষগণ আর দৈববাণী শুনবেন না। সুতরাং জাতীয় আন্দোলন চালাবে কে? যেন জাতীয় আন্দোলন বাস্তব জগতের অঙ্গই নয়, মহাপুরুষদের খেয়ালের খেলনা মাত্র! যেন চন্দ্র সূর্য পর্যন্ত মহাপুরুষদের অঙ্গুলিহেলনেই চালিত হচ্ছে! এই মন্দ বুদ্ধিই ধর্ম ও নীতির রূপ নিয়ে কৃষাণ ও মজুরকে বলছে, আমাকে উপাসনা কর, নইলে তোমরা 'চাঁদিকে চন্দ টুক্‌রে পর দেশকে বেচনেওয়ালে'।

এই কথায় 'প্রবাসী'র কথা পুনরায় মনে পড়লো। 'প্রবাসী'র প্রধান সহকারী সম্পাদক মহাশয় রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর একান্ত নিরক্ষরতাকে চরম

বিজ্ঞতা মনে করে রায় দিয়েছেন, ফরওয়ার্ড ব্লক, অনুশীলন পার্টি, কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টি, ইত্যাদির তরফ থেকে যে সকল গোপন প্রচার-পত্র প্রকাশিত হয় সেগুলি 'অতি নগণ্য ও বালসুলভ'। অথচ এই সব 'অতি নগণ্য ও বালসুলভ' প্রচার যে সব দলের নামে করা হচ্ছে তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো দেশভক্ত কর্মী যদি একটি কথাও বলতে যান তবে তিনি হবেন 'চাঁদিকে চন্দ টুক্‌রে পর দেশকে বেচনেওয়ালে'। কী অপূর্ব যুক্তি! যেন দেশপ্রীতির লক্ষণ শুধু 'প্রবাসী' আপিসে বসে কলম পেশা!

দেশের শত্রু বলে যাদের জানি, জনগণের জল্লাদ ফাশিস্ত দস্যুদের সাহায্য নিয়ে, তাদের সেনাদলে ভর্তি হয়ে, যাঁরা দেশ স্বাধীন করবেন বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন তাঁদের সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করার জন্য সোমনাথ লাহিড়ীর একটি কথাও বলা, 'প্রবাসী'র মতে, অন্যায়, কেননা বিচারালয়ে সুদ-সংক্রান্ত ও ব্যবসায় সংক্রান্ত মামলা জিততে হলে সাক্ষীসাবুদ ডাকার ও জেরা করার যে পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয়েছে সে পদ্ধতি সোমনাথ লাহিড়ী অনুসরণ করেননি। এর উত্তরে শুধু এই কথাই বলবো, দেশরক্ষা, সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকের মঙ্গলসাধন, সুদখোরের মামলার চেয়ে বড়ো জিনিস নয় এমন একটি উদ্ভট কল্পনা 'প্রবাসী'র প্রধান সহকারী সম্পাদকের মতো মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব। সোমনাথ লাহিড়ী মহাপুরুষও নন্, সুদখোর মামলাবাজও নন্। কাজেই তাঁর প্রমাণ-পদ্ধতি একটু পৃথক্ হতে বাধ্য!

রাজনীতি ও মামলা যে এক জিনিস নয়, এই সহজ জ্ঞান যাঁর নেই তিনিই মহাপ্রাজ্ঞতার ভান করে কমিউনিষ্ট পার্টির বিচার করতে বসেছেন। তাঁকে মনে করিয়ে দিতে পারি কি, নরিম্যান্, খারে ও সুভাষ বসু এই অভিযোগই করেছিলেন যে তাঁদের সম্পর্কে গান্ধীবাদী নেতারা ঠিক আদালতের বিচার করেন নি?

'জাপানী দালাল' ও 'সাম্রাজ্যবাদী দালাল' এই দুটি কথা নিয়ে সহকারী সম্পাদক মহাশয় অনেক খেলা দেখিয়েছেন। দালাল কথাটি এ স্থলে ইংরেজী agent কথার প্রতিশব্দ। রাজনৈতিক অর্থে যখন agent কথাটি ব্যবহৃত হয়, যখন আমরা কোনো দলের নেতা সম্বন্ধে বলি, তিনি agent of British imperialism হিসাবে কাজ করছেন, তখন একথা বলি না, তিনি খুব বড়ো

অঙ্কের একটা চেক্ পকেটস্থ করেছেন ; কথাটির প্রকৃত অর্থ হলো, তাঁর কাজে ও প্রচারে সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদই ভারতবর্ষে পাকা হবে। ভ্রান্তি, ভীরুতা, জেদ, অদূরদর্শিতা, সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণীস্বার্থ ইত্যাদি নানা কারণেই বহু প্রতিভাবান্, চরিত্রবান্, ত্যাগী, বাগ্মী মহাপুরুষ ভারতবর্ষে agent of British imperialism অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী দালাল হিসাবে কাজ করেছেন। হিন্দু মহাসভা ও তার নেতাদের সম্বন্ধে কথাটি অতি সুসঙ্গত। স্বয়ং পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহ্রু বারংবার অবিকল এই অভিযোগই তাঁদের ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতাদের বিরুদ্ধে করেছেন একথা শিশুরাও জানে। সুতরাং সোমনাথ লাহিড়ীর লজ্জিত, দুঃখিত বা অনুতপ্ত হবার কিছুই তো দেখছিনে। ভারতীয় লিবার‍্যালদের সম্বন্ধে এই ধরণের কথা হামেশা-ই বলে হয়ে থাকে, পণ্ডিত নেহ্রুও বলেছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রে তাঁদের সমকক্ষ লোক হিন্দু মহাসভায় কেন কংগ্রেসেও কমই আছেন। কিন্তু প্রধান সহকারী সম্পাদকের অভিধানে শব্দের রাজনৈতিক ও লৌকিক অর্থে কোনই প্রভেদ নেই। এই প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার প্রদর্শনী খুলে তিনি বোধ হয় বাহবা পাওয়ারই প্রত্যাশা করেন।

'জাপানী দালাল' ভারতবর্ষে বেশী নেই, খুবই সত্য কথা। ভারতের জনগণ জাপানী ফাশিস্ত দস্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর একথা কমিউনিষ্টদের চেয়ে জোর গলায় আর কে বলেছে? কিন্তু তাই বলে জাপানী দালাল যে দেশে একেবারেই নেই একথা সহকারী সম্পাদকই বা কি করে জানলেন? দেখ্ছি তিনি তো খুব সাক্ষীসাবুদে, আদালতের ন্যায় বিচারে বিশ্বাসী। কি ধরণের আদালতি বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তা জানতে পারলুম না—আমাদের অপার দুর্ভাগ্য। আমরা তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, দু'চারজন জাপানী দালাল দেশে ও দেশের বাইরে আছেন এবং তাঁরা নিজেদের মত গোপন করার চেষ্টা বিন্দুমাত্রও করছেন না। বরেণ্য জাতীয় নেতাদের কারাদণ্ডে জনসাধারণের বিক্ষোভ যাতে জাপানী আগমনের পথ প্রশস্ত করে, তাঁদের এই হীন ও দেশদ্রোহী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই কমিউনিষ্ট পার্টি অভিযান করেছেন। এতে সত্যকার কংগ্রেস কর্মীর সহযোগিতা করাই উচিত। জয়প্রকাশ নারায়ণের পথ, সুভাষ বসুর পথ গান্ধীজির পথ

নয়, কংগ্রেসের পথ নয়, একথা স্বয়ং গান্ধীজি ও পণ্ডিত নেহ্রু বারংবার বলেছেন। গান্ধীজি ও পণ্ডিতজি জনরক্ষার জন্য, জনযুদ্ধকে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে পরিচালনা করার জন্যই অবিলম্বে স্বাধীনতার দাবী করেছিলেন। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে গান্ধীজির সংগ্রাম এমন কোনো রূপ নিতেই পারে না যাতে বৈদেশিক শত্রুর পথ সুগম হয়। এই অত্যন্ত সহজ ও সরল সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে (অহিংসার রূপ নিয়ে) গান্ধীজির জেল চিঠিগুলিতে ফুটে উঠেছে। লিন্‌লিথগো-ম্যাক্‌স্‌ওয়েল এণ্ড কোম্পানি গান্ধীজির কণ্ঠ রুদ্ধ করেছেন বলেই তাঁর শিষ্যেরাও যে তাঁকে পরিত্যাগ করছেন, তাঁর উদ্দেশ্য ভুলে যাচ্ছেন, এই ক্ষোভই সোমনাথ লাহিড়ী তাঁর অভ্যস্ত রাজনৈতিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। অন্য কোনো ইঙ্গিত তিনি যে করেন নি, সহকারী সম্পাদক-কর্তৃক উদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকেই তা প্রমাণিত হচ্ছে। বাংলা ভাষার অর্থগ্রহণে অক্ষমতা যে 'প্রবাসী'র সম্পাদনে নিতান্ত প্রয়োজন এ একটা নূতন অভিজ্ঞতা।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ফলশ্রুতি

বংশের ইতিহাস বহু বিস্তৃত। পূর্ব্ব ইতিহাস হারিয়ে গেলেও বর্ত্তমান বংশধর বিরূপাক্ষ চৌধুরীর পূর্ব্বতন চতুর্দ্দশ পুরুষের ইতিহাস কণ্ঠস্থ। তাঁদের প্রতিটি কার্য্যকলাপ, ঘটনা তাঁর নখদর্পণে।

বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইন্দ্রনাথ মোগল সুবাদারের কাছ থেকে এ জমিদারী পারিতোষিক পান কি একটা বীরত্ব উপলক্ষে। তাঁর নামেই জমিদারীর নাম। মোগলের পরেই ইংরেজ আমল। এই চৌধুরী বংশই ছিল বিরাশী নীলকুঠির মালিক। সমুদ্রপারের শ্বেতাঙ্গের দল বার বার এই ব্যাপারে হার মেনেছে তাঁদের কাছে, পরাজিত হয়েছে, মাটীর নীচে নিজেদের অস্তিত্ব লুকিয়েছে। এমনি ছিল এ বংশের অপ্রতিহত ক্ষমতা।

এ বংশের আভিজাত্য সাতমহলা প্রাসাদের মতই সুদৃঢ় এবং পুরনো। কালের স্বাক্ষর মাটীতে থাকলেও আভিজাত্যে একটা আঁচড় পর্য্যন্ত কাটতে পারে নি, অতি বড় নিন্দুকও একথা অস্বীকার করতে পারবে না।

বিরূপাক্ষ চৌধুরী আজো গর্ব্ব করেন। যে কেউ যে কোন ছিদ্রপথে এ বংশের মর্য্যাদাকে কলঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছে, উপযুক্ত বংশধরেরা সেই মুহূর্ত্তে তাকে চূর্ণ করেছে, পিপঁড়ের মত পিষে মেরেছে। চৌধুরী বংশ আজ পর্য্যন্ত কাউকে রেহাই দেয় নি, বৌ, ছেলে, মেয়ে—কাউকে না।

পদ্মাক্ষ চৌধুরী নিজের চতুর্থ পক্ষের সুন্দরী স্ত্রীকে গলা টিপে খুন করেছেন। সৎ-মায়ের দিকে কাম-কলুষিত দৃষ্টিপাতের অপরাধে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রাণ দিতে হয়েছে। পিনাকপাণি চৌধুরী নিজের মাকে জলে ডুবিয়ে মেরেছেন। বিধবা কন্যাকে বরণ করিয়েছেন অনাহারে মৃত্যু।

মাত্র চার পুরুষ আগে নারায়ণ চৌধুরী এক প্রগল্‌ভ নাগা সন্ন্যাসীকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলেছেন মাটীর মধ্যে। চাবকে গায়ের চামড়া ছিঁড়ে নিয়েছেন উদ্ধত কুঠিয়াল সাহেবের। রাঘব সামন্তকে শায়েস্তা করবার জন্য প্রকাশ্য দিবালোকে তার উলঙ্গ পুত্রবধূকে লাঠিয়াল দিয়ে করিয়েছেন অত্যাচার। মর্য্যাদা রক্ষায় এমনি নির্ম্মম নিষ্ঠুর চৌধুরী বংশ।

চৌধুরী বংশ শাক্ত। কাপালিকের মন্ত্র-শিষ্য। পঞ্চ-ম'কার তাঁদের তাই সাধনের অঙ্গ। নারী আর সুরা তাঁদের মুক্তিপথের পাথেয়। বহু কুমারী, কুলবধূ এ বংশের মারফতে মোক্ষলাভ করেছে। বিরূপাক্ষ চৌধুরী স্পষ্ট মনে করতে পারেন এমনি অনেক কিছু। সাধনায় সিদ্ধি বংশের কর্ণধারেরা হাতে হাতেই পেয়েছেন। ক্ষণজন্মা পুরুষ তাঁরা সব। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিতে না দিতেই মায়া কাটিয়েছেন জড় সংসারের।

বিরূপাক্ষ চৌধুরী তাই একমাত্র বংশধর ইন্দ্রজিতকে বলেছেন বংশের একটা আদ্যোপান্ত ইতিহাস লিখে ফেলতে। কাছে ডেকে প্রত্যেকটি ঘটনা শুনিয়েছেন তাকে। বংশের ইতিহাস পুত্র জানত রূপকথার মত। কতক সত্য, কতক কল্পনা। বিরূপাক্ষ চৌধুরী তাকে প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করালেন। হঠাৎ একদিন শেষ বংশধর ইন্দ্রজিত গৃহত্যাগ করল তাঁর অগোচরে। চৌধুরী নিজেই স্বীকার করেন, একমাত্র তিনিই বংশকে কলঙ্কিত করেছেন ছেলেকে ইংরিজী পড়িয়ে।

আক্ষেপ করেন, বংশের আযোগ্য তিনি। সাতমহলা প্রাসাদের সঙ্গে সঙ্গে বংশের গৌরবও অস্ত গেছে। এই কি ইন্দ্রপুরের রাজপ্রাসাদ! চারি পাশ একদিন গড় দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। সাত সাতটা ফটক পেরিয়ে অন্দর মহল। শোনা যায় বত্রিশটা হাতী বাঁধা থাকত একদিন আর সওয়াশ' লাঠিয়াল। তাঁদের দাপটে বাঘে গরুতে জল খেয়েছে একঘাটে।

আজ প্রথম তিনটে ফটক পড়ে গেছে। গড় হয়েছে দুর্ভেদ্য অরণ্য, আস-শ্যাওড়া, কাসুন্দী আর ভাঁটির রাজত্ব। অতবড় পুকুরগুলো সব শুকিয়ে গেছে। চৈত্রের মাঝামাঝি রাখাল ছেলের দল মাছ ধরে কুচিবান, ডানকানা আর সোণা টাকী।

ফটকের চৌকাট দিয়ে খিড়কী পুকুরে মেয়েরা বানিয়েছে বাসন মাজার ঘাট। চণ্ডীমণ্ডপ একেবারে ধ্বসে গেছে মাঝ থেকে। শালের প্রতিমার আসন অর্দ্ধেক বসে গেছে মাটীর মধ্যে। বহুদিনের সিঁদূরের দাগ হয়ে উঠেছে ফ্যাকাশে। হাড়িকাটগুলো উঠোনের একপাশে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। উইতে খেয়ে একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে।

পিছনের তিনটে মহল একেবারে বাদ দিতে হয়েছে। বটের চারা গজিয়ে দেয়ালে ধরিয়েছে ফাটল। মাটী থেকে এঁকে বেঁকে উঠেছে তেতালা পর্য্যন্ত পুনর্ণবার লতা। পশ্চিমের দিকে কেউ যায় না। বর্ষায় নাকি ও ঘরগুলোয় শেয়ালে বাচ্চা পাড়ে।

মাঝের মহল পার্টিশন তুলে পৃথক করে নিয়েছে সরিকেরা। চৌধুরী-বংশের গৌরব আজ ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে বড়, মেজ আর ছোট বাড়ীতে।

জমিদারীতে ঘুণ ধরেছে অনেকদিন। বছর বছর নীলামে ওঠে তালুক। ফুটো নৌকোর মত এদিক সামলাতে গিয়ে ওদিকে ওঠে জল, টলমল করে মাঝদরিয়ায়।

ইন্দ্রপুরের মাটীতে লেগেছে অলক্ষ্মীর অভিশাপ। মাটীতে জোর নেই, ধানের শিষ একটু রোদেই শুকিয়ে খড় হয়ে যায়। পাটের মাথা আর তেমন বড় হয়ে বেড়ে ওঠে না। তিলে রস নেই, তেল হয় কটু গন্ধ। চৈতালী ফসল আর কেউ দেয় না। কেঁদে বলে ফুরিয়ে গেছে।

লাঠিয়ালের বংশধরেরা কেউ আজ আর লাঠি ধরতে চায় না সহজে। জমিদার বাড়ীর মাইনে উঠে গেছে অনেকদিন। পাশের গঞ্জে অনেকেই সুরু করেছে কারবার। জেলেরা ব্রত-পার্ব্বণে দুটো আঁশ ফেলে সম্মান রাখে। বিলে মাছ নেই। শুকিয়ে কাদা জেগে আছে। প্রত্যেকবার পূজোর সময় চৌধুরী বংশের নীল রক্ত চন্ চন্ করে ওঠে বিরূপাক্ষের শিরায় শিরায়। অভ্যাসবশে চীৎকার করে ওঠেন তিনি—শুয়ারকা বাচ্চা। তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়েন জেলেটার উপর। নির্ম্মমভাবে প্রহার করেন। খানিক বাদে পূজোর প্রসাদ পেয়ে ফিরে যায় বেচারা প্রণাম করে। ছোটখাট ধুতির মত তাঁর জমি-দারী। শীত মানে ত লজ্জা ঢাকে না। আদালতের নাজীরকে ঘুষ দিতে গিয়ে চোখে জল ভরে আসে তাঁর; পরক্ষণেই দাঁতে দাঁত পিষে ঝনাৎ করে টাকা দেন নায়েব রমানাথের সামনে।

ছোট বাড়ী বংশের নাম ডুবিয়েছে। অংশের সমস্তটুকু বিক্রী করেছে তারা। গঞ্জে খুলেছে ধান চালের আড়ৎ। চৌধুরী বংশের ছেলে নিজের হাতে ধরেছে দাঁড়ীপাল্লা, সেজেছে বেনে। বড় বাড়ীর সাথে পদে পদে রেশা-রেশি। মেজ বাড়ীর অবস্থা শোচনীয়। একমাত্র বিধবা মেয়ে সে বাড়ীর কর্ত্রী।

চৌধুরী বংশের প্রতাপে আজ আর বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় না। এক একখানা ইঁট খসে পড়েছে বাড়ীর। বিরূপাক্ষ চৌধুরী মেরামত করেন না। বংশের অযোগ্য সন্তান তিনি। আক্ষেপ করেন শুধু মনে মনে।

চৌধুরী ভাইপোকে বিয়ে দিয়ে বউ আনলেন রাজলক্ষ্মীকে। আর আনলেন নিজের মেয়েকে তার মামা বাড়ী থেকে। ভবানী এই প্রথম এল তার দেশের বাড়ীতে। ভবানীকে চৌধুরী নিজের হাতে বিয়ে দেবেন।

আসল সমস্যা পাত্রকে নিয়ে। বহু সম্বন্ধ এল গেল। মনোমত হয় না তাঁর। চৌধুরী বংশের মেয়ে ভবানী। বংশের উপযুক্ত ঘরেই বিয়ে দিতে হবে। বিরূপাক্ষ চৌধুরী দুশ্চিন্তায় পড়লেন। পরামর্শ করেন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করেন: উলপুরের পাত্রটি তোমার পছন্দ হয় না।

রাজলক্ষ্মী উত্তর দেয় একটু থেমে—কিন্তু পাত্রটি লেখাপড়া কিছুই শেখেনি। গম্ভীর হয়ে ওঠেন চৌধুরী: লেখাপড়া শিখে কি স্বর্গলাভ হবে শুনি। জমি জমা আছে প্রচুর, পুরনো বনেদী বংশ।

ঘোমটার অন্তরালেই রাজলক্ষ্মীর অসন্তুষ্ট মুখখানা অনুভব করতে পারেন চৌধুরী। বিক্ষোভে তাঁর অন্তর ভরে ওঠে। একালের ছেলেমেয়েরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া। ওদের জেনে ওঠা দুষ্কর। অন্তরকে প্রকাশ করে ওরা মুখে, কথায় নয়। রুচি ওদের পৃথক।

—ভবানীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন। রাজলক্ষ্মী বলে।

ফেটে পড়েন এবার বিরূপাক্ষ চৌধুরী। জিজ্ঞাসা করতে হবে ভবানীকে? ভবানী তাঁর মেয়ে নয়? তাঁর মতেই ভবানীর মত। চৌধুরী দ্রুতপদে কাছারী ঘরে চলে আসেন।

সকালে খবর আনল রমানাথ। মল্লিকপুরের ওরা দেখতে আসবে ভবানীকে। চৌধুরী সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন। ডাকলেন নন্দকে। বাইরের ঘরখানাকে ঝেড়ে পুঁছে ফিরিয়ে আনতে চান পূর্ব্বের অবস্থায়। বড় বড় অয়েল পেন্টিং ধুলোয় ঢেকেছে। পরিষ্কার করেন তাদের মেজে ঘসে। মহাযুদ্ধের ছবি খান দুই আরশোলায় খেয়ে দেয়ে ফেলে রেখেছে শুধু হাড়গোড়। ছবি দুখানাকে দেন স্থানান্তরে। পাশের কুঠুরী খুলে বার করে আনেন পুরনো ঝাড়লণ্ঠন-গুলো। ঝুলিয়ে দিলেন কড়িকাঠ থেকে। লাল নীল সবুজ স্ফটিকের লম্বমান

টুকরোয় সূর্য্যের আলো ঝলমল করে উঠল। রূপোবাঁধান গড়াগড়াগুলো মেজে ঝকঝকে করে তুলল নন্দ তেঁতুল ঘসে ঘসে। জরির কাজ করা জাজিম আর তাকিয়া বার করেন খুঁজে খুঁজে। বরপক্ষকে জানাতে হবে এটা ইন্দ্রপুরের চৌধুরী বাড়ী।

বিকেলের দিকে অভ্যাগতেরা এলেন। পাত্রও আছেন দলের মধ্যে। কনে দেখা হবে কাল সকালে। গম্ভীর হয়ে বসে আছেন বিরূপাক্ষ চৌধুরী। আলাপ ক্রমশঃ জমে ওঠে।

—লেখাপড়া শিখেছ? জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

সপ্রতিভ ছেলেটি। উত্তর দিল—না, কি লাভ?

পাশের একজন এগিয়ে দেয় কথা—বাপের জমিদারী, কি আর দরকার?

চৌধুরীর মুখে হাসি ফুটল—কাজকর্ম্ম নিজেই দেখ কেমন?

—কেন? বর হেসে উঠল, নায়েব টায়েব আছে। নিজে দেখতে যাব কেন?

—তৌজী বোঝ? সেরেস্তা? পাট্টা, আমালনামা?

বরের মুখে নির্ব্বোধ জিজ্ঞাসার চিহ্ন উঠল ফুটে। খানিক মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—জানিনে ত।

অবাক বিস্ময়ে চৌধুরী তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এও কি সম্ভব? জমিদার অথচ সাধারণ জিনিষগুলো জানে না! চৌধুরীর অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এ বিয়ে অসম্ভব। নির্ব্বোধ অজ্ঞ ছেলের হাতে তুলে দেবেন তাঁরই মেয়ে ভবানীকে!

বরপক্ষীয় একজন বললেন—কলকাতায় মানুষ কিনা; জানবে কি করে বলুন। গানবাজনা নিয়ে মেতে থাকে, ভারী ফুর্ত্তিবাজ। চৌধুরীর দৃষ্টি হয়ে উঠল কঠোর, কুঞ্চিত চোখে ফুটে উঠল তাচ্ছিল্য। গম্ভীর মুখে উঠে এলেন অন্দরে। এ বিয়ে ভেঙ্গে গেল।

কাজের লোক রমানাথ। আর একটা সম্বন্ধ আনল জুটিয়ে। দর্শনীয় বাড়ী। অনেক জমি, তেজারতি কিন্তু আপত্তি শুধু পাত্র দোজবর।—হোকগে দোজবর। কুল মিলবে ত? একগাল হেসে রমানাথ উত্তর দিল—দেখে শুনেই সম্বন্ধ পাঠিয়েছে তারা।

কিন্তু আপত্তি তুললেন ভবানীর পিসিমা। দোজবরে মেয়ে দেব না। বয়সের গাছ পাথর নেই।

—কিন্তু কত বড় ঘর। চৌধুরী বললেন,—দেওয়ান হরনাথের গোষ্ঠী। ভীমনগরের কুঠী নিয়ে যাদের সঙ্গে হয়েছিল হাইকোর্ট পর্য্যন্ত পুরো দুবছর লড়ালড়ি।

—হোকগে। পিসিমা জ্বলে উঠলেন—তার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে ডুবিয়ে দেব মেয়েকে। এ বিয়েও ভেঙ্গে গেল।

বিরূপাক্ষ চৌধুরী দুশ্চিন্তায় পড়লেন। পাত্র কোথায় পাবেন তিনি মনোমত। অনূঢ়া ভবানী যেন তাঁর বুকে বিঁধছে কাঁটার মত খচ খচ করে। পার না করে স্বস্তি নেই। তাঁর পছন্দ হয় ত, অন্যের পছন্দ হয় না। অন্যের হয় ত, তাঁর হয় না। গোত্র, বংশ, রক্ত তার উপরে পালটি ঘর চাই—পালটি নীল রক্তের ঘর। হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। তেমন পাত্র কি নেই এদেশে?

তিলজলার পাত্র নিজেই চিঠি লিখল। পণ বেশী নয়। সর্বসাকুল্যে গয়না, স্ত্রীদান নিয়ে সাড়ে পাঁচ হাজার। বাড়ী করেছে ছেলে বাঁকুড়ায়।

চিঠি হাতে পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন চৌধুরী। রুদ্ধ আবেগে দাঁত কিড়মিড় করে উঠলেন। ডেকে পাঠালেন রমানাথকে।—ওরা কি মনে করেছে বলত? রমানাথ ব্যাপারটা বুঝে উঠল না। দাঁড়িয়ে রইল চিন্তিত হয়ে —তিন পুরুষ আগে তিলজলার মজুমদাররা ছিল এ বংশের প্রজা। সাহস কম নয় ত!

এবারে কিন্তু চৌধুরী প্রায় মুসড়ে পড়লেন। বাড়ীর সবাই মত দিয়েছে এ বিয়েই হোক। রাজলক্ষ্মী, পিসিমা, ভবানী পর্য্যন্ত। কে বোঝাবে আহাম্মকদের। ইন্দ্রপুরের চৌধুরী বংশের মেয়ে হবে তিলজলার মজুমদারদের বৌ! মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও মজুমদারেরা পালপার্ব্বনে বিদায় নিয়ে কৃতার্থ হয়ে ফিরে গেছে। ওদেরই শশীনাথের ছেলে ঔদ্ধত্যের জন্য এই কাছারী ঘরেই জুতো খেয়েছে। নিজেকে কঠিন করলেন চৌধুরী। মেয়েলোকের কথায় সায় দেবার মত পৌরুষ তাঁর নয়, এ বংশের কারো নয়। বিরূপাক্ষ চৌধুরী মনস্থির করলেন। অটল, অনড় তাঁর সিদ্ধান্ত। ফেরৎ ডাকে উত্তর গেল—বিয়েতে মত নেই।

হঠাৎ চৈত্র শেষের দমকা ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল ঝরে যাওয়া গাছের শুকনো পাতাগুলো। অসহ্য রোদের তাপ শুষে নিল নিঃশেষে সবুজ রংটুকু। তাম্রাভ নতুন পাতাগুলো মুখ না খুলতেই পুড়ে ধূসর হয়ে ঝরে গেল। আর মাথা তুলল না। পলাশের রিক্ত প্রশাখায় হঠাৎ হাওয়ার বেসুরো হাহাকার জেগে ওঠে যখন তখন। আমের বোল পড়ে রইল মাটীতে, শুধু ইতস্তত ছড়ানো কৃষ্ণচূড়ার মাথায় মাথায় জ্বলে উঠল অস্তগত আগুনের মশাল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি একবার বৃষ্টি হয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

ইন্দ্রপুরের মাঠে লাগল অলক্ষ্মীর অভিশাপ। মাঠ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। নতুন রোপা ধানের চারাগুলো শুকিয়ে নেতিয়ে পড়ল মাটিতে। আনাজে পোকা ধরল। সেওলা পচে বিলের জল উঠল বিষিয়ে। মাছ উঠলো ভেসে। চৈতালী ফসল দিল না কেউ। বীজ ধান নেই, সবাই খেয়ে ফেলেছে, অনাবৃত তৃণহীন পতিত জমি রৌদ্রস্নানে হয়ে উঠল লোহার চেয়েও কঠিন। ইন্দ্রপুরের উপর দিয়ে বয়ে গেল কোন অদৃশ্য অপদেবতার অভিশাপ। ভাবী অশুভের ছায়া এসে দাঁড়াল শিয়রে। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সবাই।

তার উপর যুদ্ধের বাজার। সমুদ্রপারের হিংস্রুক মানুষের বিষ নিঃশ্বাসে সঞ্চিত ধানও গেল উড়ে। গাড়ী বোঝাই ধান চলেছে সদরের দিকে। সবাই বেচল যা ছিল তাদের। সব, মায় বীজ পর্য্যন্ত। গ্রীষ্মের ব্যারোমিটারের মত ধানের দর উঠ্‌ছে চড়চড় করে। হাহাকার উঠতে বাকী নেই।

আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিরূপাক্ষ চৌধুরী স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। ভবানীর বিয়ে চাপা পড়ে গেল। আউসের অবস্থা চোখে দেখা যায় না। গত বছরের একটা দানাও ওঠেনি ঘরে। এবারের ধান শিষ না বেরুতেই শুকিয়ে চিটে হয়ে গেছে।

মাঠের দিকে তাকানো যায় না। বিস্তীর্ণ মাঠে একটা ঘাস পর্য্যন্ত নেই। পত্রহীন বাবলার ডালে করুণ সুরে ঘুঘু ডাকে। বহুদূর প্রসারিত পায়ে চলা পথ চক চক করে চোখের উপর বিধবার সিঁথির মত। গরুগুলো গোয়ালে বাঁধা অবস্থায় ধুঁকতে থাকে। জল চাই, জল। হাজারো অন্তরের কাতর প্রার্থনা, জল চাই। চাষী মেয়েরা বাড়ী বাড়ী জল মেগে বেড়ায়। কাদা তুলে গায়ে মাখে। খোলকরতাল, সংকীর্ত্তনে মুখরিত হয়ে ওঠে সারা ইন্দ্রপুরের ক্রন্দন,

জল চাই, জল। গোটা বৈশাখেও এক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল না আকাশ থেকে।

ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসছে ইন্দ্রপুরের আয়ু রক্তহীন রোগীর মত। সদরগামী ধান বোঝাই গাড়ী লুট হল পরপর কয়েকদিন। গ্রন্থি-বাঁধা মানুষের অপরাধগুলো বাইরে আসতে চাইছে যেন। একটা সিঁদেল চোরের মাথা ফাটিয়ে দিল সেদিন সবাই। ইতস্তত খবর আসে কে যেন গলায় দড়ি দিল। কে পালাল মাগ ছেলে ফেলে।

রমানাথেরও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তার সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমনি বিভীষিকা দেখা দেয়নি কোনোদিন। চৌধুরীকে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। চিন্তিত মুখে ফিরে আসে। সান্ত্বনা দেওয়া আর হয় না মনিবকে।

রমানাথ বলল একদিন—এ বাজারে দাঁও মারল কিন্তু ছোটহাড়ী, দশ টাকায় চাল কিনে আজ ছাড়ছে ত্রিশ টাকা মণ। লাল হয়ে উঠেছে ওরা। ও বাড়ীর মেজ কর্তার মেয়ের বিয়ে সামনের অঘ্রাণেই।

জমির উপর নির্ভর করে না ওরা। হাজার হাজার কাঁচা টাকা আসছে যাচ্ছে। প্রচুর লাভ। চৌধুরী বংশের ছেলে আজ বেণে। গোত্র বদলে লাভের অঙ্কই তাদের বেশী। চৌধুরী নাক কুঁচকে কি একটা বিশ্রী উক্তি করে ওঠেন।

বিরাজপুর তালুক থেকে ভাইপো সুরজিৎ এল খবর পেয়ে। এসেই বুঝে নিল ব্যাপারটা। পরদিনই সদর থেকে আনালো গাড়ী বোঝাই চাল। কিছু-দিনের মোটা খোরাক। মাস ছয়েকের জন্য নিশ্চিন্ত।

ইন্দ্রপুরের সবাই কোমর বাঁধল। বারোয়ারী কালী পুজোটা সেরে ফেলতেই হবে। যদি বরদার দৃষ্টিপাতে রিষ্টি কাটে। সন্ধ্যের সময় চাঁদা নিয়ে গেল তারা চৌধুরীর কাছ থেকে। টাকা দিতে গিয়ে চৌধুরী থমকে দাঁড়ালেন। বিস্মৃত দিনের লুপ্ত স্মৃতি অসহ্য ঝলক মেরে গেল তাঁর মনে। ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তিনি।

সন্ধ্যে উৎরে গেছে অনেকক্ষণ। ভাঙ্গা কার্নিশের পাশে পায়রাগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্ধকার নাটমন্দিরের মাঝখানে ডানার শব্দ করে ঘুরে মরছে বিশ্রী চামচিকে। একটা পেঁচা উড়ে গেল কর্কশ, চাপা আওয়াজ করে।

দূরে একটা কুকুর আর্তনাদ করে উঠল। দালানের পাশে ভাঁটীর ঝোপ থেকে চেঁচিয়ে উঠল এক পাল শেয়াল। বিরূপাক্ষ চৌধুরী নেমে এলেন চত্বরে।

আজ আর কেউ চিনতে পারবেন না ইন্দ্রপুরের চৌধুরী বাড়ীকে। সেই বিস্তৃত ছাদ ধ্বসে গেছে পড়ে। শুধু দাঁত-বার-করা পিলারগুলো দাঁড়িয়ে। উঠোনের এককোণে স্তূপীকৃত জঞ্জালের ভিতর থেকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে একটানা সুরে। বিরূপাক্ষ চৌধুরী আজ হঠাৎ ভুলে গেলেন নিজেকে। বাড়ীর প্রত্যেকখানা ইঁটের ভেতর থেকে বহু শতাব্দীর পরিচিত গন্ধ নাকে আসছে আজ।

বিস্তৃত ছাদ থেকে ঝাড় লণ্ঠনগুলো ঝুলছে। আলোয় ঝলমল করছে ইন্দ্রপুরের চৌধুরী বাড়ী। সুপরিচ্ছন্ন তাকিয়ায় আসরের মধ্যে কাৎ হয়ে বসে আছেন জমিদার ইন্দ্রনাথ। আলবোলায় পুড়ছে সুগন্ধী তামাক। পারিষদবৃন্দ ঘিরে আছে তাঁকে। অঙ্গভঙ্গীতে লাস্যের ফোয়ারা ছড়িয়ে নাচছে কাশ্মিরী বাইজী।

আনারের মত লাল গাল। সুর্মা আঁকা নীল চোখ। আসমানী রংয়ের ওড়না উড়ছে। ঘাঘরা দোল খেয়ে উঠেছে ফুলে। সোনার চুমকী দেওয়া ময়ূর কণ্ঠি কাঁচুলী ঝক মক করে ওঠে ফটিকের আলোয়। স্তনতট ছাড়িয়ে নাভি পর্য্যন্ত এসে পড়েছে ইন্দ্রনাথের নিজের হাতে পড়িয়ে দেওয়া মুক্তোর মালা। পাখোয়াজ, মৃদঙ্গের দ্রুত তালে ক্ষিপ্র লয়ে শ্রীনগরী নটীর চঞ্চল চরণের মঞ্জীর ঝঙ্কার তুলছে। কাশ্মিরী বাইজী নাচছে।

ইন্দ্রনাথের বড় ছেলের অন্নপ্রাশন। একশো আট কালী পুজোর আয়োজন। সকালে অসংখ্য কাঙ্গালী দুহাতে লুঠে নিয়ে গেছে বস্ত্র আর অন্ন। মুঠো মুঠো করে মুদ্রা বিলিয়েছেন ইন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী। অগুনতি ঢাকের শব্দে কাঁপছে বাড়ীর ইটগুলো। ইন্দ্রনাথ সোনার জবাফুল গড়িয়ে অর্ঘ্য দিয়েছেন মায়ের পায়ে। বলির রক্তে স্রোত বয়ে গেছে। বিরূপাক্ষ চৌধুরীর চোখ ভিজে উঠল। আজকের পুজোয় তিনি দিয়েছেন মাত্র পাঁচ টাকা চাঁদা।

ভোরের ঘুম ভাঙ্গলো চৌধুরীর একটা অস্পষ্ট কলরবে। বহুলোকে জমেছে বাইরের উঠোনে। নিরন্ন মেয়ে পুরুষ শিশুর দল।

—কি চাই ? জিজ্ঞাসা করলেন চৌধুরী। সবাই এক সঙ্গে মিলিত আর্তনাদ করে উঠল। —হুঁজুর মা বাপ। এবার বাঁচবো না কেউ হুঁজুর।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন বিরূপাক্ষ চৌধুরী। ইন্দ্রপুরের প্রজা এরা সব। বিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে আজকের সমস্ত চাষী। তাঁর নিজের প্রজারা। তাঁর পথ চাইছে, কাঁদছে। চৌধুরী ডাকলেন—রমানাথ!

রমানাথ পাশেই দাঁড়িয়েছিল, সরে এসে দাঁড়াল।

সদর থেকে কত মণ চাল এসেছে ?

মাত্র ত্রিশ।

গলাটা পরিষ্কার করে এক ঝোঁকে বলে ফেললেন চৌধুরী—ওদের দিয়ে দাও সব। তিনি আর দাঁড়ালেন না সেখানে।

স্মরজিৎ বাড়ীতে এসেই চীৎকার করে উঠল। আজকের দিনে চাল বিলিয়ে উপোস করতে হবে নাকি ? ভীমরতি ধরেছে বুড়োর।

আপনার কি আক্কেল নেই জ্যেঠাবাবু ? চৌধুরী কি যেন ভাবছিলেন। অকস্মিতে আলবোলার নলটা খসে পড়ল হাত থেকে। তড়িতাহতের মত মুখ তুলে চাইলেন স্মরজিতের দিকে। সাদা ভুরুর ভিতর থেকে নীল চোখের তারা দুটো স্পষ্ট চোখে পড়ল স্মরজিতের। মুখের দু'পাশে মাংস-রেখা শক্ত হয়ে উঠেছে। নাকের ডগা কাঁপছে কি একটা বিক্ষোভে। কুঞ্চিত ললাটে একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্য। স্মরজিৎ বহুদিন দেখেনি এ চেহারা। চৌধুরী বংশের খাঁটি, অবিকৃত প্রতিকৃতি। লগুড়াহত কুকুরের মত স্মরজিৎ সরে এল সামনে থেকে।

দিন আর কাটতে চায় না চৌধুরীর। বহু দীর্ঘ ক্লান্ত দিন। ছোট বাড়ীর বড় ছেলে গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ীতে এল। কলকাতায় কলেজে পড়ে। সঙ্গে ইয়ারের দঙ্গল। দুপুর রাত পর্যন্ত ওদের বাড়ীতে বাঁয়া তবলার আওয়াজ। ছোট বাড়ীতে উঠছে নতুন তেতলা। অত রোদ্দুরেই ছাতামাথায় মজুররা খাটছে। ইট আসছে। ছাদ পিটোচ্ছে। চৌধুরীর দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে। আজকের এ অমঙ্গল একটা আঁচড়ও কাটতে পারে নি ছোট বাবুর গায়ে।

চরের কয়েকটা জমিতে সামান্য কিছু ধান পেকেছে। আর সব রোদে পুড়ে গেছে। রমানাথ একদিন জানিয়ে গেল।

—সেই ধানই আনতে মুনিষ পাঠাও। রমানাথ আমতা আমতা করে বলল—অতি সামান্য কটি ধান। খরচ পোষাবে না।

যা পাওয়া যায় তাতেই আজকের দিনে লাভ।

রমানাথ একটু ইতস্তত করল—কিন্তু ও জমিতে একটু গোলমাল আছে। —কিসের গোলমাল? ভ্রূকুঞ্চিত করলেন চৌধুরী। জরীপের সময়ই ত ঠিক হয়েছে ও জমি আমাদের দখলে। রমানাথ আর কোন কথা বলল না।

মুনিষ পাঠান হল ধান কাটতে। সকাল থেকে একটু একটু পাতলা মেঘ জমছে দক্ষিণ কোণে। চৌধুরী আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন—আজ কি বৃষ্টি হবে, রমানাথ?

রমানাথ আকাশকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। হাওয়া পড়ে গেছে। বিশ্রী একটা গুমট, ভ্যাপসা আবহাওয়া, নারকেলের পাতাগুলো পর্য্যন্ত নড়ছে না, আসন্ন বর্ষণের পূর্বাভাস। রমানাথ বলল—বৃষ্টি নামলেও রাত্রের আগে নয়।

গেঞ্জীটা খুলে চৌধুরী পাখাটা তুলে নিলেন।

হঠাৎ বাইরে একটা কোলাহল। হাউ মাউ করে কে যেন কেঁদে উঠল। রমানাথের গলার শব্দ শোনা গেল। চৌধুরী বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

মুনিষেরা ফিরে এসেছে। ধান কাটতে পারেনি ওরা। দুজনের পিঠে কাঁচা কঞ্চির মারের দাগ দগদগে হ'য়ে উঠেছে। কালশিরে পড়ে রক্ত চাপ চাপ জমে উঠেছে। বুকের পাশে কাস্তের আঘাতে রক্ত ঝরেছিল, শুকিয়ে জমাট বেঁধে উঠেছে।

চৌধুরীর মুখ দিয়ে কথা সরল না। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। সকলের আগে দাঁড়িয়ে ছিল যে, চেপে ধরলেন তার চুলের মুঠি। ক্ষিপ্ত বাঘের মত চীৎকার করে উঠলেন—ফিরে এলি কোন মুখে হারামজাদা! নির্মম ধাক্কায় মুনিষ ছিটকে মুখ গুঁজে পড়ল সিঁড়ির এক কোণে।

চৌধুরীর শিরায় শিরায় হঠাৎ বংশের রক্ত ডেকে উঠেছে। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি। খবর দাও রমানাথ, এখুনি, এই মুহূর্তে।

ছুটে গিয়ে পাশের কয়েদখানার ঘরের দরজায় সজোরে মারলেন লাথি। পুরনো দরজা আর্তনাদ করে ভেঙ্গে পড়ল। উন্মাদের মত বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন চৌধুরী নিজের হাতে বহুদিনের অব্যবহৃত মরচে ধরা

শড়কি, রামদা আর গণ্ডারের চামড়ার স্তূপীকৃত ঢাল। রমানাথ আর দাঁড়ালো না। মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিল। বিরূপাক্ষ চৌধুরীর জীবনে রক্তের স্বাদ এই প্রথম।

বাড়ীর আবহাওয়া কেমন যেন জমাট বেঁধে উঠল। রাজলক্ষ্মী আঁচ করল অনেকটা। চৌধুরী কি স্মরজিৎ কেউ আসেনি একবারও অন্দরে। বহুরাত্রি পর্যন্ত জেগে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল রাজলক্ষ্মী।

ভোর তখনো হয়নি। ঘুম ভাঙ্গতেই রাজলক্ষ্মী তেতলার জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। ভোরের আবছা আলোয় অনেক মানুষ জটলা করছে বাইরের উঠানে। এক পাশে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। তারই আগুনে ধরানো তামাকের কলকে ঘুরছে হাতে হাতে। রাজলক্ষ্মীর ত্রস্ত চোখের প্রখর দৃষ্টি ঠিকরে পড়ল বারান্দার কোণে। কে যেন বসে পাথরে শান দিচ্ছে শড়কির ফলা। জমা করা রামদার ফলাগুলো চকচক করছে অস্পষ্ট আলোয়। রাজলক্ষ্মীর মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করে উঠল।

স্মরজিৎকে সামনে পেতেই রাজলক্ষ্মী ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—অতলোক জমেছে কেন গো? আর ওই সব?

স্মরজিৎ দাঁড়িয়ে গেল। উত্তর দিল—চরের জমিটা দখল করাতে হবে।

—অতলোক?

—হ্যাঁ।

—খুনোখুনী হবে নাকি?

—হতে পারে। বাধা দিলেই হবে।

রাজলক্ষ্মী স্বামীর হাত চেপে ধরল ভয়ে, আতঙ্কে—এ বন্ধ কর না গো।

—অসম্ভব। স্মরজিৎ মাথা নাড়ল। তা হয় না। জমি বাপের নয়। জমি দাপের। হাত ছাড়িয়ে স্মরজিৎ চলে এল বাইরে। সাপের জিবের মত শড়কির ফলাগুলো এ হাত থেকে ও হাতে ফিরছে। নতুন শান দেওয়া রামদার ফলায় একটা হিংস্র কাঠিন্য ঘুমিয়ে রয়েছে।

দুপুরের শেষ দিকেই লোকজন ফিরে এল। খণ্ড যুদ্ধের পর নির্মম পরাজয় হয়েছে তাদের। হটে এসেছে ওরা। কাঁধে করে বয়ে এনেছে প্রহ্লাদকে। গলার ঠিক পাশেই শড়কির তীক্ষ্ণ ফলা এ ফোঁড় ওফোঁড় করে

দিয়েছে। পাশের ঘরটাতে ধপাস করে আছড়ে ফেলল প্রহ্লাদের ধড়টাকে।

কালোপাথরের মূর্ত্তির মত কঠিন প্রহ্লাদের চেহারা। বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পা অবধি রক্ত কালো হয়ে জমাট বেঁধে উঠেছে। ঝলকে ঝলকে তাজা রক্ত উঠে মেঝে রক্তাক্ত করে ফেলল।

কিন্তু চৌধুরীর সমস্ত কথা গেল হারিয়ে। বসে পড়লেন সামনের তক্তপোষে তিনি। আলবোলার আগুন গিয়েছে নিভে। কঠিন ক্ষমাহীন চোখে একটা অসহনীয় রূঢ়তা। চৌধুরী যেন ব্যাপারটা বুঝেই উঠতে পারছেন না।

—বেইমানী! চেঁচিয়ে উঠল মদন সর্দ্দার। বেইমান জমিদার! হাতের টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সবার সামনে। পাঁচশো লোকের সামনে পাঠিয়েছ পঞ্চাশ জনকে? আর ধরবো না লাঠি। রক্তাক্ত মদনের মুখখানা বীভৎস ক্রোধে ক্রুর হয়ে ওঠে।

—এই রইল তোমার লাঠি। দলবল নিয়ে মদন চলে গেল।

বেইমানী। চৌধুরী চমকে উঠলেন। মদন চীৎকার করছে। বিদ্যুতের শকের মত সারা শরীর মুহূর্তের জন্য থর থর করে কেঁপে উঠল। এ বংশের প্রজা মদন। সম্মানের জন্য ধরেছে লাঠি। চৌধুরী আবার বসে পড়লেন। জমির দখল ওরা নিতে পারেনি। হটে এসেছে ওরা।

চীৎকার করে বাড়ীর ভিতর কেঁদে পড়ল নন্দ—মেরে ফেলেছে ওরা পেহ্লাদকে। ও আর বাঁচবে না দিদিমণি।

রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ ধরে শুনছিল অস্পষ্ট কলরব। ভয়ঙ্কর মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিল আতঙ্কিত আগ্রহে। নন্দর কথাগুলো শুনল রাজলক্ষ্মী বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে। পরক্ষণেই দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে তাকের উপর থেকে আইডিন আর তুলোর রাশ হাতে নিয়ে তর তর করে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। রাজলক্ষ্মী ছুটল বাইরের দিকে।

পিসিমা রাজলক্ষ্মীর হাত চেপে ধরলেন—যাচ্ছ কোথায় বৌমা?

—ওরা মেরে ফেলেছে প্রহ্লাদকে। আকুল হয়ে কেঁদে উঠল রাজলক্ষ্মী।

—তাই বলে তুমি চলেছ বাইরে! ছি ছি!

পিসিমা রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে এলেন তাঁর ঘরে। ঝড়ের বেগে হঠাৎ ভবানী ঢুকল ঘরে। বলল—বৌদি শিগ্‌গির দাও ত আইডিন আর তুলো। ছোঁ মেরে হাত থেকে আইডিন আর তুলো নিয়ে ভবানী ছুটল বিদ্যুৎ বেগে। পিসিমা বাধা দেবার সময়ই পেলেন না।

লোকজন সবাই চলে গেছে। শুধু চৌধুরী আর রমানাথ বসে। উৎসব শেষের কলরবের পর মৃত্যুর মত অসহনীয় স্তব্ধতা। এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত বিড়ির টুকরো আর ভাঙ্গা লাঠির ছড়াছড়ি। দেয়ালের পাশে স্তূপাকার করা শড়কির বাণ্ডিল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে চৌধুরী দেখলেন ভবানী ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। অভাবনীয় দৃশ্যে তিনি মূক হয়ে গেলেন। নতুন করে একটা জ্বালা হঠাৎ দীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর চোখে মুখে। ধীর পদে এগিয়ে এসে তিনি দাঁড়ালেন দরজার সামনে।

—তুমি এখানে কেন? ভবানী উত্তর দিল না। চৌধুরী আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এখানে কেন?

—যাও ভেতরে। অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরুল তাঁর গলা থেকে অমোঘ নিয়তির মত। ভয় পেয়ে পাশে এসে দাঁড়াল রমানাথ।

—যাও বলছি।

—না। ভবানী উত্তর দিল।

—এতটুকু ইজ্জত-বোধ নেই তোমার। এবারে যেন ভবানী আর নিজেকে সামলাতে পারল না। আক্রোশে ফেটে পড়ল। চেঁচিয়ে উঠল—না নেই। ইজ্জত বোধ এ বেলায়। যখন ঘরের বৌ বাসন মাজে, জল তোলে তখন ইজ্জত কোথায় থাকে। যাব না আমি।

ভবানী মুখোমুখী জবাব দিচ্ছে। চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মেয়ে ভবানী শুনবে না তাঁর কথা। চৌধুরী মরিয়া হয়ে উঠলেন, ধ্বক ধ্বক করে, জ্বলে উঠল চোখ দুটো। মুহূর্তে সবল বাহু আন্দোলিত হয়ে উঠল শূন্যে। রমানাথ চৌধুরীর পা দুটো চেপে ধরল সমস্ত শক্তি একত্র করে—থামুন থামুন কর্ত্তা। এক ঝটকায় পা ছাড়িয়ে চৌধুরী ঘরের বাইরে চলে এলেন।

চৌধুরী বেশ বুঝতে পারেন পাইকেরা আর কেউ আসবে না। আজ আর কেউ সম্মানের জন্য লড়তে চায় না। কেনই বা চাইবে? তাঁর তুচ্ছ

সম্মানের জন্য কেন তারা মাথা ফাটাবে, রক্ত ঢালবে! তাঁর জমি চাষ করে, খাজনা দেয়, ফসল দেয়। ব্যস, সম্বন্ধ এখানেই শেষ। একটা ঠাণ্ডা শীতল অনুভূতি চৌধুরীর স্নায়ুগুলিকে অবশ করে ফেলে মাঝে মাঝে। একমাত্র জিনিষে ওরা ফিরতে পারে। চৌধুরী জানেন সে হচ্ছে টাকা। টাকা ঢাললেই ওরা আবার ফিরে আসবে।

রমানাথ খবর আনল চরের ওরা প্রচুর লোকজন জমা করেছে। সামান্য ধান কটি রাখবার জন্যে নয়, জমির দখল রাখবার জন্য ওরা যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত।

আবার চৌধুরী সজাগ হয়ে উঠলেন। ধান চাই নে। নিগকে ওরা ধান। জমির দখল চাইই তাঁর। ইতস্তত করে রমানাথ বলল—হাজার দেড়েক টাকা হলে লোক জড়ো করা যায়।

—দেড় হাজার?

চৌধুরী চিন্তিত হলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত টাকা কোথায় পাবেন তিনি?

অধৈর্য হয়ে উঠলেন চৌধুরী। তাঁকে দেড় হাজার টাকা আজকের মধ্যেই জোগাড় করতেই হবে। চুপি চুপি বললেন রমানাথকে—তুমি একবার চেষ্টা করো ভুবনের কাছে। যত সুদ লাগে।—ভুবনের কাছে? রমানাথ আশ্চর্য্য হল।

—তাছাড়া উপায় কি?

চৌধুরী মন ঠিক করে ফেললেন। আর সুদ দেবেন যখন, টাকা নিতে তাঁর সঙ্কোচ কোথায়?

সন্ধ্যের সময় রমানাথ ফিরে এল। ভুবনের দেখাই পায় নি সে। বাড়ীর ভিতরেই আছে তবু দেখা করে নি। ফিস ফিস করে চৌধুরী বললেন—আমি নিজেই যাব রমানাথ। তুমি এস পেছনে।

আবছা অন্ধকারে চৌধুরী এসে দাঁড়ালেন ভুবনের দরজায়। ভুবন এসে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। একটা মোড়া পেতে দিয়ে তিনবার নিল পায়ের ধুলো।

চৌধুরীর গলা কেঁপে উঠল কথা বলতে গিয়ে—আমায় হাজার দেড়েক টাকা দিতে হবে ভুবন। তিনি আর বলতে পারলেন না।

বিনম্র দীনতায় ভুবন গলে গেল। লুটিয়ে পড়ল মাটীতে। এক হাত জিব কেটে বলল—ছি ছি। এত আপনারই টাকা কর্তা। যখুনি চাইবেন।

—সুদ নিতে হবে কিন্তু তোমায়। ভুবন পিছিয়ে এল দুপা।—কি যে বলেন কর্তা। এ টাকা ত কর্তা আপনারই দৌলতে। খাজনা দিতে না পারায় বাবাকে জুতো পেটা করেছিলেন। সেই জন্যেই ত বাবা দেশ ছাড়েন। দেশ না ছাড়লে কোথায় পেতাম টাকা? আর সুদ নেব আপনার কাছ থেকে? ছি ছি!

ভুবন টাকা আনতে ঘরে ঢুকল। ফিরে এসে দেখল বিরূপাক্ষ চৌধুরী আর সেখানে নেই। সন্ধ্যের অন্ধকারে বহুদূর দৃষ্টি চালিয়েও ভুবন আর তাঁকে আবিষ্কার করতে পারল না।

শ্রান্ত বিরূপাক্ষ চৌধুরী গা এলিয়ে দিলেন শোবার ঘরে। শরীরে তাঁর আর শক্তি নেই যেন একটুও। আর কিছু ভাবতে পারেন না তিনি। বহু দীর্ঘ দিনের পথশ্রমের ক্লান্তি যেন। কপালের রগ দুটো দপ্ দপ্ করছে তাঁর! দম আটকে আসবে বুঝি তাঁর এ বাড়ীতে। একটা অদ্ভুত নিষ্ক্রিয় আলস্য তাঁর রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছে তাঁর মস্তিষ্ককে। রাত্রে বোধ হয় বৃষ্টি হবে। চৌধুরী পাশ ফিরে শুলেন।

রাজলক্ষ্মী এসে ঘরে ঢুকল, পা টিপে টিপে মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল—ঘুমিয়েছেন?

—কে, বৌ মা? চৌধুরী উঠে বসলেন বিছানার উপর।

ইতস্তত করে রাজলক্ষ্মী বলল—ওঁর কাছে শুনলাম টাকার দরকার। একটু থেমে বলল আবার—আমার কাছে কিছু টাকা ছিল। আর এই গয়নাটা, হবে এতে?

চৌধুরী অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে। গয়না ত তিনি চাননি। রাজলক্ষ্মী নিজে সেধে দিতে চাইছে। চৌধুরী-বংশের বৌ নিজের হাতে তার গয়না খুলে দিচ্ছে। চৌধুরীর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। বাঁহাতে চোখ মুছে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে মুখ ফেরালেন। দেখলেন রাজলক্ষ্মী বাইরে চলে গেছে।

কাল সারা রাত্রি ধরে বৃষ্টি হয়েছে। সকালে এসে চৌধুরী দেখলেন এক-রাত্রে মাঠের চেহারা গেছে বদলে। নেতিয়ে পড়া ধানের ডগাগুলো সবুজ হাসিতে মাথা তুলে উঠেছে ঊর্দ্ধপানে। সামনের পুকুরে জল জমেছে। ভাঁটীর ভিজে পাতাগুলো এখনো শুকিয়ে ওঠেনি। আস্‌স্যাওড়ার পাতা নতুন করে চকচকে সজীব হয়ে উঠেছে রোদ্দুরের রং গিয়েছে বদলে।

রমানাথ একটু পরেই এল। চৌধুরী ডাকলেন—এদিকে এস রমানাথ।

কান খাড়া করে রমানাথ শুনল তাঁর কণ্ঠস্বর। কেমন নতুন অদ্ভুত শোনাচ্ছে তাঁর গলার আওয়াজ। বহু যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট বিচূর্ণ আত্মার আর্তনাদের মত। এ কণ্ঠস্বর রমানাথ শুনল এই প্রথম।

রমানাথ ঘরে ঢুকতেই নোটের তাড়া তার হাতে তুলে দিয়ে ভাঙ্গা গলায় ধীরে ধীরে বললেন চৌধুরী—দেড় হাজার আছে এতে। আজই গঞ্জে বড় দেখে ঘর ভাড়া নেবে। চালের আড়ৎ খুলবে তুমি আমার হয়ে।

রমানাথ ফিরছিল। আবার চৌধুরী তাকে ডাকলেন—আর সেই তিল-জলার পাত্রকে চিঠি দাও আজই। তারা যেন দেখে যায় ভবানীকে।

তাঁর চোখ দুটো লাল। চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠেছে। রমানাথ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কাল সারারাত বিরূপাক্ষ চৌধুরী শুধুই কেঁদেছেন।

অবন্তী সান্যাল

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই স্থলে গুটিকতক হিন্দুর প্রচলিত ও অপ্রচলিত ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে; এগুলি হইতে দেখা যাইবে যে এক সময় হিন্দুর আচারের সহিত মুসলমানের আচারের কতটা নৈকট্য ও সাদৃশ্য ছিল। বিষ্ণুসংহিতা বলিতেছে, লেখ্য, অর্থাৎ দলিল, ত্রিবিধ। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে, 'রাজ-সাক্ষিক' (রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ করচিহ্নিতং রাজ-সাক্ষিকম্ ॥ ৭।৩) এতদ্বারা করচিহ্ন (দস্তখত বা মোহরের বদলে করতলের ছাপ) সাহায্যে দলিল দস্তখত করার প্রথাও ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়, রাজসভায় সভাসদের হাঁটু গাড়িয়া, অর্থাৎ "বীরাসন" করিয়া বসা হিন্দু দিগের প্রাচীন রীতি '(বীরাসনং সদা তিষ্ঠেৎ'—শঙ্খ,১৮।২); শোনা যায় পার্ব্বত্য রাজগণের সভায় এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। মুসল-মান রাজদরবারে আজ পর্য্যন্ত এই প্রথা আছে। পারস্যেও প্রচলিত আছে। জাপানীদের বসিবার ভঙ্গীও এই প্রকারের মত। বোধ হয়, পারস্যবাসীরা মঙ্গোলদের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহা একটি প্রাচীন প্রথা। তৃতীয়, বাৎসায়ণের কামসূত্র নামক পুস্তকের সপ্তম অধিকরণে (২—১৪।১৫) দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে একটি আচারের কথা উল্লিখিত আছে। ইহা দক্ষিণ-ভারতীয় যুবক ও বালকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহা মুসলমানদের "সুন্নত" (মুসলমান ও ইহুদীর লিঙ্গত্বকচ্ছেদ-সংস্কার, circumcision) প্রথার ন্যায়। এই সম্পর্কে স্বর্গত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলেন, 'মুসলমানদের যেমন 'সুন্নত' এই সূত্রেও সেই ভাবের কর্ম্মের উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা যে ভোগার্থ (ধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই) তাহাও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে।...এই যে বর্হিবিপ্লবজনিত অভ্যন্তর দ্বন্দ্বের বিরাম ইহারই অন্যতম পরি-ণতি 'সুন্নত' জাতীয় ত্বকচ্ছেদ নিবৃত্তি। বিশেষতঃ এই কার্য্য ঐ জাতির ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া ঐদিকে সকলেরই বিদ্বেষ বা অকর্ত্তব্যতাজ্ঞানও উদ্বুদ্ধ হইল" (ভূমিকা,

পৃঃ ৭-৮) †। এক্ষণে কথা, এই 'সুন্নত' জাতীয় প্রথা দক্ষিণের হিন্দুরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজকালকার মত, কামসূত্র দ্বিতীয়- তৃতীয় শতকে লেখা হইয়াছিল, কারণ, এই পুস্তকে শতবাহন রাজবংশের উল্লেখ দেখা যায়, অন্যদিকে দেখা যায় যে আরব ও ইহুদীরা দক্ষিণ ভারতে গমনাগমন করিত। কচ্ছের 'ভূজ' নামক স্থানে তিনখানি তাম্রলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ঐগুলি আরব ও ইহুদিদের স্মরণার্থে কবরস্থানে প্রোথিত ছিল। এইগুলি ২৫০ খৃষ্টাব্দের বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং, ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই এই সকল জাতি তথায় যাতায়াত করিত। ইহাদের মধ্যে ইহুদিদের ভিতর এই উপরোক্ত প্রথাটি ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য। এই সেমিটিক জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়া দক্ষিণের হিন্দুরা উক্ত প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে (Three Semitic Inscriptions from Bhuj)। চতুর্থতঃ, মোগল বাদশাহদের ন্যায় প্রাচীন হিন্দু রাজারাও বরফ (নীহার) খাইত (বশিষ্ঠ সংহিতা, ১৯ অধ্যায়, "নীহার সার্থনামস্যান্ন মূল্যমাত্রং নৈহারিকং স্যান্মহামহস্থঃ স্যাৎ···)‡ পুনঃ স্মৃতি বলিতেছে যে ময়ূর, কপিঞ্জল, বাদ্ধ্রীণস্ ভক্ষণ করা যাইতে পারে। শঙ্খ সংহিতা বলিতেছে যে যমসংহিতায় এই সব খাওয়ার ব্যবস্থা আছে (শঙ্খ, ১৭।২৭)। কেহ কেহ শেষোক্ত জীবটীকে পক্ষী বলিতে চাহেন, কিন্তু অন্যত্র ইহা খাসী বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক সময়ে ইহার মাংস বিষ্ণু পূজায় প্রদত্ত হইত। নূলা পঞ্চানন বলিয়াছেন, "বিষ্ণু পূজায়···কৃতক্লীব শাস্ত্রের বিধান।" 'হালুয়া'র সংস্কৃত নাম 'সংজাব' (ব্যাস সংহিতা ৩।৫৫)।

খৃষ্টীয় সমাজতত্ত্ব

ভারতে খৃষ্টীয় মণ্ডলী একটি ক্রমবর্দ্ধমান সম্প্রদায়। বিভিন্ন সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে এই সমাজ পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। খৃষ্টানধর্ম্মের

† তর্করত্ন মহাশয় ইহাও বলিয়াছেন যে, এই সূত্রের কোন ভাষ্য বা টীকা আজকালকার ভারতীয় ভাষায় আজ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই; তিনি করিবেন বলিয়াও উহার বঙ্গানুবাদ করেন নাই। বস্তুতঃ ৭ম অধিকরণের কোন ভাষ্য এবং আধুনিক ভাষায় অনুবাদ আজ পর্য্যন্তও হয় নাই। হিন্দু লেখকেরা এই বিষয় একবারে চাপিয়া গিয়াছেন।

‡ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যুগে যখন বরফের ব্যবহার প্রচলন আরম্ভ হয় তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইহা ব্যবহার করিতেন না!

সহিত ভারতের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। দক্ষিণের খৃষ্টানেরা বলেন, খৃষ্টের শিষ্য সাধু টমাস্ (St. Thomas) প্রচারার্থ ভারতে আগমন করেন, সুদূর দক্ষিণে তাঁহার সমাধি আছে। কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। মালাবার অঞ্চলে সিরিয় (Syrian) খৃষ্টানমণ্ডলীভুক্ত একদল লোক বহুকাল হইতে আছেন; তাঁহাদিগকে "নাজারা" (Nazarene) বলা হয়। ইঁহাদের আকৃতি ও আচারে প্রতিবেশী ভারতীয়দের সহিত বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ইঁহারা এবং স্থানীয় ইহুদীরা নাম ও বাহিরের আচরণে স্থানীয় হিন্দুদের অনুকরণ করেন। এই খৃষ্টীয় মণ্ডলী যে অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে তাঁহারা অতি সচেতন। একবার একটি ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদের এক স্কুলে গিয়া তাহাদিগকে মুরুব্বি চালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কতদিন তোমরা খৃষ্টান হইয়াছ?" প্রত্যুত্তরে ছাত্রেরা বলে, "তোমার পূর্ব্ব-পুরুষেরা যখন জার্ম্মানীর জঙ্গলে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইত তখন হইতে আমরা খৃষ্টান" (১)।

এইরূপ কথিত আছে যে, এই মণ্ডলী খৃষ্টীয় যুগের প্রাক্কালে সিরিয়া দেশ হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং পরে অনেক ভারতবাসীকেও স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া নিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের আকৃতি স্থানীয় ভারতবাসী হইতে পৃথক নহে, যদিচ হিন্দুদের সহিত ইঁহাদের সামাজিক আদান প্রদান নাই। একজন শিক্ষিত সিরিয় খৃষ্টান লেখককে বলেন, ইহা হইতে পারে যে দুই একজন লোক সিরিয়া হইতে ঐ স্থলে ঔপনিবেশিক রূপে আসিয়াছিলেন। ইহাও হইতে পারে যে দুই একটি সিরিয় ভাষার শব্দ ধর্ম্মের ভিতর দিয়া তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা আসলে ভারতীয় কোন জাতির (race) লোক (২)।

১। Henry Bruce—Letters from Malabar.

২। মালাবারের এই খৃষ্টানেরা যে সিরিয়া হইতে আসিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। আরব খলিফাদের শাসনকালে সিরিয়াতে (সাম) দুই দল খৃষ্টীয় মণ্ডলী ছিল। জাফরাইট ও নেষ্টোরিয়। এতদুভয়ের মধ্যে শেষোক্তেরা বোগদাদের খলিফার অনুগ্রহভাজন ছিলেন। তাঁহাদের পাট্রিয়ার্ক বোগদাদে থাকিতেন। সেখান হইতে তাঁহারা ভারত ও চীনে মিশনারী-কার্য্য পরিচালনা করিতেন। মালাবারের "Christians of St. Thomas" নেষ্টোরিয় পাট্রিয়ার্কের অধীন ছিল। এই সম্পর্কে Hitti—"History of the Arabs", P. 356 দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় খৃষ্টানদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইঁহাদের অনেকেই পর্ত্তুগীজ ভারতে বাস করেন। পর্ত্তুগীজেরা অনেক ভারতবাসীকে জোর করিয়া খৃষ্টান করিয়াছে। পশ্চিম ভারতের পর্ত্তুগীজ এলাকার গোয়া নামক স্থানের খৃষ্টানদের গোয়ানীজ (Goanese) বলা হয়। পর্ত্তুগীজ ভারতের খৃষ্টানেরা পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারে ইউরোপীয় চালচলন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পর্ত্তুগীজ ও স্পেনীয়গণ এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার যেখানে রাজ্য বিস্তার করিয়াছে সেখানে স্থানীয় লোকদের জোর জবরদস্তি করিয়া খৃষ্টান ও ইউরোপীয় ভাবাপন্ন করিয়াছে। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের "ফিলিপিনোরা" এবম্প্রকারের একটি জাতি।

সাধু জেভিয়ার (St. Xavier) ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ভারতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন তখন রোমের পোপ ভারতে ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে এই মর্ম্মে একটি বিশিষ্ট "বুল" (৩) (অনুজ্ঞা) প্রকাশ করেন যে, খৃষ্টান হইলে হিন্দুর পূর্ব্ব আচার রীতি, সামাজিক পদ্ধতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই। ইহার ফলে, গোয়ানীজ প্রভৃতিগণ খৃষ্টান হইয়া জাতিভেদ ও তৎপ্রসূত আচার পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহাদের ইউরোপীয় নাম ও পোষাকের মধ্যে লুক্কায়িত হিন্দুর বর্ণভেদ। গোয়ানীজদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেকে 'চৎপাবন' ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করেন, কেহ বা আবার নিজেকে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচয় দেন। পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতীয় গোয়ানীজদের মধ্যে বিবাহ ও আহারাদি চলিত না, এক্ষণে আহারাদি চলে বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু বিবাহাদি এখনও চলে না।

পর্ত্তুগালে যখন 'রিপাব্লিক' (সাধারণতন্ত্র) শাসন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন উহার রাষ্ট্রীয় সভাপতির প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন জনৈক 'গোয়ানীজ' ভদ্রলোক। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত কুট্টিনিয়ে (৪)। তিনি ১৯১৪ খৃঃ আমেরিকা পরিভ্রমণকালে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সমিতিতে ভারতবাসীদের

৩। মিশনারী সোসাইটীর সেণ্ট্ সেভিয়ারের জীবনী দ্রষ্টব্য।

৪। এই প্রকারে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী (Grand Vizier) কিয়ামিল পাশার (১৯১৩ খৃঃ) প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ছিলেন ঢাকার একজন মুসলমান বাঙ্গালী।

সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য সস্ত্রীক আসেন। তিনি নিজেকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন।

দক্ষিণের মাদ্রাজ অঞ্চলে ভারতীয় খৃষ্টানদের মধ্যে উচ্চ জাতীয় ও 'পারিয়া' জাতীয় খৃষ্টানদের সামাজিক ব্যবধান এখনও দূরীভূত হয় নাই বলিয়া শোনা যায়, পারিয়া জাতির খৃষ্টানদের জন্য পৃথক গির্জ্জা আছে।

উত্তরে প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য নাই বলিয়া হালে খৃষ্টীয়-মণ্ডলী দাবী করেন। এই সমাজে আগেকার উচ্চজাতীয় লোকদের প্রাধান্য আর নাই, কাঞ্চন-কৌলিন্যই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। বাহ্যিক পোষাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারে তাঁহারা ভারতীয় পদ্ধতিই আঁকড়াইয়া আছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সহিত হিন্দুদের বাহ্যিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এমন কি, উদার খৃষ্টানদের সহিত উদার হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাহ চলিতেছে!

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রথম যুগে খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণকারী ভারতীয়দের গোয়ানীজদের ন্যায় ইউরোপীয়করণ ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরলোকগত শ্রদ্ধেয় জনৈক প্রবীণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের নিকট লেখক শোনেন, পাছে খৃষ্টান-বাঙ্গালীরা স্বজাতীয়দের সহিত পুনঃ মিশিয়া পুরাতন সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করে, এইজন্য Rev. Duff ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, নব-দীক্ষিতদের পোষাকে এমন পার্থক্য থাকা দরকার যদ্দ্বারা তাহারা সাধারণের নিকট চিহ্নিত হইতে পারে এবং স্বজাতীয়দের সহিত আর মিশিতে না পারে। এই নীতি মধ্যযুগীয় রীতিপ্রসূত। এই সময়ে প্রথা ছিল, লোকে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে নূতন ধর্ম্মগুরুর জাতির পোষাক ও আচার গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য আফ্রিকা ও এশিয়াতে খৃষ্টান হইলে বেশভূষায় ইউরোপীয় সাজিয়া স্বজাতির সহিত আলাদা হইতে হয়, অর্থাৎ পরিবর্ত্তন সাধিত করা হয়। ভারতে মুসলমান হইলে তাহার এই পরিবর্ত্তন করিতে হয়। মধ্যযুগীয় 'রসুল-বিজয়' পুস্তকে ব্রাহ্মণকে মুসলমানকরণে উক্ত পরিবর্ত্তনের বর্ণনা আছে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও ইতিহাসে পাওয়া যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে কাট্রু (Catrou) নামক জনৈক ইউরোপীয় পর্য্যটক তাঁহার মোগলবংশের ইতিহাস পুস্তকে একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। সম্রাট নৈষ্ঠিক কাজি ও ইমামদের আহারে নিমন্ত্রণ করেন; সেই সময় তাঁহার আহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে নিষিদ্ধ মাংস এবং মদও ছিল……ইহাতে নৈষ্ঠিকদল

তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, অল-কোরআনে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোন ধর্ম্মে মদ্য ও সকল প্রকার খাদ্য খাওয়ার অনুমতি আছে। ইহাতে তিনি উত্তর পান যে, কেবল খৃষ্টানধর্ম্মেই এই প্রকার অনুজ্ঞা আছে। প্রত্যুত্তরে তিনিও বলিলেন, "তাহা হইলে আমরা খৃষ্টান হই। পোষাক কষাবাঁধা কোটে (close coats) এবং পাগড়ীকে হ্যাটে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য দর্জ্জি ডাকা হউক।" ইহাতে নৈষ্ঠিক-দল নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন···এবং সুর নামাইয়া বলেন যে, সম্রাট এই সকল নিষেধবিধি দ্বারা আবদ্ধ নন (৫)।

এইস্থলেও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন দ্বারা পুরাতন জাতি-তাত্ত্বিক বাহ্যিক চিহ্নগুলিও পরিবর্ত্তন করার সংবাদ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপীয়দের ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া ভারতীয় খৃষ্টানদের ইউরোপীয় সাজিতে হইত। পশ্চিম ভারতের ন্যায় বাঙ্গলায় যেসব পর্ত্তুগীজ নামধারী খৃষ্টান আসেন, তাঁহারা সকলেই পর্ত্তুগীজ বংশোদ্ভূত না-ও হইতে পারেন। বাঙ্গলার ইতিহাস হইতে জানা যায় যে ভূষণার রাজকুমার খৃষ্টান হইয়া পর্ত্তুগীজ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আরব-উম্মিয়াদদের খলিফাদের সময় বিজিত জাতীয় লোকেরা মুসলমান হইলে তাহাদের আরব নাম ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিতে হইত। ইহাকে "আরব-সাম্রাজ্যবাদীয় যুগ" বলা হয়। ইহারই ফলে পারসিক, ঈজিপ্ত ও পশ্চিম এশিয়ার মুসলমানদের সকল বিষয়েই আরব সাজিতে হইয়াছিল। পরে পারসিক জাতীয়তাবাদ উদ্ভূত হইলে, তাঁহারা ধীরে ধীরে পারসিক নাম পুনঃ প্রচলন করিতে আরম্ভ করেন; আরব সাহিত্য ছাড়িয়া ফার্সী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে থাকেন। উপস্থিত সময়ে বিগত প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া পারস্যে আরব কৃষ্টির সমস্ত বাহ্যিক চিহ্ন বিতাড়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে। ফারসী ভাষা হইতে আরবী শব্দ বিতাড়িত হইতেছে। লোকের প্রাচীন জারতুষ্ট্রীয় যুগের নামকরণ হইতেছে, পোষাকেও তদ্রূপ কেমালের সময় হইতে তুর্কিতে সেই প্রকার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

৫। Elliot and Dowson, "History of India", Vol. VI, Pp. 513-514 টাইটাস কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পৃঃ ৭০।

ভারতে ইহার বিপরীত অবস্থা চলিতেছে। কথিত আছে যে, সম্রাট আকবর ভারতীয় মুসলমানদের পারসিক নাম রাখিবার প্রথা প্রচলিত করেন। তাঁহার রাজ্যে পারসিক "নৌ-রোজ" উৎসব (ইহা আসলে জারতুষ্ট্রীয় উৎসব, তাহা মুসলমান পারসীকেরা গ্রহণ করিয়াছেন) প্রচলন করেন। তাঁহার 'দীন-ইলাহী" মধ্যে দিন ও মাসের প্রাচীন পারসিক নাম প্রচলন করেন (৬)।

ভারতীয় খৃষ্টানদের প্রতি হিন্দুদের যে মনোভাব দেখা যায় ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি তাহা অন্য প্রকার। খৃষ্টান ও হিন্দুর মধ্যে সেইপ্রকার তিক্ততা নাই যেরূপ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আছে। অবশ্য খৃষ্টান-জনসংখ্যার অত্যল্পতাও তাহার একটি কারণ। কিন্তু পূর্ব্বের মুসলমান শাসকদের নির্য্যাতন ও ভারতীয়দের মুসলমানকরণকালে জাতিতাত্ত্বিক পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহাদের "বিদেশী" করায় এই তিক্ততা সৃষ্টি হইয়াছে এবং ফলে উভয় সমাজের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়াই গিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

—হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান—

সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান কোথায় তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাজের বাস্তব জীবনে এবং আইনে পার্থক্য আছে। বাস্তব জীবনে ভারতে স্ত্রীলোক সম্মান পাইয়াই আসিয়াছেন, কিন্তু আইনতগতভাবে স্ত্রীলোকের অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না এবং এখনও নহে। এই বিষয়ে প্রাচীন ভারত সভ্যপদবাচ্য অন্যান্য ঐতিহাসিক জাতিসমূহ অপেক্ষা পৃথক ছিল না, বরং সামাজিক জীবনে ভারতীয় স্ত্রীলোকের অবস্থা ভালই ছিল। গ্রীসের কৌমাবস্থার সামন্তযুগীয় হোমার বর্ণিত আড্রোম্যাবি ও অন্যান্য স্ত্রীলোকদের অবস্থার সহিত হিন্দুর পৌরাণিক মধ্যযুগীয় রামায়ণ ও মহাভারতের স্ত্রীলোক দের অবস্থার তুলনা করিলেই তাহা পরিলক্ষিত ও বোধগম্য হইবে। ব্যবহারিক জীবনে রোমীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা তৎকালীন ভারতীয় স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থার সহিত তুলনা করিলে তাহা প্রতীত হইবে। সামাজিক জীবনে যে অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় স্ত্রীলোকের অবস্থা ভালই ছিল, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঘোষা প্রভৃতি কতিপয় স্ত্রীলোক ঋক্‌স্তোত্র রচয়িতা ছিলেন। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে দর্শনশাস্ত্রের গূঢ় তথ্য

৬। আবুল ফজলের "আকবর নামা" দ্রষ্টব্য।

শিক্ষার দিবার কথা পাওয়া যায়। মায়ার বলেন, প্লেটো কিম্বা অরিষ্টটলের কাছে কিম্বা খৃষ্টীয় মণ্ডলের পিতাগণ (Council of Fathers of the Church) —যাঁহারা বরং স্ত্রীলোকের আত্মা আছে কিনা তাহা লইয়া তর্কবিতর্কে প্রস্তুত হইতেন, তাঁহাদের নিকট ইহা কি অসম্ভব প্রকারের হাস্যাস্পদ ব্যাপার হইত (৭)। কিন্তু ভারতে প্রস্তরযুগ হইতেই নানা মূলজাতীয় জাতিসমূহের বাসস্থান হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন জাতির সমাজতাত্ত্বিক বিবর্ত্তনও এক প্রকারের ছিল না এবং কোন-সর্ব্বশক্তিমান রাষ্ট্রশক্তি সকলকে সভ্যতার সমস্তরে আনয়ন করিয়া সকলের একত্ব সম্পাদন করে নাই, আর হিন্দুধর্ম্ম তাহার নরতাত্ত্বিক ভিত্তিতেই অবস্থান করিয়া তাহার সমাজকে বাঁধা-ধরা একটা কাঠামোর মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত করায় নাই। এই জন্যই আজ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে এত বৈচিত্র্য ও অনৈক্য বিদ্যমান আছে। মায়ার যথার্থ বলিয়াছেন যে, প্রাচীন-কাল হইতে ভারতের লোকেরা এবং তাহাদের কৃষ্টি, আর্য্য ও আদিম জাতিদের মিশ্রণ দ্বারা উত্তরোত্তর জটিল হইতেছে (৮)। কাজেই নানাবিধ আচার এবং সামাজিক অবস্থা আজ পর্য্যন্ত ভারতে দৃষ্ট হয়; বিভিন্ন জনসমষ্টি সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে আজ পর্য্যন্ত অটুট আছে, এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

এক সময়ে বাকোফেনের মতটি গৃহীত হইত যে, জগতে "মাতার-অধিকার" রূপ (mother-right) প্রতিষ্ঠান দ্বারা পৃথিবীর সকল জাতিই অভিব্যক্ত হইয়াছে (৯)। কিন্তু এই মত আজকাল আর অবিসম্বাদিতরূপে গৃহীত নহে। এক্ষণে বলা হয়, খুবই সম্ভব ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিসমূহে পিতার অধিকার"রূপ (father-right) প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ছিল। ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে 'পিতার অধিকার' প্রতিষ্ঠানটিই দৃষ্ট হয় যদি চ ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে, সংসারে পিতার স্বেচ্ছাচারিত্ব (Pater familias) রোমানদের ন্যায় ছিল না। গোলাপ শাস্ত্রী (১০) বলিয়াছেন, প্রাচীন আইনানুসারে স্ত্রীলোককে জীবন-ব্যাপীই অধীনতা স্বীকার করিতে হইত (মনু. ৯।৩; যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৮৫)। স্ত্রী-

৭। J. J. Meyer, "Sexual Life in Ancient India", Vol. II, p. 44

৮। J. J. Meyer, "Sexual Life in Ancient India", Vol. I, P. 130.

৯। Bachofen, "Das Mutter-recht".

১০-১১। G. Shastri, A Treatise on Hindu Law, Pp. 581-582.

লোকের বিবাহের অর্থ, তাহার উপর পিতার যে অধিকার ছিল তাহা স্বামীকে হস্তান্তর করা। স্ত্রীলোক সম্পত্তি-বিহীন হইত (মনু, ৮।৪১৬)। কিন্তু পরে দায়ভাগোক্ত মনু ও কাত্যায়নে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোক ছয় প্রকারের 'স্ত্রীধন' প্রাপ্ত হয় (মনুকাত্যায়নৌ (৪, ১, ৪)। আবার নারদ, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রী-ধনের কথা বলিয়াছেন; এবং দেবল বলিয়াছেন, এই স্ত্রীধনের উপর আপৎকাল ব্যতীত স্বামীর কোন অধিকার নাই। ব্যাসও বলিয়াছেন যে, এই সম্পত্তিতে তাহার জ্ঞাতিদের কোন অধিকার নাই (দায়ভাগোক্ত ব্যাস, ৪, ১, ১৬)।

পিতৃগৃহে বাসকালে কন্যা ও পুত্রের কোন সম্পত্তি থাকিত না, বরং তাহারা নিজেরাই সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। কারণ তাহার উপার্জ্জিত অর্থ পিতারই সম্পত্তি হইত (মনু, ৮।৪১৬)। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের আইনগত অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইত, কিন্তু কন্যার হইত না; পরে গোলামের অবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা স্ত্রীলোকের ভাগ্যে বিবর্ত্তিত হয়। বৌধায়ন বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা দায়াধিকার (inheritance) পাইতে পারে না, কারণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 'শক্তিবিহীন এবং দায়াধিকারের অযোগ্য হইয়া স্ত্রীলোকেরা অকর্ম্মা" (বৌধায়ন, দায়ভাগোক্ত ১১।৭।১১), কিন্তু পরে স্ত্রীলোক 'স্ত্রীধন' পাইতে লাগিল এবং পরে অন্য প্রকারেও বিষয় পাইতে লাগিল (১১)।

বৈদিক যুগের পর দুর্গাচার্য্যকে বলিতে শোনা যায়, পিতার কন্যা তাহার পুত্রের সহিত সমান, যেহেতু কন্যার পুত্র তাহার দৌহিত্র (যাস্ক, ৩য় অধ্যায়)। তৎপর দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন, পুত্রের জন্মকালে যেসব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান (sacrificial rites) হয় তাহা কন্যার বেলার অনুরূপ। তৎপর গর্ভাধান ক্রিয়ার উৎসবকালে যে সব শাস্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহাও এক। এক প্রকারের শারীরিক অবস্থা দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের জন্ম হয় (১২)। কিন্তু কৌমগত রীতি এই যুক্তি গ্রাহ্য করে নাই; যাস্কের ইহার প্রতিপক্ষে প্রতিবাদ দ্বারা এই বোধগম্য হয় যে, লোকাচারই বরাবর বলবৎ থাকে।

বৈদিক যুগের প্রথমাবস্থায় স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠনের কথা পাওয়া যায় না। মদ্‌গলানী পত্নী সশস্ত্রে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার গোধন উদ্ধার

১২। The Nirghanta and the Nirukta of Yaska—tr. by L. Sarup, Pp. 229.

করিয়াছিলেন ; জনকের সভায় গার্গী সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের তর্ক ও আলোচনা করিতেছেন ; যজ্ঞস্থলে রাজমহিষীরা আসিয়া যোগদান করিতেছেন, ইত্যাদি সংবাদ জানা যায়। মায়ার বলেন, প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় রমণীগণ যে অবগুণ্ঠন ও অবরোধে থাকিতেন না তাহা পরিষ্কার দেখা যায় (১৩)। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত নাটকগুলি হিন্দুর সামন্তযুগে লেখা হয়, সেইজন্য রাজার বহুপত্নী, সহস্রাধিক কামপত্নী, তজ্জন্য রাজাবরোধ ও তাহা পাহারা দিবার নিমিত্ত প্রহরী, কঞ্চুকী (সৌরিদল্ল), নপুংসক ইত্যাদির অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহা সম্রাট ও সামন্ত রাজাদের ঘরের কথা। কিন্তু বর্ত্তমানের অবগুণ্ঠন বা অবরোধ প্রথা, মায়ারই স্বীকার করিতেছেন, মুসলমান বিজয়ের পর আবির্ভূত হয় (১৪)। দক্ষিণ ভারত বা ভারতের যে সব প্রদেশ মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয় নাই, সেই সকল দেশের স্ত্রীলোকের এই সকল বিষয়ের প্রথার সহিত তুলনা করিলেই আসল তথ্য প্রকাশ পাইবে।

কিন্তু আইনতঃ স্ত্রীলোক তৈজসপত্রের ন্যায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়ায় তাহাকে যে সব কদাচারের ভাগী হইতে হইত ইউরোপীয় জাতির স্ত্রীলোকদেরও প্রাচীনকালে সে সব বিষয়ের ভাগী হইতে হইত। মায়ার বলেন, রাজা মাদ্রশ্বন প্রিয়তমা পত্নীকে বশিষ্ঠকে দান করিতেছেন (ঋক্ ১২।২৩৪।১২, ১৩।১৩৭।১৮) এবং অতিথিকে স্ত্রীলোক উপহারের উদাহরণও সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। যুদ্ধে শত্রুদের স্ত্রীগণকে কয়েদ করা (মনু, ৭, ৯৬) ও এক ধার্ম্মিক সবরকে যুবতী বিধবা প্রদান করার কথাও (মহাভারত, ১৩।১৬৮।৩৩) তিনি উল্লেখ করিয়াছেন (১৫)। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন দেশেও এই রীতি ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকদের নিকট সংবাদ পাওয়া যায়। রোমের বড় পিউরিটান কেটো (Cato) তাঁহার বন্ধুকে নিজের স্ত্রী উপঢৌকন দিতে কিছু অন্যায় মনে করেন নাই। পশ্চিম এশিয়ার লিবেসন পর্ব্বতের আরবভাষী জাতিদের মধ্যেও এই প্রথা আছে বলিয়া পর্য্যটকেরা বলেন (১৬)। আটাইশ বৎসর পূর্ব্বে লেখকের জনৈক রুশ সহপাঠী বলিয়াছিলেন, রুশদেশের

১৩। Meyer—Op. cit., Pp. 447—448.

১৪-১৫। Meyer—Op. cit. P. 512.

১৬। Burton's Travels.

উক্রেইন কৃষকদের মধ্যে আহারান্তে অতিথিকে রাত্রিতে নিজের স্ত্রীকেও উপঢৌকন দেওয়ার প্রথা আছে। কোনও ভারতীয় পর্য্যটক শুনিয়াছেন, দক্ষিণ-জার্ম্মাণীর ব্যাভেরিয়ার কৃষকদের মধ্যে "গুরু প্রসাদী" বা "গুরু-গাঁই" (Lex Primus Noctis—the right of first night) অনুযায়ী পুরোহিত বা জমিদারের নিকট স্ত্রীকে তাহার বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রি যাপন প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। শেষোক্ত অনুষ্ঠানটি ফ্রান্সের বিপ্লব কাল পর্য্যন্ত সেই দেশে প্রচলিত ছিল (১৭)। তবে একথা সত্য, যে ভারতে 'গুরুপ্রসাদী' প্রথা এখনও অপ্রচলিত ও অজ্ঞাত নহে। ইহা এই দেশের ধর্ম্ম ও সামন্ততন্ত্রের সহিত বিজড়িত হইয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে চলিয়াছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে চলিতেছে। *

এই সব প্রথা ধর্ম্মের ও অর্থনীতিক সামাজিক ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান (institution) সভ্যতার উন্নতি ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও পরিবর্ত্তিত হইলে অন্তর্হিত হয়। এই সব প্রথা কেবল ভারতেই আছে বা ছিল বলিয়া কটাক্ষপাত করা কেবল জাতিগত কুসংস্কার প্রদর্শন করা হয়।

মায়ার ভারতীয় প্রাচীন স্ত্রীলোকদের বিষয়ে আরেকটি আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মহাভারতে বর্ণিত তৎকালীন স্ত্রীলোকেরা দৃঢ়চেতা ছিলেন। তিনি বলেন, প্রাচ্য সাহিত্যে পুরুষের তুলনায় দৃঢ় মন এবং অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ও কামযুক্ত স্ত্রীলোকের নজির পাওয়া যায়। প্রেমালাপের সময়ই এই সব লক্ষণ ধরা পড়ে। তিনি বলেন, প্রাচ্যের অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সম্পর্কিত গল্পেও এই সব লক্ষণ দৃষ্ট হয় ; ইহা হয় ভারত হইতে, না হয় তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সেই সব দেশে আসিয়াছে। আর মধ্যযুগীয় ফরাসী সাহিত্যে ইহা নিশ্চয়ই আসিয়াছে। এই প্রকারের স্ত্রীলোক ক্রিয়াশীল (active), পুরুষ ক্রিয়াহীন (passive) ; তাহার প্রিয়াই তাহাকে সুখী করে এবং ভারতে

১৭-১৮। এই প্রথা সম্পর্কে Westermarck, "History of Human Marriage" এবং Alison, "History of Europe", Vol. V দ্রষ্টব্য।

* এই সংবাদ আজকালকার মার্জ্জিত রুচির ভদ্র লেখকেরা গোপন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, বাঙ্গলার মেদিনীপুর, সিংভূম ও ভারতের অন্যান্য স্থানে এই প্রথা এখনও কৃষকদের মধ্যে আছে।

তাহার কাছে প্রিয়াই অভিসার করিতে আসে। তুর্গেনিয়েভ, পুস্কিন্ এবং অন্যান্য লেখকের মধ্যেও ইহা প্রতিভাত হয়। আবার ফরাসী সাহিত্য হইতে এই ভাবটি মধ্যযুগীয় জার্ম্মাণ সাহিত্যে আসিয়াছে (১৯)।

সত্য বটে, ভারতীয় স্ত্রীলোক প্রেমালাপকালে খুবই active এবং aggressive রূপে সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাও সত্য যে, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বৈষ্ণব পদাবলী পর্য্যন্ত ভারতীয় বা হিন্দু সাহিত্যে "স্ত্রীলোক অভিসার করিতে যাইতেছে" এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানদাসের শ্রীমতী বলিতেছেন, "যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে, যেথানে নিঠুর হরি।" সত্য বটে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যে আজকালকার ইউরোপীয় সাহিত্যে বর্ণিত coyish নায়িকা পাওয়া যায় না; কিন্তু তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোক অপেক্ষা ভারতীয় রমণীগণ অধিক কামুকা। বরং বলা যাইতে পারে যে, যে-কারণে ভারতীয় সাহিত্যের অনুকরণে প্রাচ্য ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের সাহিত্যে নায়িকারা active ও aggressive বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন তদ্রূপই ভারতীয় এক সাহিত্যের লেখককে অনুকরণ করিয়া আর একজন লেখক তাঁহার নায়িকাকে চিত্রিত করিয়াছেন। এই কারণেই ভারতীয় কবিদের নায়িকারা অভিসার করিতে বহির্গত হইতেন। ইহা সমাজতাত্ত্বিক "অনুকরণ" (imitation) (২০) তথ্যানুসারেই সংঘটিত হইয়াছে। ইউরোপীয় সমালোচকদের মতানুসারে, ইহা ভারতীয় মূলজাতিগত লক্ষণ (racial characteristic) না হইয়া সাহিত্যিকের অনুকরণ প্রবৃত্তি দ্বারাই নায়িকা এইভাবে বিচিত্রিতা হইয়াছেন বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯। J. J. Meyer,—Op-cit. Vol. II, Pp. 437-438.

২০। Tarde—'Imitation'.

লক্ষ্মীছাড়ী

(৪)

গাঁয়ের মোড়লরা দেখলে চাঁপা বড় দজ্জাল মেয়ে। বাগ্ মানে না কিছুতেই। অথচ ওর বয়েস বাড়চে যেন রোজ রোজ। ছুঁড়িটার মুখখানাও সুন্দর। রঙটাও গোরা। শরীরেরও তেমনি আঁটসাঁট্ বাঁধুনি। কবে কোথায় গিয়ে কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে থাকবে, তখন তার ম্যাও সাম্‌লাবে কে? তার ওপর ওদের দেখাশোনার সব ভারই যখন ওরা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েচে। বিশেষ করে এইসব দেখে শুনে চুপ করে তো থাকা যায় না। উপায় যাহোক করতে হবে। অর্থাৎ বিয়ে দেওয়া।

সবাই মাথা চুলকোতে লাগল। আর চুপ করে রইল। কারণ, খরচ আছে। শুধু তামাকের ধোঁয়া জমে উঠল আর হুকোর খোলের ভেতর থেকে গুড় গুড় করে একটানা শব্দ উঠ্‌তে লাগল। বিশেষ কথাবার্ত্তা হবার কথা নয়। খানিক চলল চোখ টেপাটেপি। কারণ চক্ষুলজ্জা ছিল। তারপর হুঁ হ্যাঁ আর ইসারা। তাতেই সবাই খুসী। সকলেই বুঝল, রেহাই পাওয়া নিয়ে কথা।

অতগুলো লোকের ঐকান্তিক চেষ্টা মিথ্যে হবে কি করে। বুড়ো বর একটা জুটল। কাঁচা বয়সের ছেলের খোঁজ ওরা করেই নি, কারণ, তাতে খরচা আছে।

বরপক্ষ মেয়ে দেখতে এল। চাঁপা হঠাৎ শুনলে তার বে। ওর মনে মনে ভারি একটা পুলক লাগল। কেবলই লজ্জা করতে লাগল। ওর কত কি মনে আসতে লাগল। যেন রূপকথার হাট লেগেচে ওর মনে মনে। সে হাট যতই ওর মনে জমাট বেঁধে বসতে চায়, ততবারই পাড়ার বৌঝি গিন্নিদের টানা হ্যাঁচড়ার রূপোর কাঠির ছোঁয়া লেগে ভেঙে ভেঙে যায়। ও কত কি ভাবে, অথচ কিছুতেই কারো কূল খুঁজে পায় না। কি যেন মিষ্টি মিষ্টি ভাবনা। অথচ ধরা ছোঁয়া নেই। কোথায় সব ভেসে ভেসে ভেঙে ভেঙে মিলিয়ে যেতে থাকে। আবার নতুন করে দল বেঁধে একটার পর একটা আসে। বসে বসে সে সবটুকু ভাববার, জানবার সময়

পেলে না। সবাই মিলে ওকে ধরে সাজিমাটি ঘষে, সরময়দা মাখিয়ে চক-চকে করে তুলল। তারপরে সেই গোছা গোছা কালো চুলে মাথার ওপর জল দিয়ে ঝেঁপে টেনে এনে পাতা কেটে দিলে। বিনুনী করে দিলে। আর পরালে পাড়ার কোন বৌয়ের ইঁদুরেকাটা একখানা লাল চেলি। কেউ কিন্তু তাগা বালা হার খুলে দিলে না। শুধু কাঁচের গাছ কয়েক চুড়ি আর রুলি ওর দুহাতে গলিয়ে দিলে। তাতেই অমন সুন্দর হাত দুখানা জ্বলজ্বল করে উঠল। চাঁপা সেইদিকে চেয়ে রইল শুধু।

মেয়ে দেখে অপছন্দ হবার কিছু ছিল না। বরপক্ষ তখুনি ধান দুব্বো দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে গেল। দেনা পাওনার কথা সবই ঠিক ঠাক হয়ে গেল। শুধু পাত্রীর বোনটীকেও খোরপোষের জন্য নিতে বরমশাইকে রাজি করান গেল না। মোড়লেরা ভেবেছিল, এই সঙ্গে ঘ্যাঙাটাকেও বিদেয় করতে পারলে মন্দ হবে না। কিন্তু ওদের এ চাল ব্যর্থ হল। ওরা মাথা চুলকে পরস্পর বলাবলি করলে, যাক্, ঐ একটাই এখন পার হোক। ওটাকে পরে যা হয় করা যাবে।

সন্ধ্যেরাতে বর এল। সঙ্গে পুরুত আর দুজন বরযাত্রী। তাদের চিড়ে দৈ আর বাটা চিনি দিয়ে পরিতোষ করে ভোজন করান হল। উলু উলু করে চাঁপার বে হয়ে গেল সাঁঝরাতেই। অতবড় দুর্দ্দান্ত মুখোড় মেয়ে চাঁপা যেন কি হয়ে গেল এই কদিনে। সে একেবারে চুপ। কি যে ভাবে, তা বোধ হয় নিজেও জানে না। সবটা সে যে বুঝতে পারচে না, মাথায় ঢুকচে না—এও বোধ হয় ও বুঝতে ও জানতে পারলে না। এমনি করে ও একেবারে চুপ হয়ে গেল।

বর গিয়ে উঠল পাল্কীতে। তা, বয়েসটা ঘাটের ওপর। তাই সময় সময় একটু হাঁফ ধরে। পাল্কীর ভেতর তাকে লম্বা হয়ে শুতে হল। কাজেই আর একটা ডুলির বন্দোবস্ত না করে উপায় রইল না।

কাপড়ের ঘেরাটোপের মধ্যে চাঁপা গিয়ে উঠল। তখনো তেমনি উদাস মন তার। হঠাৎ তার মনে সাড়া জাগল, টগরের কান্নায়। সে দৌড়ে দিদির কাছে চলে আসতে চায়। কাঁদতে লাগল মেয়েটা, ও দিদি ভাইরে, আমিও যাবো। পাড়ার গিন্নীরা গাল পাড়তে লাগল। আ মর, হারামজাদি।

দিদি যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ী, ছুঁড়ি কেঁদেই মলো! দিদির কাছে আসতেও দিলে না। জোর করে ধরে রাখলে। ডুকরে ডুকরে টগর কাঁদতে লাগল। চাঁপা হাতছানি দিয়ে ডাকল। টগর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল ওর বুকের ওপর। চাঁপা কিছু বলতে পারল না। শুধু টপটপ করে জল পড়ল টগরের মাথার ওপর।

দেরি হচ্ছে, শুভলগ্ন বয়ে যায়। পুরুত ঠাকুর তাড়া লাগাল। ওরা টগরকে ওর বুক থেকে ছিনিয়ে নিলে। ব্যায়রা ডুলি কাঁধে তুলে নিলে। বরযাত্রী দু'জন আর পুরুত ঠাকুর চাদরে কোমর সেঁটে বাঁধলে। তারপর ছাতামাথায় চটি হাতে ওরা ক'জন বর-বৌয়ের সঙ্গে ট্যাঙ ট্যাঙ করে চলতে লাগল। টগর বুক ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল, ও দিদি ভাইরে। বেদনামাখা হয়ে চাঁপার মুখখানা ডুলির ফাঁক দিয়ে ফুটে রইল শুধু।

* * *

(৫)

ছ'টা মাসও কাটল না। চাঁপা একদিন ভরদুপুরে ডুলি চড়ে এসে হাজির। ঠিক দুপুরে চাঁপাকে এইভাবে হাজির হতে দেখে গাঁয়ের বৌঝিরা মনে মনে শিউরে উঠল। আহা। সে সোনার চাঁপা আর নেই। কোথায় গেল সেই ডগ্‌ডগে সিঁদুর টিপ। কোথায় বা তার সেই লম্বা লম্বা পা ফেলার তেজী হাঁটুনি। মুখের ভাবই যেন বদলে গেছে। অমন পুরন্তো মুখখানা লম্বাপানা হয়ে গেছে। কেমন যেন কঠিন। গায়ের সাদা থানখানা যেন কি করে ওর গায়ে নেপটে রয়েছে। লম্বা হাত দুখানা সরু দেখাচ্চে। মুখে নেই সে তেজ। ম্লান রঙের একটা পোঁছ ধরেচে। ও যেন কি হয়ে গেছে। চুপ চাপ। যেন চাঁপার বয়েস বেড়েচে।

চাঁপা এক ফোঁটাও কাঁদলে না। মেয়েরা ভাবতে লাগল তারাই শুরু করবে কিনা। চাঁপা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলে, পিসি, আমার টগরমণি? আকাশ ফুঁড়ে এইবার উঠল কান্নার রোল।

চাঁপা চমকে উঠল। বুকের ভেতরটা ওর ধড়াস করে উঠল। ও নাড়া দিয়ে বলল, পিসি, পরে কেঁদো। আগে বল শুনি। চাঁপার তেমনি কঠিন মুখখানা।

পিসি মায়াকান্নায় গোঙাতে গোঙাতে বললে, সেই সন্ধ্যেবেলা থেকে বাছা কান্না সুরু করল। মুখে শুধু, ও দিদি, দিদিরে। তারপর আর কি মা। তেরাত্তির কাটলো না। কত কোবরেজ টোট্‌কাটাট্‌কি।

চাঁপার সমস্ত বুক ভেঙে তোলপাড় করে রুদ্ধশ্বাস ছাপিয়ে বেরিয়ে এল। ছোট্টো একটু ওঃ—। আর দুফোঁটা জল। সে দুটো বিন্দু টল্‌মল করতে লাগল চোখের কোলে।

চাঁপার এই পাষাণী মুখ দেখে ওরা সবাই ঘাবড়ে গেল। যাহোক কিছু যে চাঁপাকে বলা উচিত তা বুঝল। কিন্তু কারুরই গলা দিয়ে শব্দ বেরলো না।

মূঢ়ের মত একটুখানি বসে থেকে চাঁপা নীরবে গিয়ে উঠল সেই ডুলিতে।

ওর বুড়ো বর মরলো যে তার ব্যথা ওর তত লাগেনি। কারণ সে বুড়োর মুখে মুখে গাড়ু-গামছা, হুঁকো কলকে ছাতা লাঠি যুগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও দিক থেকে চাঁপা তাকে চিনতো না। কিন্তু টগরের এই ঘা ওকে রীতিমত দাগা দিলে। চাঁপা যখন শ্বশুরঘর করতে এল, টগরকে সবাই তখন ছিনিয়ে রেখেছিল। সেই কষ্ট ওকে বেজেচে। কিন্তু ওর সেই টগরমণি যে আর নেই, একথা ও ভাবতে পারলে না। দিনের পর দিন শুধু বুকফাটা গুম-রুনির কান্না কাঁদলে।

ওর সতীনপো সংসারের কর্ত্তা। চাঁপার চেয়ে বয়েসে সে প্রায় ডবল বেশী। চাঁপাকে মা বলে ডাকতে তার বাধতো। তাই প্রথম থেকেই সে ভারিক্কির চালে বলে এসেচে—ছোটগিন্নি।

সে যাক্। চাঁপাকে এত শিগ্‌গীর বাপের বাড়ী থেকে ফিরতে দেখে আর পড়ে পড়ে কাঁদতে দেখে নতুন কর্ত্তা ভেবেছিল ওটা মেয়েলি স্বভাব। দুদিন গেলেই সব থামবে। এই ভেবে ও চুপ করেছিল। কিন্তু ক্রমেই যখন দেখলে ছোটগিন্নিকে জোর করে খাওয়াতে হয়, নৈলে উপোস দেয়। তখন ও আর চুপ করে থাকতে পারলে না।

ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে চাঁপা ফোঁপাচ্ছে। মাথার রাশ কালো চুল আঁধারের মত বিছানো রয়েছে। ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে সতীনপোর মুখ দিয়ে হঠাৎ আর কিছু বেরল না। ও থমকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ডাকলে, ছোটগিন্নি।

চাঁপা চম্‌কে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে বসে হাঁটুতে মুখ গুঁজে রইল। চোখ থেকে নিঃশব্দে জল বেয়ে বেয়ে ঝরতে লাগল শুধু। লোকটা গ্রামের মেয়েদের শোক ঢের দেখেচে। কিন্তু ঠিক এমনি ধারাটা যেন আর কখনো নজরে পড়ে নি। এই ধরণটা ওকে ঘা দিল।

ও ধীরে ধীরে চাঁপার কাছে বসে জিগ্যেস করল, বাড়ীর খবর সব ভাল তো?

চাঁপা একেবারে ভেঙে পড়ল। হঠাৎ যেন তাতে ভীষণ একটা নাড়া লাগল ওর মনে

দিনের পর দিন আসে আর যায়। চাঁপার দিনও কোথা দিয়ে ঠেলেঠুলে চলে যায়

সতীনপো-বৌ চাঁপার চেয়ে বছর কয়েকের বড়। তিন ছেলের মা। পাকা গিন্নি। সে নিজে খাটার চেয়ে পরকে খাটিয়ে নিতে জানে। কাজেই গের-স্থালির যত কিছু কাজ, এই মনে কর, ধান ঝাড়া, চাল বাছা, ঘর-দোর নিকনো, কাঠকুঠো হাতড়ে আনা, দুটো-বা শাক সবজীর বাগান করা। এই আর কি। সবই সে ঠিক চাঁপাকে দিয়ে করিয়ে নিত। চাঁপা অতশতো বুঝত না। সংসারে খাটতে হয়, তা নৈলে চলে না। এই ও মোটামুটি জানত। তাছাড়া কাজে ও কোনদিন আল্‌গা নয়। ও-ই যে বাড়ির সত্যি-কার গিন্নী। রীতিমত একটা পদ তার আছে। ওকে কেউ খাটিয়ে নিচ্চে, অতশতো বোঝবার মত পাকা মন ওর হয় নি। তাছাড়া গিন্নী হবার লোভ ওর একেবারেই ছিল না। সে যাই হোক। কাজের মধ্যেই ও কিন্তু নিজেকে আর খুঁজে পেল না। ও যেন কোথায় কোথায় হারিয়ে রইল।

গরুর খোঁটাটা বাঁশের খেঁটের ঘায়ে মাটিতে পুঁতে চাঁপা গরুটার কাছে এগিয়ে আসে। তার গলায় মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, হ্যাঁ মা ভগবতী, বল না মা, কেন আমার টগরমণিকে নিয়ে নিলি। কোথায় সে গেল। কত কাঁদচে বল্ দিকি দিদি দিদি বলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে।

গরুটা কাল পাথরের মত চকচকে ঘন গভীর চোখ দুটো তুলে চাঁপার দিকে চেয়ে থাকে। কে জানে মানুষের চোখের জল ও বোঝে কিনা। কিন্তু ঐটুকুন

চেয়ে থাকার পর গরুটা মুখখানা উঁচু করে চাঁপার মাথার চুলে ঠেকিয়ে চুপ করে রইল। চাঁপা দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরল।

সব্জীর ক্ষেতে জল দিতে গিয়ে চাঁপা ওই কদমতলার সরু পথটার পানে ফিরে ফিরে চাইবে। ওর বিশ্বাস, টগর ওকে ছেড়ে কখনই থাকতে পারবে না। আসবেই একদিন। তাই ওই দিকে চেয়ে ও ভাবে।

কদমতলার সরু পথটা এঁকেবেঁকে চণ্ডীঠাকুরের বাড়ির কানাচ ঘুরে গোঁসাইদের বাঁশবাগানের ভেতর দিয়ে রথতলায় গিয়ে পড়ে। সেখান থেকে সোজা গেছে মুনকুঠির হাঠ। তারপর আর দু-কদম গেলেই তো কুমীরখালি। খেয়া পার হলেই ওপারে প্রকাণ্ড গঞ্জ। সেখানে সব দেশের লোক জমা হয়। তাদের কারুর না কারুর হাত ধরে, কোলে চড়ে, টগর যে একদিন হঠাৎ এসে, দিদিরে বলে ডেকে উঠবে, এই ও মনে মনে ভেবে রেখেছে।

পুকুর থেকে কলসীটা ভরে নিয়ে আসতে আসতে চাঁপা বারে বারে অনর্থক কদমতলার শূন্য পথটার পানে চায়। এ ওর নিত্যিকার আশা।

ক্ষেতে জল দিতে দিতে ও যেন হঠাৎ দেখতে পায় ঠিক টগরের মতন ছোট্টো কে কদমতলা দিয়ে টিপিটিপি আসচে। কলসীটা ভুঁয়ে নামিয়ে রেখে ও একটুখানি এগিয়ে আসে। নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করতে করতে শেষে দেখে চণ্ডীঠাকুরের মেয়ে কুন্‌কী, ঘটী গামছা নিয়ে নাইতে আসচে।

একদিন দুপুরে, সতীনপো-বৌ আর চাঁপা খেতে বসেচে। তার সঙ্গে আজে বাজে টুকরোটাকরা গল্প চলচে। এমন সময়ে হঠাৎ বাইরের রাস্তা থেকে কচি গলায় একটা কান্না উঠল, ও দিদিরে—। চাঁপা ভাত ফেলে দৌড়।

বৌ তো অবাক। ছোট ছেলেপিলে ঝগড়া মারামারি করে অমন কান্না-কাটি করেই থাকে। তাই বলে ভাত ফেলে ঠিক দুপুরবেলা দৌড়ে পথে বেরতে হবে, এমনতর কথা বৌ তো বাপের জন্মে শোনে নি।

ভাতের থালা কোলে নিয়ে একলা বসে বৌ ভাবতে লাগল। সৎমাই হোক, আর যাই হোক, ওর মনটা বড্ড নরম।

কিন্তু চাঁপা চোখে আঁচল চেপে কাঁদতে কাঁদতে যখন বাড়ি ঢুকল বৌ তো ভয়ে একেবারে কাঠ। চাঁপাকে একটা ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি ছোটগিন্নি? অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

চাঁপা ছোট ছেলের মত ফুলে ফুলে উঠে কোনক্রমে বললে, ও চণ্ডী-ঠাকুরের মেয়ে কুন্‌কী। আমি ভেবেছিলাম, বুঝি টগর।

বৌয়ের ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। চোখ কপালে তুলে বৌ বললে, তোমার ও সব ন্যাকরা রাখো বাপু। ঠিক দুপুরবেলা বাড়া ভাতে শত্তুর বাড়িয়ে মরাকান্নায় আর অমঙ্গল ডাকতে হবে না। নাও, দুটো মুখে তুলতে দাও। বাধ্য ছোটো মেয়েটির মত চাঁপা কান্না গিল্‌তে গিল্‌তে ভাতের কাছে ঘাড় গুঁজে বসল।

(৭)

কথাটা নিয়ে চাঁপার সতীনপো অনেক ভাবলে। শেষে একদিন ওর বছর তিনেকের বড় ছেলে শশীকে ডেকে বললে, হ্যাখ্, ঐ ছোটগিন্নি আমার মা। তোর ঠাক্‌মা হয়। তুই দিদি বলে ডাকবি, বুঝলি? শশী অতশত জানত না। বাপ মায়ে ছোটগিন্নি বলে। শুনে শুনে তাই বলে এসেচে। আজ নতুন নামে ডাকতে পাওয়ার লোভ শশীকে পেয়ে বসল। ও তখুনি এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ওর নতুন দিদির খোঁজে। শোবার ঘর, রান্নাঘর গোয়ালঘর কোথাও পেলে না। শেষে খিড়কির দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবচে পুকুর ঘাটটা একবার ঘুরে আসবে কিনা। কিন্তু সন্ধ্যের অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। তাই আর সাহস হল না।

চাঁপা কাপড় কেচে এক ঘড়া জল নিয়ে তাড়াতাড়ি আসচে। ভাত চড়াতে হবে। খিড়কির দোরে ঢুকেই পেছনে মিষ্টিগলার জড়ানো ছোট্টো একটুখানি ডাক শুনলে। ও দিদি!

চমকে উঠে চাঁপা দরজাটা ধরে ফেল্‌লে। দেখলে শশী গদগদ হয়ে হাসি হাসি মুখে। মুখখানা একেবারে কাদাপানা করে শশী চোরের মতন চুপি চুপি দাঁড়িয়ে রয়েচে। চাঁপা সেইখানেই ঘড়াটা নাবিয়ে রেখে শশীকে বুকের ভেতর চেপে নিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

শশীকে ও পেলে। এতদিনে চাঁপার মনের শান্তি ফিরে এলো। যেন অনেকদিনকার মরা-চাঁপা, আজকে হঠাৎ শশীর ডাকের পরশে বেঁচে উঠ্‌লো।

চাঁপা বলে, শশী, চট্‌পট্ খেয়ে নে। দেখি কোথায় কামরাঙা পাকে। শশী বলে, দিদি, বকুল ফল ভারি কষা। গলা আট্‌কে যায়। শশীকে কোলে নিয়ে হাত দুলিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে চাঁপা এই অচেনা গাঁয়ে করমচা কামরাঙা বোঁচ্‌ তেঁতুল আমরুল আমলকী খুঁজতে বেরোয়। শশীর সঙ্গে অনর্গল কথা কয়। গল্প বলে।

কিন্তু চাঁপার চলনে আর সে ভঙ্গিমা নেই, আছে ভাঙন। হাত দুলোনোয় সে সৌষ্ঠব নেই, আছে খানিকটা শুধু নিছক দোলা। ফল খুঁজতে বেরোনোয় সে বন্য আগ্রহ নেই, আছে চেষ্টা। ওর ঘাড় দুলোনোয় সে লীলা নেই। যেন ঝিমিয়ে গেচে। চাঁপা ফিরল। সব যেন ওর ভেঙে চুরে গেচে। এই জোড়াতাড়া দেওয়া চাঁপা শশীকে বুকে তুলে নিয়ে আবার জাগল।

সতীনপো তার বৌকে চুপি চুপি ডেকে বললে, দেখলি, ঠিক ধরেচি।

বৌ নীরবে ভাবতে থাকে ওর সৎ-শাশুড়ীর কথা, চাঁপা মেয়ের কথা, আর তার নরম মনের গভীর ব্যথা।

(ক্রমশঃ)

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

তিনটি অচলিত রবীন্দ্র-রচনা

রবীন্দ্রনাথের তিনটি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এই তিনটি রচনাই প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র অচলিত সংগ্রহের ২য় খণ্ডে।

মন্ত্রি অভিষেক

আলোচ্য প্রবন্ধটি ঠিক প্রবন্ধ নয়, এটি একটি বক্তৃতার প্রবন্ধে রূপান্তর। প্রবন্ধটি 'ভারতী ও বালক' নামের মাসিক পত্রিকায় ১২৯৭ সনের বৈশাখ-সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে বেরোয় ২রা জ্যৈষ্ঠ যখন কবির বয়স ২৯ বছর এবং কন্‌গ্রেস সবে পাঁচ বছরে পা দিয়েছে। "এমারল্ড নাট্যশালায় লর্ড ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ উপলক্ষে যে বিরাট সভা আহুত হয় এই প্রবন্ধ সেই সভাস্থলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত হয়"। এই প্রবন্ধটি সাহিত্যিক দৃষ্টিতে বিচার করার সময় আমাদের এই গোড়ার কথাটুকু মনে রাখতে হবে যে আসলে এটি জনসভায় পড়া একটি বক্তৃতা। বক্তৃতা আর প্রবন্ধে অনেক তফাৎ। বক্তৃতা, বিশেষতঃ এই রকম রাজনৈতিক, সমসাময়িক সমস্যাঘটিত বিষয় নিয়ে উত্তেজিত, অনেকসময় অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা যখন সমস্ত আবহাওয়াটাই ভাবাবেগে থম থম করছে হচ্ছে এক কথা, আর ভাল করে ধীর মস্তিষ্কে সমস্ত দিক গুছিয়ে শিক্ষিত, ভদ্র পাঠকের সামনে হাজির করা হচ্ছে অন্য জিনিষ। আমরা এখনকার পাঠকেরা এমারল্ড থিয়েটারের সেই জনসভায় উপস্থিত ছিলাম না, আমাদের কাছে 'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধরূপেই প্রথম দেখা দিয়েছে, কাজেই তার প্রাবন্ধিক রূপই আমাদের বিচার্য। বিশেষতঃ কবির প্রথম চিন্তাশীল রাজনৈতিক প্রবন্ধ হিসেবে এর একটা স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে।

সমগ্রভাবে বিচার করলে মন্ত্রি অভিষেকের যুক্তিপ্রধান দিকটাই প্রথমে নজরে পড়ে। তা বলে এই নয় যে কবি তাঁর বক্তব্য (অর্থাৎ বড়লাটের মন্ত্রণা-পরিষদে ভারতীয় সদস্য নিয়োগের প্রশ্নে মনোনয়নের বিরুদ্ধে যে আপত্তি। কবি এঁদের নির্বাচনের কথা বলেছেন) কয়েকটি নীরস যুক্তি পর পর সাজিয়ে সমর্থন করেছেন। কবির এই প্রবন্ধ যুক্তিপ্রধান হলেও ভাবাবেগ রহিত

নয়। কবির প্রবন্ধে আবেগ (emotion) আছে কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে। একথা তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনে সন্তোষ আর গরজ—আমাদের এই দুটি হৃদয়বৃত্তির অবতারণা থেকেই পরিস্ফুট। পরাধীন জাতির প্রতিনিধি শাসকের কাছে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা উপস্থিত করার জন্যে হৃদয়বৃত্তির দোহাই দিয়েছেন। এখনকার সময়ে এই ভাবাবেগ হাস্যকর। অবশ্য সে যুগে কন্‌গ্রেসের শৈশবে, মহারাণীর রাজত্বকালে, ইংরেজের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর আমাদের ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যখন অটল, যখন ইংরেজ শাসনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র-ভাবে স্বাধীন হবার চিন্তা কেউ করতেন না, ব্রিটিশ শাসনের সুশীতল ছায়ায় আরামে দিন কাটাতে পারলেই মোক্ষ লাভ হবে আমরা মনে করতুম, সে দৃষ্টিতে বিচার করলে কবির এই ভাবাবেগে আশ্চর্য হই না। তখনকার কন্‌গ্রেস "ইংরেজের নিকট উপকার প্রত্যাশা করে" (পৃঃ ১৬৯) (১)। কবি-রহস্য করে বলেছেন যে এই বাক্যবাগীশ কন্‌গ্রেসের কথায় গবর্ণমেণ্টের বিচলিত হবার কি আছে (পৃঃ ১৭০-৭১)। তখনকার লোকের ইংরেজের ওপর কি অগাধ বিশ্বাস, নীচের উদ্ধৃতিগুলি পড়লেই তা স্পষ্ট হবে। "কিন্তু নিজের স্বার্থকেই যদি ইংরেজ ভারত শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য করিতেন তবে আমাদের এমন দুর্দশা হইত যে ক্রন্দন করিবারও অবসর থাকিত না।.....এ পর্যন্ত কখনো কখনো দৈববশতঃ দুর্ঘটনাক্রমে উক্ত মর্মঘাতী চর্ম খণ্ডের তাড়সে আমাদের জীর্ণ প্লীহা বিদীর্ণ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু আমাদের শীর্ণ আশালতা ক্রমশঃ সজীব হইয়া উন্নতি দণ্ড আশ্রয় পূর্বক সফলতা লাভের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার প্রতি আক্রোশ কার্যে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় নাই।" (পৃঃ ১৬৩)। "ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এত বহুল সুফললাভ করিয়াছি যে তাহার নিঃস্বার্থ উপকারিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কৃতঘ্নতা মাত্র" (পৃ ১৬৪)। এই মনোভাব নিয়ে দেখলে কবির ওই ভাবাবেগে আমরা বিস্মিত হই না।

এই প্রবন্ধ রাজনৈতিক হলেও এতে যে সাহিত্যরসাশ্রিত পদ নেই তা নয়। তিনি যেমন অন্য অনেক জায়গায় করেছেন সে রকম এই প্রবন্ধেও ছোট এবং বড়, ক্ষুদ্র ও মহৎ ইংরেজের পার্থক্য খুব সুন্দর করেই বুঝিয়েছেন। "অবশ্যই তোমাদের খাপের মধ্য হইতে যেমন তরবারি মধ্যে মধ্যে মহেন্দ্রের

বজ্রের ন্যায় আপন বিদ্যুৎ আভা প্রকাশ করিয়াছে, তেমনি তোমাদের অন্তরের মধ্যে যে দীপ্ত মনুষ্যত্বের মহিমা বিরাজ করিতেছে তাহাও প্রবল শাসনের মধ্য হইতে মাভৈঃ শব্দে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। নিম্নে ভূমিতলে দ্বারের নিকট যে প্রহরী বন্দুকের উপর সঙীন চড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহার অপ্রসন্ন মুখে নিষেধের ভাব দেখা যায়, কিন্তু যে জ্যোতিষ্মান পুরুষ প্রাসাদের শিখরদেশে দাঁড়াইয়া আছে সে আমাদিগকে অভয়দান করিয়া আহ্বান করিতেছে ;..... এক ইংরাজ আমাদের প্রতি কটমট করিয়া তাকায়। আর এক ইংরাজ উপর হইতে আপন মহত্বের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করে" (পৃঃ ১৬৮)। ১৭১ পাতায় তিনি তখনকার বড় ইংরেজের প্রতিনিধিদের "দরিদ্র জাতির জন্য হিউমের সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন, ইউল ও বেডারবর্নের জ্যোতির্ময় সহৃদয়তা"র উল্লেখ করেছেন।

এ পর্যন্ত প্রবন্ধটির বিশ্লেষণ করা গেল। এবার সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলছি। ১৮৯০ সালে প্রবন্ধটি যে সমস্যাকে (বড়লাটের মন্ত্রণাপরিষদের ভারতীয়করণ) ভিত্তি করে রচিত, ৫৩ বছর পরে, আমরা ইতিমধ্যে স্বাধীন হতে না পারায়, ওইটিই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সমস্যা রয়ে গেছে ; এবং এ বিষয়ে ইদানীং অনেক লেখালেখিও হয়ে গেছে। ঐ প্রবন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। কবির চরিত্রে যে একটি অন্তর্নিহিত সংযম আর শালীনতা-বোধ ছিল আলোচ্য প্রবন্ধের মধ্যে তা পরিস্ফুট। উত্তেজনার মুহূর্ত্তেও তিনি বল্গাত্যাস করেন নি। সমস্ত প্রবন্ধে কোথাও প্রতিপক্ষকে আক্রমণের ভাব নেই। কবি ইংরেজের মহত্বের কাছে মনুষ্যত্বের নামে আবেদন জানিয়েছেন। প্রবন্ধটির প্রকাশভঙ্গী (treatment) সাবজেক্‌টিভ (subjective) ; এবং এখেনেই বঙ্কিমের রাজনৈতিক প্রবন্ধের সঙ্গে কবির রাজনৈতিক প্রবন্ধের পার্থক্য। বঙ্কিমের প্রকাশভঙ্গী অবজেক্‌টিভ (objective)। তুলনায় বঙ্কিমের বিবিধ প্রবন্ধে 'ভারতকলঙ্ক' এবং 'ভারতের স্বাধীনতা পরাধীনতা' দ্রষ্টব্য। এই সব প্রবন্ধে বঙ্কিম ভারতের পরাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তার প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন, ভাবাবেগের সংস্রবহীন তাঁর প্রবন্ধে নীরস যুক্তিগুলি পর পর সাজিয়ে গেছেন। বঙ্কিমের প্রবন্ধে অবান্তর বিষয় আছে, এজন্যে তার আবেদন (appeal) ঘুর পথে

(indirect) ; কিন্তু কবির প্রবন্ধে অবান্তর বিষয় নেই এজন্যে তা সোজাসুজি (directly) আঘাত করে। প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ পাঠকের কাছে তাঁর মনোভাব ব্যাখ্যা করেছেন—" আলোচ্য প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ, অনেক তর্ক, এবং অনেক ইতিহাস আছে। আমি একান্ত সংকোচে তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করি নাই ; অভ্যাস অনুরাগ ও চর্চা অনুসারে রাজনীতি আমার অধিকার বহির্ভূত। রাজনৈতিক প্রসঙ্গও সম্ভবতঃ যুক্তিশাস্ত্রের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়, অর্থাৎ সত্যের নিয়ম হয়ত এখানেও খাটে" (পৃঃ ১৭৮)। কবির এই আদর্শ সামনে রেখে আমি তাঁর প্রবন্ধটি বিচারের চেষ্টা করেছি। সফল হয়েছি কিনা তা পাঠকেরা বলবেন।

ব্রহ্মমন্ত্র, ঔপনিষদ ব্রহ্ম

রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ১৮০—২২০) এই প্রবন্ধ দুটি পর পর প্রথম মুদ্রণের তারিখ অনুসারে সাজান আছে। এদিকে গ্রন্থ পরিচয়ে দেখা যায় যে (পৃঃ ৭১৯) ঔপনিষদ ব্রহ্মের বীজ প্রবন্ধ ব্রহ্মোপনিষদ ১৩০৬ সালের ৭ই মাঘ শান্তিনিকেতনে কবি পড়েন। ব্রহ্মমন্ত্র কবি পড়েন পরের বৎসর ১৩০৭। উপনিষদ ব্রহ্ম প্রথম ছাপা হয় ১৩০৮ সালে। ছাপান তারিখের ওপর অবশ্য আমার বলার কিছুই নেই কিন্তু ব্রহ্মমন্ত্র প্রবন্ধকে যেভাবে উপনিষদ ব্রহ্মের মধ্যে হুবহু পাই তাতে ওকে উপনিষদ ব্রহ্মের একটা সংকলন ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। সেজন্যে মনে হয় উপনিষদ ব্রহ্মের মূল কাঠামো ব্রহ্মমন্ত্রের আগেই নির্দিষ্ট ছিল। কবি কোথাও তাঁর পুরোনো লেখার পুনরাবৃত্তি করেন নি। উপনিষদ ব্রহ্মে করেছেন বলে মনে হয় না। এখন আমরা যে আকারে উপনিষদ ব্রহ্ম প্রবন্ধটি পাচ্ছি সেটি কখনও সেভাবে কোন জনসভায় কবি পড়েছিলেন কিনা গ্রন্থ পরিচয়ে তার উল্লেখ নেই। আলোচনার সুবিধের জন্যে আমি আগে উপনিষদ ব্রহ্ম এবং পরে ব্রহ্মমন্ত্র আলোচনা করে এই প্রবন্ধ দুটির সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিচার করছি।

গোড়াতেই একটি কথা বলে নিচ্ছি। উপনিষদ ব্রহ্ম প্রবন্ধটির ভেতরে ব্রহ্মমন্ত্র প্রবন্ধটি হুবহু কমা, সেমিকোলন শুদ্ধ আছে। উৎসাহী পাঠক ২০১ পৃষ্ঠায় ১৪শ লাইন থেকে ২০৯ পৃষ্ঠার ২২শ লাইন পর্যন্ত, এবং ২১৫ পৃষ্ঠার

১৩শ লাইন থেকে ২১৭ পৃষ্ঠার ২৮শ লাইন পর্যন্ত মিলিয়ে দেখলেই আমার কথা বুঝতে পারবেন। শেষ লাইনটি দু' প্রবন্ধেই এক। এ থেকে মনে হয় কবি প্রথমে উপনিষদ ব্রহ্ম প্রবন্ধটি রচনা করেন (ছাপার তারিখ বিচার করছি না) এবং পরে তা থেকে বেছে বেছে ব্রহ্মমন্ত্র প্রবন্ধটি সঙ্কলন করেন। এটি উপনিষদ ব্রহ্মের একটি রসগ্রাহী সংকলন ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাহিত্য রসের দিক থেকে ব্রহ্মমন্ত্রের সুর অনেক উচ্চ গ্রামে বাঁধা। সমস্ত প্রবন্ধটি একটি গান বা কবিতার মতন ঝরঝর করে পড়া যায়। কোথাও বুঝিয়ে বলব, ব্যাখ্যা করব এই মনোভাব বা মাষ্টারী ভঙ্গী নেই ; কবি আমাদের জেরা করতে করতে এগোননি, দেশের লোকের ধর্মভাবকে জরীপ করার চেষ্টা নেই—এক কথায় ব্রহ্মের উপলব্ধিতে একটি আবেগোজ্জ্বল, কবিচিত্তের প্রকাশে আমরা রসসিক্ত হয়ে উঠি। এই জন্যেই বলছিলাম যে ব্রহ্ম মন্ত্র প্রবন্ধটি পরে সংকলিত বলে মনে হয়।

এ কথার পর উপনিষদ ব্রহ্মের আলোচনাই আগে করা দরকার। এই প্রবন্ধটির প্রথমেই দেখি যে এটি একটি বক্তৃতা, (কবে দেওয়া হয়েছে তা জানি না) এবং বক্তৃতা আর প্রবন্ধে যে কোথায় তফাৎ তা মন্ত্রি অভিষেকের আলোচনায় বলেছি, এবং এই পার্থক্য ঠিক কতটা গভীর তা উপনিষদ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মমন্ত্র পড়লেই বোঝা যাবে। প্রথমেই মনে হয় কবি যেন সমবেত ভদ্রলোকদের জেরা করছেন। আমরা কি ব্রহ্মকে জেনেছি ? যাঁরা জেনেছেন সেই সব ঋষিদের কথা কি আমরা অবিশ্বাস করব ? ভঙ্গীটা যেন কোন কাল্পনিক প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে কবি তাঁকে—সত্যং, জ্ঞানং, অনন্তং এক এক করে ব্রহ্মের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন। বক্তৃতায় ব্যাখ্যা না করলে চলে না, কারণ শ্রোতাদের সবারই বুদ্ধিবৃত্তি সমান নয়। এই জন্যে উপনিষদ ব্রহ্মের এই অংশটুকু (আমি এখানে যে অংশে ব্রহ্মমন্ত্র আছে, তার আলোচনা করিনি) ব্রহ্মমন্ত্রের ব্যাখ্যার মতন মনে হয় যা অনেকটা প্রচার সাহিত্যের কোঠায় পড়ে। তবে কবি উপনিষদ ব্রহ্মের এই অংশটুকে নিছক প্রচার সাহিত্য করেই লেখেননি, নিজের প্রতিভার জোরে একে এই ধরণের সাম্প্রদায়িক প্রচার সাহিত্যের চেয়ে অনেক উঁচুতেই তুলেছেন।

এবার উপনিষদ ব্রহ্মের সারাংশ ব্রহ্মমন্ত্রের আলোচনা করছি। আগেই বলেছি যে এই প্রবন্ধটি একটি গীতিকবিতার সমগোত্রীয়। আবেগোজ্জ্বল কবিচিত্তের প্রকাশে প্রবন্ধটি যেন থর থর করে কাঁপছে। উপনিষদের উদ্ধৃতি এবং কবির উপমায় সমৃদ্ধ এই লেখাটির আবেদন (appeal) অত্যন্ত সহজ এবং ঋজু। সংসারত্যাগী আরণ্যক ঋষি কবিরা সংসার এবং ব্রহ্মোপাসনা এই দুইয়ের মধ্যে যে ভারসাম্য (balance) খুঁজে পেয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁরা যে আধুনিক যুগের অনেক ভীরু, স্বার্থপর এবং জীবনসংগ্রামে পরাজিত লোকের সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন নি তা কবি সুন্দর করেই বুঝিয়েছেন। "ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি তাহাই মুক্তি। সংসারকে অপমানপূর্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিম্বড়না—তাহা এক জাতীয় স্বার্থপরতা। সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা" (পৃঃ ১৮৮)। মোটের উপর 'ব্রহ্মমন্ত্র'কে কবি-রচিত রসসিক্ত ধর্ম প্রবন্ধের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এই দুটি প্রবন্ধের মূল পার্থক্য হচ্ছে unity of thought -এর ইতর বিশেষ। উপনিষদ ব্রহ্মে চিন্তার সমগ্রতা নেই; তাতে কেমন একটা কাটা কাটা ছাড়া ছাড়া ভাব, সমস্ত প্রবন্ধটা পড়লে মনে হয় যেন গতি (flow) নেই ; অথচ ব্রহ্মমন্ত্র দেখুন—সম্পূর্ণ লেখাটা একটি নিরেট, নিটোল মুক্তার মতন আমাদের সামনে ঝলকিয়ে ওঠে।

জীবেন্দ্রকুমার গুহ

প্রাসঙ্গিক

ছদ্মনামের সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যাঁরা আমাকে জানেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে বলছিলেন, সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবিতার ওপর বেশী ঝোঁক দিয়ে আমি নাকি পক্ষপাতিত্ব করছি। বিশেষত বাংলা দেশে যখন কবিতার চেয়ে ছোট গল্পে বেশী দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এবং সাধারণ পাঠক এই সব প্রতিষ্ঠাবান অপেক্ষাকৃত প্রগতিসম্পন্ন লেখকের রচনা অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করছে, সে অবস্থাতে তো বটেই।

অভিযোগটা মনে এসে লাগল। সার্বজনীনতার মাপকাঠি হিসাবে কবিতার চেয়ে গল্পের আপাত উপযোগিতা সত্যই বেশী, নিরপেক্ষতার তাগিদে সেটা স্বীকার করতেই হ'ল। কারণ, কবিতায় যে আবেগটা আঙ্গিক ও ইঙ্গিতের মধ্যস্থতায় প্রায় অশরীরীভাবে অপেক্ষা করে, রাসায়নিক উপমায় যেটা সমভাবাপন্ন পাঠকের অভাবে অম্লজানের মত বাষ্পীয় সত্তা মাত্র, যাকে সমূর্তভাবে জলীয় আকারে পেতে হ'লে পাঠকের মনের জলজান (হাইড্রোজেন) এসে দ্বিগুণ মাত্রায় তার সঙ্গে বৈদ্যুতিক মধ্যস্থতায় মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক, গল্পে সেই আবেগ প্রকরণ ও প্রসঙ্গের দৈনন্দিনতার পাদপীঠে আশ্রিত হ'য়ে সুপেয় হ্রদের জলের মত টলমল করে, পাঠক চেনা পথ দিয়ে হেঁটে এসে অঞ্জলিভরে তুলে নিয়েই তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেন। আগ্রহান্বিত হ'য়ে ইদানীন্তন গল্পক্ষেত্রের দিকে চোখ ফেরালাম। তাতে মোটামুটি যে রকমটা ধারণা হ'ল নিচে লিপিবদ্ধ করছি।

১। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : এককালে শরৎচন্দ্রের গ্রাম্য জীবনের লিরিক গল্পের স্থলে কয়লাখনি ও সমাজের অসূর্যম্পশ্য নানা স্তরের ওপর আলোক সম্পাত ক'রে ধন্যবাদভাজন হ'য়েছিলেন। বহুদিন পরে 'দিগন্তে' তাঁর একটি গল্প দেখে খুশী হ'য়ে উঠেছিলাম। কিন্তু প'ড়ে ততটা উৎসাহ বজায় রাখতে পারি নি, কারণ গল্প লেখার স্বকীয় স্বাচ্ছন্দ্য অটুট থাকা সত্ত্বেও গল্পটি স্ত্রীর যে সাইকোলজিক্যাল মোড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটা পতি পরম গুরুর দেশে প্রায় সহজাত সংস্কারের মতই মেয়েদের মনে কন্‌ভেনশান্যাল। এবার আর কোথাও এঁর লেখা দেখি নি।

২। প্রেমেন্দ্র মিত্র : ইনিও প্রথমে পাঠকের মনে বলিষ্ঠ সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে স্থান ক'রে নিয়েছিলেন, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অতি-সাধারণ সব সমস্যা এঁর লেখনীতে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটে ওঠো তাছাড়া ইনি লেখেনও খুবই কম। 'ষ্টোভ' গল্পের জন্য দিগন্ত সম্পাদককে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দেওয়া উচিত হত, কিন্তু গল্পটি ভালো জমে নি বলে সে ইচ্ছা সংযত করতে হ'ল। কারণ, ইনিও সামান্য ও সূক্ষ্ম একটা মনের প্যাঁচের ওপর গল্প দাঁড় করাতে চেয়েছেন, অথচ গল্পের চরিত্র তিনটির মনের কনটেক্‌ষ্ট ভালো ফোটে নি বলে শেষ পর্যন্ত ষ্টোভ ফাটল কি ফাটল না, এটা কেবলমাত্র ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-পড়া কৌতূহলকেই উদ্দীপিত করে, তার বেশী নয়।

৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ধ্বংসমুখী বনেদী বড় ঘরের ছবি থেকে বেদের দল, সাঁওতাল ছোকরা কিম্বা আধুনিক যুগের সমস্যা সব কিছু নিয়েই ইনি সার্থক গল্প রচনা ক'রে জনপ্রিয় হ'য়েছেন। বস্তুত লেখায় অব্যবসায় ও দরদ আছে এমন লেখক বোধ হয় বাংলাদেশে এখন মাত্র তারাশঙ্করই। কিন্তু এবার কয়েকটি গল্পে যদিও তিনি পূর্বখ্যাতি অম্লানই রেখেছেন, 'আনন্দ-বাজারের' 'মন্বন্তরে' হতাশ করেছেন সন্দেহ নেই। উপকরণের প্রাচুর্য চমক লাগিয়ে দেবার মত, প্রসঙ্গও একেবারে হালের, সমস্যাও আনকোরা নতুন, কিন্তু সমস্ত সত্ত্বেও প্রধান চরিত্রের কোনো ঘাতসহ এবং স্পষ্ট (ideological foundation) দার্শনিক ভিত্তি না থাকায় সমস্ত কিছু ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে নি, উপন্যাস তার integrity হারিয়েছে। তবু লেখককে ধন্যবাদ দিতে হয় তাঁর সচেতন দৃষ্টির জন্য, সহানুভূতিশীল মনের জন্য।

৪। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : মনস্তাত্ত্বিক লেখক বলতে বাংলাদেশে একমাত্র এঁর কথাই উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধরণের নরনারীর নানারকম মানসিক সমস্যার এমন সার্থক শিল্পরূপায়ণ বাংলা সাহিত্যে মানিক বাবুর লেখাতেই প্রথম দেখি। আশ্চর্য হ'চ্ছে অল্পদিনের মধ্যেই এত অজস্র তিনি লিখেছেন, কিন্তু কখনোই নিজেকে repeat করেন নি। অনেকের ভাল লাগেনি, কিন্তু আনন্দবাজারের 'বাস' গল্পটি আমার ভাল লেগেছে। টেকনীকটা ভাল, গল্পের মূলসূত্র বাস্-আসা, কিন্তু আসে পাশে চরিত্রের ভিড় কত, ওরই মধ্যে একটা কাহিনীর আভাসও আছে

গোবর্দ্ধন আর গুণমতীকে কেন্দ্র ক'রে, কুমড়ো বিক্রি করতে গিয়ে অবস্থা-বিপাকে সেটা দান ক'রে দেবার ছোট্ট ট্রাজেডি লেখকের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দেয়। কিন্তু এঁরই লেখা 'প্রতিবিম্ব' সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার অভাবে কেবল যে সাম্যবাদী রাজনীতিকে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত ক'রেছে তাই নয়, গল্পও ঢিলে হ'য়ে পড়েছে, প'ড়ে মনে অপ্রসন্নতা জাগে, লেখকের ওপর অভিমান জাগে। Sabotage-এর গল্পও নিশ্চয়ই সাহিত্যে অমূল্য হ'য়ে থাকতে পারে, educative হিসাবে, কিন্তু তার পেছনে লেখকের সমর্থন দেখলে মন বিরূপ হ'য়ে ওঠে, ইচ্ছা ক'রে মাণিক বাবু এভাবে অপ্রিয় না হ'লেই পারতেন, বিশেষ ক'রে তিনি যখন জানেন, বাংলাদেশের বুদ্ধিমান পাঠকবর্গ তাঁকে উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রধান বলেই গ্রহণ করেছেন।

আরো অনেকের লেখাই অল্প বিস্তর পড়েছি। স্থানাভাবে বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারলাম না। তবে ওরই মধ্যে হালের নাম করা লেখক সুবোধ ঘোষের 'গুল্লাভিসারে'র ব্যর্থতার কথাটা বলে রাখা ভাল। কারণ,

ওপরের সমস্ত লেখকই একটি মাত্র গুণের অভাবে সার্থক গল্প রচনা করতে অক্ষম হ'য়েছেন, সেটা হ'চ্ছে বাস্তবিক ঐতিহাসিক বোধ, সবচেয়ে পরে লিখতে শুরু করেছেন ব'লে সুবোধবাবুর রচনায় সেটা সবচেয়ে conc rete.

কারো নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ওপরের আলোচনায় কারো ওপর অজানায় অবিচার ক'রে থাকলে, এই ভেবে মার্জনা করতে পারেন যে, আমি ব্যক্তিগত ভাবে এঁদের সকলের গল্পেরই উৎসাহী পাঠক।

পরীক্ষিৎ

['প্রাসঙ্গিক'-লেখকের মতামত সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব ও সম্পাদকীয় সংস্রব বর্জিত।—প. স.]

সৈনিক ও শিবির

মুহূর্তেরা কানে কানে গেয়ে যায় সহরের গান
আমাদের হিমশয্যা প্রান্তরের জনঘনতায় :
মরণের হাতে হাত, মৃতের অরণ্যে সন্ধ্যাছায়
নিভৃতের কানে বাজে দূরাগত সহরের গান।

মৌমাছির মতো ভীড়ে ঠাসাঠাসি বিক্ষুব্ধ এ নীড়।
ছেঁড়া চটে গান গায় হিমবায়ু : উত্তপ্ত কুটির ;
ভেসে আসে আহতের সকরুণ মৃত্যু-আর্তনাদ,
জনশূন্য দূর মাঠে শকুনি ও শিবার বিবাদ।

স্নায়ুর ঐশ্বর্যে আজ মূর্চ্ছাতুর অবসন্নতার
স্থান নেই ; জনান্তিকে গুচ্ছে গুচ্ছে অবৈধ গুঞ্জন,
কর্মঠ পেশীতে কাঁপে অসহিষ্ণু বলিষ্ঠ যৌবন
সমতল জীবনের আকাঙ্ক্ষায় আগ্নেয় তৃষ্ণার।

বিস্ফোরক মত্ততায় উত্তেজিত সংক্রামক দিন ;
অবাধ্য একত্বে দৃপ্ত সর্বনাশা উদ্যত সঙ্গীন।
অস্ত্রের আক্ষেপে কাঁপে ভবিষ্যৎ ; ছিন্নভিন্ন চট।
উত্তোলিত যবনিকা : সুন্দর, উজ্জ্বল দৃশ্যপট।

শ্রীপরিতোষ খাঁ

জবাব

আশংকা নয় আসন্ন রাত্রিকে
মুক্তি-মগ্ন প্রতিজ্ঞা চারদিকে
হানবে এবার অজস্র মৃত্যুকে ;
জঙ্গী-জনতা ক্রমাগত সম্মুখে।

(২)

শত্রুদল গোপনে আজ, হানো আঘাত
এসেছে দিন ; পতেঙ্গার রক্তপাত
আনেনি ক্রোধ, স্বার্থবোধ দুর্দিনে ?
উচ্চমন শাণিত হোক সংগীনে।

(৩)

ক্ষিপ্ত হোক, দৃপ্ত হোক তুচ্ছ প্রাণ
কাস্তে ধরো, মুঠিতে এক গুচ্ছ ধান।
মর্ম আজ ধর্ম সাজ আচ্ছাদন
করুক : চাই এ দেশে বীর উৎপাদন।

(৪)

শ্রমিক দৃঢ় কারখানায়, কৃষক দৃঢ় মাঠে,
তাই প্রতীক্ষা, ঘনায় দিন স্বপ্নহীন হাটে।
তীব্রতর আগুন চোখে, চরণপাত নিবিড়
পতেঙ্গার জবাব দেবে এদেশে জনশিবির ॥

– সুকান্ত ভট্টাচার্য

যতি

মুখটা পীতাভ লোকান্তরের স্বপ্নে।
আলো ও ছায়ার ছবি আঁকা তা'তে যত্নে।
ধমনীর স্রোতে ক্রম-ক্ষীয়মাণ শব্দ
'সুরু হ'ল' বলে' ঘোষে কোন্ নব অব্দ?
রূপালী নদীর তীরে অই কালো বন্দর—
খয়েরি-রূপালী পটভূমিকায় সুন্দর!
বিস্মৃতি-স্রোতে আর্বত তুলি' ছন্দে,
শাদায় কালোয় মেতেছে মহা-আনন্দে।
দেখা যায় অই, তীরের ওপারে কত কী,
কত কাছে তবু কাছে যেতে সংশয় কী?
ক্রমে ক্রমে সেই দূরত্বটাও কমল;
আলোর তরণী ছায়াবন্দরে ভিড়্‌ল।
পাণ্ডুর চোখে নীল ছায়াটাও সরল,
শাদায় কালোয় প্রেমালাপে যতি পড়্‌ল॥

শ্রীমিহিরকুমার সেন

সম্পদের অভিশাপ

বিধাতা শুধায়: ঐ যে চিরন্তন গিরিমালা—ওরা কি আমার নয়?
ঐ যে ধেনু-চরা শ্যামল প্রান্তরগুলি, ঐ যে বেগবতী স্রোতস্বিনী—
ঐ যে কচি আর তাজা শস্যসম্ভার, আপেল ফুলের যত উজ্জ্বল পেয়ালা—
আমার পর্ব্বতের অলিন্দ থেকে যেন সিংহাসনে ব'সে দেখতে পাচ্ছি
এই বিস্তীর্ণ ভুবনকে—
তারা কি আমার নয়? আমার সন্তান-সন্ততির নয়? আমি কি
নেই তাদের মধ্যে?
আর কতকাল আমার এই বিস্তীর্ণ বসুধাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকারের
সীমারেখা দিয়ে তোমরা খণ্ডিত ক'রে রাখবে? আর কতকাল
চল্‌বে স্বত্ব-স্বামিত্ব আর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে তোমাদের এই
সকল আলোচনা?
কতকাল আর তোমরা ধনসম্পদ নিয়ে নিজেদের লুকিয়ে রাখ্‌বে
গৃহ-প্রাচীরের অন্তরালে? আমাকে এড়িয়ে, তোমার ভাই-বোনদের
এড়িয়ে এমনি ক'রে আর কতকাল দূরে দূরে ফিরবে?
মনে রেখো। আমি প্রলয়ের সেই ঝড়! তোমাদের বিষয়-সম্পত্তির
অধিকারের আমি বিন্দুমাত্র পরোয়া করি নে। বজ্রে আর বিদ্যুতে,
বন্যায় আর দাবানলে তোমাদের শস্যক্ষেত্রগুলিকে আমি
ধ্বংস করবো, উৎসন্ন করবো।
তোমাদের প্রথম-জাত সন্তানকে আমি তোমাদের গৃহমধ্যেই
হত্যা করবো—তোমাদের ঐশ্বর্য্যকে আমি রূপান্তরিত করবো
একটা প্রহসনে।
ওরে নির্ব্বোধের দল! তোরা কি জানিস্‌নে কবে কোন মুহূর্ত্তে
তোদের পরমায়ু ফুরিয়ে যাবে?
তবুও অজস্রধারায় যে সম্পদরাশি তোদের উপরে আমি ঢেলে
দিয়েছি তা নিয়ে তোরা নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করবি?
একথা জেনে রেখো: সকলের জন্য গৃহদ্বার যারা উন্মুক্ত ক'রে

না রাখবে, আমারই মতো যারা সকলকে প্রেম দিতে না পারবে—
তাদেরকে আমি নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবো!
সান্ধ্য আকাশের পটভূমিতে ঐ যে গাছগুলি তাদের শাখা বাহুগুলিকে
দিকে দিকে বিস্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে আমি
যে মর্ম্মরপ্রস্তর ভূগর্ভে সঞ্চিত ক'রে রেখেছি, শত শত পাহাড়ের
অধিত্যকায় চরে বেড়াচ্ছে ঐ যে আমার গো-ধন—তারা যে
আমার—আমার সমস্ত সন্তান-সন্ততির।
তুমি যদি শুধু নিজের ভোগে তাদের লাগাতে চাও—তোমাকে
অভিশাপ কুড়াতে হবে।
বিষয়ের অভিশাপ কিছুতেই তোমাকে মুক্তি দেবে না।
তোমাদেরই ভোগের জন্য যে দেশ আমি রচনা করেছিলাম,
—দুশ্চিন্তায় কুঞ্চিত ললাট এবং ক্লান্ত, অবসন্ন ও ভারাক্রান্ত
হৃদয় নিয়ে তার উপর দিয়ে সরিসৃপের মতো তোমাদের বিচরণ
করতে হবে।
তোমার জমিদারির কোনো কাননের বৃক্ষ শাখায় ক্ষুদ্রতম
পাখীটিও মুক্তির আনন্দে গান গাইবে, রাখাল বালক
হাল্‌কা মনে মাঠে মাঠে বাঁশি বাজিয়ে ফিরবে,
কিন্তু হায়! তোমার দিন কাটবে দুঃসহ ক্লান্তি এবং নিঃসঙ্গতার
মধ্যে—তুমি রইবে একান্ত সকলের অনাত্মীয় হোয়ে;
কারণ আমার তুচ্ছতম জীব থেকে আপনাকে দূরে
সরিয়ে রেখেছে ব'লে আমার কাছ থেকেও দূরে স'রে গেছ তুমি।
আমি গণ-দেবতা। এই হচ্ছে আমার বাণী। পর্ব্বত
আমার সিংহাসন। *

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

* Edward Carpenterএর The Curse of Property গদ্য-কবিতার অনুবাদ।

পুস্তক-পরিচয়

ইঙ্গিত—মণীন্দ্র রায়। পরিচয় প্রেস। দাম—আট আনা।

আলোচ্য বইকে প্রতীক-নাট্য বলা যায়। স্বভাবতই ব্যক্তির পরিবর্ত্তে ভাব এখানে প্রধান, ঘটনাসংঘাতের চাইতে পরিবেশসংগতি বেশী। চরিত্রের টাইপও মনস্তত্ত্বের বিভাগ ততটা অনুসরণ করেনি, যতটা করেছে সমাজ-তত্ত্বের। সুতরাং ব্যবহারের বৈচিত্র্য ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে নয়, বিশেষ একটা সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি-প্রতিক্রিয়ার রকমফের দেখানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

কাহিনী এবং চরিত্র পৌরাণিক এবং পুরণো। রামচন্দ্র অনার্য্য বানর শ্রেণীর সাহায্যে রাক্ষস-সাম্রাজ্য ধ্বংস ক'রে সীতার উদ্ধার করেন; স্বকীয় আভিজাত্যের জোরে রাক্ষস আধিপত্য বিনষ্ট করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না; একমাত্র অনার্য্যশক্তির সংগঠিত অভ্যুত্থানই এ ঐতিহাসিক সংপ্লব আনতে সক্ষম। সাম্রাজ্যশক্তি এবং শোষিত সাধারণের এই চরম সংঘাতে উপরস্তরের প্রগতিশীল দৃষ্টি-সম্পন্ন একটা অংশ নবজাগ্রত শোষিত সাধারণের সক্রিয় নেতৃত্বে নিজেদের মুক্তির সন্ধান পায়, সামষ্টিক কল্যাণের সামনে শ্রেণী-স্বার্থকে অতিক্রম করতে শেখে। বলা বাহুল্য, মুক্তির এই ইঙ্গিত সুলভ নয়, এর দায়িত্ব দুঃসহ। কখনো নেতৃত্বের কঠিন দায়িত্বভার নায়কের নিজের যোগ্যতায় অবিশ্বাস আনে, অবশ্যম্ভাবী অনার্য্য নেতৃত্ব স্বীকার করায় নিঃস্ব আত্মাভিমানের অতীতকীর্ত্তি বাধা আনে, শ্রেণীগত রক্তসম্বন্ধ ছিন্ন করতে গিয়ে হৃদয় হয় রক্তাক্ত, আবার স্বকীয় পরিবেশের সন্দিগ্ধতার ভৌগোলিক এবং শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করতে গিয়ে পদে পদে অভাবনীয় প্রতিমূল্য দিতে হয়। কিন্তু তবু ইতিহাসের ইঙ্গিতে এই একমাত্র পথ, অন্যপথ অন্ধ আত্মহননের।

এই নাটকে বর্ণবোধলোপের পথে এই বিবিধ টাইপের যথাক্রম প্রতীক হ'লেন রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সরমা। রাবণ সাম্রাজ্যশক্তির আধার, বানরগণ শোষিতশ্রেণীর প্রতিভূ। বিষয়গত কাঠামো হ'চ্ছে—হৃতসম্ভব সাম্রাজ্যের বিনাশে অনার্য্য সাধারণের প্রতিষ্ঠা: সীতারূপিণী সামষ্টিক কল্যাণবোধের মুক্তি।

কিন্তু এ' তো প্রাথমিক কাব্যাতিরিক্ত পরিচয়। প্রশ্ন : বিষয়বস্তু কাব্যে রূপ নিয়েছে কি? আঙ্গিকের ব্যবহার-বিচার প্রয়োজন। এবং দেখা দরকার প্রতীক, ভাব এবং আবেগ অঙ্গাঙ্গীভাবে একাত্মলাভ করেছে কিনা। এ বিচার সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী।

নিরলঙ্কৃত তত্ত্ববিবৃতিতে আবেগ সঞ্চার মণীন্দ্রের টেকনিক নয়। যেখানে চেষ্টা করেছেন, জমেনি। যেমন তৃতীয়া সখীর মুখে ডায়ালেকটিকের ব্যাখ্যা—"সমন্বয়ে শেষে সদসৎ লভে ক্ষণিক।..."কিন্তু শব্দচিত্রে পরিবেশ সৃষ্টি করার শক্তি তাঁর আশ্চর্য্য। নিচের ক'টি পংক্তিতে—

উদ্ধৃত হৃদয় তব পক্ষশয্যা ছাড়ি'
উন্মুখ আকাশ পানে মেলে শতদল।...

কিম্বা :

জিঘাংসাজ্যাবদ্ধ চিত্ত বেগস্তব্ধ কার্মুকের প্রায়
কাঁপে থরোথরো।...

প্রথম দৃষ্টান্তে 'উদ্ধৃত' এবং 'উন্মুখ'-এর ধ্বনিগত সংঘাত লক্ষ্যণীয়। প্রথম পংক্তিতে পক্ষশয্যা হ'তে উত্থানের ধাক্কা 'দ্ধৃ'-তে রূপ নিয়েছে, দ্বিতীয় পংক্তির 'উন্মুখ' বিকাশের স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যগ্রতার আভাস দিচ্ছে, আর শেষে 'মেলে শতদল'-এর কোমল ধ্বনিতে সে স্ফূর্ত্তি সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতেও ধ্বনি ও চিত্রের প্রকাশশক্তি বিস্ময়কর। সংহত আবেগ 'বদ্ধ' এবং 'স্তব্ধে'র ধ্বনিগুণে এবং জ্যাবদ্ধ কার্মুকের চিত্রে বেগস্তব্ধের মতই স্তম্ভিত হ'য়ে রয়েছে।

চিত্র ও শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ নৈপুণ্যে মণীন্দ্র শ্রেণীলোপের বিভিন্ন স্তরকে ফোটাতে সক্ষম হ'য়েছেন। বিভীষণের মনের দ্বন্দ্ব, সত্যস্বীকারের প্রয়াস এবং পরিশেষে নতুন শক্তির হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া এই পংক্তি ক'টিতে রূপ নিয়েছে :

নির্য্যাতিত অনার্য্যের
তীব্রতরী নবীন খেয়ায় ভাসাই সন্ত্রান্তভাগ্য,
শ্রেণিচ্যুত আমি বিভীষণ।...

'য'-এর সঙ্গে রেফ-এর ধ্বনি সংঘাত অনিশ্চিত জমিতে রুক্ষ পদক্ষেপের আভাস দেয়; 'তীব্র' 'সন্ত্রান্ত' এবং 'শ্রেণিচ্যুতে'র ধ্বনির একাগ্রতাও অনার্য্য

আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ইঙ্গিত করে। 'খেয়ায়' এবং 'ভাসাই'-এর শব্দচিত্র পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ সূচক।

রাবণের ভঙ্গুর সাম্রাজ্যস্বপ্নের ছবি বিস্তৃত আত্মবিশ্লেষণে তত পাইনে যত পাই মৃতবাণ-হরণের পর মন্দোদরীর নেপথ্য আগমনের বর্ণনায়।—

ছিন্ন ঝড়ে ওড়ে কেশদাম
চোখেমুখে, গতিভঙ্গে লুণ্ঠিত অঞ্চল
সর্ব্বস্ব হারায়ে আসে এ কোন্ রমণী
উদ্‌ভ্রান্ত ব্যস্ততাভরে!

ধ্বনি ও চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগে মণীন্দ্রের লিপিকৌশল একাধিক স্থানে আশ্চর্য্য। তাঁর বক্তব্য সোজাসুজি মনে ঘা দেয়, এবং স্থায়ী ছাপ রাখে। যে আবেগ তাঁর কাব্যে একটা বলিষ্ঠ ঋজুতায় প্রতিষ্ঠিত তা কাব্যরূপময়, অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আবেগের সঙ্গেও তার নাড়ীর যোগ অচ্ছেদ্য। শব্দ প্রয়োগ এবং মিল, অন্তর্মিল ও ছেদ টানবার কৌশলে পাঠকের আবেগকে কখনো ঢিলে হ'তে দেয় না। এ বইতে পয়ারের ব্যবহারও অভিনব, সমস্ত মিলিয়ে মণীন্দ্রের শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাঁর 'একচক্ষু' কাব্যগ্রন্থে তিনি ইতিপূর্ব্বেই অবশ্য প্রমাণিত করেছেন যে সাম্প্রতিক বাংলার বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

একটা জিনিষ চোখে পড়েছে। ইঙ্গিত শুধু অনার্য্য নেতৃত্বে সামাজিক মুক্তিরই নয়, কবিকল্পনার ভবিষ্যৎ ধারারও বটে। কিন্তু এখনো রক্তের সংস্কার দুস্তর; যে শ্রেণীর নেতৃত্বে সংপ্লব ঘটতে পারে তার সঙ্গে আদর্শবোধের সংযোগ আনা গেছে, কিন্তু মৌল ব্যবধান এখনো অনতিক্রান্ত। প্রমাণ, এ নাটকে অনার্য্যশ্রেণীর মনের বিচিত্র চিন্তা, কল্পনা, সংশয়, কিম্বা বিশ্বাস-বোধের কোনো চিহ্ন নেই। এ সমস্যা পৃথিবীর সবদেশের কবি সাহিত্যিকের। বিচার-বুদ্ধির দ্বারা যে নিশ্চিত সত্যে পৌঁছানো গেছে, রক্তে তা মেশে নি। সেই চেষ্টা তাই কবিতায় একটা ফাঁপা জোরের ভাব এনেছে : নিজেকে নিজে বোঝবার চেষ্টায় যা হ'য়ে থাকে। মণীন্দ্রের সততা এবং আঙ্গিকের সম্পদও এই সমস্যাকে অতিক্রম করতে পারে নি।

কিন্তু এ তো মধ্যবর্ত্তী স্তরে ঘটেই। এর চাইতে বড় কথা মণীন্দ্রের চেষ্টার সততা। 'ত্রিশঙ্কুমদন' থেকে 'ইঙ্গিতে' পৌঁছানোই এ সততার প্রমাণ। শ্লেষ-বিদ্রূপে মণীন্দ্রের সমাজবোধ থেমে যায়নি; বলিষ্ঠতর বিশ্বাসবোধে পৌঁছানোর প্রয়াস পরিস্ফুট। শ্রেণীসত্তাকে অতিক্রম ক'রে সামষ্টিক কল্যাণের সক্রিয় তাগিদে শিল্পকে প্রাণবান করাই মণীন্দ্রের সাধনা : যাবার পথের বিচিত্র বাধা, বেদনা, অনুভূতি ও অগ্রগমনের তাগিদ 'ইঙ্গিতে' উজ্জ্বল হ'য়ে রইল।

শিবনারায়ণ রায়

মিছিল—অনিলকুমার সিংহ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। পৃঃ ১১২। দাম এক টাকা চার আনা।

শ্রীযুক্ত অনিলকুমারের প্রথম গল্পসংগ্রহ 'মিছিল' পড়ে রচনার উৎকর্ষে সন্তুষ্ট হয়েছি। গল্পগুলির বিষয়বস্তু অভিনব, গাঁথুনি ভালই যদিও তাদের ওপর আস্তর এবং চুণকাম উৎকর্ষের অপেক্ষা রাখে। একটি গল্প (নিরিবিলি) বাদে অন্য গল্পগুলির বিষয়বস্তু একদিকে দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিত নরকঙ্কাল দলের সঙ্গে মুষ্টিমেয় ধনীর সংঘর্ষের টুকরো ইতিহাস। ধনবণ্টন প্রথার ব্যবস্থাবৈষম্যে আধুনিক সমাজের এক অংশ যেমন ধনস্ফীতিতে ফুলে উঠেছে, অপরদিকে ছোট চাষী এবং মজুরেরা ক্রমশঃই তেমনি সর্বহারার স্তরে নেমে যাচ্ছে এবং তা ধনীদের কি অপরিসীম লোভের জন্যে, লেখক গল্পগুলিতে সেকথা বোঝাতে চেয়েছেন, যদিও সর্বত্র সমর্থ হননি (যেমন "কাহিনী")। আমাদের নৈতিক জীবন, অর্থাৎ, যে নিয়মে আমাদের সংসার এবং সমাজ চলে (যেমন পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভাইবোনের ভালবাসা) তা যে অর্থ নৈতিক জীবনের উপর নির্ভরশীল তা "মিছিলে" পরিস্ফুট। যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সন্তানকে অচলা পিতৃভক্তি শেখায় এখন আর তা নেই। "মিছিল" গল্পে এই দুই যুগেরই দ্বন্দ্ব। নন্দিতার পিতৃভক্তির চেয়েও জয়ী হোল তার মানবপ্রেম। এই গল্পসংগ্রহে "পরিখা"কেই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠের আসন দেওয়া যায়। মানুষের আশা, আকাঙ্খাকে আধুনিক ধনতান্ত্রিক অর্থবণ্টন ব্যবস্থা কি-ভাবে

নিষ্পেষিত করে দেয় গল্পে লেখক তা সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিষণলালের জীবনে কেদারনাথ এনে দিলেন চরমতম ট্র্যাজেডি।

লেখকের ভাষা সুন্দর ঝরঝরে এবং জোরাল। তিনি dialogue-এ স্বাভাবিকতা অনেক জায়গায় রাখেন নি (যেমন 'কাহিনী'তে), চাষী মজুরেরা অবিকল আমাদের ভাষায় কথা বলেছে। এবং 'নিরিবিলি'তে চরিত্রদের পারস্পরিক কথাবার্তায় বুদ্ধদেব বসুর প্রভাব স্পষ্ট। খুব সংক্ষেপে এবং সহজে যে তিনি একটি সুন্দর চিত্র আঁকতে পারেন তা 'ঐরাবত'-এর প্রথম ক'টি পংক্তি পড়লেই বোঝা যায়।

বইতে ছাপার ভুল যথেষ্ট। আমরা সাঁপ পড়তে এবং বলতে অভ্যস্ত নয়; ৩৭ পৃষ্ঠায় 'গরম রুটি'র উপমা কানে অনভ্যস্ত ঠেকে। বইয়ের মুদ্রণ, বাঁধাই ভাল, দাম আমাদের পকেটেরই মত। বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানিয়ে চললেও শ্রীসূর্য রায়ের আঁকা প্রচ্ছদপটটি বস্তুপুঞ্জসমাবেশে ভারসাম্যের (compositional balance) অভাবে ভাল হয়নি।

জীবেন্দ্রকুমার গুহ

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

সম্পাদকীয়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিচিত্র কর্মিষ্ঠ জীবনের অবসান সমস্ত দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, বিশেষভাবে ক্ষতিকর পত্রিকা-সাহিত্যের পক্ষে। বাংলা পত্রিকা-সাহিত্যে তিনি ছিলেন যুগ-প্রবর্তক— 'প্রবাসী' পত্রিকা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'প্রবাসীর' আগে 'প্রদীপ' ও তারও আগে 'দাসী'—এই নামের একটি অতি ক্ষুদ্রাকার পত্রিকা তিনি পরিচালন ও সম্পাদন করেছিলেন। সংস্কৃতি ও রাজনীতিবিষয়ক বিবিধ রচনা জনপ্রিয় আকারে ব্যাপকভাবে প্রচারের প্রথম সার্থক চেষ্টা 'প্রবাসী'। ইতিপূর্বে যে এই চেষ্টা হয় নাই তা নয়ঃ 'বঙ্গদর্শন' ও 'সাধনা'র নাম বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস থেকে কোনোদিন লুপ্ত হবে না। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' ও 'সাধনা' বা পরবর্তী যুগে 'সাহিত্য' ও 'সবুজপত্র' —এই পত্রিকাগুলি ছিল বিশেষভাবে সাহিত্যিক পত্রিকা, শুধু তাই নয় অনন্য প্রতিভাশালী একজন সাহিত্যিক কিংবা ছোট্ট একটী সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে অবলম্বন ক'রে এই পত্রিকাগুলি বিকাশ লাভ করেছিল। এদের গ্রাহক সংখ্যাও ছিল 'প্রবাসী'র তুলনায় অনেক কম। এই জাতীয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক পত্রিকার দরকার ও দাবি আজও আছে কিন্তু যে জাতীয় পত্রিকা ভবিষ্যতে প্রকৃত জনসাহিত্যের বাহন হবে, 'প্রবাসী' তারই গৌরবময় সূচনা। এই কারণে, বিশেষভাবে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে, রামানন্দ বাবুর স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

জনযুদ্ধ

এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধে লেখক জনযুদ্ধ কি জিনিষ তা পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই বিষয়ে নানা বিরোধী মত আছেঃ এই প্রবন্ধের ফলে এই বিরোধের অবসান হবে এ রকম দুরাশা আমরা পোষণ করি না, কিন্তু অনেকের অনেক সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণা এই প্রবন্ধটী মনোযোগের সঙ্গে পড়লে দূর হতে পারে এই আমাদের বিশ্বাস। যদি না হয় ও এই প্রবন্ধ প'ড়ে কারও মনে কোনো প্রশ্ন ওঠে তা জানালে তা সমাধানের সাধ্যমত চেষ্টা আমরা করব।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

১৩শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৫০

পরিচয়

চতুর্দ্দশপদীর পদসঞ্চার

(আলোচনা)

পরিচয় পত্রের শারদসংখ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র লিখিত 'চতুর্দ্দশপদীর পদসঞ্চার' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেছি। মাননীয় লেখক বিস্তর পরিশ্রম করেছেন, এবং মধুসুধন দত্তের সনেট্‌গুলি সম্বন্ধে মতবাদ প্রকাশে কিছু মৌলিকত্ব দেখাবার প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি কতদূর সার্থকতা অর্জ্জন কর্‌তে পেরেছেন সে বিষয়ে পণ্ডিত এবং সাহিত্যিক ব্যক্তিবৃন্দই বল্‌তে পারেন। আমাদের মত সাধারণ পাঠকের এই প্রবন্ধটি পাঠ করে সাধারণ ভাবেই দুই চারিটি কথা মনে হয়। তারই বিষয়ে সংক্ষেপে বল্‌তে চাই।

মধুসুদনের কাব্য বিচার কর্‌তে বসে তাঁর উপরে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের প্রভাব বিবেচনা করা সমালোচনার নিয়মগত পন্থা। কারণ, প্রতীচ্যের সাহিত্য তাঁর রক্তকণিকায় মিশে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথম কথা, কেবল ইটালি অথবা গ্রীস্ নয়, ইংলণ্ডের প্রভাবও অতি তীব্রভাবে মধুসূদনকে আশ্রয় করে। সুতরাং, মধুসূদনের সনেট্ বিচারে শুধু দান্তে অথবা পেত্রার্ক প্রভৃতির নাম উল্লেখ কর্‌লে চলে না।

মিল্টনের প্রভাব মধুসূদনের সমগ্র কাব্যসাধনাকেই যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল। অবশ্য সে সম্পর্কে সম্যক্ আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়।

কাব্যরসিক মাত্রেই অবগত আছেন যে মিল্টন্ quatrainগুলি ও octave বা sestel এর মধ্যের অনতিক্রম্য ভেদরেখা বর্জ্জন করেছিলেন। বিদেশী সমালোচকের ভাষায়, তাতে মিল্টনের সনেট্‌গুলিতে কামানগর্জ্জন অনুভূত

হোত। মিল্টনের সনেট্ প'ড়ে এ উক্তির যাথার্থ্য বোধগম্য হয়। অষ্টকে অর্থের প্রাথমিক সমাপ্তি না হলেও তাতে অষ্টকের ভাগ্য অলীক প্রতিপন্ন হয়ে যায় নি।

মধুসূদন সনেট্ শুধু পেত্রার্কের আদর্শে লেখেন নি। তাঁর লিখিত সনেট্-গুলি থেকেই এ প্রমাণ গৃহীত হ'তে পারে। ইংরাজি ভাষায় সনেটের রূপান্তরও নানাভাবে তিনি তাঁর চতুর্দ্দশপদী কবিতাতে দেখান। English Sonnet' বল্‌তে যা বোঝায়; Surrey, Spenser, Sidney, Drummond, Shakespeare, Keats প্রভৃতি যাকে আঙ্গিক ও ভাবের বাঁধাধরা ইটালিয়ান্ মূর্ত্তি থেকে কিছু না কিছু মুক্তি দিয়ে গিয়েছিলেন, তারও নানাবিধ রূপ মধুসূদনে পাওয়া যায়।

প্রবন্ধলেখক মধুসূদনের 'কবি মাতৃভাষা' (পরে 'বঙ্গভাষা') সনেটের rhyme-scheme তুলে দেখিয়ে বলেছেন যে তাতে ইটালিয়ান্ সনেটের rhyme-scheme পাওয়া যাচ্ছে না। এই কবিতাটির ষড়ক অংশের ঢংএর মিল্টনের একটি ইটালিয়ান্ সনেটের এই অংশের ঢংএর সঙ্গে মিল আছে, এবং অষ্টক অংশ দু একটি খাঁটি সনেটেরই অনুসরণ। ভাষাতত্ত্ব পুস্তকে তাদের রূপ অগ্রাহ্য হলেও মাতৃভাষায় তাদের ইতস্তত চলন বাধা পায়নি।

পেত্রার্কীন্ rhyme-scheme যে মধুসূদনের অবিদিত ছিল না, তার প্রমাণ তাঁর অনেক সনেটে পাওয়া যায়। 'কমলে কামিনী' সনেটটির rhyme-scheme হচ্ছে abba, abba, cde, cde, এতে অষ্টক-ষড়কের ভাগও আছে। 'সায়ংকালের তারা' সনেটের rhyme-scheme হচ্ছে abba, abba, cdc, dcd. এতে অষ্টক-ষড়কের ভেদরেখা আছে। Keats, Wordsworth Mrs. Browning প্রভৃতি সনেটীয়ররা এই শেষোক্ত কাঠামোতে সনেট লিখ্‌তে বেশী অভ্যস্ত ছিলেন। উপরোক্ত দুইটি rhyme-scheme ইটালিয়ান্।

'কাশীরাম দাস' সনেটের rhyme-scheme হচ্ছে abab, abab, cdc, dee; এটি Spenser-এর সনেটের ছকে, যদিও 'linking rhyme-scheme' নেই, বরঞ্চ Drummond, Sidneyদের কাঠামোতে। এতে octave sestel-এরও পরিষ্কার ভেদরেখা নেই। কিন্তু এই 'ঘেঁষাঘেষি' 'পীড়াদায়ক' নয়, মিল্টনের মত গাম্ভীর্য্যবর্দ্ধক। মিল্টনের পরবর্ত্তী কবিরা, Keats, Wordsworth,

Mrs. Browning ইত্যাদি ভেদরেখা বর্জ্জন করেই অনেক উৎকৃষ্ট সনেট লিখে গিয়েছেন।

'অন্নপূর্ণার বাঁশি' সনেটের কাঠামো হচ্ছে; abab, abab, cdc, dcd। এতে অষ্টক-ষড়কের ভাগ আছে। 'জয়দেব' সনেটের rhyme-scheme হচ্ছে, abba, baba, cdd, caa। এতে অষ্টক-ষড়কের কিছুমাত্র ভাগ নেই।

কিন্তু, octave-sestel এর ভেদরেখা সম্বন্ধে মধুসূদনের কতটা জ্ঞান ছিল তার প্রমাণ বহু সনেটের দুই অংশের সুনির্দ্দিষ্ট ভেদরেখা থেকে পাওয়া যায়, ('বঙ্গভাষা' দ্রষ্টব্য)।

অসংখ্য সনেট্ থেকে এইরূপ সামান্য দুই চারিটি উদাহরণ আলোচনা করলে দেখা যাবে বৈচিত্র্যের সন্ধান মধুসূদনকে কত রকম মিল এবং বিষয়বস্তুর সন্ধানে উৎসুক করেছে, অথচ খাঁটী ইটালিয়ান্ সনেটের মূর্ত্তি সম্বন্ধেও তাঁর কোন অস্পষ্ট ধারণা নেই।

কিন্তু, মধুসূদন ইটালিয়ান্ নির্দ্দেশানুযায়ী পাঁচটির বেশী rhyme ব্যবহার করেন নি, যদিও শেক্সপীয়রের মত couplet-এ তিনি কয়েকটি সনেট্ শেষ করেছেন। couplet-এ সমাপ্তি ইটালিয়ান সনেটে দুই চারিটি পাওয়া যায়। তবে এটি বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ তাহ'লে এতে এপিগ্রামের সুর চলে আসে।

মনোসংযোগপূর্ব্বক মধুসূদনের সনেট্গুলি পাঠ করলে স্বতঃই মনে হয় না মধুসূদন অসতর্ক ছিলেন অথবা সনেটের আত্মা তাঁর উপলব্ধির বাহিরে ছিল। তিনি পেত্রার্কের সনেট্ পাঠ করে বঙ্গভাষায় তার প্রবর্ত্তন করে ক্ষান্ত হননি, পরন্তু তার ভবিষৎ মুক্তির পথও নির্দ্দেশ করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

ইংরাজি সনেট্ যেরকম Elizabethan Sonateer দের হাতে বিস্তৃতি লাভ করেছে, সেই রকম ইংরাজ কবিদের অনুসরণে মধুসূদন নানারূপভাবে সনেটের রূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে গিয়েছেন। কখনো তিনি কেবল মিল্টনকে কখনো বা অন্য কবিকে অনুসরণ করেছেন। ইংরাজি সাহিত্যে সনেটের অজস্র প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও তৎকালে এক মিল্টন্ ব্যতীত rhyme-scheme এর সঙ্গে কবিত্বের সন্ধি করে খাঁটী ইটালিয়ান্ কাঠামোতে সনেট্ লিখে সাফল্য অর্জ্জন করতে বিশেষ কেউ সমর্থ হননি। তাও, এক্ষেত্রে মিলটনের নববিধানের কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

যে অনতিক্রম্য ভেদরেখাকে অতিক্রম করবার দুঃসাহসের জন্য প্রবন্ধ-লেখক মধুসূদনকে 'অসতর্ক' এবং তাঁর প্রতিভাকে 'অসংযত' আখ্যা দিয়েছেন, সে ভেদরেখা প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন বিলুপ্ত করেন মিলটনের প্রভাবে। ইংরাজি সনেটনির্ম্মাতাদের প্রভাবও তাঁর rhyme-scheme-এর বৈচিত্র্য অন্বেষণে দেখা যায়। অবশ্য ইটালি এবং পেত্রার্ককে বন্দনা না করে যে কোন ভাষার যে কোন সনেটীয়র অগ্রসর হতে পারেন না। কারণ, ইটালি দেশকে এবং Guiltone নামক ব্যক্তিকে সনেটের জন্মদাতা বলে উল্লেখ করা হয়। দান্তে ও পেত্রার্কের হস্তে হয় তার চরমোৎকর্ষ।

ইংরাজিতে যে সকল কবিগণ সনেট পাঠ করে সনেটের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অবগতি লাভ করলেও নিজেরা নানারূপ নূতনত্ব আনেন, সেটা অজ্ঞানতাপ্রসূ নয় বা অসতর্কতা নয়, ইচ্ছাকৃত। সেইরূপ মধুসূদন দত্তের বৃহৎ প্রতিভা যে শুধু ইটালিতে সীমাবদ্ধ থেকেও অস্পষ্ট ধারণা হেতু অন্যরূপে সনেট নির্ম্মাণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছে তা নয়, ইংরাজি ভাষার প্রভাব তার মধ্যে পূর্ণ বিদ্যমান থাকবার জন্য কেবল ইটালির সনেট তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আবার, সুচারুভাবে সে ভাষা না জেনে মধুসূদন দত্তের সনেট বিচার করা ভীতিজনক। কারণ, সনেটের বাঁধা পরিখা সত্ত্বেও ইটালিয়ান্ সনেট্ কখনো কখনো ভিন্ন পরিখায়ও প্রবাহিত হোত।

ইংরাজি ভাষা ইটালিয়ান্ ভাষার মত মধুর ও গীতিশ্রবণ নয়, তাই প্রয়োজনের তাগিদায় কিছু রূপ পরিবর্ত্তন সনেটে অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। আবার ফরাসী কবি Marot এবং Du Bellayর দ্বারাও ইংরাজি সনেট প্রভাবান্বিত হয়েছিল। সুতরাং, ইংরাজি সনেটের পার্থক্য স্বাভাবিক এবং সে পার্থক্য ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত দত্ত কবির পক্ষে গ্রহণ করাও স্বাভাবিক।

মধুসূদন যে ইংরাজি সনেট বহু অংশে অনুসরণ করেছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর সনেটের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলেও বোঝা যাবে। শেক্সপীয়র তাঁর 'patron'দের উদ্দেশ্য করে যে সমস্ত সনেট লিখে গেছেন এবং মিল্টনের ব্যক্তিগত সনেটগুলি দেখা যাক। মিল্টনের পূর্ব্বে সাধারণতঃ প্রেমমূলক সনেটের প্রচলন ছিল, মিল্টন নানাবিষয়ে সনেট রচনা করে বিষয়বস্তুর ঐশ্বর্য্য বাড়িয়েছিলেন। মধুসূদনের সনেটগুলি তুলনা করলেই সাদৃশ্য

পাওয়া যাবে। লরা বা বিয়াত্রিচেকে উদ্দেশ্য করে sonnet-sequence-এর ধরণ কতটা মধুসূদনে পাওয়া যায় ?

যদিও মধুসূদন পেত্রার্ককে বন্দনা করে তাঁর পদকে অনুসরণ করেন, মিল্টনের সনেটের প্রভাব তাঁর কবিতার মধ্যে বেশী দেখা যায়। মিল্টনে আবার পেত্রার্কের কমনীয় মাধুর্য্য অপেক্ষা দান্তের ঔদার্য্য ও শক্তির ছায়া বেশী পড়েছে, শব্দনৈপুণ্য ও সমতা স্থানে স্থানে ব্যাহত। মধুসূদনেও আমরা তাই পাই। দান্তের সনেট পড়া থাকলেও মধুসূদন পেত্রার্কের প্রতি বাহ্যিক অনুরাগ অধিক দেখিয়েছেন। কিন্তু মিল্টনের মধ্য দিয়ে দান্তের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য বেশী। সনেটের নিয়মানুসারে তার সনেটগুলি lyrical নয়, contemplative ; এবং একটি সম্পূর্ণ চিন্তার প্রকাশ। যদি মধুসূদনের নবাবিষ্কৃত সনেটে ত্রুটী বা কবিত্বশক্তির বিচ্যুতি থাকে তাহ'লে বলা যাবে মিলটনের মত তাঁর বিরাট ধারণা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির পক্ষে উপযোগী ছিল না। সনেটের বাঁধাধরা ইটালিয়ান্ কাঠামো রাখাই সুবিধার অথবা শেক্সপীয়র ও মিলটনের মত আঙ্গিক ও আত্মার দিক থেকে মুক্তি সন্ধানেই বেশী সার্থকতা সে কথা বিচার্য্য।

সনেট যাঁরা সাফল্যের সঙ্গে লিখে গেছেন, তাঁদের সকলেরি প্রতিভা মধুসূদনের অপেক্ষা সংযততর ছিল না, এবং ইতালীয় চতুর্দ্দশপদী এত কঠিন নয়, যা মধুসূদনের পক্ষে অনুসরণ করা সহজসাধ্য ছিল না। যিনি বিদেশী ভাষার মহাকাব্যের প্রকৃত রূপটি অতি সহজে বঙ্গভাষায় এনেছিলেন, যিনি অমিত্রাক্ষর নবকাব্যের বাহনরূপে প্রবর্ত্তিত করলেন, ক্ষুদ্র একটি সনেটের আইন-কানুন কি তাঁর জানা ছিল না, অথবা বৈচিত্র্যই তাঁর উপাস্য ছিল ?

এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের দুই এক স্থলে যা খটকা লেগেছে, তারও উল্লেখ করি। মিল্, স্পেন্সর, বেন্থাম যখন অনিবার্য্যরূপে এদেশে প্রবেশ লাভ করেছেন তখনি কি সাহিত্যের অবয়ব হিসাবে উপন্যাস ও নাটক প্রথম এদেশে এসেছে ? সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটিকা ভিন্ন নাটকের অভাব ছিল না। Richardson-এর 'Clarissa Harlow' যদি উপন্যাস হয়, তাহ'লে 'কাদম্বরী'তে কি উপন্যাসের বীজ নিহিত নেই ? লেখক কি অর্থে উপন্যাস বলেছেন জানি না, 'সাইকো অ্যানালিসিস্' অর্থে কি ?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মধুসূদনের তুলনা কর্‌বার মোহ আজো কেন আমাদের আছে? কবিমাত্রেই তুলনীয়—এ কথা কেন হাস্যকর মনে হচ্ছে না? দুই বিভিন্ন প্রণালীতে বহমান্ প্রতিভাকে একত্র করে তুলনা করা সম্ভব নয়। আত্মার রহস্যময় অন্বেষণের পথে উপনিষদ এবং পাশ্চাত্য দর্শনের আলোতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা। মধুসূদনের কাব্যসাধনা শব্দঝঙ্কার ও কল্পনার অপরূপ চিত্রসম্ভাররচনায়। নির্ম্মিতি বা craft তাঁর হস্তে কলা বা art হয়ে ওঠেনি, একথা 'মেঘনাদবধ কাব্য' ধীরমস্তিষ্কে এবং যথোচিত সম্ভ্রমের সহিত পাঠ করে আমাদের মনে হয়নি। তবে ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।

আর শেষ কথা এই যে, মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদীর 'অপটু পদসঞ্চারের' পরে প্রবন্ধলেখক সেই পথে বহু 'ঘাসের ঘ্রাণ' এবং 'সূর্য্যালোকের প্লাবন' ও 'তারাখচিত আকাশের স্তব্ধতা' দ্বারা স্নান করে এসেছেন—এটা ঠিক বোঝা গেল না। নীরস সমালোচনার অঙ্গে এতটা কাব্য সাধারণ পাঠকের জন্য হয়তো নয়। তবে, যদি লেখক বল্‌তে চান যে তারপরে বঙ্গভাষায় চতুর্দ্দশপদী আঙ্গিক ও আত্মা ঠিক রেখে অন্য কবিদের হস্তে সূক্ষ্ম ইতালীয় আদর্শে মহা সাফল্য লাভ করেছে, তাহ'লে কতটা ঠিক বলা হবে? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই যে বাঁধাধরা নিয়মকানুন সর্ব্বতোভাবে মেনে চলেন নি।

শ্রীমতী বাণী রায়

ভাত

ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে কেউ আন্দাজ করতে পারেনি। বাঁধা-দরে চাল নেবার আশায় যারা ফুটপাতের কড়া রোদে ধুঁকছিল তাদের প্রায় সকলেই 'পাগলা'কে চেনে। ওকে কখনও নম্বর মারতে দেখা যায়নি। ড্রেণের পাশে উঁচু জায়গাটার ওপর তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চিলের চোখের মত জলজল করতে থাকে।

'কি রে পাগলা, পোলোয়ার গন্ধ পাচ্ছিস নাকি?' নিতাই শুধোয়।

টিয়ে পাখির মত নাকের উর্ধাংশ তার অদৃশ্য ঘ্রাণের লোভে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ফুটপাতের ও-পাশে অট্টালিকার কোন একটি বিশেষ ঘরের প্রতি দৃষ্টি তার তীক্ষ্ণতর আভায় উজ্জ্বল।

'শালা তোর বাবার কি?' পাগলা তার জট-পাকানো দুর্গন্ধ চুলে উকুন হাতড়ে উত্তর দেয়, 'জুটবে কোন দিন?' হাসে।

'না জুটুক! যেমন তুই পাগলা—তেমনি ঘেয়ো কুকুরের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট খেয়ে পেট ভরাস্!'

'ডাক্তার সায়েবের কুকুর ঘেয়ো?' এক দলা থুথু নিয়ে কচলাতে কচলাতে ও বলল, 'শালা তোর ঐ ত নেংটি ইঁদুরের মত তিন বাচ্চা। কুকুরের চাইতেও অধম, মাগ নিয়ে এয়েছিস চাল নিতে! ব্যাটা লজ্জা করে না?' হঠাৎ গলার স্বর নিচু করে, 'মাগীটার ত গতর আছে, কেন রোদ্দুরে শুকিয়ে ফেলছিস? খাটাবি? এই দেখ!' পাগলা তার ছেঁড়া কাপড়ের খুঁট বার করে নিতাইকে দেখায়। 'দেখ শালা চক্ষু সার্থক করে নে!' লাইন ছেড়ে নিতাই এগিয়ে আসে। পাগলার কাপড়ে বাঁধা অজস্র এক টাকার নোট, সিকি, দু'য়ানি, আধুলী! 'তোর বৌ'কে আট আনা, তোকে চার আনা করে রোজ রাতে দেবো, খাটাবি?'

'আস্তে বল্ না হারামজাদা!' নিতাই চাপা কণ্ঠে ধমক দেয়।

'ওঃ ব্যাটা আমার কত বড় মানী লোক!' পাগলা তার নোঙরা দাঁত ক'টা বার করে। বাঁ হাতে আর এক দলা থুথু নিয়ে কচলায়, শোঁকে! 'এবার আর নেংটি ইঁদুর নয়, বাঘের বাচ্চা! তুই শালার জান কি? ঐ ত খিঁচ-

পেটান চেয়ারা! দেখবি? দেখ!' বিব্রত নিতাই হাত ধরে তাকে নিয়ে যায় আড়ালে!

* * * * *

রোদ্দুরে গাছের পাতা কুঁকড়ে গেছে, হাওয়ায় দুলছে সে পাতা, মর্মরিত শাখায় বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। মাঝে মাঝে দু'একখানা মিলিটারী লরি রাস্তা কাঁপিয়ে দৌড়চ্ছে। চালকের নীল চশমায় পার্ল বন্দরের ছায়া। জ্যোৎস্না-লোকিত সমুদ্র-তীরে অলস প্রেমের গান। বারুদের গন্ধে নিশ্বাস ভারাক্রান্ত হয়ে এল।

ফুটপাতে গামছা বা কাপড়ের দ্বারা কয়েক হাত জায়গা রিজার্ভ করে মেয়েরা বাড়ির ছায়া আশ্রয় করেছে। ক্লান্তি আর অবসাদে মাংসপেশী তাদের শিথিল। বিকেল চারটেয় বাঁধা-দরের চালের দোকান খুলবে। ম্যাগ্‌নোলিয়া হেঁকে গেল। চলন্ত ট্যাক্সিতে বীর সৈনিকের আলিঙ্গনবদ্ধ ফিরিঙ্গি যুবতী প্রেমের আর সূর্যের উত্তাপে জরজর।

পাগলাকে দেখা গেল মেয়েদের নিরীক্ষণ করছে। ইতিমধ্যে কখন যে ড্রেনের পাশে উঁচু জায়গায় ভাত, মাছের কাঁটা এবং মাংসের হাড় জমেছে কারুর নজরে পড়েনি। একটি ভিখিরি মেয়ে ভাত শেষ করে মাংসের হাড় চুষছিল। ডাক্তার সায়েবের কুকুরটা ঘুরছিল আসে পাশে।

পাগলা দৌড়ে এল, তখন ভাতের একটি কণাও অবশিষ্ট নেই, কুকুরটাকে লাথি মেরে সে তাড়াল, বলল, 'ব্যাটা খবর দিতে পারনি? শূয়ারের বাচ্চা!'

মেয়েটা উঠে পড়ল, শরীরে হাড্ডি ছাড়া এক ফোঁটা মাংস নেই, বয়েস সতেরো কি আঠারো!

'এই দাঁড়া!' পাগলা প্রায় হুকুম করল তাকে।

মেয়েটি দাঁড়াল, তাকাল ওর দিকে, অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি!

খপ করে তার হাত চেপে ধরল সে, 'খেলি যে বড়!' পাগলা হাসল, 'থাকিস কোথা?'

'হাত ছাড় না!'

'খেলি যে তার দাম দিবি না?'

'কিসের দাম? হাত ছাড় না!' মেয়েটি একটা ঝট্‌কা মারল।

ওর মুষ্টি প্রায় আলগা হয়ে আসছিল, 'বা রে! তোর গায়ে ত ক্ষমতা আছে দেখছি! রাত্রে আসিস কুলি বাজারের ঘাটে দেখবো তোর তাগদ কত?'

মেয়েটি ওর হাতে কামড় বসিয়ে দিল। হাত সরিয়ে নিয়ে পাগলা চেঁচিয়ে উঠল তীব্র কণ্ঠে। রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল তার কনুই বেয়ে। 'আর ধরবি হাত?' জিজ্ঞেসা করল মেয়েটি।

পাগলা ক্ষিপ্র হাতে ধরল তার চুল, মাথাটা বার বার ঠুকতে লাগল মাটিতে। লাইন ছেড়ে কয়েকটি মেয়ে এগিয়ে এল; ও-পাশের পুরুষের পংক্তিতে জায়গা নিয়ে কি এক বিষম গোলমাল বেধে গিয়েছিল বলে তারা আর মনোযোগ দিতে পারেনি।

যে-মেয়েটি জোয়ান ছিল সে পাগলার পিঠে এক লাথি মারল। সঙ্গে সঙ্গে আট দশ জন মেয়ে তাকে আক্রমণ করল, এক দিকে হাত বাড়াতে গেলে অন্য দিক থেকে চলে তার ওপর বর্ষণ। কোন শব্দ নেই! পাছে মরদগুলো এগিয়ে আসে সে-ভয়ে পাগলার মুখে টুঁ শব্দ নেই।

কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল পাগলা ড্রেনের ধারে কাতরাচ্ছে; শেষ লাথিটা যে মেরে গেল—পাগলা দেখল—সে নিতাই-এর বৌ!

* * * * *

খবরটা যেন বাতাসে উড়ে এল—চারটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। জায়গা দখল করবার ধুম পড়ে গেল। কয়েক মিনিট হাতাহাতি আর ধাক্কা চলল। একটি মেয়ে কোলের ছেলেকে দুধ পান করাচ্ছিল। জায়গা তার বেহাত হয়ে গেল।

দুধ পান শেষ হলে শিশুকে কোলে নিয়ে সে বিদ্যুত-গতিতে ছুটে এসে প্রৌঢ়ার হাত চেপে ধরল, 'ও জায়গা আমার, বেরিয়ে এসো!'

'মর মাগী!' প্রৌঢ়া মুখ ভ্যাংচাল, 'তোর জায়গা কি? সকাল থেকে বসে আছি!'

কিন্তু সহজে ছাড়লে চলবে না, দশটি লোকের পেছনে মানে এক ঘণ্টা দেরি। 'বা রে বা! সবাই ত দেখেছে, জিজ্ঞেস কর না কেন?'

'কাকে আবার জিজ্ঞেস করব? আমি সরব না এখান থেকে, দেখি কার সাধ্য আমায় হাটায়!'

মেয়েটি ওকে টেনে আনবার চেষ্টা করল লাইন থেকে, কিন্তু পারল না, অবশ্য কেউ তাকে সাহায্য করবারও আগ্রহ দেখাল না। পাশের একজনকে সে বলল, 'ধরত ভাই ছেলেটাকে। দেখি জায়গা ছাড়ে কি না!'

ছেলেটিকে ও ধরল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে আসন্ন যুদ্ধের জন্যে প্রতিপক্ষ প্রস্তুত হল। মেয়েটি এগিয়ে এসে ওকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে স্থূলকায়া প্রৌঢ়া সামলাতে না পেরে ছিটকে বেরিয়ে গেল লাইন থেকে, মেয়েটি দাঁড়াল কায়েমী হয়ে; ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়তে কয়েক মুহূর্ত তার লাগল মাত্র। চুল ধরে ওকে হিড় হিড় করে টেনে আনল রাস্তায়। মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। ধুলো আর কাদায় শরীর তাদের বহুরূপী আকার ধারণ করল।

ব্যাপারটা আরও কিছুদূর গড়াতে পারত কিন্তু মেয়ে ভলান্টিয়ার্সের কেউ কেউ ততক্ষণে এসে পড়েছে।

'চাল নিতে এসেও তোমরা মারপিট ছাড়বে না?' কমরেড চামেলী দত্ত বলল, 'আমরা এই রোদ্দুরে কত জরুরী কাজ ফেলে তোমাদের সাহায্য করতে আসি। আর তোমরা কিনা রাস্তার মাঝখানে মারামারি করছ, কি হয়েছে আমায় বল।'

উভয় পক্ষের নালিশ শুনল চামেলী দত্ত। এ-আর-পি-র সুনীল ইতিমধ্যে এগিয়ে এসে বলল, 'ব্যাপার কি চামেলী দি? বাস্তবিক আপনি না থাকলে কি করে যে এ-সব ঝামেলার কাজ চলত কে জানে?' সস্তা এসেন্স মাখান রুমালখানা সে একবার ঘাড়ের ওপর বুলিয়ে নিলে আলগোছে যেন ঘামের সঙ্গে ময়লা না লাগে। ক্যাপস্ট্যানের প্যাকেট থেকে হাত সাফাই করে একখানি স্পোর্টসম্যান বার করল।

কমরেড চামেলী দত্ত, বাইশ বছরের সুশ্রী, শ্যামল তরুণী, দেশের পায়ে যার কুমারী-জীবন উৎসর্গীকৃত, মধুর হেসে বলল, 'না, ভাই, আমার জন্যে কি এ মহৎ কাজ আটকায়? এরা-যারা এক মুটো চালের জন্যে সারা দিন দাঁড়িয়ে আছে ঘর সংসার ফেলে এরা ত আমাদেরই ভাই বন্ধু, পরমাত্মীয়, এদের সাহায্যে না এসে আমি কি পারি? এই ত আমাদের দেশের সত্যিকারের অবস্থা, দারিদ্র্য, অনাহার, মৃত্যু।'

সুনীল সিগারেটটা অবশেষে ধরাল, একখানা প্যাঁচ কষাবার লোভ সে সংবরণ করতে পারল না, কি কথায় চামেলীর মন পাওয়া যায় এ-কদিনে সুনীল তা টের পেয়েছে, বলল, 'কিন্তু এই দেশব্যাপী দুর্দশার জন্যে যারা দায়ী তাদের চৈতন্য উৎপাদন আপনি কি করে করবেন?'

'আমাদের অস্থির হলে চলবে না!' চামেলী দত্ত রোদ্দুর থেকে গাছতলায় সরে এসে বলল, 'পথের সন্ধান আমরা পেয়েছি, সংকল্প এবং সাহস নিয়ে চাই এগিয়ে যাবার দৃঢ়তা, পেছলে চলবে না, ভয় দূর করতে হবে, আর চাই একতা। শক্তিবানের সঙ্গে লড়াই করতে হলে প্রয়োজন অধিক শক্তির, সে শক্তি আমরা অর্জন করতে পারি।

সুনীল ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগল।

কার্ড বিলি করা সুরু হয়েছে, এ-কার্ড দেখালে তবে চাল পাওয়া যাবে। ভলান্টিয়ার্সরা বার বার লাইন ঠিক করে দিচ্ছিল। ধাক্কা এবং গালাগালির বিরাম নেই।

সুনীল সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল, 'চামেলী দি'—চুপ করল সে, কেননা সে জানে কখন থামতে হয়।

চামেলী হাসল, গভীর সে হাসি; সুনীল হৃদপিণ্ডে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা সামলে নিল।

কমরেড সুরেন মজুমদারকে দেখা গেল। ভারিক্কি লোক, গম্ভীর, বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশ। সকলেই সুরেনকে শ্রদ্ধা করে, মান্য করে। বিভিন্ন বাঁধা-দরের দোকানগুলি সে একবার পর্যবেক্ষণ করে যায়।

* * *

রাস্তায় ক্লান্ত রিকসার শেষ টং টং শব্দও মিলিয়ে গেল। দূরে ডেকে উঠল একটি ভয়ার্ত কুকুর।

পার্কের ধারে পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে এক দল মানুষ ঘুমে আচ্ছন্ন। যদি বৃষ্টি নামে বাড়ির মধ্যেই তারা আশ্রয় নেবে। শায়িতদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য বোঝবার উপায় নেই। কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে সবাই। মাথার নিচে তাদের জীবনের সম্বল।

দূর থেকে পাগলাকে আসতে দেখে নিতাই বাড়ির দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল, পায়ের কাছে তার বৌ আর তিনটি শিশু।

কাছে এগিয়ে এল পাগলা, ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিয়ে অন্ধকারে স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য বোঝবার চেষ্টা করল।

নিতাই তার হাত ধরে বলল, 'করছিস কি? জেগে গেলে তোর পাগলামি ঘুচিয়ে দেবে তা জানিস? চল পার্কের মধ্যে।'

'কৈ কোথায়?' পাগলাকে আর বিকৃত-মস্তিষ্ক বোধ হল না।

'চল না। সব ঠিক।'

নিতাই তাকে নিয়ে এল পার্কের ছায়াঘন নির্জনতায়—একটি ট্রেঞ্চের ধারে।

'কৈ রে! দেখছি না যে?' পাগলার গলার অস্থিরতা প্রকাশ পেল।

'এই যে।' নিতাই খপ করে দু'হাতে তার গলাটা টিপে ধরল শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে।

দু'জনে গড়িয়ে পড়লো ট্রেঞ্চের মধ্যে। নিতাইর একখানা পা বুঝি ভেঙে গেল কিন্তু গলা সে ছাড়ল না। পাগলার মাংসপেশীর খাঁজে তার আঙুল-গুলো ক্রমশঃ গভীর হয়ে বসে যাচ্ছে।

নিতাই যখন অর্ধমৃত অবস্থায় ওপরে উঠে এলো তখন তার দু'হাতের মুটোয় পাগলার সঞ্চিত অর্থ।

* * *

রাত্রি গভীর।

আকাশে তারার মিছিল।

একটি পুরুষের হাত ধরে আধ-ঘুমন্ত এক শিশু, কোলে একটি; পাশে সসন্তান একটি মেয়ে, সহরের উত্তর মুখো তারা চলেছে।

দুরন্ত বেগে একটি মিলিটারী লড়ি দৌড়ে গেল, ইঞ্জিনের শব্দটাকে হঠাৎ সাইরেন বলে ভুল হয়।

কাল সকালে নূতন জায়গায় চালের জন্যে নম্বর লাগাতে হবে।

শ্রীরঞ্জত সেন

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হিন্দু আইনের ভিত্তি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেখা যায় যে, মানবজাতিসমূহের কৌমাবস্থার প্রথম যুগে কতগুলি রীতি ও রেওয়াজ উদ্ভূত হয়। পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের জন্য কতকগুলি রীতি ও ব্যবহার সৃষ্ট হয়। এইগুলিই পরে কৌমগত রীতি ও আইন বলিয়া গণ্য হয়। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুন (rule) দ্বারা জীবনের পরিচালনাকে 'রীতি' বা রেওয়াজ বলে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থনীতিক আদান-প্রদানের নিয়মকে 'ব্যবহার' বা 'আইন' বলা হয়। মানুষ যখন পরস্পরের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আদান-প্রদানের জন্য ঐক্য বা সমান নিয়ম গ্রহণ করে, তদ্দ্বারা একটা আদান-প্রদানের নিয়ম বা আইনও সৃষ্ট হয় (১)। ইহাই হইতেছে সাধারণ জাতিতাত্ত্বিক নিয়ম এবং এই তথ্য হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে কতকগুতি রীতি ও ব্যবহার উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহাদের কৌমগত রীতিকে "লোকাচার" (custom) বলা হইত এবং এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মগত রীতি ও নীতি (ধর্ম্মশাস্ত্র) ছিল। আবার এখন দৃষ্ট হয় যে রাজকীয় আইন বা রাজনীতি সম্পর্কীয় আইনও (অর্থশাস্ত্র) ছিল।

বলা হয়, হিন্দুর আইন—শ্রুতি ও স্মৃতি, সনাতন লোকাচারের উপর ভিত্তি করিয়া স্থাপিত (২)। হিন্দুরা বলেন, তাঁহাদের আইন ঈশ্বর প্রদত্ত (divine origin) (৩)। এইজন্য রাষ্ট্র এই আইনের অধীন—যেহেতু রাজা এই ঈশ্বরপ্রদত্ত আইনের অনুসরণ করিতে বাধ্য। কিন্তু রাজা বিচারকর্ত্তা বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাঁহার অনুজ্ঞা মোকদ্দমাকারীদের নিকট

১। Max Schmidt, "Voelker Kunde", P. 232.

২। Golap Sastri—Hindu Law. P. 14 ; Molla—Hindu Law, Pp. 7-8.

৩-৬। Sastri-Hindu Law—P13 ; 13 ; 13-14 ; 14.

শিরোধার্য্য হইত। এইজন্য পরবর্ত্তী টীকাকারগণ বলেন, কোন কোন বিষয়ে রাজকীয় অনুশাসন ঈশ্বরপ্রদত্ত আইনের ন্যায় বাধ্যতামূলক, যদি ইহা শেষোক্তের আপত্তিকর না হয় (৪)। রীতি (custom) ও আচার ব্যবহার (usages) হইল আইনের ভিত্তি এবং সেইগুলিকে ভারতের অ-লিখিত আইন (unwritten laws) বলা হয়। এইগুলি বেশীরভাগ লোকের লোকাচার বলিয়া তাহাদের দেশের সাধারণ আইন (common laws) বলা যাইতে পারে (৫)। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, ইহা সত্য যে হিন্দুযুগে রীতিকে আইনতঃ গ্রাহ্য করা হইত; এইজন্যই দায়াধিকার (Law of Inheritance), বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপার স্মৃতিতে সম্পূর্ণভাবে দেশগত (territorial) ছিল না(৬)।

শাস্ত্রীজী বলেন, জীবনের আচরণ বিষয়ে রীতি সমূহ অ-লিখিত ঈশ্বর-প্রদত্ত আইন বলিয়া বিবেচিত হয়। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "সদাচার" আইনতঃ গ্রাহ্য। কেহ কেহ ইহার পরিবর্ত্তে "শিষ্টাচার" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন (৭)। অবশ্য অনেক প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিতের মতে এই 'সদাচার' বা 'শিষ্টাচার' আর্য্যাবর্ত্তের রীতিতে আবদ্ধ, আবার কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে পণ্ডিত লোকদের আচারেই সীমাবদ্ধ। যদিচ ব্যবসায়ী শিল্পী প্রভৃতিগণ তাঁহাদের রীতি দ্বারাই বাধ্য। কিন্তু অসৎ-রীতি (immoral customs) এই আইনের বহির্ভূত। এইজন্য এই বিষয়ে বর্ত্তমানের আদালতে গোলযোগ উপস্থিত হয় (৮)।

মীমাংসাশাস্ত্রের ভাষ্যকারদের মধ্যে রীতি ও আচার-ব্যবহারের আইনের রূপ-বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, রীতি স্মৃতির নিম্নে এবং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে স্মৃতিই বলবৎ হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানের আদালতের দরবারে রীতিকে স্মৃতি অপেক্ষা বলবৎ বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে—যেহেতু "Under the Hindu system of law clear proof of usage will outweigh the written text of the law" (৯)।

ইংরেজ-ভারতের সর্ব্বোচ্চ আদালতে রীতিকে (custom) আইনের চূড়ান্ত বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। ওখানে বলা হইয়াছে—একটা বিশিষ্ট

৭। Sastri—P. 25.
৮-১৩। Sastri—Pp 26-28.

গোষ্ঠী বা বিশিষ্ট জনপদে 'রীতি' অনেক দিন হইতে ব্যবহৃত হওয়ায় উহা আইনের মর্য্যাদা ও শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে (১০)। রীতি (custom) সম্পর্কে জার্ম্মান আইনজ্ঞদেরও এই অভিমত (১১)।

উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রীতির সংজ্ঞা হইতেছে, ইহা একটি নিয়ম যাহা একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী বা বিশিষ্ট লোকসমষ্টি বা বিশিষ্ট জনপদে বহুদিনের প্রচলনের দ্বারা আইনের শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে (১২)। আবার রীতিকে (ক) স্থানীয় (খ) শ্রেণীগত (গ) গোষ্ঠিগত বলিয়া বিভক্ত করা হয় (১৩)।

হিন্দু-আইনের উৎপত্তি ও উহার কার্য্যকরী শক্তি বিষয়ে বর্ত্তমানের আইনজ্ঞ পণ্ডিতদের ও আদালতের ইহাই শেষ কথা। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। কারণ "আখিলউসের গোড়ালির পশ্চাতে ধাবমান কচ্ছপের ন্যায়" মোটা মোটা স্মৃতি পুস্তকসমূহ প্রতিনিয়ত হিন্দুর পশ্চাতে ধাবমান হইতেছে।

ব্রাহ্মণ্য-পুরোহিততন্ত্র আজ পর্য্যন্ত দাবী করে যে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ-ই হইতেছে আইন, রাষ্ট্রের সকলে ইহা দ্বারা বাধ্য এবং পুরোহিতেরা এই আইনের হোতা। কিন্তু আজকালকার ঐতিহাসিকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, "অর্থশাস্ত্র" নামক আর এক শ্রেণীর আইন-পুস্তক ছিল। অবশ্য ইহাও ব্রাহ্মণদের দ্বারাই লিখিত হইয়াছিল *। এইজন্য ইহার মধ্যেও শ্রেণী-লক্ষণ বিরাজ করিতেছে। এমন কি, কৌটিল্য যিনি শূদ্রদের রাজনীতি ও অর্থনীতি-ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের উপর কঠোর ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও এই সকল পুস্তকে উত্থাপিত হইয়াছে।

এতদিন যাঁহারা কতগুলি ব্রাহ্মণদের লিখিত 'ধর্ম্মশাস্ত্র' পাঠ করিয়া হিন্দুর আচার-ব্যবহার, রীতি ও আইনের শেষ বুঝিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে

* ব্রাহ্মণ ব্যতীত বৌদ্ধদের মধ্যে কেহ কেহ যে 'রাজনীতি' সম্পর্কে পুস্তক লিখিয়াছিলেন গৌড়ের সম্রাট ধর্ম্মপালের জামাতা 'মঞ্জু রক্ষিত' তাহার প্রমাণ। তাঁহার পুস্তকগুলি দ্বিতীয় "তান্‌যুর"-এ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। সেইগুলি আবিষ্কৃত ও অনূদিত হইলে অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হইবে। এতদ্বারা প্রাচীন ভারতের রাজনীতিতত্ত্বের অনেক নূতন সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।

করিতেন, এক্ষণে কৌটিল্যের পুস্তক আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ভাবিয়া মাথা ঘামাইতেছেন যে হিন্দুর রাষ্ট্রীয় আইনটি কি ছিল? জলি বলেন, স্মৃতিসমূহ ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিজেদের ব্যবহারের জন্যই লিখিত হইয়াছিল এবং এইগুলিতে নিজেদের শ্রেণীগত দাবী স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইঁহাদের মতে, ক্ষত্রিয়েরা তাঁহাদের নিম্নে একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী; আর দেশের বেশীর ভাগ লোক যাহারা শূদ্র, তাহারা সমাজের এত নিম্নস্তরে অবস্থিত যে তাহাদের আচার-ব্যবহার এবং আইনগত রীতির উল্লেখই প্রয়োজনীয় বলিয়াছেন স্মৃতি-কারেরা মনে করে নাই। পুনঃ স্থানীয় রীতি এবং বিভিন্ন পণ্ডিতদলের মত-ভেদের ফলে স্মৃতিসমূহে মতভেদ আছে। আবার জলি বলিয়াছেন, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, স্মৃতিগুলি ব্যক্তিগত লিখিত পুস্তক; সেইজন্য অন্যান্য দেশের আইন পুস্তকের পর্য্যায় ফেলা যাইতে পারে না (১৪)।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, 'ধর্ম্মশাস্ত্র' ও 'অর্থশাস্ত্র' নামে দুই শ্রেণীর আইন-পুস্তকই ছিল। ইহাদের মধ্যে কোনটি রাষ্ট্রীয়-আইন বলিয়া গ্রাহ্য হইত তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া জয়শওয়াল বলিয়াছেন, "তাহা হইলে দেশের আসল civil and criminal laws কোথায় ছিল? এই সম্পর্কে লেখকের উত্তর এই, তাহা অর্থশাস্ত্রেই নিহিত ছিল (১৫)। তৎপর তিনি বলিতেছেন "সূত্রযুগে রাজার আইন ধর্ম্ম-আইন হইতে পৃথক ছিল। সেই-গুলি অর্থশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইত···ধর্ম্ম-আইন (স্মৃতি) যথার্থ হিন্দু-আইন বা তাহার ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না···কেবল সর্ব্বপ্রথম মানবধর্ম্মশাস্ত্রকে অর্থ-আইন-এর স্থান দখল করিতে দেখা যায় এবং ইহাকে নিজের তাবেদার করিয়া নেয়। ইহার কারণ যে···পুরোহিততন্ত্র দেশের রাজ-শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় (১৬)।" এক্ষণে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, অর্থশাস্ত্রই ভারতীয় আর্য্যরাষ্ট্রের আইন (code) ছিল এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সাহিত্য ও অর্থশাস্ত্রগুলির প্রমাণ মানিয়া নিয়াছে (১৭)।

কিন্তু হালের পণ্ডিতদের মধ্য হইতে এইরূপ মত উত্থাপিত হইয়াছে যে, ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত

১৪। Jolly—Recht und Sitte, P. 45.

১৫-১৭। "Manu and Jajnavalkya", Pp. 13, 17, 3.

হইলে প্রথমোক্তই বলবৎ হইবে (১৮)। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণ নিয়া অনেক গোলমাল আছে; আর ব্রাহ্মণাধিপত্যের সময়েই পুরাণসমূহ লিখিত বা পুনঃ সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়; সেইজন্য ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের মতের প্রতি-ধ্বনি করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

এই বিষয়ে উভয় দলের মত বিশ্লেষণ করিয়া এই তথ্য পাওয়া যায় যে, শান্তি সম্পর্কে রাজকীয় আইন ব্যতীত "প্রায়শ্চিত্ত" নামে আরও একটি সামাজিক আইন ছিল *। এই সামাজিক বিচার ও দণ্ড রাজাদ্বারা ক্ষমতা-প্রাপ্ত "পরিষদ" পরিচালনা করিত (১৯)। কিন্তু এই সামাজিক দণ্ড কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে; আর "মহাপাতক" বিষয়ে পরিষদের বিচারকালে রাজাকেই দণ্ডপ্রদান করিতে হইত (২০)। এতদ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, রাজার অনুজ্ঞাই শেষ আইন ছিল। তাহাতে ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে, রাষ্ট্রীয়-আইন (State or Civil Law) ধর্ম্ম বা পৌরোহিত্য আইন (priestly canon) অপেক্ষা ঊর্দ্ধে ও বলবৎ ছিল।

আবার এই বিষয়ে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ইউরোপের মধ্যযুগীয় গির্জ্জার আদালতের (Ecclesiatical Law Court) ন্যায় ব্রাহ্মণদের জন্য পৃথক আদালত ছিল না। "পরিষদ" একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহাতে সামাজিক সমস্যাগুলি মীমাংসিত হইত, আর ইহা রাজার ক্ষমতার বাহিরেও থাকিত না। বোধ হয়, ইহা আজকালকার জাতি-পঞ্চায়েতের ন্যায় কার্য্য করিত।

অতঃপর শুক্রনীতি ও বৃহস্পতিতে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে রাজা ও তাহার কর্ম্মচারীদের সহযোগিতায় আদালত সংগঠিত হইত (২১)। এক্ষণে

১৮। সিতিকান্ত বাচস্পতি—"The Principles governing the administration of criminal law in ancient India" (in Bengali), P136.

* এই সম্বন্ধে Dr. B. N. Dutta—"Authoritative Source of Hindu Law" in Advance Puja Special, 1940 আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৯-২০। বাচস্পতি—১২, ১৩-১৪।

২১। Sukraniti—translated by Prof B. K. Sarkar. শুক্রনীতি অপেক্ষাকৃত হালের। ক্যানের মতে বৃহস্পতি নারদের সমসাময়িক। তাহারা গুপ্তযুগের লোক বলিয়া অনুমিত হয়।

কথা উঠে, বিচারকালে রাজা কোন আইন দ্বারা পরিচালিত হইত। এই বিষয়ে মতভেদ আছে। জলি বলেন, রাজা, মন্ত্রী বা কোন ধর্ম্মমন্ত্রী আইনের সম্পর্কে কোন পুস্তক লিখিলে তাহাই সেই রাষ্ট্রের আইন বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইত। এইজন্য তিনি বলেন, যেসব স্মৃতি আজকাল প্রচলিত আছে তাহা হিন্দুদের গ্রাহ্য আইন পুস্তক নহে (২২)। ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উদার পুস্তক "পরাশর সংহিতা" ব্রাহ্মণদের মতে কলিযুগে গ্রাহ্য নয়।

কিন্তু ভবিষ্যপুরাণ ও ব্রাহ্মণদের দাবীর বিপক্ষে শুক্রনীতি বলিতেছে, "রাজা শাস্ত্রে অ-লিখিত এবং জাতি, গ্রাম, সংঘ ও গোষ্ঠী মধ্যে প্রচলিত রীতি-গুলি ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার কর্ত্তব্য সমাধান করিবে (৪-৫।৮৯—৯১)(২৩)। যেসব রীতি দেশ, জাতি, (caste) বা মূলজাতি (race) মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে সেগুলি অটুট রাখিতে হইবে, নচেৎ লোক বিক্ষুব্ধ হয়" (৪,৫,৯২-৯৩) (২৪)। দেশের বিভিন্নাংশের বিভিন্ন রীতির প্রচলন সম্পর্কে ইহাতে আরও উক্ত হইয়াছে, "এই লোকগুলির কার্য্যের জন্য তাহাদের প্রতি প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তি-বিধান হইতে পারে না···যাহাদের রীতিগুলি জনশ্রুতি বা প্রথা (tradition) দ্বারা গৃহীত এবং তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের দ্বারা জীবনে প্রয়োগ করা হইতেছে তাহারা এই রীতিগুলি অনুসরণ করে বলিয়া নিন্দনীয় হইবে না" (৪, ৫, ১০১)(২৫)।

এতদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থানীয় আচার ও আইনের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে শুক্র, 'রীতি'কেই শেষ-আইন অর্থাৎ এই সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। নারদও এই প্রকার বলিয়াছেন (২৬); কাত্যায়নও বলিয়াছেন যে, বেদের ন্যায় রীতিগত আইনকে সম্মান করিতে হইবে (২৭)। বৌধায়নও উত্তর এবং দক্ষিণের কোন কোন ব্যাপারে পৃথক রীতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "এই সকল রীতি বিষয়ে প্রত্যেক দেশের নিয়মই বলবৎ বলিয়া বিবেচিত হইবে" (১।১।২—৬)।

২২। Jolly—P. 27-28.

২৩-২৫। Sukraniti—Pp. 187-188.

২৬। Kane—History of Dharmasastras, P. 203.

২৭। Jolly—Hindu Law & Customs, tr. by B. K. Ghose, Pp. 3-4.

কিন্তু বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী সময়ে গৌতম বলিয়াছেন, "কোন কোন দেশের কতকগুলি রীতি বৈদিক প্রথা ও স্মৃতির বিপক্ষতাচরণ করিলে গ্রাহ্য হইবে, এই বিধান অন্যায়" (২৮)। ইহার বহুপরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা কুমারিলভট্টও ব্রাহ্মণ্যবাদীর অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া এই প্রকারের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিকা, ১।৩)। কিন্তু আইন সম্পর্কিত শেষ পুস্তক শুক্রনীতির মতামত ইতিপূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে এই বোধগম্য হয় যে, গুপ্তযুগে ও তৎপরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্যকালে যখন বিভিন্ন কৌমগুলি আর্য্যীভূত হইতেছিল তখন তাহাদের রীতি ও আচার হিন্দু-আইনজ্ঞেরা স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যই বলিয়াছেন, "কোন দেশ বিজিত হইলে তত্রত্য আচার-ব্যবহার ও কুলস্থিতি তথৈব পরিপালন করিতে হইবে" (১, ৩৪৩)। তৎকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভিন্ন রীতি ও আচার স্বীয় সমাজশরীরে কুক্ষিগত করিতেছিল; এইজন্য "লোকাচার" বা "দেশাচার" হিন্দু-আইনে আজ পর্য্যন্ত বলবৎ। এই কারণ বশতঃ জলি বলিয়াছেন, "রীতিই হইতেছে হিন্দু-আইনের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি।" রীতিকে বিশেষ স্থান প্রদান করায় যাঁহারা আইনের ইতিহাস নিয়া আলোচনা করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে ভারতীয় রীতিগত আইনের (customary law) চিহ্ন (trace) এবং তাহা কি প্রকারে বাঁচিয়া আছে উহার মূল অনুসন্ধান করা। ইহা বিশেষভাবে এই কারণেই প্রয়োজন যে, ব্রাহ্মণদের মত প্রকাশ করার একটা বাতিক (theorising tendency) এবং শ্রেণী-স্বার্থ তাহাদের আইন-বিষয়ক সাহিত্যকে এত অভিভূত করিয়াছে যে তাহাদের আইনের নিয়মগুলিকে সমালোচনা ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যায় না (২৯)।

এই আলোচনা হইতে ইহা বোধগম্য হয় যে, স্মৃতিগুলি ব্রাহ্মণদের শ্রেণী-স্বার্থের পরিচায়ক পুস্তক মাত্র এবং এইগুলিতে উক্ত ব্যবস্থাসমূহ তাহাদের খেয়ালপ্রসূত ইচ্ছামাত্র। এইজন্যই এই পুস্তকগুলির মধ্যে এত বিসম্বাদী মত ব্যক্ত হইয়াছে। এইগুলি যে আইনপুস্তক নহে তাহা বিভিন্ন রীতি

২৮। Kane—P. 17; Jolly—Pp. 3-4.

২৯। Jolly—Op. cit, Pp. 3-4.

ও আচারব্যবহার পাশাপাশি বর্ত্তমান থাকা হইতেই ধরা পড়ে। যেমন, উত্তরে বৌধায়ন (প্রশ্ন—১, ২, ৩) ও বৃহস্পতি (২৯ শ্লো) মাতুল কন্যা ও পিতৃস্বসা পুত্রের বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণে ইহা আইন-সঙ্গত এবং ইহার সমর্থনে স্মৃতিও তথায় রহিয়াছে; পুনঃ উত্তরের সাহিত্যেও এই প্রকারের বিবাহের নজীর আছে (মহাভারত—অর্জ্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ এবং ভাস দ্রষ্টব্য)। মনু ব্রাহ্মণদের মৎস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন (১০।৯২), কিন্তু কুর্ম্মপুরাণে শঙ্ক (আইস্) যুক্ত মৎস্য দেবতা ও ব্রাহ্মণদের নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিবার ব্যবস্থা আছে। (১৭।৩৭)। বাঙ্গলা, কাশ্মীর এবং বোম্বাই ও মিথিলার সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যেও উহা প্রচলিত আছে, ইহাঁদের মধ্যে এইটি 'লোকাচার' রূপে গণ্য ; স্মৃতি ও পুরাণে পলাণ্ডু, ও রসুন [মনু ৫।২০ ; এই গ্রন্থে' 'গাজর'ভক্ষণও নিষিদ্ধ এবং কুর্ম্ম (১৭।২০) ; এই সঙ্গে "শুক্ত"ও নিষিদ্ধ হইয়াছে] ভক্ষণ নিষিদ্ধ ; কিন্তু ভারতের সকল যায়গায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে (জনকতক গোঁড়া ব্যতীত) তাহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। শূদ্রদের উপবীত গ্রহণ নিষিদ্ধ ; কিন্তু আলরেরুণী খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে শূদ্রদের শণ (linen) সূতার যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন : The Sudra is like a servant to the Brahmin……he still desires not to be without a Yajnopavita, he girds himself only with the linen one. (Ch. LXIV) (৩০)। মনুতেই একস্থলে ব্রাহ্মণদের চাতুর্ব্বর্ণের বিবাহের ব্যবস্থা আছে, আবার অন্যত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে ; একস্থলে মাংস খাওয়া নিষেধ (১০।৯২) করা হইয়াছে, আবার অন্যত্র যজ্ঞের মাংস ভোজনের বিধান আছে। পুনঃ বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। অথচ মধ্যদেশের অনাচরণীয় নিম্নশ্রেণীয় হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও তালাক প্রথা (divorce) প্রচলিত আছে এবং এই প্রথার উল্লেখ কৌটিল্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরূপে দেখা যায় যে, এই সকল ধর্ম্ম পুস্তকের অনুশাসনগুলি পুরোহিত-তন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থ প্রণোদিত ইচ্ছামাত্র। ইহাতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার

৩০। Alberuni—tr. by Sachau, Vol. II, P. 136 ; রাজপুতনায় টড্‌ও ইহার প্রচলন দেখিয়াছিলেন (Rajasthan, Vol. I.)

বড়াই মাত্র আছে। সমাজতত্ত্ববিদ্ সরোকিনের (৩১) ভাষায় এই সব পুস্তককে Ideational অর্থাৎ তুলনামূলক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও যুক্তি বিহীন বিশ্বাসগত একটা কাল্পনিক আদর্শমাত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

হিন্দুর ধর্ম্ম-আইন যে পুরোহিততন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণকল্পে খেয়াল প্রসূত যুক্তি-বিহীন আদর্শমাত্র তাহার প্রকৃষ্ট নজীর মধ্যযুগের স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন। প্রাচীন প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক অনেক সংস্কৃত পুস্তক ঘাঁটিয়া তাঁহার "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" লিখিত হয় এবং বাঙ্গালার হিন্দুর সমাজের উপর উহা প্রয়োগ করা হয় এবং তন্মধ্যে তিনি যেসব নূতন ব্যবস্থা হিন্দুর কলি-যুগের ব্যবস্থা বলিয়া প্রদান করেন তদ্বিষয়ে তিনি কি অনুসন্ধান করিয়া-ছিলেন যে তাহা ভারতের অন্যত্র প্রচলিত বা অপ্রচলিত কিনা ? তুলনা-মূলক আলোচনা দ্বারা তিনি কি ঘোষণা করিয়াছিলেন কলিতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বর্ণ বিদ্যমান ? সেইকালে ভারতের সর্ব্বত্রই ক্ষত্রিয়বর্ণের দাবীকারী জাতিসমূহ বিদ্যমান ছিল এবং অনেক রাষ্ট্রও তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত ; এমন কি তাঁহার পরে বাঙ্গলা প্রদেশে লিখিত বিভিন্ন পুস্তকে বাঙ্গালী সমাজে "ব্রহ্মক্ষত্রী" এবং রাজপুত্র বা রাজপুত জাতিদের অস্তিত্বের কথা উল্লিখিত আছে। আবার পশ্চিমে বৈশ্যত্বের দাবীকারী জাতিসমূহও তৎকালে বিদ্যমান ছিল। বলা হইয়া থাকে যে, বাঙ্গলায় তৎকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সংস্কার-বিহীন ছিল, কিন্তু তুলনামূলক অনুসন্ধান করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে অন্যত্র তৎকালে সেই প্রকারেরই আচার ছিল এবং আজও অনেকটা তদ্রূপই আছে। আজও পশ্চিম-ভারতে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের বংশধর বলিয়া দাবীদারদের অনেকেই উপবীত ধারণ করেন না, বৈশ্যদের মধ্যেও তদ্রূপ। বাঙ্গলার সাহিত্যে মধ্যযুগে ব্রাহ্মণদেরও প্রয়োজনের সময়ে কেবল উপবীত ধারণ করিবার কথা উল্লেখ আছে †। পুনঃ রঘুনন্দনের সময়ে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণদের কতটা ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ছিল ? নবদ্বীপে তখন কি শ্রুতি অনুযায়ী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিল ? সিন্ধু ও কাশ্মীরের ব্রাহ্মণেরা মুসলমান-স্পৃষ্ট খাদ্য

৩১। Sorokin—Cultural & Social Dynamics.

† দীনেশচন্দ্র সেন—বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৪। "ময়নামতীর গান ও গোরক্ষবিজয়"—ব্রাহ্মণদের গলায় উপবীত সর্ব্বদা থাকার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না, অনেক সময়ে উহা বস্ত্রাদির ন্যায় টাঙ্গাইয়া রাখা হইত, বাহিরে যাইবার সময় তাহা ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। এই রীতি মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন কোন পরিবার যে উপবীত বিরহিত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ সেদিনের প্রবাদবাক্যে রহিয়াছে ; "পৈতা ছাড়ি পৈতা নেয় বৈদিকে দেয় পাতি"। এই উপলক্ষেই কি 'চেনা বামুনের পৈতার দরকার নাই' রূপ প্রবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল ?

আহার করেন বলিয়া শোনা যায়। সিন্ধুদেশের শূদ্রজাতিগুলিও উপবীত ধারণ করেন এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা বেনিয়াদের অনুকরণ করেন (‡)। আবার তিনি হিন্দুর বিধবাদের নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা দেন। কিন্তু লেখক যতদূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, ইহা অন্যত্র প্রচলিত নাই। কেবল একদল ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য, এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ হয়, তথাকথিত আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া তাঁহারা উহা আঁকড়াইয়া আছেন; কারণ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যায় যে, গোঁড়ামি বা প্রতিক্রিয়াশীলতা আভিজাত্য অহঙ্কারের লক্ষণ বলিয়াই প্রমাণিত হয়। এই ব্যবস্থা কিন্তু বাঙ্গলার অন্য জাতির বিধবারা মানেন না। তাঁহারা মৎস্যাদি আমিষ আহার করেন এবং নিরম্বু উপবাস করেন না। তাঁহারা রঘুনন্দনের ব্যবস্থার বাহিরের দল কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও আজকাল অনেকে মৎস্য ভক্ষণ বর্জ্জন করিতেছেন। বোধ হয়, তাঁহারা কায়স্থ ও ব্রাহ্মণজাতীয় বিধবাদের অনুকরণ করেন, নচেৎ শেষোক্তদের সমাজে তাহাদিগকে নিন্দনীয় হইতে হয়। কিন্তু আসলে ইহা একটি দেশাচার মাত্র, ইহা পাপ বা দুষ্কৃতি নয়। রঘুনন্দনের Ideational খেয়াল সমগ্র বাঙ্গলার হিন্দুর উপর কার্য্যকরী হয় নাই (৩২)। ফলে এই খেয়ালগুলি হিন্দু বিধবাদের উপর দুর্ব্বিসহ ও পীড়াদায়ক হইয়া আজও আছে (এই সঙ্গে বাঙ্গলায় রঘুনন্দনের "সতীদাঃ" ব্যবস্থারও উল্লেখ করা যায়)। এই সকল অতি উদ্ভট ব্যবস্থাগুলির ভিত্তি না আছে লোকাচারে না আছে শ্রুতিশাস্ত্রে। এইজন্যই আজ রঘুনন্দনকে কেহ জালিয়াৎ বলিতেছেন, কেহ বা আবার মুসলমান শাসকের উৎকোচগ্রাহী বলিয়া অভিযুক্ত করিতেছেন (ভট্টাচার্য্যের 'হিন্দুমিশন' পত্রিকায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

‡ Hasting's Encyclopaedia, Vol. II এবং ইহাতে W. Crooke's প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৭১।

৩২। 'বর্দ্ধ ব্রাহ্মণ' সমাজভুক্ত অনেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় এবং ঘোষাল বংশীয় বিধবারা আমিষাদি খাদ্য বিষয়ে নিজেদের যজমান বিধবাদের আচার অনুকরণ করেন। যাঁহারা ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং স্বকর্ণে শুনিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতেই লেখক এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লক্ষ্মীছাড়ী

(৮)

দিনের পিছনে দিন ছোটে, তার পিছনে পক্ষ, তার পিছনে মাস। এমনি করে সময়ের ছুটোছুটিতে আস্ত একটা বছরই দৌড়ে চলে যায়। এই বিগত প্রত্যেক দিনের প্রতিটি ক্ষণের মধ্যে চাঁপা বেঁচে এসেছে। এমনি করে দু-দুটো বছর চাঁপার সুমুখ দিয়ে চলে গেছে।

চাঁপা ছেলে বয়সে অনেক ঠ্যাঙানি খেয়েচে। ওর সৎমা মরবার আগে পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে ঠোনাটা, চুলের মুঠো নাড়া, গুম্‌গুমিয়ে গোটাকতক কিল দিয়েচে। এই শাসনের ভিতর থেকে বয়েস বাড়লেও চাঁপা যেন কচিটিই ছিল। কিন্তু এ বাড়ী এসে অবধি ও দেখলে, ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো।

এখানে এসে পা দেবার পর কিছুদিনের মধ্যেই যেসব গণ্ডগোল ঘটলো তাতেই চাঁপা একেবার ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তার ওপর ওর বুকের মাণিক—আমোদ আল্লাদ, ঝগড়াঝাঁটি, পাড়া-বেড়ানো, খেলাধুলো, গল্পগাছা, সবের সঙ্গী, ওর জীবনের একমাত্র বন্ধু টগরের অভাব।

এইসব মিলিয়ে চাঁপার মন মুহ্যমান হয়ে গেল। তাই ওর নিজের দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্ত্তনটা ভালো করে ঠাওর করবার অবসর পায় নি। ও দেখলে, এখানে ওকে শাসন করবার কেউ নেই। বরঞ্চ যেন যত্নআত্তি লেগেই আছে। ওর প্রতি যে বাড়ীর সবাইকার নজর, ও যে ঘরের কেউকেটা তা ও স্পষ্ট বুঝলে।

ও ভেবেছিল, ওর সতীনপোটা নিশ্চয় ওকে শাসন করবে। তা ছাড়া সতীনপো বৌ, সেতো ঠোনাঠুনি গালমন্দর আগায় আগায় রাখবে।

কিন্তু ওর সতীনপো ভারিক্কিচালের অত বড় জোয়ান হয়ে যে মিষ্টি করে নরম গলায় কথা কইবে, এ চাঁপার ধারণারও অতীত। তাই ও প্রথমটায় একটু আশ্চর্য্য হয়ে বড় বড় চোখ মেলে সতীনপোর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তখন শোকের সময়, চোখ দিয়ে শুধু টপটপ্ করে জল পড়তে লাগল। তা নৈলে চাঁপা অবাক হয়ে ওর সতীনপোকে জিজ্ঞেস করতো, কি বললে?

তাছাড়া ওর সতীনপো সময়ে অসময়ে এসে, বিষয় আশয়, বাগানপুকুর, গরু বাছুর, আত্মীয়স্বজন, লোকলোকুতো, সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। কি করি বলো তো? চাঁপা তো অবাক। ও আবার বলবে কি? তাই ভেবে পেলে না। সতীনপো ছাড়ে না। বলে, সবই তো তোমার। কাজেই হুকুম পরামর্শ দরকার বৈ কি!

চাঁপা হতবাক। সব ওর! ও হুকুম করবে! পরামর্শ দেবে!

শেষ পর্য্যন্ত ওর বিস্ময় ঘোচে না। কথা ফোটে না।

সতীনপো বলে, ছোটগিন্নি, অমন চুপ করে থাকলে তো চলবে না। আমাকে পরামর্শ দিতে হবে বৈকি।

ব্যাপারটা ওর মনের মধ্যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে। এ মর্য্যাদায় মনের আশ্বাস পায় না। তবুও সতীনপোর প্রশ্নগুলো মনে মনে ভাবতে লাগল। এমনি করে দায়িত্বের ভাবনা ওর মাথায় ঢুকল। তাইতে চাঁপার গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পেল।

ও নিজেই মাঝে মাঝে ভাবত, দূর হোকগে ছাই, এসব কথায় আমার দরকারই বা কি! বুঝিও না কিছুই। তার চেয়ে বরঞ্চ কোমোরপাড়ার ভেতর দিয়ে গিয়ে বকতীর্থবিলের পাড়ে দাঁড়ালে দেখা যায়—বক উড়চে, শঙ্খচিল উড়চে, পানকৌরি ডুব দিচ্ছে, হাঁসের প্যাঁকপ্যাঁকানি, মাছরাঙার ঝাঁপ খাওয়া, মালোদের ছেলেরা ঘুনি পাতচে, ছিপ নাচাচ্ছে; গরুগুলো কচি ঘাসের লোভে লোভে জলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্চে; বৌরা জল নিতে এসেচে। কিন্তু ভাবনাটা ওর মাথায় লেগেই থাকে। সাহস পেয়ে চাঁপার মাথায় ভাবনা জ'মে উঠেচে।

বলবো বলবো করে ওর দুটো দিন কাটলো। সংসার সংক্রান্ত ব্যাপার ভাবতে ওর ভারি মজা লাগে। চাঁপা ভাবলে লোকগুলো অবশ্যই বোকা। তা নৈলে এইসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে অত মাথা কোটাকুটি কিসের! কারণ পুকুর থাকলেই লোকে দু চারটে মাছ ধরে খাবে বৈ কি! তাতে আবার খরচ করে কাঁটাপালা ফেলবার দরকার কি! কিম্বা পাটের দর যদি নেবেই থাকে, উপায় কি। ঘরে মজুত রাখো। যেই দাম চড়বে তখন বিক্রী করলে লাভটা ঠিক থাকে। তাছাড়া জ্ঞাতিকুটুম্ব যে যেখানে আছে, তাদের তত্ত্বতল্লাস

করতে হবে বৈ কি। তা যেমন করেই হোক। তা নৈলে ভালো লাগে না। গোয়ালঘরের পোড়ো চালাটা দীনে নাপতে যদি চেয়েই থাকে, দিতে হবে বৈ কি। আর তা না হলে, এই ঘরপোড়া অবস্থায় লোকটা একপাল ছেলে-পিলে নিয়ে যায় কোথায়! এসব তো অতি সহজ সমস্যা। এই ভরষায় একদিন সুযোগ বুঝে চাঁপা রাতের বেলায় কথাটা পাড়লে।

সতীনপো তখন রান্নাঘরের দাবায় খেতে বসেচে। তার সুমুখে কাঠের দেরকোর ওপর মাটির পিদ্দিম জ্বলচে।

চাঁপা ইতঃস্তত করে করে শেষে বললে, তুমি যে সেই বলছিলে—।

কথা আটকে গেলো।

সতীনপো উৎসাহভরে বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো বলো। চাঁপা কোনক্রমে বললে।

বৌ তো রান্নাঘরে বসে একা একা হেসেই আকুল। সতীনপো অথচ চাঁপার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বসে আছে। বৌয়ের হাসির ছুরি ওর অবাকপানা ভাবে বিঁধে গেলো যেন। চমকে উঠে ও বললে, কিরে বৌ, হাসলি যে বড়? ছোটগিন্নি যা বলচে, তোর মাথায় কোনদিন তা ঢুকবে না। ওটা অনেক বড় মনের পরামর্শ। বুঝলি?

বৌ কি বুঝলে কে জানে। মোটকথা বিষয় বুদ্ধি সম্বন্ধে স্বামীর ওপর ওর অগাধ বিশ্বাস। কাজেই খুব একটা ঘা খেয়ে বৌ চুপ করে গেল। মুখ-খানা ভার করে এসে দাঁড়ালো, রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরে।

সতীনপো চাঁপাকে বললে, তুমি যা বললে, তাই আমি করবো।

চাঁপা কিন্তু বৌয়ের হাসি শুনে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সতীনপো যতই বলুক না কেন, কোন কথা আর ওর কানেই ঢুকল না।

চাঁপার এই অপ্রস্তুতের ভাবটা লক্ষ্য করে ও বললে, আচ্ছা ছোটগিন্নি, আমি না হয় তোমার সতীনপো, কিন্তু সম্পর্কটা তো ছেলের। কিন্তু কৈ, কখনো তো আমাকে কাছে ডাকো না।

চাঁপা একেবারে সিঁদুর বর্ণ হয়ে উঠল। বললে, তুমি আমার চেয়ে কত বড়! কি করে—তোমাকে—চ—চন্দোর বলে ডাকি! আমার ভারি লজ্জা করে।

চাঁপার মনে নতুন ভাবের ছোঁয়া লেগেচে দেখে চন্দোরের মনে স্বস্তি লাগল। ও খেতে খেতে রকমারি গল্পগাছা সুরু করলে।

সেদিন একাদশী, বোশেখ মাসের শেষ আন্দাজ। রোদ্দুর টা টা করচে। মাঠের মাটি ফেটে লম্বা লম্বা চিড় খেয়ে গেচে। গরুগুলো ধুকতে ধুকতে এসে কাদাঘোলা তলানি জলের ডোবায় মুখ বাড়াচ্চে। পাখীরা গাছের পাতার তলায় চুপচাপ বসে আছে। শুধু চাতকের কাতর ডাক, বোশেখের শুষ্কতাকে ভেদ করে কেঁপে কেঁপে উঠচে—ফটিক্ জল!

চাঁপাকে নির্জ্জলা উপোষ করতে হবে। বিধবার নিয়ম, উপায় কি!

চন্দোর যেন কিছুই জানে না। এমনিভাবে ভোরবেলা বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল, ছোটগিন্নি, আজ আর আমার জন্যে বসে থেকো না। গুদোমে আজ পাট ওজন হবে। সমস্ত দিনটাই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। সেখানেই বক্সীকে দিয়ে যা-হোক দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে খেয়ে নেব।

দুর্গার উপায় নেই। না রাঁধলে, না খেলে, সংসারের অকল্যাণ। চাঁপার শুকনো মুখখানার দিকে চেয়ে ওর মনটা হু হু করে উঠতে লাগল। আড়ালে গিয়ে বৌ বারে বারে চোখের জল পুঁছতে লাগল। এসব ভাল লাগে না। তবুও যা হোক করে হাতা খুন্তি নেড়ে কাজে লাগতে হয়।

চাঁপা রান্নাঘরের দাবায় এসে বসলো। বললে, হ্যাঁ বৌ, কিছু খেতে নেই?

বৌ সাড়া দিতে পারে না। গলার কাছে কান্না এসে আটকে জমে ওঠে।

চাঁপা আবার বলে, হ্যাঁ বৌ, আচ্ছা, ভাত তরকারী নাই খেলুম। কিন্তু ফলমূল, এই ধরো কলা কি বেল? কিম্বা চাট্টিখানি মুড়ি? আচ্ছা বৌ, আমরুল শাক খেতে দোষ কি? সেতো আর খাবার জিনিষ নয়। কাঁচাপাতা তো? তবে?

বৌয়ের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে থাকে। বলে, কি করব মা, খেতে যে নেই।

তবুও চাঁপা বলে, বৌ রে, ভারি খিদে পায়। চাঁপা রান্নাঘরের দাবা থেকে উঠে এসে ঘরের মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

বৌ যেন আর সামলাতে পারে না। ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। ওর ছোট বোনের বয়সি মেয়ে। মনটা আরো কচি, আহা! দুর্গার

আজ ভারি ইচ্ছে করতে লাগল ছুটে গিয়ে চাঁপার মুখখানা বুকের ভেতর করে চেপে নেয়।

বৌয়ের রান্না হয়ে গেচে। ছেলেদের অনেকক্ষণ খাওয়া দাওয়া মিটে গেচে। দুর্গা কি করবে ভেবে পাচ্চে না। চুপি চুপি ও বারকয়েক উঁকি মেরে চাঁপাকে দেখে এল। তারপর মুঠোখানেক ভাত একখানা সান্‌কিতে বেড়ে রেখে বাকী থালা শুদ্ধু নিয়ে চলল পুকুরঘাটে। জলে পা ডুবিয়ে, ঘাটের রাণার ওপর বসতে দুর্গার বুক ভেঙে কান্না এল। এই ঠিক দুপুরবেলা ও একা একা ঘাটে বসে কাঁদতে লাগল।

হঠাৎ মনে পড়ল, দিনদুকুরে অমন করে কান্নাকাটি করা অমঙ্গল। তাড়াতাড়ি চোখের জল পুঁছে বৌ থালার ভাত জলে ভাসিয়ে দিয়ে ঘরে এল। ঘরে আর কোনো কাজ বাকি নেই। কি করবে তাই ও ভেবে পেলে না। শেষে কলসী কাঁখে নিয়ে অনর্থক জল তুলতে লাগল। ঘরে জল এনে ভেবে পায় না, অত জল কি হবে। শেষে ঢেলে দেয় তুলসীর ঝাড়ে, শাকের ছোট ক্ষেতে, লিচুগাছটার গোড়ায়।

চাঁপা হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, হ্যাঁ বৌ, আমি খেলে অমঙ্গল হবে? শশীর? তোমাদের?

দুর্গা কি বলবে!

চাঁপা বললে, দেখচো বৌ, কি রদ্দুর! ভারি তেষ্টা পাচ্চে। দাও না একটু ঠাণ্ডা জল। বৌ নীরবে কলসীর তলানি জলটুকু গাছের গায়ে ঢেলে দেয়। গাছ ভিজে, মাটি ভিজে, জল গড়িয়ে উঠানে এসে যায়।

কোন উত্তর না পেয়ে চাঁপা রেগে ওঠে। বলে, না দিলে তো ভারি বয়েই গেল। পুকুরে যেন আর জল নেই! বলে দুমদুম করে পা ফেলে ঘরে ঢুকে ঝনাৎ করে ঘরের কপাট বন্ধ করে!

বৌ নিঃশব্দে কলসী নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু জল নিয়ে আর ফিরতে পারল না।

দুর্গার মনে একটা সংশয় জেগেচে। ও ভাবচে, কচি একফোঁটা মেয়ে খেলে অমঙ্গল না হাতি! আর আমি খেলেই মঙ্গল! কাঁচকলার শাস্তোর! স্বর্গের দেবতা মাথায় থাকুন! চাঁপাকে শুকিয়ে মরতে দেব না।

হঠাৎ ওর নজরে পড়ল, পুকুর ধারের গাছগুলোয় অনেক পেঁপে পেকে রয়েচে। বাঁখারির একটা আঁকশি তৈরি করে বৌ গোটাকতক পেড়ে ফেললে। রোদ লেগে ফলগুলো আগুণ হয়ে রয়েচে। বৌ তাড়াতাড়ি পুকুরের ঠাণ্ডা পাঁকে পেঁপেগুলো পুঁতে ফেললে। কিন্তু ওর আর তর সয় না। কেবলই চাঁপার তুলসীপাতার মতন শুকনো ঠোঁট দুখানা চোখের সুমুখে ভেসে উঠতে লাগল।

তাড়াতাড়ি পেঁপেগুলো তুলে নিয়ে ও ঘরে এল।

চাঁপাকে ডেকে বললে, ও ছোটগিন্নি, ইদিকে এসো তো একবার।

দুর্গার গলার ব্যাকুলতার আভাষ পেয়ে চাঁপা আর রাগ করে শুয়ে থাকতে পারলে না। দাবায় বেরিয়ে দেখলে বৌ পেঁপে ছাড়াচ্ছে। চাঁপা এসে ওর কাছে বসলো।

দুর্গা বললে, গেলুম পুরুতবাড়ি। বামুনদিদি বললে, আ হারামজাদি, তিন ছেলের মা হয়ে এটুকুও জান না! কচি মেয়ের আবার নিয়ম! বললে, যা যাঃ, রান্নাজিনিষ ছাড়া ফলপাকোর সব খাবে।

চাঁপা বললে, তবে বৌ! ছাখো দিকিনি, বেলা গড়িয়ে গেল। আমাকে শুধু শুখিয়ে মারলে।

দুর্গা চুপ করে রৈলো। পেঁপের পাথরটা ওর দিকে এগিয়ে দিলে।

চাঁপা একখানা পেঁপে গালে ফেলে বললে, আঃ বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল বৌ। জানিস্ বৌ, ঠিক যেন শিল কুড়িয়ে গিল্‌চি।

বৌ খুসী হয়ে বলে, খাও না, সবগুলো বসে বসে খেতে হবে।

খেতে খেতে চাঁপা গল্প করে। একদিন ভাতের হাঁড়ি নাবাতে গিয়ে কেঁসে গেল। সৎমা ঘরের শিকলি তুলে বন্ধ করে রাখলে। সারা দিনমানটা ওর সে কি কষ্ট! কত কান্নাকাটি। কিন্তু সৎমা সে পাত্তরই নয়। শেষে বিকেলের পানে, টগরমণি কোথা থেকে এক কাঁড়ি আমরুল শাক ছিঁড়ে এনে জানলার কাছে ডাকলে। বললে, দিদিভাই, আর তো কিছু পেলুম না। কি আর হবে! এই চুপি চুপি খা ততক্ষণ। মা যে ভাঁড়ারে চাবি দিয়ে বেরুল। সেদিনটা শুধু শাক খেয়েই কাটলো।

চাঁপার খাওয়া হলে দুর্গা ঘরে গিয়ে বসলো। গলায় আঁচল দিয়ে সজল চোখে মাথা খুঁড়ে ঠাকুরের কাছে নিবেদন জানালে, অপরাধ নিও না, হে মধুসূদন, ও নিতান্ত শিশু।

চন্দোরের ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। উঠানে পা দিয়েই চন্দোর সন্ধ্যের আবছায়া আলোতে দেখলে, চাঁপা খুটি ঠেস দিয়ে দাবায় একলা চুপ করে বসে রয়েচে। সারাদিন কাজের তাড়ায় মাথার ঠিক ছিল না। এখন মনে পড়ল আজ খাওয়া হয়নি। সে চাঁপারই জন্যে। চাঁপাকে অমনভাবে বসে থাকতে দেখে চন্দোরের মনটা ভারি হয়ে উঠল। কারণ, বসে থাকবার মেয়ে চাঁপা নয়। কাজ সে একটা না একটা নিয়েই আছে। বিশেষ করে এই এখন, সন্ধ্যের সময় ছেলেগুলো ওকে ঘিরে ধরবে। আর চাঁপা গল্পের কল্পনায় কখন বাঘ ডাকবে, কখন পেত্নীর নাকি কান্না, কথায় কথায় সুর ক'রে ছড়া কাটবে। চাঁপার মিষ্টি গলায় বাঘের ডাক বেরোয় না কিন্তু অনুকরণটা কত মিষ্টি লাগে। ছেলেগুলো যতই শোনে, ততই হুঁ, হ্যাঁ, তাপ্পর করতে থাকে। সন্ধ্যের অন্ধকারে মিলিয়ে সবটাই কি আশ্চর্য্য মধুর। সেই জ্বলজ্বলে চক্‌চকে চাঁপাকে কখনো চুপচাপ অস্পষ্ট থাকতে দেখে ভালো লাগে!

চন্দোর বললে, ও বৌ, আজ আর আমার ভাত রাঁধিস্ নি। শরীরটা ভাল নেই। সারাদিন রোদ্দুরে পুড়ে, মাথা ধরে, শরীরটা মাটি।

আসল কথাটা কি, বৌ তৎক্ষণাৎ বুঝলো। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে চন্দোরের মুখহাত ধোবার জল দিলে। চন্দোর ঘরে ঢুকলো, বৌও পেছন পেছন গেল। বললে, সে হবে না। অমন করে উপোষ দিলে চলবে না তো। তাছাড়া রাতপিত্তি ভাল নয়। অমন করে সংসারের অমঙ্গল কর না। ভাতটাত না খাও, অন্য যাহোক কিছু খেতেই হবে।

চন্দোর জিজ্ঞেস করলে, বৌ, তুই তো খাস্‌নি দেখ্‌চি।

দুর্গার ঠোঁটের ওপর একটা ম্লান হাসির রেখা জাগ্‌ল।

বৌয়ের মনে একটা আতঙ্ক লেগেচে। কাল্কটা করে ফেলে অবধি ওর নানারকম কথাই মনে হচ্চে। কথাটা বলবার জন্য বৌয়ের মন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেচে। ওর অন্যায়টা সম্বন্ধে স্বামীর একটা মতামত না পাওয়া পর্য্যন্ত স্বস্তি নেই।

চন্দোর বললে, কি করে খাই বল দিকি ? ঐ টুকুন কচি মেয়ে !

দুর্গা যে চাঁপাকে পেঁপে খাইয়েচে, সেইটুকু বাদ দিয়ে আর সব ব্যাপার বলতে লাগল। চাঁপার কাতরভাবে খেতে চাওয়ার কথা শুনে চন্দোরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হঠাৎ এক ঝলক রক্ত চন্দোরের সমস্ত মুখখানা লাল করে দিলে। বললে, ছাখ বৌ, তুই রাক্কুসী ! তবুও তুই ছোটগিন্নিকে কিছু দিলি না !

এই অপ্রত্যাশিত গালাগালিতে বৌয়ের বুক যেন আল্লাদে দশহাত হয়ে উঠল। সে ভাবটা চেপে বৌ চুপ করে রৈল।

চন্দোর তামাক টানতে টানতে বললে, শুনচিস্ বৌ, ওসব উপোষটুপোষ এখন বন্ধ থাক। ঐ টুকুন কচি মেয়েকে দিয়ে ওসব করানো চলবে না।

বৌ বললে, তোমার কি, বাইরে বাইরে থাকো। মরতে আমিই মরি। চোখের ওপর এক ফোঁটা জলের জন্যে টাটা করে বেড়াবে, আর আমি ছেলের মা হয়ে তাই দেখি। আমি ওসব পারব না।

চন্দোর চটে কাঁই। বললে, হাতে কি তোর পক্ষঘাত হয়েছিল ? তুই পাষাণী ! দুর্গা বললে, তা বৈকি ! অবস্থা দেখলে পাষাণও গলে যায়। আমি তো আমি। কি আর করি, দিলুম দুখানা পেঁপে ছাড়িয়ে।

চন্দোর কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ছোটগিন্নি খেলে ? বৌ বললে, খাবে না ! আহা !

চন্দোর হঠাৎ চুপ করে গেল।

বৌ বুঝলে, ব্যাপারটা অবশ্যই চন্দোরের মনঃপুত হয়নি। ও গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল, অমন অলুক্ষুণে সংসার আমি করতে পারব না। যাকগে সব চুলোয়।

চাঁপা ঘরে এসে হাজির। এঘরে সে বড়-একটা আসে না।

চন্দোর ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, এসো। চাঁপা সোজাসুজি এগিয়ে এসে চন্দোরের হাতের দাবনাটা ছুঁয়ে বললে, ওমা, তবে যে বল্‌লে অসুখ !

চন্দোর বহুৎ বহুৎ মিথ্যে মামলা মকদ্দমা, জালিয়াতি পর্যন্ত করেচে। কিন্তু এমন করে ধরা আর কখনো পড়েনি। ও একেবারে বোকা বনে গিয়ে, নাঃ, অসুখ মানে, গায়ে কিছু নয়, এই,—প্রভৃতি বলে এমনি

আমতা আমতা সুরু করে দিলে যে চন্দোরের সেই নিরুপায় অবস্থা দেখে চাঁপা তো খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

একটুখানি অবসর পেয়ে চন্দোরের মন যাওবা গুছিয়ে উঠছিলো, চাঁপার হাসিতে আবার সব তাল পাকিয়ে উঠলো।

চাঁপা বললে, চলো খাবে। বলে চন্দোরের একখানা হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে দাবায় আনলে। চন্দোর এক হাতে হুঁকো নিয়ে অন্য হাত ধরা অবস্থায় নিতান্ত ভাল মানুষের মতন ওর সঙ্গে এলো।

বৌ তো ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ। কারণ চাঁপা এ বাড়ী আসার আগে এমন ব্যাপার বহুবার ঘটেচে। চন্দোর ভাতের থালা ফেলে রাগ করে উঠে গেচে। কিন্তু কেউ কখনো ওর কাছে ঘেঁসতে সাহস করেনি। শুধু নিজে নিজে কেঁদে উপোষ করেচে সে। সেই রাশভারি লোকটা কেঁচো হয়ে যাবে যে, এ কথা বৌ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

শশী ওর ক্ষুদে বোন রাখালীকে কুনুর গোঁত্তা দিয়ে চুপি চুপি বললে, এই ছাখ। মানে, ওর খুব মজা লেগেচে।

দুর্গার অবাক আর শেষ মানে না। দেখলে কি, চন্দোর সত্যি সত্যি মুখ হাত পা ধুয়ে এলো, একেবারে চুপচাপ্।

তখনো রান্না শেষ হতে দেরী আছে। ব্যাপার দেখে বৌ তাড়াতাড়ি একটা পাথর বাটিতে চাট্টিখানি মুড়ি নিয়ে এখোগুড় মেখে দিলে। চাঁপা তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল আন্‌লে। ওর সামনে এমন ভাবে বসলো যেন দেখবে যে একটাও মুড়ি ওর মুখ থেকে না পড়ে। দুর্গা থ হয়ে অন্ধকারে চন্দোরের পেছনে দাঁড়িয়ে।

চাঁপা বল্‌লে, তুমি আজ সারাদিন খাওনি কেন ?

চন্দোর বাপের জন্মে এমন দাবী শোনেনি। ও চিরদিন জানে মাটির দাবী আর টাকার দাবী। ও জানতো জগৎটা তাইই। ও কাউকে কখন দাবী নিতে দেয়নি। আজ দেখলে, এটা ওর জীবনে এক নতুন ঘটনা।

নদীর প্রবাহের মুখে পলি পড়ে পড়ে মুখ আটকে গেলে ক্রমে জলটা মৃয়ূর্ষু হয়ে ওঠে। কিন্তু হঠাৎ কোনক্রমে সজীব ঢেউ এসে পেছনে ঘা দিলে, সুমুখের জল চলতে থাকে বাধা কাটিয়ে। চন্দোর বুকের ভেতর ঠিক

যেন তেমনি একটা ধাক্কা আর চলার সাড়া পেলে। চাঁপার কথায় তাই ও হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারলে না। ওর শুধু মনে পড়লো, চাঁপা সন্ধ্যেবেলায় একা একা দাবায় চুপচাপ করে বসেছিল।

চাঁপা বলতে লাগলো, বিকেলবেলা ঘাটে গিচি, দেখি, ওমা, কম জলের ধাপে ভাত একেবারে ছড়ান। ঘরে এসে সরা খুলে দেখি হাঁড়িতে কিছু নেই। উনুনের পাশে একখান সানকি তার ওপোর শুকনো এক মুঠো চট্‌কানো ভাত, আর মাটিতে একথাবা। মাগো, বৌ খায়নি! তুমিও খাওনি। কেন বলত? আমি উপোষ করব, আমার নিয়ম, তোমরা কেন—

চাঁপার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। মুখে আঁচল চেপে ও হুমহুম্ করে গিয়ে ঘরে ঢুকলো।

চন্দোর মাত্তর দুগাল মুড়ি খেয়েচে। আর একগাল সবে মুখে তুলচে। হঠাৎ চাঁপার কান্নার সুর পেয়ে ওর তোলা হাতখানা যেন পাথর হয়ে গেল।

বৌ যেন আর কিছুতেই নড়বে না। এমনি করে দাঁড়িয়ে আছে।

চন্দোর চুপ করে বোকার মতন চাঁপার চলে যাবার দিকে চেয়ে রইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চাঁপা মুখে কাপড় গুঁজে বেরিয়ে এল। ফুঁপিয়ে উঠে বললে, খাচ্চো না যে?

তৎক্ষণাৎ চন্দোর হাতের সেই ধরামুঠোর মুড়ি গালে ফেলে দিলে। যেন ভারি একটা অন্যায় করে ফেলেচে।

চাঁপা বললে, না খেতে পেলে, আমার ভারি কষ্ট হয়। তোমাদের হয় না? বৌ তুমি যা হয় কিছু—

দুর্গাকে যেন ভেঙে ফেলে নতুন ছাঁচে গড়া হয়েচে। তা নইলে, ঐ মেয়ে কিনা সুড়সুড় করে রান্নাঘরে গিয়ে গুড়মুড়ি খেতে লাগে! চাঁপার মুখখানা দেখে বৌ যেন ভয় পেয়ে গেছে। এমনি করে চাঁপা ওর সামনে বসে রইল।

চন্দোর চালের বাতার তলা দিয়ে তারায় ভরা অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে একলা একলা গুড়মুড়ি খেতে লাগল।

খাওয়া তখনো ওর শেষ হয় নি। এক গাল মুড়ি হাতে করে নিয়ে খেতে ভুলে গেচে। চন্দোর এসে হাজির রান্নাঘরে। বললে, ছোটগিন্নি, এ বাড়ীতে তোমার উপোষ করা চলবে না।

চাঁপার চোখে তখনো কান্নার জল। মুখে কিন্তু অনেকখানি হেসে ফেললে। বললে, কেন?

ততক্ষণে চন্দোরের মাথায় যেন জমির বখরা-দাবির খুনে-রক্ত জ্বলে উঠেছে। বললে, কেন আবার কি! হবে না। ব্যস!

দু'একদিনের মধ্যেই কথাটা পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, মুকুজ্জে গিন্নি একাদশীর দিন দ্বাদশীর খাওয়া সেঁটেচে। কিন্তু কি করে যে রটলো সেইটেই আশ্চর্য্য। কথায় বলে, দেয়ালের কান আছে! তা না হয় রইল। কিন্তু সে বলবার মুখ পেল কোথায়!

পরে জানা গেল ব্যাপারটা কি! পেঁপে কুটে খোসাগুলো দুর্গা পাঁশগাদায় ফেলেছিল। বিকেলবেলা পুকুরে জল নিতে এসেছিল দত্তদের বৌ ক্ষেমী। টাট্‌কা পেঁপের খোসা দেখে সে শশীকে কথাটা জিজ্ঞেস করে। শশী সাফ্ উত্তর দিয়েচে, কেন দিদি তো খেয়েচে। ব্যস।

সেদিন চন্দোর ফিরে আসচে আড়ৎ থেকে। তখন সন্ধ্যে হবার দেরী আছে। গাঁয়ের মোড়লদের তাসের আড্ডার কাছে আসতে সবাই ওকে ছেঁকে ধরলে। বললে, বাপু হে, শুনচি ব্যাপার গুরুতর।

চন্দোর ভাবতে ভাবতে আসচে, ওর ধান জমির দক্ষিণ দিকের বাঁওড়ের কথা। কি করে তার জল মাঠে আনা যায়। কাজেই হঠাৎ আক্রমণে ও ঘাবড়ে গেল। ওর এই ভড়কানোতে ওরা উৎসাহ পেলে। বললে, তাহলে আর কি, একজোড়া জুতো আর মোজা তোমার নতুন মাকে এনে দাও গে।

চাঁপার বিষয়ে পাড়ার কানাঘুষোটা চন্দোরের কানে যথাসময়েই এসে উপস্থিত হয়েছিল। চন্দোর সামলে নিয়ে বললে, তাইতো এখন আর সেকাল নেই যে এক ঘরে করে রাখবেন। মুস্কিল বটে। কি করা যায় তাহলে?

কথাটা ও এমনভাবে শেষ করলে যেন এতে ওরই সম্পূর্ণ স্বার্থ এবং এক-ঘরের বদলে আর একটা কিছু করতে না পারলে যেন ওরই সব অস্বস্তি। তারপর চোখ দুটো কড়া করে চেয়ে ও সজোরে চলে গেল। পাণ্ডাদের আড্ডা চুপ হয়ে রইল।

চন্দোর খুব ভারিক্কি চালবেজে ছেলে। তাছাড়া গ্রামের একমাত্র মহাজন বলতে ওইই। শুধু টাকায় নয়, বিপদে আপদেও। কারণ চন্দোরের কিছুতেই আপত্তি নেই।

কাজেই ওরা সবাই আছাড় খাওয়া ঢেউয়ের মতন চৌচির হয়ে পাতলা হয়ে এল। নাঃ, তাই বলছিলুম আমরা—এই সব বল্‌তে বল্‌তে।

এই রকম নিত্যি নতুন ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে চাঁপা দু-দুটো বছর কাটিয়ে এসেচে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ও হুইটম্যান

'পুঁথির কথা কইনে মোরা উল্টো কথাই কই'—ফাল্গুনী নাটকে নব-যৌবনের দল চলেছে এই গান গেয়ে। এই গানের মধ্যে কবি নিজেকে ধরা দিয়েছেন। বড়ো কবিরা কখনো ছেঁদো কথা বলেন না। তাঁরা নূতন পথের যাত্রী—তাঁদের চোখে নতুন জগতের স্বপ্ন। তাঁরা অতীতের প্রতিধ্বনি নন, নব আদর্শের স্রষ্টা। তাঁদের সুরের সঙ্গে আমাদের সুর মেলে না। সমাজের সাড়ে পনেরো আনা লোক পুরাতনের জাবর কেটে চলে। ছেলে-বেলায় আমরা মা-ঠাকুরমা-পিসিমার আওতায় যে সব আদর্শ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করি শেষ পর্য্যন্ত তারাই আমাদের মনের জীবনকে রাঙিয়ে তোলে। নতুন চিন্তার বীজ আমাদের মনের মধ্যে উড়ে এসে পড়ে বটে কিন্তু অঙ্কুরিত হোতে পারে না। কিন্তু এমন অসাধারণ মনও আছে যা নূতনের বীজকে নিজের মধ্যে সফল কোরে তোলে আর সেই নব আদর্শকে সংক্রামিত ক'রে যায় ভাবীকালের বুকে। এই রকমের অসাধারণ মন যাঁদের তাঁদেরই আমরা বলি যুগ-মানব। যুগ-মানবদের শক্তি অসামান্য। এই অসামান্য শক্তিরই বিকাশকে আমরা দেখতে পাই জাতি যা-কিছু নিয়ে গৌরব করতে পারে তার মধ্যে, তার আর্টের নব নব কীর্ত্তির মধ্যে, তার বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মধ্যে। যুগস্রষ্টারা সংখ্যায় চিরকালই মুষ্টিমেয় কিন্তু সমাজের যা-কিছু গৌরবের নিদর্শন সে তাদেরই সৃষ্টি। সংখ্যাগরিষ্ঠের দল তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাত্র। হুইটম্যান্ কবিকে বলেছেন : leader of leaders. এর তাৎপর্য্য হচ্ছে : কবির কণ্ঠে নতুনকালের সুর। সেই সুর আমাদের মনের মধ্যে রচনা করে নতুন আদর্শকে। পুরাতন সংস্কারের নাগপাশ থেকে চিত্তকে দেয় মুক্তি। নতুন আদর্শ যে তৈরী করে গৌরবের প্রথম অর্ঘ্য তো তাঁরই, কারণ মানুষ হিসাবে আমরা কি-রকম হব তা নির্ভর করে আমাদের আদর্শের প্রকৃতির উপরে। আমরা যা ভাবি তারই দ্বারা আমাদের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে বল্‌লেন নব্য ভারতের রাষ্ট্রগুরু। এর তাৎপর্য্য হচ্ছে : স্বাধীন নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন তার সমস্ত গরিমা নিয়ে আমাদের অন্তরলোকে প্রথম উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে। Bernard Shaw তাঁর

Man and Superman-এ বলেছেন : But men never really overcome fear until they imagine they are fighting to further a universal purpose, fighting for an idea as they call it. কবির হাতে এই আদর্শের জয়ধ্বজা।

রবীন্দ্রনাথ আর হুইটম্যান—দুজনেই কবি ; কেবল কবি নন, মহাকবি। কবিপ্রতিভার কাজ আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গিমার মধ্যে পরিবর্ত্তন আনা। সেই পরিবর্ত্তন তাঁরা এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ এনেছেন নব্য ভারতবর্ষের চিন্তা-জগতে, হুইটম্যান এনেছেন নব্য আমেরিকার চিন্তা-জগতে। যেখানে লোকে পুঁথির কথা তোতাপাখীর মতো আওড়াতো সেখানে তাঁরা উল্টো কথা বলেছেন। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তাঁদের গানের মূল সুরটী কি, তবে বল্‌বো : honour ; যদি পুনরায় প্রশ্ন করেন honour কথাটীর আসল তাৎপর্য্য কি, তবে বল্‌বো : honour means that the life in a person is something that has worth, historical dignity, delicacy, nobility. মর্য্যাদা কথাটার অর্থ হ'চ্ছে মানুষের জীবন এমন একটা কিছু যার দাম আছে, আভিজাত্য আছে, যাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ আর হুইটম্যান দুজনেই মানুষের মধ্যে এই মর্য্যাদাবোধকে জাগাতে চেয়েছেন। সেইজন্য তাঁদের কণ্ঠে স্বাধীনতার আর সাম্যের জয়গান। Spengler বলছেন : To submit to insult, to forget a humiliation, to quail before an enemy—all these are signs of a life become worthless and superflous. অসম্মানকে যখনই স্বীকার ক'রে নিলাম জীবন তখনই তার মূল্য হারিয়ে ফেললো। তারপর থেকে অস্তিত্বকে বহন ক'রে চলা একটা বিড়ম্বনা মাত্র। তাকে টিকে থাকা বলে, বেঁচে থাকা বলে না। রবীন্দ্রনাথ আর হুইটম্যান দু'জনেই বলেছেন জোরের সঙ্গে বাঁচতে। যৌবনের কাছে রবীন্দ্রনাথের বাণী হচ্ছে—'আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' জীবন থেকে মর্য্যাদা যখন চলে যায় তখন মানুষ বেঁচে থেকেও 'আধ-মরা'র পর্য্যায়ে পড়ে আর আধমরা যারা তারাই আসল কৃপার পাত্র। পুনরায় Spengler-এর ভাষায় : To lose honour means to be annulled as far as Life and Time and History are concerned. মর্য্যাদা হারিয়ে ফেলা মানে জীবনের দিক দিয়ে, কালের দিক দিয়ে, ইতিহাসের দিক দিয়ে মৃতের সামিল হ'য়ে থাকা। যোগাযোগের

বিপ্রদাস বল্‌ছে কালুকে : 'সর্ব্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করিনে, ভয় করি অসম্মানকে।' যোগাযোগের কুমু বলছে : 'মিথ্যে' হ'য়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারবো না। আমি ওদের বড়ো বৌ, তা'র কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই ?' কুমুর জীবনের মর্য্যাদাকে তার স্বামী মধুসূদন কেবলই আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে। সেই অসম্মানের বোঝাকে স্কন্ধে নিয়ে কুমু যদি শ্বশুর বাড়ীতে বড়ো বৌ হ'য়ে থাকতে স্বীকার করতো—তার সেই বেঁচে থাকার কোনো মানে হোতো না। এই জন্যই অসম্মানের কালিমা থেকে জীবনকে মুক্ত রাখবার জন্য কুমু মধুসূদনের গৃহে 'বড়ো বৌ' হ'য়ে থাকবার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি চেয়েছে। কুমু বলছে বিপ্রদাসকে : 'মানুষ যখন মুক্তি চায়, তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারি বোন, দাদা, আমি মুক্তি চাই।'

রবীন্দ্রনাথ যে স্বর্গে তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন সেখানকার বৈশিষ্ট্যের কথা লিখতে গিয়ে প্রথমেই লিখেছেন 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির।'

'আমারে সৃজন করি' যে মহাসম্মান
দিয়েছো আপন হস্তে, রহিতে পরাণ
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি।'

রবীন্দ্রনাথের অজস্র লেখার মধ্যে যে সুরটী বিশেষ ক'রে বেজে উঠেছে সে হ'চ্ছে জীবন থাকতে অপমানকে সহ্য না করবার এই সুর। আমাকে আমি হ'য়ে উঠ্‌তে হবে। আমার স্বকীয়তাকে আমি কোনো রকমেই বিসর্জ্জন দিতে পারিনে। নিজের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব হ'তে দি'লে তার দ্বারা বিধাতাকেই আমরা আঘাত করি। মোতির মা বিপ্রদাসকে বললে, 'কিন্তু আপন সংসার না থাকলে মেয়েরা যে বাঁচে না, পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাই তো।" উত্তরে বিপ্রদাস যা বললে তা হচ্ছে গণতন্ত্রের চিরকালের বাণী আর এই বাণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মের কথাটীকে আমরা ধরতে পারবো। বিপ্রদাস বল্‌লে "স্থিতি কোথায় ? অসম্মানের মধ্যে ? আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি কুমুকে যিনি গ'ড়েচেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা ক'রে গড়েচেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারো নেই, চক্রবর্ত্তী সম্রাটেরও না।"

গল্পগুচ্ছের মধ্যে 'স্ত্রীর পত্র' বলে যে গল্পটী আছে সেখানে মেজ বৌ সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে আর ফিরে গেল না। তার কণ্ঠ থেকেও অনুরূপ কথা বেরিয়ে এসেছে: "আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজ বৌ।"

এ যেন ইব্‌সেনের সুর। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের ইবসেন। মেজো-বৌয়ের খোলস ছিন্ন ক'রে যে বেরিয়ে এলো সে কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, সে বিধাতার আদর দিয়ে তৈরী মানুষ। তার মধ্যে বাজছে অনন্তের সুর। মনুষ্যত্বকে যদি খর্ব্ব হ'তে দিই, নিজেকে যদি অন্যের ছায়া এবং প্রতিধ্বনিতে পর্য্যবসিত করি তবে সে অসম্মানের গ্লানি কেবল মানুষকে নয়, বিধাতাকেও স্পর্শ করবে। তাইতো রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হোলো:

মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর! সেথায় যে পাদক্ষেপ করে,
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে
হোক্ না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে
সর্ব্বশক্তি ল'য়ে মোর! যাক আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব।

এখানে honour-এর আদর্শের পায়ে কবির সঙ্গীতের অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে।

হুইট্‌ম্যানও এই একই সুরে গান গেয়েছেন।

The whole theory of the universe is directed unerringly to one single individual—namely to you.

সমস্ত বিশ্ব একটীমাত্র লক্ষ্যের পানে এগিয়ে চলেছে আর সেই লক্ষ্য হচ্ছে তোমাকে ফুটিয়ে তোলা।

I only am he who places over you no master, owner, better God, beyond what waits intrinsically in yourself.

তোমার ভিতরে যা অপেক্ষা করছে—তোমার সেই স্বকীয়তার উপরে কাউকে আসন দিতে আমি রাজি নই—কোনো প্রভুকে নয়, মালিককে নয়, ভগবানকে পর্য্যন্ত নয়।

হুইট্‌ম্যান্ যে আদর্শ-স্বদেশের কল্পনা করেছেন সেখানেও নারী এবং পুরুষ জীবন গেলেও অপমানকে সহ্য করতে রাজী নয়। স্বদেশকে কিরকম আদর্শে তিনি গড়তে চান তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

Where men and women think lightly of the law,
Where the slave ceases and the master of slaves ceases,
Where the populace rise at once against the never-ending audacity of elected persons,
Where fierce men and women pour forth as the sea to the whistle of death pours its sweeping and unript waves,
Where outside authority enters always after the precedence of inside authority,
Where the citizen is always the head and ideal, and President, Mayor, Governor and what not, are agents for pay……

"যেখানে পুরুষ এবং নারী আইনের কোনো ধার ধারে না,
যেখানে ক্রীতদাস নেই, ক্রীতদাসদের মালিকও নেই,
যেখানে নাগরিকগণ নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের ঔদ্ধত্য এক মুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করে না,
যেখানে দুর্দ্দান্ত নারী ও পুরুষ কাতারে কাতারে আগিয়ে চলে যেমন ক'রে মৃত্যুর বাঁশী শুনে সমুদ্রের তরঙ্গমালা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ছুটে যায়,
যেখানে বাহিরের নির্দ্দেশ অন্তরের নির্দ্দেশকে কোনোক্রমেই ঠেলে ফেলতে পারে না,
যেখানে নাগরিকের আসন হোলো সবার উপরে, প্রেসিডেন্ট, মেয়র, গভর্ণর এরা হোলো বেতনভুক কর্ম্মচারী মাত্র।

হুইট্‌ম্যানের কাছেও আত্মমর্য্যাদার মূল্য সব কিছুর মূল্যকে ছাড়িয়ে আছে। তরুণ আমেরিকাকে তিনি ডাক দিয়েছেন মানুষের জীবনকে মর্য্যাদা দেবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের কুমু বলছে: 'এমন কিছু আছে, যা ছেলের জন্যেও খোয়ানো যায় না।' হুইটম্যানও রবীন্দ্রনাথের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে

বলেন—অন্তরে যে অনির্ব্বাণ আমি রয়েছে সেই আমিকে ভগবানের কাছেও খাটো করা চলে না। মর্য্যাদাকে যারা বড়ো আসন দিয়েছে তাদের হাতে চিরদিনই রণতূর্য্য। রবীন্দ্রনাথ এবং হুইট্‌ম্যান্ দু'জনের হাতেই পাঞ্চজন্য। বিপ্রদাসের কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন: 'দল-গড়া শাস্ত্রগড়া নির্ব্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে। যতো সব ইচ্ছাকৃত অন্ধদাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ ক'রেচে, তারি বাসা ভাঙবার দিন এলো।'

যে লড়াইয়ের হাওয়া উঠেচে সমুদ্রপারে বার্ণার্ড শ'য়ের আর ইব্‌সেনের, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের আর রল্যাঁর লেখায় সেই লড়াইয়েরই হাওয়া রবীন্দ্র সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় সমস্ত রকমের দাসত্বের বিরুদ্ধে নির্ম্মম অভিযান। ক্ষমতার ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে ক্লান্তিহীন অভিযান চালিয়ে যাবার আহ্বান ধ্বনিত হয়ে উঠেছে বলাকায়। প্রান্তিকের শেষ কবিতায় এই সংগ্রামের সুর। সেখানে আছে:

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

হুইটম্যানও নব্য আমেরিকাকে ডাক দিয়েছেন দাসত্বের বাসা ভাঙবার জন্য যোদ্ধার নিশান হাতে তুলে নিতে।

My call is the call of battle, I nourish active rebellion,
He going with me must go well arm'd,
He going with me goes often with spare diet, poverty, angry enemies, desertions.—(Song of the open Road)

রাষ্ট্রের এবং সমাজের বৈষম্যমূলক যে ব্যবস্থা চলে আসছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে ক্ষতি এবং আঘাত অনিবার্য্য। সেই ক্ষতিকে এবং আঘাতকে বরণ করবার জন্য চাই সিংহের নির্ভীক হৃদয়। ভীরুতাই অন্ধকারের

শক্তিপুঞ্জকে কায়েম করে রেখেছে। দুঃখকে, বিপদকে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার প্রেরণা তাই রবীন্দ্রনাথের এবং হুইট্‌ম্যানের কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ নূতন ভারতবর্ষের কানে এবং হুইট্‌ম্যান নূতন আমেরিকার কানে যে বাণী শুনিয়েছেন তা হচ্ছে নীট্‌শের Live dangerously.

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।"

এই সুরই বলাকার সুর। এই সুরই খুঁজে পাই হুইট্‌ম্যানের কবিতায়:

For we are bound where mariner has not yet dared to go,
And we will risk the ship, ourselves and all.

নাবিকেরা যেখানে যেতে ভরসা পায় না আমরা সেই অকূলের যাত্রী,
আমাদের জাহাজ, আমাদের জীবন, আমাদের সর্ব্বস্ব আমরা বিপন্ন করবার জন্য প্রস্তুত।

হুইট্‌ম্যান লিখেছেন:

Listen! I will be honest with you.
I do not offer the old smooth prizes, but offer rough new prizes···

রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই সুরেই তরুণ ভারতবর্ষকে দুঃখের পথে আহ্বান ক'রে গেয়েছেন:

ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ়ফণা।
নিদ্রা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

উভয় কবির সুরের ঐক্যকে পরিস্ফুট করবার জন্য আরও অনেক কবিতার অংশ একদিকে Leaves of Grass এবং আর একদিকে বলাকা প্রভৃতি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারতো—কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানেই দাঁড়ি টান্‌লাম।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জংগল

সত্যিই, আমার গল্পটা শোনাবার জন্য যে এই ভদ্রলোককে আপনারা কষ্ট ক'রে ডেকেছেন—এটা আপনাদের ভয়ানক অনুগ্রহ। এর ভেতরেই আপনাদের কাজের সময় এতটা বাজে নষ্ট ক'রে ফেলেছি যে ভূমিকা ক'রে আর সময় চাইব না। তবে, কোনো সম্পাদক বা লেখক-গোষ্ঠীর কোনো লোকের কাছেই এই গল্পটা বলতে চেয়েছিলেম। আর এখন আপনাদের অনুগ্রহে তার সুযোগও হোলো।

তা হোলে, একরকম বলতে গেলে,—আচ্ছা, কী রকমেই বা বলা যায়? অভিযান গোছের কিছু একটা। শেষ পর্যন্ত একটা কিছু আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি। আপনারাই বলুন না, করিনি কি?—অবশ্যি এম্‌নি ক'রে যদি বলতে বলেন। তা হোলে ওঁর সময় আর নষ্ট করা উচিৎ হবে না; সত্যিই উনি যখন অনুগ্রহ ক'রে এসেছেন। এবারে আমরা সোজাসুজি ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়বো এবং বলবো কি করে কি হোলো। যদি আপনাদের কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে বা আমিই সহজ ক'রে বুঝিয়ে বলতে না পারি,—আমাকে থামিয়ে নিতে দ্বিধা কোরবেন না যেন।

আমার এই জীবনে কিন্তু এর চেয়ে বড়ো বিস্ময় কিছু ঘটেনি। কারণ, বুঝতেই পাচ্ছেন এপর্য্যন্ত জংগল শুধু প'ড়েই দেখেছি। সত্যিই তো আর কোনটার মধ্যে যাইনি। এবং সেই প্রথম, সর্বপ্রথম অনুভূতি, একেবারে ঠিক জংগলের মধ্যে গিয়ে পড়ার, যেন একটা·····কিন্তু জানেন, প্রথমেই কি আমাকে চমকে দিলো?·····ঠিক ট্যাংকঘর, সেই যে গরম জলের পাইপের গন্ধ, ঘরের দেওয়ালে পর্যন্ত। ঠিক ছাগল ছানার মতো প্রায়ই অবাক ব'নে গেছি;—গরম দেশের গন্ধও কি অম্‌নি, ভ্যাঁপ্‌সা, বুনো? এবং জেনে আমি খুসীই হ'য়েছি যে বন-জংগলের গন্ধটাও ঠিক কী রকম। যদিও একটা শুধু ঝাপটার মতো মাত্র। এই এম্‌নি ক'রে তো আর গন্ধ শুঁকতে আরম্ভ করিনি। হ'তে পারে, এতো ঝাঁঝালো সে গন্ধ যে নাকের অনুভব শক্তিই ম'রে গিয়েছিল; হয়তো বা আর কোন গন্ধের উপরেই মনোযোগ ছিল। এবং প্রথমে তো আর কোন গন্ধের কথা জানতেই পারিনি। এই

সমস্ত জংগলের বন্য আর অদ্ভুত কালো রূপ, নেশার মতো আমাকে পেয়ে বসলো। দেখুন, রঙ্‌ ক'রে বলার শক্তি ভগবান আমাকে দেননি—কিন্তু ঐ বনের মধ্যে ঢুকেই বুঝতে পারলাম, নিগ্রোরা কাল কেন? এই প্রকৃতিই রঙ্‌ ফলাবার মজার একটা স্কিম বানিয়ে রেখেছে। নিগ্রোরা কালো, কেননা আর কোনো রঙের হোলে তারা থাকতোই না। বোধ হয়, এবারে বুঝতে পাচ্ছেন কী বলতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, কী ক'রে গেলাম সেখানে। আচ্ছা, এখনি আমি সে কথায় ফিরে আসছি, এই এক্ষুনি। কিন্তু তার আগে আমার একেবারে প্রথম অনুভূতির কথাটা বলা উচিত মনে করি। প্রসংগটা বিশেষ প্রয়োজনের কি না।

আশ্চর্য গাছগুলি! বলা নেই, কওয়া নেই একেবারে সোজা উপরে উঠে গেছে! আর শিকড় কি এক একটা, অতো উঁচু জন্মেও দেখিনি। সোজা উপরে চ'ড়, তারপর নেবে উঠে তবে তোমাকে পেরিয়ে যেতে হবে। পায়ের তলায় একটু চাপ দিয়ে যে এগিয়ে গেলে সেটি হচ্ছে না। তারপর ঘাসগুলি। বোধ হয়, জংলা ঘাসই, হয়তো বা ঝোপ বা অন্য আর কিছু। ঠিক নাম বলা সম্ভব না; আপনারা হয়তো বুঝতে পাচ্ছেন। আর, সেখানে তো আমার বসতি ছিল না কোনোদিন; অথচ অবাক কাণ্ড, অসুবিধের কোন কারণই ঘটে নি।

উপরে খুব একটা তাকিয়েছি মনে পড়ে না। মাটির খুব কাছের জিনিষগুলো দেখতেই বেশী উৎসুক ছিলেম। আর মাটি, মনে হোলো খুব কাছে এগিয়ে আছে। হয়তো বা অদ্ভুত শিকড়গুলি মস্তো বড়ো বড়ো তাই, বা ঘাসগুলি উঁচু সেজন্য—ঠিক অবশ্যি বলা যায় না। যাই হোক, জংগলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, এবং জানেন তো বইয়ে পড়েছি—বনের মধ্যে আলগা ছেড়ে দাও তো লাট্টুর মতো গোল হ'য়ে ঘুরবে। মাথা হারিয়ে গেছে,—কেমন একটা জংলা ভয় হৃৎপিণ্ডটা থাবা দিয়ে ধ'রে বুকের মধ্যে চুপসে দিয়েছে। তুমি একটা অসহায়, আর ফিরবার উপায় নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনারা, ওই রকম কিছু একটা আমার ভাগ্যে পড়েনি। সেই জংগলের মধ্যে প্রত্যেকটি নিমেষ নিঃশেষে অনুভব ক'রেছি, এবং বিচিত্র অস্পষ্ট শব্দগুলি, সত্যিই আশ্চর্য,

অদ্ভুত! কি যেন একটা ডেকে চলেছে অবিরাম, অবিশ্রান্ত। শুধু এই শব্দ: ঝিক্‌ট্ ঝিক্‌ট্ ঝিক্‌ট্ ঝিক্‌ট্ ঝিক্‌ট্ ঝিক্‌ট্। এক রকম ধূসর কালো আলোয় সমস্ত কিছু ঢাকা, মনে হয় যেন—কিন্তু দেখুন, অমন অদ্ভুত আলো আর কোথাও দেখেছি বলেই মনে হয় না। ঠিক যেন রাতের অন্ধকারে সমস্তই তুমি দেখতে পাচ্ছো, কিন্তু কোথাও রাতের কালির মতো কালো নেই।

আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম, ঐ ঘন অন্ধকার আর ধোঁয়াটে আলোয় প্রত্যেকটি জিনিষই যেন স্পষ্ট, খুব কালো। জংগলের অস্পষ্ট বীথি-পথে ঘাসের ডগাগুলো নড়ছে, কাঁপছে। দেখে 'রেলওয়ে ট্যানেলের' ছবি মনে পড়ে। পথগুলি ঠিক যেন গোল; গাছ-ঘাস সমস্ত মিলে 'টিউব-রেলওয়ে'র ভেতোরের মতো গোল হ'য়ে গেছে। জোড় মুখের গোলগুলি সারি বেঁধে কালো দূরান্তে চলে গেছে। শুধু টিউব-টানেলের সাদা চূর্ণকামের বদলে গাঢ় ধূসর সব।

আশা করি, খুলেই সব বলতে পারছি। একটু নজর দিয়ে দেখতে গিয়ে বর্ণনার বাহুল্যে গোল পাকিয়ে ফেলছি না। বনের মধ্যে ঢুকে যেই সোজা হাঁটতে আরম্ভ করেছি—কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানতে চাইবেন কেন আমি হাঁটতে আরম্ভ করলাম। হ্যাঁ, দেখুন, মনে হোলো যেন একটা অভিযানে নেবেছি, এবং আমার জীবনে এটাই একমাত্র সুযোগ। পথ যেন ঠিক চেনাই আছে, নিজেকে একটুও হারিয়ে ফেলিনি। ধূসর-কালো টানেলের সোজা পথে পা টিপে টিপে হাঁটছিলাম, খুব আস্তে আস্তে—আর চমৎকার লাগছিলো। যেন জীবনের প্রত্যেকটি নিমেষ একটা দুর্বার উন্মাদনায় বেগে উঠেছে,—'স্পিড-রেকর্ড' ডিঙিয়ে যাবার সময় যেমন একটা উন্মুখ নেশা, বিপজ্জনক উত্তেজনার মুখে একটু কালের প্রত্যেকটি নিমেষ এমন ক'রে বাঁচা যে মানুষের পক্ষে তার বেশী ভাবাও অসম্ভব। এই জংগলের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে এগুতে গিয়ে ঠিক এমন একটা অনুভূতি,—ঠিক অমনি।

একথা বলা মোটেই বাহাদুরী হবে না যে মোটর প্রতিযোগিতার একজন পাকা চালকের মতো নিজের উপরে আস্থা ছিলো। আমার সমস্ত শক্তিই

মুঠোর মধ্যে দৃঢ় সংহত। নিজেকেই সানন্দ ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম, জংগল আমাকে তার ফাঁদে ফেলতে পারে নি।

তারপরে, নানান রকম সব সজাগ শব্দ ও গন্ধ। প্রথমে তো শুধু পাইপ ঘরের গন্ধই ছিলো, তার কথাতো আগেই বলেছি, আর সেই ঝিকট ঝিকট ঝিকট ঝিকট। এখন অন্য আওয়াজও সুড়্ সুড়্ ক'রে বেরিয়ে এসে যেন আলাপ জমাতে চাচ্ছিলো। ছেঁড়াখোঁড়া পাতার ভিজে গন্ধ, নোন্‌তা রকম। এমন কি গাছের বাকলের গন্ধও ঠিক ধরতে পারছিলাম, সবুজে চামড়াটে গন্ধের মতো। দেখুন, গন্ধ তো আর বর্ণনা করা যায় না। বুঝতেই পাচ্ছেন, মোটেই তা সম্ভব না। কথা এসে এখানে হারিয়ে যায়। নাকের তো কোন ভাষা নেই।...যতই এগুচ্ছিলাম খুব নরম নরম চাপা শব্দ কানে আসছিলো। যেন আমার চারপাশে অনেক লোকজন। আমাকে সামনে এগুতে দেখে ক্রমে ক্রমে স'রে যাচ্ছে। আমার কিন্তু মজাই লাগছিলো, একটু যেন সহানুভূতিও হোলো। মনে হোলো, সত্যিই যদি চারপাশে লোকজন থেকেই থাকে, দিশী, বিদেশী, যাই হোক না, তারা ভদ্রতাই কচ্ছে; সমস্ত জংগল দেশটা আমাকে একা উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু ঠিক তাই নয়। ক্রমে খট্‌কা লাগলো, হয়তো বা তারা এহেন জীব আগে কখনো কোনদিন দেখতেই পায়নি, অথবা আমাকে দেখে ভয় পেয়ে ব'সেছে। কী জানি! সম্ভবত, তাদের জংগল-জীবনে এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর ঘটেনি। কোনো দিশী মাটিতে শাদা চামড়া এসে দেখা দেয়নি, দুনিয়ার এমন কোন কানাচে আজো যে র'য়েছে—এ আমার জানাই ছিলো না। তাই তো বলছে সবাই। বলে না যে, দুনিয়ার প্রত্যেক জনপদে তাদের সন্ধানী পা এসে প'ড়েছে? আমার অবশ্যি মনে হ'য়েছে যে একটু বাড়াবাড়িই হ'চ্ছে যদিও।

তা যাই হোক, শব্দগুলি এই ইংগিত জানাচ্ছিল—মানুষ ও আর সবাই আমার পথ থেকে চুপি চুপি স'রে দাঁড়াচ্ছে। যেন আমি খুসীমত বেড়াবো বা আমার সামনে খোলা পরিষ্কার পথ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছে। চমৎকার ভদ্রতা কিন্তু। নিজের কাছেই নিজে বলছিলাম। আতিথেয়তা এমনি হওয়াই উচিত হ'য়েছে। তারা হয়তো ভেবেছে, আমি একেবারে—এই যাকে বলে ঘাবড়ে যাবো।

বাঃ রে, এটা তো তাদেরি জংলা দেশ, আমার নয়। হ্যাঁ, শুনুন তারপরে, এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার ক'রে ফেললাম, যাতে একটু ঘাবড়েই দিলো। তা হ'লে সেটা আরম্ভ করার আগে, কী ক'রে যে সেখানে গিয়ে পড়লাম,—সেকথাই বুঝিয়ে বলছি।

বুঝতেই পাচ্ছেন, সেদিনটা হালকা ধরণের, এই হোলেই-হোলো ছুটির দিন ছিল না, মোটেই না। একটু চেঞ্জে যাবার কথা ছিল। এই ঘরেই আমাকে অনেকবার আপনারা বলেছেন যে এখন আমার উচিত প্রত্যেক বিষয়ের ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা, নিজেকে একরকম ভুলে যাওয়া। চট্ ক'রে সব ব্যবস্থাও হোলো। লিলিকে সব বাচ্চা কাচ্চাদের সংগে ক'রে স্বচ্ছন্দে ডিভনশায়ারে পাঠালাম, একসমুরের পল্লীপ্রান্তে একটা বাসাঘর দেখে। তারপরে খোলাপথে দিল-খোলা বেরিয়ে পড়া গেলো। সাধ হোলো, একেবারে দূরে পাড়ি দেবো, ছুটি নেবো একেবারে প্রকৃতির মধ্যে। স্থিরও ক'রে ফেললাম, তা হ'লে সোজা বাইরে-বিদেশেই গিয়ে পড়া যাক। এই তথাকথিত কি-আর-করি ধরণের বেড়ানো নয় যে টুরিষ্ট এজেন্টের মারফৎ হাত ধরে একটুখানি, আর পিছু পিছু একপাল অচেনা লোক; কিছু খুঁজে নেবার আগেই তা আমার সামনে জাহির ক'রে ব'সে আছে!

আমি ঠিক করলাম সোজা চলে যাব একেবারে—যেখানটায় গিয়েছিলাম। ফিরে জংগলের মধ্যে। ফিরে জংগলের মধ্যে কেন বললাম ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, কেননা জন্মেও তো সেখানে আর যাইনি! কী ক'রে সেখানে গিয়ে পড়লাম সেকথা বরং রেখে দেওয়া যাক। হ্যাঁ, তাই ঠিক হবে। ভ্রমণের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানো নিশ্চয়ই পছন্দ করেন না আপনারা। সত্যি, এতো চট্‌পট্ ক'রে যে বেরিয়ে পড়া সম্ভব হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি! স্যাদাম্‌পটনের মুখে নিউ-ফরেষ্টের সেই জায়গাটায় গাড়ী দাঁড় করিয়েছি এবং পৌঁছেছি গিয়ে একেবারে বনের মধ্যে, এর ভেতরে আর থামিনি বলা চলে। আমার মনে হয়, সত্যিই আপনারাও একবার ভেবে দেখুন না, প্রায় সমস্ত ইংলণ্ডই কিন্তু একদিন জংগল ছিল। হয়তো ছিল না,—যদিও—শুনেছি তুষার-যুগের কথা, আর এই—অবশ্যি

আমার এই জংগলে তুষারের কোন লক্ষণই নাই,—এবং সেটাই হ'চ্ছে আরেকটা মজার ব্যাপার।

জানি যে বেশ গরম লাগছে, কিন্তু আমার তা'তে কিছু এসে যায় নি। বরং গায়ে লাগা তাপটা ভালোই লাগছিলো। সেই মস্তো মস্তো শিকড়গুলির ফাঁক দিয়ে, উপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগুচ্ছি, মাটি খুব কাছে, ভাপসা সোঁদা গন্ধ আসছে, আর একটা উত্তেজনা যে এক্ষুনি হয়তো এমন একটা কিছু টানেলের পথে আমার সামনে এসে পড়বে—যে অমনি আমি—না, না, আমার তো উত্তেজিত হওয়া ঠিক হবে না। আমি গল্পের কথা পেরিয়ে গেছি,—সেবারও আপনারা জানিয়েছেন। সত্যি, আমাকে খেয়াল করিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কোথাও একেবারে ভেতরে গিয়ে জড়িয়ে পড়লে প্রত্যেক ইংরাজই নাকি একটু মুস্কিলে প'ড়ে যায়, অস্বস্তি বোধ করে। এটাই মজার ব্যাপার যে জংগলের মধ্যে আমারো অমন হ'য়েছিলো। ঠিক এই জংগলের মধ্যে পড়ে হয়তো বা সব সাহেবেরি সমান দশা হয়।

হঠাৎ খেয়াল হোলো একী কচ্ছি আমি? বলতে পারি না, তাই বা মনে হোলো কেন? কিন্তু হ্যাঁ, দেখুন, আলোটা নিবিয়ে দিলে বোধ হয় আরো ভালো ক'রে বোঝাতে পারবো। কিছু মনে করলেন না তো, আপনি কথা দিন আপনার বন্ধুও কিছু মনে করবেন না। দেখুন, এটা সত্যিই দরকার কিনা, কেননা—আচ্ছা, আচ্ছা, ধন্যবাদ।

হঠাৎ জ্ঞান হোলো, এই জংগলের মধ্যে রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, একেবারে রাতে। প্রত্যেকটি জিনিষ এমন স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে, যেন তখন দিন। কিন্তু এমনটা হোলো কেন? বলতে পারেন আপনারা কেন? কারণ, বুঝতে পাচ্ছেন, ঠি-ক এই রকম ক'রে হাঁটছিলাম আমি। দেখছেন তো, আলো নেবানো, কেমন অন্ধকার কিন্তু কোন কিছুই তো উল্টে ফেলছি না। ফেলছি না তো? চেয়ার টেব্‌লের পায়ে আমার মাথাটা ঠুকে যাচ্ছে না। ঠিক তখনকার মতোই এই ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওই, ওখানে আপনার বন্ধুর পা র'য়েছে—বনের মধ্যে ঠিক যেন সেই একটু শাদা ঝলক, সেই ছোট নরম জন্তুটির, নাম জানি না,

শাদা-শাদা গোল-গোল। এক রকম জংলা প্রাণী……কিন্তু দেখুন, দেখুন এবারে আর সামলাতে পাচ্ছি না যে! তা হোলে সত্যিই আপনার বন্ধু কিছু মনে করবেন না?……হ্যাঁ আমি, আমি সত্যিই যে কামড়ে ফেলবো তা ভাবতেই পারিনি! ক্ষমা করবেন, ভয়ানক মর্মাহত আমি, বিশ্বাস করুন। পা'টা হয়তো একটু ছুলে গেছে, না? কিন্তু খুব লেগেছে কি? অবশ্যি, কাপড়টা নিশ্চয়ই ছিঁড়ে দিয়েছি। আচ্ছা, আচ্ছা, ওটাকে বেমালুম রিপু করা যাবে। ক্ষমা করুন, কীই যেন আমাকে একেবারে পেয়ে বসেছিলো, আমার আর কাণ্ডজ্ঞানই ছিল না। তারপর শুনুন, হঠাৎ বুঝতে পারলাম, —সেই জংগলের মধ্যে চারপায়ে ভর ক'রে হাঁটছি, আমার চোখ দুটো যেন সেই আগের চোখই নয়! তাই তো অন্ধকারেও ঠিক দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই থেকে কেবলি মনে হয়, ঠিক ঐরকম হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইংলণ্ডে তার সুবিধে খুব কম। হ্যাঁ, এবারে আপনারা স্বচ্ছন্দে আলো জ্বালতে পারেন।

চমৎকার একটা গল্প বলেছি না? কিন্তু এ নিয়ে কী আর কোরবো আমি? আপনারা সত্যি খুব ভদ্রতাই ক'রেছেন, আর তাতেই বা কী? আপনার বন্ধু হয়তো ভাবছেন এখানেও এম্‌নি সুবিধে ঘটে যেতে পারে। কিন্তু এখানে সেটি হচ্ছে না। আমার এই জংগলের কথা শুনে রেখেছেন, তাই? যদিও আমি সত্যিই ভুলে গেছি কোথায় সেই জংগল, এবং কী ক'রেই বা গেলাম সেখানে—তবুও সত্যি আপনারা আমাকে সেখানে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন? সত্যি বলছেন? ফর্মের উপরে সুধু একটু নাম-সই, ব্যস্? আমার কিন্তু ধারণাই ছিলো না যে আপনারাও ট্রাভেল-এজেন্সিতে জড়ানো, ও তা'হলে আপনার বন্ধু! আচ্ছা, আপনারা দুজনেই নাম-সই কচ্ছেন? গাড়ীও একটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমিও এখনি রওনা দিতে পারি? সত্যি, আপনারা আগেই এতোটা ভেবে রেখেছেন? আমার ধারণাই ছিলো না, সত্যিই কোন ধারণা ছিলো না যে এতো চটপট্ কাজ করতে পারেন? তবে হ্যাঁ, আমিও এখুনি বেরিয়ে পড়তে পারলেই খুসী হই। মাল পত্তরের জন্যও মাথা ঘামাবো না। আর চিতাবাঘের আবার ও সব কি?

অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী

* John Gloag-এর 'Jungle' হইতে।

বর্ষশেষ

রাত্রিদিন নিদ্রাহীন। ধারালো বাতাস
অসন্তোষে। কতো রাত্রি দীপালোকহারা!
তাপদগ্ধ এ ধরণী। আলোর ইসারা
জোনাকীর মতো পথে। শ্রান্ত নীলাকাশ।
হীনবল নই তাই হইনি নিশ্চল।
অক্ষুব্ধ সাহস বাহুতটে। সমাবেশ
সকল শক্তির। জনতার কোলাহল
পথে-পথে। সঙ্গীতের মতো জাগে দেশ।

সিসিলিতে খারকভে বিজয়ী বাহিনী
ক্লেদমুক্ত করে জনপদ। এই দেশে
আমরাও লড়ি। জাতীয় ঐক্যের বাণী
হাতিয়ার। সবাইকে আজ সঙ্গে টানি।
খারখভ, সিসিলির প্রেরণা স্বদেশে
দেয় নববল, ভীত পঞ্চমবাহিনী॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অস্বীকৃতি

কালো পাষাণের লুব্ধ জিহ্বা,
ঘুটঘুটে রাত্রিতে সহস্র বলির রক্ত।
কাপালিকের চক্রান্তে আমাদের রক্ত মোক্ষণ।
মহাকালের কৃষ্ণপক্ষ।
শ্মশানে বসন্ত নয়, বসন্তে শ্মশান ;
সুন্দরী-বীভৎসতা নয় বীভৎস কুৎসিত।
ভক্তি নয়, ভয়, শুধু ভয়।
আমাদের অঞ্জলি আকাশ-কুসুমে নয়—
ঘানিটানা জীবিকার শুধু সর্শে ফুলে।
সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা,—বৈষ্ণবীয় মহাপ্রেমও
দেখেছি। কত বাঁশী শুনেছি।
কত বাঁশী সুদর্শন হ'ল।
কত কৃষ্ণ কালী হ'ল।
কালো ভূতপ্রেত কালো কোর্ত্তা
কালো মৃত্যুর স্তুতি গায়।
আজ অস্বীকার।
অস্বীকৃত কালো যুগ, কালো বিগ্রহ,
কালো কাপালিক আর কালো বলিদান।
ভয়ার্ত্ত চোখ মরিয়া হয়েছে,
অঞ্জলির খোলা হাত বুঁজে গেছে,
শক্ত বোঁজা হাত ঊর্দ্ধে উঠেছে।

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সৈনিক

বহু মৃত্যু পার হ'য়ে এসেছি ত চ'লে :
বহু রাত্রি, বহু দিন—
এসেছি নিষ্ঠুর পায়ে দ'লে,
তবু আজও পাই নাই চূড়ান্ত বিজয়—
তাই ত আসেনি আজও থামার সময়।
গোবির উত্তপ্ত বুক আজও টানে পিছনে আমায় :
উন্নত পামীর কাঁপে আজও জানি চরণের ঘায়।
সিনেভ্ সুমের—
আজও রক্তে টানি তার জের।

তবুও এগিয়ে চলি বদ্ধ-দৃষ্টি সম্মুখের দিকে :
দিগন্তে সূর্যের রঙ্ হয় হোক্ ফিকে—
নামে যদি নামুক তিমির—
আমার গতির বেগ তবু রবে স্থির।
অসীম সমুদ্র-বক্ষে আমি যেন দিশারী নাবিক
নিঃসঙ্গ নির্ভীক :
নিশ্চিত যাত্রার শেষে পাব জানি কূল—
যতই হোক না পথ বিপদ-সঙ্কুল।
পথের বিপদ আর বাধা সুকঠিন—
পার হব হাতে নিয়ে উঁচানো সঙ্গীন।

আমার পথের শেষে আকাঙ্খিত দেশে
সোনায় হরিতে মেশা অপরূপ বেশে—
জানি পাব ঈপ্সিত বিজয়
তাইত এগিয়ে চলি নিঃশঙ্ক নির্ভয়।

গোপাল ভৌমিক

আলোচনা ও প্রতিবাদ

"জনযুদ্ধের গোড়ার কথা"

অগ্রহায়ণের 'পরিচয়ে' শ্রদ্ধাভাজন অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের জনযুদ্ধ প্রবন্ধটি দেখলাম। আমার নিরবলম্ব তার্কিক মনের কয়েকটি প্রশ্নের নিরসন না হওয়ায় এই পত্রাঘাত। হয়ত প্রশ্নগুলি অবান্তর।

মেনে নিলুম এই যুদ্ধটা রাশিয়ার পক্ষে জনযুদ্ধ। জার্ম্মেনী ও রাশিয়া দু'জায়গাতেই একনায়কত্ব হলেও তফাৎ আছে। এবং সেই তফাতের জোরেই একটি দেশের জনসমাজ অনিচ্ছায় বা একটা হিংস্রমনোবৃত্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বা মানসিকতার দিক থেকে সম্পূর্ণ অবুঝ বলেই অন্য দেশে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে আর একটি দেশের অগণিত জনসমাজ আদর্শের খাতিরে, মানবতার জন্যই আত্মদান করছে।

রাশিয়ার যদি এটি জনযুদ্ধ হয় তাহলে রুশীয়রা হেরে যাবে বা হেরে যেতে পারে এ চিন্তা কি করে উদয় হয়? রাশিয়ার প্রতিটি সূচ্যগ্রভূমি যতদিন না জারমানরা দখল করবে, প্রতিটি রাশিয়ানকে তারা যতদিন না নিহত করবে (বন্দী করলেও রাশিয়ার মনোবৃত্তি অটুট থাকবেই, এই কথাই যখন আমরা মেনে নিচ্ছি) ততদিন রাশিয়ার হেরে যাওয়ার প্রশ্ন তো ওঠেই না। এবং সব চেয়ে বড় কথা এই যে আদর্শের যুদ্ধে বাইরের সাহায্যের কথা ওঠে না। রাশিয়ানরা প্রথম দিকে বাইরের সাহায্য চায়ই নি—এখনও ঠিক চাইছে একথা বলা চলে না। তা ছাড়া "মিত্রপক্ষ" তাদের কতটুকু সাহায্য দিয়েছে সেকথাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

আমরা বলতে পারি যে যখন তারা মানবতার জন্য যুদ্ধ করছে তখন মানবতার দিক থেকেই আমাদের সাহায্য করা উচিত। কিন্তু আমাদের মানবতা কি আছে? যাদের নিজের দেশেই মানুষ বলে পরিচয় দেবার অধিকার নেই, সত্তা নেই, তারা কিসের মানুষ? অনাহার ও নগ্নতা যাদের নিত্য সহচর তারা কি মানুষ?

এই প্রশ্নের অন্য দিকও আছে।

রাশিয়ায় জনযুদ্ধ হলেও কি ইয়োরোপখণ্ডের যুদ্ধ জনযুদ্ধ ছিল বা আছে? আমেরিকায়? ইংলণ্ডে না হয় সোশালিজ্‌মের অনেকখানি মেনে নেওয়ায় সেখানে যুদ্ধ জনযুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। য়ুরোপখণ্ডে এখন গরিলা যুদ্ধ চলছে বলে সেখানে কি এখন জনযুদ্ধ চলছে?

সবচেয়ে বড় কথা এই যে রাশিয়াকে সাহায্য করতে হবে বলে আমাদের জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হবে। রাশিয়ার সঙ্গে কি জাপানের যুদ্ধ চলছে? এখানে হয়ত মিলিটারী ষ্ট্রাটেজীর বড় বড় কথা উঠবে। বেচারা চীন!

লেবাননের দুর্ঘটনার সঙ্গে ভারতবর্ষের এক বৎসর আগের ইতিহাসের বেশ মিল আছে। স্বাধীনতাপ্রিয়, মানবমৈত্রীর প্রথম পাদপীঠ ফ্রান্সের আচরণ কি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারি? না সব জায়গায়তেই আমাদের বড় বড় কথার দিকে নজর রাখার দরুণ "ছোট ছোট" ঘটনাগুলিকে উপেক্ষা করতে হবে?

এটা ঠিক কথা যে আজ জাপান যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ ক'রে বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করে, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হব আমরাই। সুতরাং প্রতিরোধ করতেই হবে। সে দিক দিয়ে আমাদের যুদ্ধ নয় বলে নিষ্ক্রিয় থাকার অর্থ নেই। কিন্তু যেখানে রাশিয়ার একটি বাড়ী ভাঙলে সমস্ত রাশিয়া এসে সাহায্য করবে, সেখানে এই ভারতবর্ষে—আমার বাড়ী ভাঙলে সেটি আমারই! বাংলা দেশের পথে ঘাটে যে শিবতাণ্ডব চলেছে তার জন্য ষ্টেটই কি দায়ী নয়? যা হবার হয়ে গেছে বলে মেনে নিলেও, জিজ্ঞাসা করবো এখনও তার প্রতিবিধানের জন্য কি হচ্ছে?

একটি শ্লোগান মাঝে মাঝে শোনা যায় যে জাপানীদের যুঝবার শক্তি অর্জন যদি আমরা করতে পারি তা হলে ব্রিটিশের সঙ্গে বোঝাপড়া করাও আমাদের পক্ষে শক্ত হবে না। পক্ষান্তরে কি এইটি প্রশ্নই করা যেতে পারে না যে ব্রিটিশের সঙ্গে সমান তালে চলবার ক্ষমতা আমরা পেলে জাপানীদের প্রতিরোধ করা আমাদের পক্ষে কি খুবই দুরুহ হবে?

জাপানীদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকার বা তাদের সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হবার ইঙ্গিত আমি করছি না। একের দাসত্ব থেকে অন্যের কাছে দাসখত লেখবার সদিচ্ছা আমার বিন্দুমাত্রও নেই। আমি খালি

জানতে চাই যে জাতীয়তাবোধের যতই দোষ থাকুক, জাতীয়তাকে বাদ দিয়ে কি আমরা আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছোতে পারি? রাশিয়ার আদর্শ মহামানবতার হলেও, রাশিয়া একটা ভৌগলিক জায়গা তো বটেই।

এত সত্ত্বেও আরও একটা কথা উঠতে পারে। জনযুদ্ধ হোক আর না হোক, আমাদের ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, যুদ্ধের নানারকম অসুবিধা আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে, দু'চার জন যে সুবিধাগুলোও ভোগ করে নিচ্ছেন না তা নয়, আমরা চাই বা না চাই যুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। এ অবস্থায় সব রকম দুঃখ কষ্ট অসুবিধা ভোগ করার পর আমরা যদি আরও একটু কষ্ট সহ্য করি, যুদ্ধোত্তর আশা ভরসার দিকে চোখ রেখে, তা হলে কি অন্যায় হবে? কিন্তু চার্চ্চিল ও অ্যামেরী সাহেবের চোখা চোখা বুলির পর, আমেরিকার ঘন ঘন ষ্ট্রাইকের সংবাদের পর, বিশেষ করে তাদের রিপাবলিকান পার্টির শ্লোগান জেনে যুদ্ধটা হেস্তনেস্ত মীমাংসা পর্য্যন্ত চলা সম্বন্ধে কি আমাদের সন্দেহ জাগতে পারে না? এই সন্দেহই যদি জাগে তবে এটা কিসের জনযুদ্ধ?

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার

'চতুর্দশপদীর পদসঞ্চার'

বিগত পূজা সংখ্যার 'পরিচয়ে' 'চতুর্দশপদীর পদসঞ্চার' নামে আমি যে প্রবন্ধটি লিখেছিলাম, সে সম্বন্ধে শ্রীমতী বাণী রায়ের আলোচনা প'ড়ে যুগপৎ কৃতজ্ঞ ও বিস্মিত হ'লাম। আমার আলোচনাটি পড়ে, তিনি যে কাগজ কলম নিয়ে একটু পরিশ্রম ক'রেছেন সেজন্যে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি, আর এই লেখাটি প'ড়ে তিনি যে এর বিষয়বস্তু ও প্রসংগের বাইরে বহুদূর বিচরণ ক'রে আসতে পেরেছেন সেজন্য বিস্ময় বোধ করছি। যাই হোক্ তাঁর ব্যক্ত ও প্রচ্ছন্ন প্রশ্নগুলির একে একে উত্তর দেবার চেষ্টা করি:

শ্রীমতী রায়ের আলোচনার প্রথম এবং অধিকতর অংশে অনুচ্চারিত অথচ সুস্পষ্ট প্রশ্নটি হ'চ্ছে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সনেট সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা এ প্রবন্ধে নেই কেন?

উত্তর—কারণ এ প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে চতুর্দশপদীর পদসঞ্চার সম্বন্ধে। 'সঞ্চার' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'আবির্ভাব ও বিস্তার' (চলন্তিকা দ্রষ্টব্য)। বাংলা সাহিত্যে 'সনেটে'র আবির্ভাব প্রসংগে 'সনেটে'র বিস্তারিত কুলজীর পুখানুপুংখ বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক ব'লেই মনে করি। এই প্রসংগে শ্রীমতী রায়ের আলোচনার উপসংহারের প্রশ্নটিরও জবাব দেওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "মধুসূদনের চতুর্দশপদীর অপটু পদসঞ্চারের পরে প্রবন্ধ লেখক সেই পথে বহু ঘামের ঘ্রাণ এবং সূর্য্যালোকের প্লাবন ও তারাখচিত আকাশের স্তব্ধতা দ্বারা স্নান করে এসেছেন"—এট ঠিক বোঝা গেল না।

উত্তর : সাহিত্যের গতি ধারাবাহিক। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ—বাংলা সাহিত্যের এই দৌড়টা আকাশপথে সাধিত হয়নি। মধুসূদনের হাতে বাংলার সনেট 'নার্সারি' বা শিশুসদনে লালিত হ'য়েছে। পরবর্তী কবিদের হাতে এই শিশু বাল্য-কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনে পদার্পণ করেছে; শ্রীমতী বাণী রায় এই তত্ত্বটি-ই কি বুঝতে পারেন নি? এই প্রসংগে তৃতীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়।

প্রশ্ন :—'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মধুসূদনের তুলনা করবার মোহ আজো কেন আমাদের আছে?'

উত্তর—কারণ মানব-সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় প্রবন্ধ লেখকের এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু মানুষের আস্থা আছে। বঙ্গদেশীয় মুচিরাম গুড় শ্রেণীর ডিপুটির পক্ষেই পিতা সাফলরামের নাম বিস্মৃত হওয়া সম্ভব। অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাটে' নন্দলাল নামক বায়ুকোপগ্রস্ত লোকটিও বিলাসিনী কারফরমাকে বলেছিলেন, "দেখুন দেখি—আর ষ্টুপিড্ বাবা কিনা আমায় একটা ঘ্যানঘেনে মেয়ে জুটিয়ে দিচ্ছেন!"

বাংলা সাহিত্যের পথিমিতির কাজে হাত দিলে পথের দূরত্ব নির্দেশক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এবং মধুসূদন উভয়েই স্মরণীয় এবং তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ এবং মধুসূদন উভয়েই প্রতিভাবান কবি। অন্যান্য সকল জগতে যদি সমধর্মীর তুলনা করা হাস্যকর মনে না হয়, তা হ'লে কাব্য জগতেই বা তা কেন মনে হবে বুঝতে পারছি না।

শ্রীমতী বাণী রায়ের আর একটি মন্তব্যের উত্তর দিয়ে আমার বর্ত্তমান পত্ররচনা শেষ করি। তিনি লিখেছেন : "সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটিকা ভিন্ন অন্য নাটকের অভাব ছিল না।"

নিবেদন :—সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক ছিল। দৃষ্টান্ত ভাষ রচিত উরুভঙ্গ।

হরপ্রসাদ মিত্র

পুস্তক-পরিচয়

ঈসকাইলাস—শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়। শতাব্দী গ্রন্থমালা প্রদর্শিকা। মূল্য—এক টাকা আট আনা।

মোহিনীবাবু বহু যত্ন ক'রে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন। ঈসকাইলাসের নাটক তিনি মূল গ্রীক ভাষায় পড়েছেন; পরিশিষ্টে মূল গ্রীক থেকেই বাংলায় কিছু কিছু অনুবাদ করেছেন। গ্রীক ট্র্যাজিডির উৎপত্তি ও বিশেষত্ব আলোচনা ক'রে লেখক ঈস্‌কাইলাসের সাতখানি নাটকের ধারাবাহিক পরিচয় দিয়েছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন। তারপর ঈসকাইলাসের গঠন-শিল্প, কথাবস্তু-নির্ব্বাচন, চরিত্র-চিত্রণ, অভিনয়-কুশলতা, ভাব-সম্পদ্ ও ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরিশিষ্টে অনুবাদ আছে সেকথা আগেই বলেছি।

ঈসকাইলাস ট্র্যাজিডির জনক; আবার তিনিই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডিয়ান। মানুষের জীবনে দৈবশক্তির ভয়াল ও মহিমময় দ্বন্দ্বলীলাকে মানুষের ভাষায় এমন অলৌকিক ও মূল প্রাকৃতিক রূপ দিতে আর কোন্ কবি সক্ষম হয়েছেন? সেই প্রাচীন যুগে আমাদের বীর প্রপিতামহগণের চিত্তলোকে স্বর্গ ও মর্ত্য কেমন এক হয়ে গিয়েছিলো, যে অমোঘ বিধির কাছে আত্মসমর্পণ করে জীবনযুদ্ধে তাঁরা জয়ী হলেন আবার পরাজিতও হলেন সেই বিধির বন্ধনে দেবতা ও মানব কেমন অজস্র গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়ে মরজগতে অমর ইতিহাস রচনা ক'রে গেছেন, ঈসকাইলাসের রচনায় তার সমুদ্ধতম প্রকাশ দেখি। বাস্তব সামাজিক দ্বন্দ্ব, মানবের সহিত প্রকৃতির, শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর, জাতির সহিত জাতির, ঈসকাইলাসের নাটকে অগ্ন্যুৎপাত করেছে, ভূমিকম্পের দোলা এনেছে, প্রলয়ের সুর তুলেছে। পরের যুগের নাটকে বাস্তবের এই অমোঘ মহিমা আর দেখি না।

মোহিনীবাবু ঈসকাইলাসের ট্র্যাজিডির ভিতরকার রূপটি চমৎকার ফুটিয়েছেন। প্রাচীন ও বৈদেশিক সাহিত্যকে এমন সজীব ক'রে তোলা কম শক্তির পরিচায়ক নয়। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ, মার্জিত ও সরল। ঈসকাইলাসের নাটকের কাহিনীগুলির বর্ণনায় নাটকীয় ভাবসূত্রটি তিনি এমন দক্ষতার

সহিত অনুসরণ ক'রে গেছেন যে পাঠক বুঝতেই পারবেন না যে সমালোচকের স্কন্ধে আরোহণ করে তিনি কেমন অনায়াসে এগিয়ে চলেছেন। গ্রীক কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদের একটা বৃহৎ সার্থকতা আছে। আক্ষরিক অনুবাদে ছাড়া তার গ্রীকত্ব বজায় থাকা কঠিন। মোহিনীবাবু ওই পথই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু অনুবাদ আরো ভাল হতে পারতো কিনা এ বিষয়ে মতভেদ থাকবে।

গ্রন্থটি সত্যই উপাদেয় হয়েছে। গ্রীক ট্র্যাজিডির প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও অনুরাগ এর ছত্রে ছত্রে। গ্রীসের সামাজিক ইতিহাসের আর একটু পরিচয় দিলে বোধ হয় ভাল হতো। কিন্তু সাহিত্যিক বিচার যা গ্রন্থকার করেছেন তা খুবই উচ্চাঙ্গের। পাঠক মহলে গ্রন্থটির আদর হয়নি শুনলে সত্যই দুঃখিত ও বিস্মিত হবো।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ভবিষ্যতের বাঙালী—এস্ ওয়াজেদ আলি। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনচিন্তাবাদের প্রয়োজনীয়তা কতখানি এস্ ওয়াজেদ আলির লেখা 'ভবিষ্যতের বাঙালী' প্রধানতঃ তারই প্রতিপোষক। যুক্তিবাদ দাঁড়িয়ে আছে এরই উপর ভর ক'রে। রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানকে মনের ঔদার্য্য দিয়ে পার্থিব দৃষ্টিতে দেখলে যা দাঁড়ায়, 'ভবিষ্যতের বাঙালী' তারই বিশুদ্ধ নিষ্কর্ষ। যুক্তিবাদ এখানে নির্ব্বিবাদেই উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং সেদিক থেকে লেখকের বিশ্লেষণী মন ক্বচিৎ আদর্শচ্যুত হয়েছে বলেই মনে হয়। এই চ্যুতি কোন কোন ক্ষেত্রে দুঃখবাদীর খেদে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতীতের উত্তমতায় উভরায়। কিন্তু তাতে লেখকের ভবিষ্যতের মূলীভূত বিষয়ে বিশেষ হাত পড়েনি, কারণ সর্ব্বত্রই তাঁর দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে এবং তা নিঃসন্দেহে আশাবাদীর দৃষ্টি। তাছাড়া অতীত ও বর্ত্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যৎ বিচ্ছিন্ন ত' নয়ই পরন্তু এতদ্‌উভয়ের পরিণতই ভবিষ্যৎ। অতীতে যা ছিল, বর্ত্তমানে যা আছে, ভবিষ্যতে তা

থাকবে কিনা তা আপাতদৃষ্টিতে যদিও অনুমানসাপেক্ষ, কিন্তু তবুও বর্ত্তমানের মধ্যে অতীতের স্মৃতি থাকে এবং বর্ত্তমানেরও থাকবে ভবিষ্যতে।

সমাজে, রাষ্ট্রে ও মানুষের মনে প্রতিনিয়ত যে ঘাত-প্রতিঘাত চলছে, গ্রহণ-বর্জ্জন চলছে, ক্রমায়তধারায় সমাজকে, রাষ্ট্রকে, মানুষকে তা নিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে; সে ভবিষ্যৎ সমাজ, রাষ্ট্র, বা শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের দিকও হ'তে পারে অপকর্ষের দিকও হ'তে পারে; ফলতঃ পরিবর্ত্তনের দিক যে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এস্ ওয়াজেদ আলি সাহেব তাঁর গ্রন্থের বহু ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান বাঙালীর সার্ব্বত্রিক দুর্দ্দৈবের কথা আলোচনা সম্পর্কে যুক্তিবাদের ভিত্তিতে যে কথা বলেছেন তা'তে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা আশাবাদী হ'তে পারি,—যদি না এই বর্ত্তমানের ছাপ ভবিষ্যতের উপর গিয়ে অর্সায়। কিন্তু তা অর্সাবেই যদি না আজ বর্ত্তমানকেই আমরা আমাদের কাজে লাগাতে পারি। এই গ্রন্থে বর্ত্তমান-বিশোধক অনেক কথাও গ্রন্থকার বলেছেন যা শ্রুতিমধু ও যুক্তিসঙ্গতও তবে অমোঘ কিনা তা ভবিষ্যতই বলতে পারে।

মনুষ্য সমাজে বিজ্ঞানের অতুলনীয় উৎকর্ষের দিক দেখে যেমন আমরা আশ্চর্য্য হই, তেমনি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের বহুবিধ অপকর্ষের দিক দেখেও আড়ষ্ট কম হই না,—এই বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে ভয় করে। সমাজ-ব্যবস্থার কথা তুললেও দেখা যায়, অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে ঠিক যে কে সমাজ-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও উপশম এনেছিল বা এনেছে, এবং কে যে আতান্তর সৃষ্টি করেছিল বা করেছে তা ঠিক ক'রে বলা শক্ত। একদিন আত্ম-ত্যাগই ছিল যে মানুষের চরমোৎকর্ষ, কালে তা আত্মসর্ব্বস্ব হ'য়ে দেখা দিল,—আত্মপরে অভেদের বদলে এলো দারুণ বিভেদ এবং তখনই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনও গেল বদলে। এই পরিবর্ত্তন অনন্তকাল ধরেই চলছে; অতীতেও অতীতের মানুষ এ নিয়ে খুশি হয়নি, বর্ত্তমানেও আমরা হচ্ছি না, ভবিষ্যতেও হব ব'লে আশা করা দুরূহ। যে সমাজতন্ত্রের বা সাম্যবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সুখ পরমার্থলাভের পথে পদার্পণ করল, যা পৃথিবীশুদ্ধ লোকের চোখে নতুন আলোর নেশা লাগান, সেও একদিন সময়ের হাতে রেহাই পেল না, বিকৃত হয়ে দেখা দিল একনায়কত্বে ও সমষ্টিতন্ত্রতায়। তাহ'লে ত' সেই অতীতই ফিরে এলো আবার রকমফের হ'য়ে! বাঙালীর কথায় ঐ অতীত-বর্ত্তমানকে

নিয়ে আর তাল ঠোকাঠুকি করতে ইচ্ছে করে না—ছোট বড়ো সমস্যাগুলি সত্যিই আজকের এই পারিপার্শ্বিক নিষ্পেষণে যে ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছে তার সবই আমাদের স্বকৃতোদ্ভূত যে নয়, তা একটু চিন্তা করলেই ধরা পড়ে। দেশের মুক্তির আবহাওয়ায় এই সব কলুষ, বাঙালীর অতীতে যা ছিল না, বর্ত্তমানে যা আছে, ভবিষ্যতে তা থাকবে না বলেই আশা করা ছাড়া আর বর্ত্তমানে কি করবার আছে!

যুক্তিতর্কের কূট-কচালির কথা বাদ দিয়ে সহজভাবে দেখলে সত্যিই 'ভবিষ্যতের বাঙালী' পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও বাঙালার যে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এর প্রতিটি ইঙ্গিত ভাষার প্রাঞ্জলতায় স্পষ্ট, দরদের ছোঁয়ায় প্রাণস্পর্শী এবং নৈষ্ঠিক নিরপেক্ষতায় সজাগ। ওয়াজেদ আলি সাহেব যে একজন বিশুদ্ধ বাঙালী, তিনি যে হিন্দুও নন, মুসলমানও নন (সাহেব ত নন-ই) এই একপেশেমি বর্জ্জিত লেখাই তার দিব্য-প্রমাণ।

'ভবিষ্যতের বাঙালী' নামক প্রথম প্রবন্ধটির নামানুসারেই গ্রন্থখানির নামকরণ হয়েছে এবং এই গ্রন্থে রাষ্ট্রের রূপ, রাষ্ট্র ও নাগরিক, হিন্দু-মুসলমান, ভবিষ্যতের বাঙলা-সাহিত্য, প্রেমের ধর্ম্ম ও জাতীয় জাগরণ নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে কোনটিই জাতীয় জীবনের দিক থেকে কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়, বর্ত্তমানকালে। বাঙলা ভাষায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হুমায়ুন কবির ছাড়া ঠিক এই ধরণের প্রবন্ধ আমি পড়েছি বলে মনে হয় না।

বিশেষ ক'রে, 'ভবিষ্যতের বাঙালী' ও 'হিন্দু-মুসলমান' এই দুটি প্রবন্ধই এই গ্রন্থখানিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করেছে। সকল সম্প্রদায়ই এই প্রবন্ধ দুটি পাঠ ক'রে উপকৃত হবেন এবং নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে যে জগৎ তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার সুযোগ পাবেন। এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখছেন: 'আমার মনে হয়, এ সমস্যার সমাধান যতদিন সমাজ, কৃষ্টি এবং সাহিত্যের তরফ থেকে না হ'বে ততদিন রাজনীতির দিক থেকেও হবে না। কেন না, রাজনীতি হ'ল বাইরের জিনিষ, আর সামাজিক জীবন, কৃষ্টি ও সাহিত্য, এসব হ'ল জাতির অন্তরের জিনিষ। অন্তরের মিল না থাকলে, বাইরের চুণকাম করা মিলের কোন মূল্য নাই। সামান্য ঝড়-বৃষ্টিতেই

সে ভুয়া ইমারৎ ভূমিসাৎ হ'বে। * * * অন্তরের মিলনের ভিত্তিই হচ্ছে ভাষা এবং সাহিত্য। ভাষার ঐক্য ছাড়া মানুষের মধ্যে সেই প্রগাঢ় হৃদ্যতা আসতে পারে না, যার উপর ভিত্তি ক'রে একটা সুসম্বদ্ধ জাতি গড়া যেতে পারে, আর সেই হৃদ্যতা সমগ্র ভারতের মধ্যে নাই বলেই রাষ্ট্রের দিক থেকে আমাদের জাতি গড়নের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।'...এই প্রসঙ্গের শেষ তিনি করেছেন সুন্দরভাবে, 'ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, সহজেই বুঝতে পারা যায়, আপাততঃ জাতি (Nation) সৃষ্টির উপকরণ এক বঙ্গদেশেই পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। অন্য কোন প্রদেশের বিষয় সেকথা বলা চলে না। এই বাংলাদেশেই হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ একটা ভাষা আছে, যার সহায়ে তাঁরা সাহিত্য চর্চ্চা করেন, আর যাকে তাঁরা বাংলার সাধারণ ভাষা বলে স্বীকার করেন। তা ছাড়া বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আরও অনেক বিষয়ে এমন সব ঐক্যের উপাদান আছে, যার সাহায্যে নেশন বা জাতি-গঠন কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হ'তে পারে।

অতএব এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বাংলার হিন্দু-মুসলমানের কর্ত্তব্য এবং ভাগ্যের (Destiny) নির্দ্দেশ হ'চ্ছে এই বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমানকে নিয়ে এবং বাংলা ভাষার সাহায্যে একটি জাতি গঠন করা। বাংলার দৃষ্টান্ত দেখে অন্যান্য প্রদেশের লোকও ক্রমশঃ এই পথে অগ্রসর হবে।' হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্পর্কে কথাগুলি বিশেষ ভাবেই প্রণিধান যোগ্য।

'ভবিষ্যতের বাঙালী' নামক প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে এখানে এমনি একটি অত্যন্ত সহজ অথচ সারগর্ভ ছত্র তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি লিখছেন, 'রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে অনেক সময় ব্যর্থ হয়, প্রাচীন রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান যে অনেক সময় অন্তর্বিপ্লব বশতঃ আপনা থেকেই ভেঙে পড়ে, তার কারণ কি? একটু অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাই, ঐক্যের যে সূত্রগুলি আমরা উল্লেখ করেছি, তাদের সবগুলির কিম্বা কতকগুলির অভাব হয়েছিল বলেই সেরূপ ঘটেছে; ঐক্যের স্থানে তাই অনৈক্য এসে দেখা দিয়েছে, মৈত্রীর স্থানে দ্বন্দ্ব এসে দেখা দিয়েছে, সহযোগের স্থানে অসহযোগ এসে দেখা দিয়েছে, আর তার ফলে রাষ্ট্র-সৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।' পূর্ব্বোল্লেখিত প্রবন্ধ হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্পর্কেও এই

কথাগুলি খাটে এবং এই ঐক্যাভাবই যে আজ আমাদের জাতীয় জীবনের মূলে ঘুন ধরিয়ে, তাকে ছন্নছাড়া ও স্বগৃহে পর ক'রে দিয়েছে তা হতভাগ্য আমরা না বুঝলেও এই নাটকের তৃতীয় নায়ক যে ভালোভাবেই বোঝেন তার প্রমাণ হামেশাই পাওয়া যায়।

এইবার আমরা 'ভবিষ্যতের বাঙলা-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে উপর উপর কিছু আলোচনা করব। এই প্রবন্ধে গ্রন্থকার বাঙলা-সাহিত্যের প্রাচীন লিপিকারদের পক্ষপাতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র ও আলাওয়ালের কথা বাদ দিয়ে, বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই, সকল সময়েই, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, (অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটু স্বতন্ত্র ভাবে বলা হয়েছে) উচ্চ হিন্দু ভদ্রশ্রেণীর জীবন দিয়ে, তাদেরই আদর্শ দিয়ে, সমস্যা দিয়ে, সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন বলে দুঃখিত হয়েছেন এবং এ-কথাও লিখেছেন, 'শ্রমিক জীবনের সমস্যা এই দুই সাহিত্যের (মানে, বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-সাহিত্যে) কোনটিতেই স্থান পায়নি'...। কথাটা বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে খাটলেও, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য নয়। পরবর্ত্তিকালে এমন ইঙ্গিত ও উক্ত ধরণের পারিপার্শ্বিক রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাওয়া যায়।

আসল কথা, সাহিত্যের মৌলিক তত্ত্বগুলিকে বাদ দিলেও সময় ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে কোনদিনই সে এড়াতে পারেনি। ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র বা প্রাক্‌রবীন্দ্রিয় লেখকদের মধ্যে তখনকার সামাজিক, লৌকিক ও মানসিক অবস্থার বিবরণ ও বৈচিত্র্যই এসেছে বহুল পরিমাণে এবং সেটা স্বাভাবিকই। তৎকালীন চিত্রই ত' তাঁরা এঁকেছেন, তৎকালীন সমস্যার কথাই ত' তাঁরা আলোচনা করেছেন—তাকে বিবৃতও করেননি কাল্পনিকও করেননি, তার মধ্যে বাস্তবিকতার ত' পরিচয় পাওয়া যায়; অবশ্য সে বস্তুতান্ত্রিকতার মধ্যে ভাববাদের ডোজ ছিল একটু বেশীই।

বিদেশের ক্লাসিসিজিম, হ্যানোভারিয়ানিজিম, রোমান্টিসিজিম ও ভিক্টোরিয়ো যুগের সকলেই, সকলসময়েই তাদের নিজস্ব যুগের মানসিকতাকেই ত' প্রকাশ করেছে সাহিত্যের মধ্যে। শ্রমিক-জীবনের সমস্যা যখন ছিল না, তখন শ্রমিক-জীবনের সমস্যা নিয়ে গ্রন্থ-রচনা করলে তা নিছক কল্পনা-

বিলাস হ'ত, রিয়ালিষ্টিক যে হ'ত না তা গ্রন্থকার নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। তখনকার সমাজ-শিক্ষাই ছিল অন্য, আদর্শও ছিল অন্য, এবং তৎকালীন সাহিত্যে তাই তারই প্রতিফলন ঘটেছে—নীট্‌সের মত ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা সব দেশে সকল সময় ত' জন্মায় না।

ইউরোপের ভাবুকদের মন সর্ব্বদা ভবিষ্যতের দিকে সত্য, কিন্তু ওয়েলস্, শ' বা হাক্সলে আজ যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন তা অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হ'লেও অনেকে আবার বর্ত্তমানে তাকে কাল্পনিক, অবাস্তব বলেও উড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে ও রবীন্দ্রপর অনেক সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্যেও বর্ত্তমান অতিক্রম ক'রে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে এবং বর্ত্তমান যুগেই সেটা সম্ভব, অতীতে সম্ভব ছিল না। বর্ত্তমান বাঙলা-সাহিত্য আজ আর ঠিক অতীতমুখী নয়, আজ সে সংস্কার-মুক্ত, সমাজের বৃহদ্‌পরিবারের জন্য তার চিন্তা, বহু নিয়ম-কানুন, বাধা-বিঘ্নের বাইরে গিয়ে আজ সে দাঁড়িয়েছে—বড় আদর্শ নিয়ে—ভারতীয় সর্ব্বজাতীয় আদর্শ ও সমস্যা নিয়ে, যথার্থ বাস্তবতার ভিত্তিতে। আজকের যে সাহিত্য ক্রমশঃ ব্যাপ্তিলাভ করছে, তার প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় নিষ্ক্রিয়তা দূরীভূত হয়ে একদিন হয়ত বাঙালীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। এই সাহিত্যের সাহায্যেই হয়ত বাঙালী পাবে সবচেয়ে বড় গৌরব এবং এস্ ওয়াজেদ আলি সাহেবের লেখা 'ভবিষ্যতের বাঙালী' সেইদিনই বোধ হয় স্বার্থকতা লাভ করবে সবচেয়ে বেশী।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র

১৩শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
পৌষ, ১৩৫০

পরিচয়

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ী মুরগীর মাংস খাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল খাওয়াটা নেহাৎ-ই উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে; সেই ভদ্রলোক এবং আমরা কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে গল্প বেশ জমে উঠল। সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ় এবং সুসংহত অভিযানের প্রশংসা করলেন ভদ্রলোক। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এ মন্তব্যও করলেন যে, মুসলমানদের আজকালকার সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার জন্য একজন খুব বড় হিন্দু লেখকের উস্কানি অনেকখানি দায়ী। এই লেখক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই নিয়ে তখুনি আমার কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কি ভাবে ঠিক মনে নেই, চট করে প্রসঙ্গটা অন্য দিকে মোড় নিল।

মনে পড়ে যখন কলেজে পড়তাম, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান বিদ্বেষী কিনা এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তর্ক চলেছিল কলেজ ম্যাগাজিনে। আমরা রীতিমত 'কোমড়ে গামছা বেঁধে' বংকিমের অসাম্প্রদায়িকতা প্রমাণের মানসে বাছা বাছা যুক্তিজাল প্রয়োগ করতাম। সে কথা মনে পড়লে এখন হাসিই পায়; এ ধরণের প্রচেষ্টাকে এখন নিরর্থক বলে মনে করি। বঙ্কিমের সাহিত্য পড়ে যদি বহু লোকের মনে হয়ে থাকে তা পক্ষপাত-দুষ্ট তবে বই-এর চরিত্র সমাবেশের সঙ্গে লেখকের মতামতের কোন সম্পর্ক নেই, এ সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করা নিরর্থক। লজিক বা অঙ্কশাস্ত্রের সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ দিয়ে হৃদয়বৃত্তির সাহায্যে আমাদের যে বোধ জন্মে তা উল্টে দেওয়া বড় শক্ত।

আসল কথা হল, আমরা যদি আমাদের আজকের দিনের পরিবর্তিত জ্ঞান ও বুদ্ধি নিয়ে, দুই পুরুষ আগের লেখককে বিচার করতে যাই তো সে

বিচারের গোড়াতেই অসংশোধনীয় ভুল থেকে যেতে বাধ্য। বঙ্কিমের বিচারে প্রথমোক্ত মুসলমান ভদ্রলোকও যে ভুল করেছিলেন, ঠিক সেই একই ভুল কলেজ-জীবনে আমরাও করেছিলাম। বঙ্কিম-সাহিত্য বিচারে ঠিক এই ধরণের ভুল আরও বহু সমালোচক করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ একজন বঙ্কিমের বড় সমঝদার ছিলেন। কিন্তু তিনিও জায়গা বিশেষে এমন মন্তব্য করেছেন যে, বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে বঙ্কিম ইতিহাস এবং কল্পনার থেকে আহৃত অনেক মজার মজার চমকপ্রদ ঘটনা আমাদের উপহার দিয়েছেন। তিনি তো জানতেন না যে সাধারণ লোকের সাধারণ জীবন কাহিনী মানুষের কাছে আরও উপভোগ্য হয়ে থাকে। এই ভাবে বঙ্কিমকে একটু আধটু কৃপাকটাক্ষ বণ্টন করা হয়তো সহজ, কিন্তু বঙ্কিমের বিচারের পদ্ধতি ওটা নয়। রবীন্দ্রনাথের কালে যে সমাজকে দেখার পদ্ধতিই বদলে গেছে এটা মনে রাখা দরকার। এবং তখন আর একটা জিনিষও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা হল বঙ্কিমের অনন্যসাধারণত্ব ; সেটা হল এই অনস্বীকার্য তথ্য যে বঙ্কিমের পক্ষে যেমন রবীন্দ্র-সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর ছিল না, তেম্নি অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বঙ্কিম-সাহিত্য সৃষ্টি করা। এর প্রমাণ একেবারে হাতে হাতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সময় অনেক কূপ-মণ্ডুক সাহিত্যিক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্কিমী ভাষা এবং বঙ্কিমী ভাবকে অব্যাহত রেখে যে সমস্ত সাহিত্য রচনার প্রয়াস পেয়েছেন, পরবর্ত্তিকালে সেগুলো 'বটতলার বই' নামে উপহাসের বস্তু হয়েছে। অথচ এই বইগুলিকে সমগ্রভাবে বিচার না করে, ভাষা, ভাব এ সবকে আলাদা আলাদা করে দেখলে বোঝা যায় তার কোনটাই বঙ্কিমের থেকে নিকৃষ্ট ছিল না। বঙ্কিম-চন্দ্রের সবই তাঁরা অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন, শুধু প্রাণশক্তিটুকু বাদ ছিল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তবু তো বঙ্কিমের সমঝদারই ছিলেন। ঠিক ঠিক বঙ্কিম-বিরোধী জেহাদ সুরু হয় শরৎচন্দ্রের থেকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী যে আকস্মিকভাবে চপলমতি বারবনিতা-সুলভ হয়ে উঠল, শরৎচন্দ্রের মতে এতে সমাজনীতি হয়তো বজায় ছিল, কিন্তু সাহিত্যনীতি বলে যে একটা স্বতন্ত্র নীতি আছে সেটা লজ্জায় মুখ লুকোবার জায়গা পায় নি। সাহিত্য নীতির উপর সমাজনীতিকে স্থান দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে অপরাধ করেছিলেন

শরৎচন্দ্র তা কোনদিন ক্ষমা করতে পারেন নি (শরৎচন্দ্রের 'স্বদেশ ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য)। আধুনিক সমালোচনা পড়লে শরৎচন্দ্র জানতে পারতেন সাহিত্য নীতি বলে যে জিনিষটাকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আসলে সেটা স্বতন্ত্র কোন বস্তু নয়, সেটা হল তাঁর সময়ের পরিবর্তিত সমাজ-নীতিরই সাহিত্যিক প্রকাশ।

সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর যে সমালোচনার পাহাড় জমে উঠেছে আজ এতদিনে সেগুলো পাঠকসাধারণের উপর ক্রিয়া করতে সুরু করেছে। কাজেই বঙ্কিম সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণায় পৌঁছুতে হলে এই সমালোচনার প্রভাব থেকে আমাদের মন মুক্ত হওয়া দরকার। সেইজন্যই এইগুলোর উল্লেখ করতে হয়েছে, এবং বঙ্কিমের সাহিত্যালোচনায় আমরা অগ্রসর হব এই সমালোচনাগুলিকে কেন্দ্র করেই।

এই সমালোচনাগুলি থেকে পরিষ্কারই বোঝা যায় আজকের দিনের বঙ্কিমের আলোচনায় দুটো প্রশ্ন প্রধান হয়ে উঠেছে। এক হল বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের আদর্শ, তার নীতি এবং প্রকৃতি নির্ণয় ; আর দ্বিতীয়টা হল বঙ্কিমের সাহিত্য-নীতির মাপকাঠি এবং তার প্রয়োগকুশলতা।

প্রথম এবং প্রধান প্রশ্নটা নিয়েই আগে সুরু করা যাক। কিন্তু এই প্রশ্নের সংগে বংকিমের সময়ের প্রসংগটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

মুসলমান রাজত্বের, এবং মুসলমান রাজত্বের অন্তিমকালে উদ্ভূত বিভিন্ন শক্তিগুলির তখন সুনিশ্চিত অবসানের পরেও বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। তার ফলে ইংরেজ রাজত্ব তার আইন-কানুন নিয়ে, তার বুর্জোয়া অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। সেই সংগে এই বিরাট ভারত ভূমিতে এই সর্বপ্রথম ভৌগোলিক একতা প্রতিষ্ঠিত হল। শুধু তাই নয়, এই প্রতিষ্ঠার পরও একটা যুগ কেটে গেছে। শিক্ষা, সমাজ এবং ধর্ম্মে ইউরোপীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে নব-প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুযায়ী নতুন সংস্কার নিয়ে এসে ইতিমধ্যেই রামমোহন রায় মাটিন লুথারের অনুরূপ স্থান অধিকার করে বসেছেন। দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়েছে, অগ্রগামী অংশের কাছে ইউরোপের নতুন সংস্কৃতি তার সমস্ত সম্ভার নিয়ে হাতের কাছে সমুপস্থিত।

দেশের সমগ্র জনসাধারণের চিন্তাধারাকে বদলে দেবার পক্ষে এ পরিবর্তন তখুনি যথেষ্ট ছিল না; কিন্তু এ পরিবর্তন সমগ্র জনসাধারণের অর্থনৈতিক ভিৎ-এর উপর করল দারুণ আঘাত। ফলে যে নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি হল, তা তখনকার অগ্রগামী শ্রেণীর কাছে ধরা না পড়ে পারে নি। এই অগ্রগামী শ্রেণীর মধ্যে ছিল যারা সরকারী শাসনযন্ত্রের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিল, বা ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রিত শিল্প এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে বিশেষ অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে যে সব জমিদার রাজধানীর জীবন-যাত্রা-যাপনের ভিতর দিয়ে নতুন আলোর সন্ধান পাচ্ছিলেন। বুর্জোয়া পদবাচ্য এদের অনেকেই ছিল না, কিন্তু অর্থনীতির যাদুবলে আমাদের দেশের বুর্জোয়া-প্রধান সমাজ গড়ে তুলেছিল এরাই। এদের মধ্যে আস্তে আস্তে বুর্জোয়া চিন্তাধারার এবং জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, স্বাধীন-চিন্তার প্রচেষ্টা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিধি-নিষেধের প্রতি অবহেলা প্রভৃতি মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল। এক শ্রেণী ছিল যারা অনুকরণের উগ্রতায় একেবারে পুরোপুরি সাহেব ভাবাপন্ন হয়ে সাহেবী জীবন-যাপনের পথে এগিয়ে গেল। সমাজের সংগে তাদের সম্পর্ক এত শিথিল হয়ে এল যে তারা দেশের উপর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই আবার একটা বৃহত্তর সম্প্রদায় নতুন বুর্জোয়া চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ হয়ে উঠলেও তারা নিজেদের ভারতীয়ত্ব ভুলে গেল না, এবং সেটা এই প্রথম অত্যন্ত নিবিড় ভাবে অনুভব করল। ফলে অত্যন্ত সহজে তারা সমাজের নেতৃত্বের স্থান অধিকার করে বসল। অবিশ্যি সমাজ বলতে তখন মধ্যবিত্তের চেয়েও অভ্যন্তরের স্তরকে বোঝায় নি। কায়িক পরিশ্রম রত সমাজকে টেনে আনার ক্ষমতা তখনকার বুর্জোয়ার হয় নি।

মোটের উপর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হল তা রীতিমত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অনুরূপ। শুধু এ-বিপ্লবের নায়ক আমাদের দেশের জনসাধারণ নয়, বৃটিশ বণিক। আপন স্বার্থের প্রয়োজনে তারা এদেশের উপর নিরঙ্কুশ অত্যাচার-অনাচার চালিয়ে নিজেদের শাসন ও সেই সংগে নিজেদের বুর্জোয়া অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করেছিল। দারুন যন্ত্রনার ভিতর দিয়ে আমাদের দেশের শতধা বিভক্ত অরাজকতা আর কুসংস্কারে ভরা ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসান হয়ে নতুন যুগের পত্তন হল।

কাজেই বিদ্রোহী চিন্তাধারা আমাদের দেশেও ঠিক তার চিরাচরিত নিয়মই অনুসরণ করতে বাধ্য হল। আমাদের দেশের লোক বিপ্লব আনেনি বলে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তা অনতিক্রম্য হয় নি। এখন প্রশ্ন হল চিন্তাধারার এই চিরকেলে নিয়মটা কি? সেটা একটা অদ্ভুত আপাতবিরোধী মানসিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়। পৃথিবীতে মার্ক্সীয় দর্শনের জন্মের পর থেকে আমরা পরিষ্কার জানতে পেরেছি বটে যে মানবেতিহাস ক্রমান্বয় নির্দিষ্ট দ্বান্দ্বিক জড়বাদের নিয়মানুসারে এগিয়ে চলেছে। এক হাজার বছর আগের পৃথিবীর চেয়ে এক হাজার বছর পরের পৃথিবী অনেক আগুয়ান। কিন্তু এম্নি আশ্চর্য ব্যাপার, একমাত্র আধুনিক যুগ ছাড়া মানুষের মন কখনো তা স্বীকার করে নি। চিরদিনই মানুষ বর্তমানের দুঃখ-দুর্দশার উপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভেবেছে যে তার অতীত ছিল অনেক বেশী সুখের, তার অতীতের 'সত্যযুগে' এসব দুঃখ কষ্ট ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। কাজেই বিপ্লব যখন বর্তমানকে ভেঙ্গে চুড়ে নতুন করে জীবন-ধারা সৃষ্টি করার তাগিদ নিয়ে আসে, মানুষ অম্নি ভাবতে সুরু করে এবার আর কোন ভাবনা নেই, এবার অনতিবিলম্বে আমাদের 'চমৎকার পুরোণ দিনগুলি' ফিরিয়ে আনতে পারলেই সমস্ত সমস্যা আর দুর্ভাবনা থেকে অব্যাহতি লাভ করা যাবে। বর্তমানের চলতি নিয়মের কুশাসন আর নয়; এবার সত্যযুগের সেরা সমাজ-নীতিকে প্রবর্তন করে তবে আমরা ক্ষান্ত হব। সত্যযুগের সেরা নিয়মগুলি কি ছিল সেটা অবিশ্যি এতদিন পরে আজ আর কারও কাছে তেমন স্বচ্ছভাবে সুপরিস্ফুট নয়। কাজেই লেগে যেতে হবে সেই নিয়মগুলি উদ্ধার করতে; রাষ্ট্রনায়কের সেরা কর্তব্য হল তাই। এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে রুশো অতি প্রাচীন যুগের সামাজিক চুক্তি Social contract (সেটা কাল্পনিকই হোক আর বাস্তবিকই হোক) আবিষ্কার করেছিলেন যাকে কেন্দ্র করে আসলে কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্র গড়ে ওঠে। ঠিক তেম্নিভাবে রামমোহন রায় তখনকার ব্রাহ্মণদের কথার উপর নির্ভর না করে স্বতন্ত্রভাবে উপনিষদ পাঠ করেন ও তার ভিত্তিতে প্রাচীনের পুনঃ প্রবর্তনের নামে আসলে জাতিভেদহীন গণতন্ত্র-সম্মত ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করে ভবিষ্যতের পথ তৈরী করলেন। এর পর আমরা দেখব একই প্রেরনায় উদ্বোধিত হয়ে বঙ্কিম স্বাধীনভাবে শাস্ত্র

পাঠে ব্রতী হন এবং জাতীয়তাবাদের প্রথম পাঠ আমাদের উপহার দিয়ে যান।

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। বঙ্কিমের সময় যে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ সুরু হয়েছিল তার মধ্যে মুসলমানরা বিন্দুমাত্রও অংশ গ্রহণ করেন নি। তার কারণ একদিকে যেমন বিজিত রাজার জাত হিসাবে মুসলমানদের অনমনীয় আত্মমর্যাদাজ্ঞান, যার ফলে বিজেতাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে তারা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছে; আবার তেম্নি তার পিছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদ শিল্পে অভিজ্ঞ ইংরাজ বণিকের ভেদ-নীতির অতি সূক্ষ্ম প্রয়োগ, যার ফলে না অর্থনীতি, না শাসন-বিভাগ, কোন ক্ষেত্রেই মুসলমানদের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি। কিন্তু কারণ যাই হোক, কয়েক শতাব্দী ধরে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের নাগপাশে দেশকে আবদ্ধ করে রাখার পর ইংরাজের হাতে পরাজয় বরণ করার পর তারা যেন দেশের ইতিহাস থেকে মুছে গেল। নতুন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে যে সমাজ 'কোমরে গামছা বেঁধে' এগিয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে একজনও এমন মুসলমান ছিল না যার নাম উচ্চারণ করে আধুনিক মুসলমান গর্ব বোধ করতে পারেন। এই সত্য কথাটা স্বীকার না করলে সেই সময়কার প্রগতিশীল আন্দোলনের তাৎপর্য বুঝতে অনেক অসুবিধা হবে। কিন্তু তার জন্য আজকে আপশোষ বা অনুতাপ করা বৃথা। প্রগতির পথে যাত্রা সুরু করার দিন কোনদিন পার হয়ে যায় না; এবং একবার সুরু হলে শিখরদেশ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে বেশী সময় লাগে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও উল্লেখ করা দরকার। বাংলা দেশের সুধী সমাজ সেই সময় যেমন জাতীয় ছবি আঁকার সময় অত্যন্ত অবলীলাক্রমে মুসলমানদের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, তেম্নি তাদের মনের পট থেকে বাংলা-বহির্ভূত বৃহৎ ভারতবর্ষের রূপ মুছে গিয়েছিল। এবং সেও হয়েছিল ঐ একই কারণে। যে অর্থ নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সোপানে বাংগালী হিন্দু এগিয়ে এসেছিল তার পাশে অন্য প্রদেশের লোকেরা তখনো দাঁড়াতে পারে নি। কাজেই সর্ব-ভারতীয় জাতীয়তা বা সর্ব-ভারতীয় একতার কথা মুখে মুখে তখন যতই আওড়ানো হয়ে থাকুক, ভারতবর্ষ বলতে তখন সবাই বাংলা বুঝেছিলেন। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস পুনরুদ্ধারেই সমস্ত

মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, এবং বাংগালীর কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যই ছিল সবারই সর্বাধিক আগ্রহের ব্যাপার। তবু যখন ভারতের সমস্ত প্রদেশ জাগতে সুরু করল তখন তারা বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদকে বাংগালীমার্কা বলে ঠেলে ফেলে দেয় নি। তাঁর থেকে প্রয়োজনীয় প্রেরণা তারা সংগ্রহ করতে পেরেছিল।

এইবার বঙ্কিমসাহিত্য আলোচনায় অগ্রসর হয়ে আমাদের সকলের আগে মনে রাখা দরকার যে বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ তাঁর একটা অতিরিক্ত গুণ নয়, সেটাকে বাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্যকে ভাবাই যায় না। সেটাকে বাদ দিয়ে বঙ্কিম-সাহিত্যকে বিচার করতে যাওয়া মানে প্রাণটুকু বাদ দিয়ে কাঠামোর কথা ভাবা। বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর সবল সজীব জাতীয়তাবাদ।

এই প্রাথমিক সত্যকে বুঝতে না পারার ফলে আমরা বরাবর বঙ্কিমের সঙ্গে স্কটের তুলনা করে এসেছি। অথচ স্কটের সঙ্গে বঙ্কিমের তুলনা করা আর কৃত্তিবাসের সংগে মাইকেলের তুলনা করা একই কথা। স্কটের উপন্যাসের কাঠামো বংকিম গ্রহণ করেছিলেন, তেম্নি তো মাইকেলও কৃত্তিবাসের (যদিও অমিল) গ্রহণ করেছিলেন! কিন্তু কৃত্তিবাসের সংগে মাইকেলের তফাৎ এত স্পষ্ট যে তাদের তুলনা কারও মনেও আসে নি। জাতীয় চেতনাহীন কৃত্তিবাস আর্যদের আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবিস্তারের যুদ্ধের প্রশংসায় মুখর হতে এতটুকু ইতস্তত করেন নি। মাইকেল পেরেছিলেন? শ্রেষ্ঠতর সভ্যতার দূত ইংরেজে কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেও তিনি তাদের ভারত-বিজয়ের অন্তর্নিহিত গভীর অন্যায়কে অন্ততঃ অন্তর্মনে স্থান না দিয়ে পারেন নি। সেইজন্যই আমাদের দেশের দেব-প্রীতির এত তীব্র ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে 'মেঘনাদ বধ কাব্যের' প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে আততায়ী রামচন্দ্রের যুদ্ধের অন্যায্যতা, যুদ্ধ-নীতি লঙ্ঘন করার হীন মনোবৃত্তি। রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠতর সভ্যতার দূত হলেও তাঁর পররাজ্য লোভে হস্ত-প্রসারটা অন্যায়, ভীষণ অন্যায়। এইখানেই মাইকেল আর কৃত্তিবাসের পার্থক্য—মূলগত চিন্তাধারার পার্থক্য। বঙ্কিম আর স্কটের মধ্যে পার্থক্যও ঠিক এতখানি বিরাট, কিন্তু সেটা এমনভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়ে নি।

বঙ্কিমের সঙ্গে বরং তুলনা চলে সেক্‌স্‌পীয়রের। স্কট এবং সেক্‌স্‌পীয়রের সাধারণ গুণ ছিল, কোনরকম সংশয় বা বাধার ধার না ধেরে রোমান্সের, মানব মনের অনুভূতিগুলির মধ্যে যথেচ্ছভাবে অবগাহন করা; সেইজন্য উভয়েই মনোমত বিষয়বস্তু আহরণ করেছিলেন মধ্যযুগের ঘটনাপুঞ্জ থেকে। কিন্তু এটুকু বাদ দিলে পার্থক্যটা অনেক বেশী প্রচণ্ড। স্কটের রোমান্সের উদ্দেশ্য হল বর্তমানের থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা। তাঁর সময়েই ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া শিল্প-ব্যবস্থার চূড়ান্ত রিক্ততা, আর ভিতরকার অকরুণ, নিরাবরণ শোষণের রূপ সাহিত্যিকদের কাছে ধরা পড়ে গেছে; এমন কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত ফাঁকিবাজী বুঝে ফেলোছলেন। তার ফলে স্কটের রোমান্স চেয়েছিল এই ক্লেদাক্ত বর্তমানকে ভুলে থাকতে, যদিও সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে তা নিরর্থক। সাহিত্যের যে সংজ্ঞা 'all art is useless' (শিল্পমাত্রই ব্যবহারিক প্রয়োজন-বর্জিত) তার অনুরূপ সাহিত্য সৃষ্টি বাস্তবিক পক্ষে স্কটের থেকেই সুরু হয়েছিল। কিন্তু সেক্সপীয়রের ব্যাপার স্বতন্ত্র। তাঁর রোমান্স হল মধ্যযুগের সহস্র রীতি-নীতির নিগড়ে আবদ্ধ অচলায়তন জীবনের বিরুদ্ধে অভিযান। বিদ্রোহের প্রয়োজনের, নব জীবন আরম্ভের উত্তেজনায় সে সাহিত্য ছিল সজীব, সবল, আবেগ-চঞ্চল। স্কটের মধ্যযুগীয় ঘটনায় বিহার মানে হল নির্মানব, নির্বীর্য শিভ্যালরীর বিলাস। সেক্সপীয়র কিন্তু মধ্যযুগীয় পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এক একটী বুর্জোয়া ধর্মা জাতীয় বীর। মধ্যযুগীয় বারের বৈশিষ্ট্য হল ভেদ-ব্যবস্থা প্রসূত তীক্ষ্ণ বংশ-মর্যাদা-জ্ঞান, আর অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে শিভ্যাল্‌রীর নীতি পালন করে যাওয়া। মধ্যযুগের লেখকদের চরিত্র-অঙ্কন-নীতি ছিল ভাল-মন্দ মিশানো মানুষকে দেখানো নয়, মানুষকে দেবতা এবং দানব এই দুইভাগে ভাগ করে দেখানো এবং এর একমাত্র কারণ হল গণতান্ত্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভাব। সেক্সপীয়র এ দুই-ই বদ্‌লে দিলেন—সেক্সপীয়রের বীররা বংশমর্যাদায় গর্বিত নয়। তারা তাদের নিজস্ব শক্তিতে, বৈশিষ্ট্যে এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। চরিত্রাঙ্কনের ব্যাপারেও দেবতা এবং দানবের বদলে ভালমন্দে মিশানো রক্ত-মাংসের মানুষ দেখা দিয়েছে। সেক্‌স্‌পীয়রের বীররা অদ্ভুত, প্রায় অতি মানবিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও আবার অদ্ভুত দুর্বলতার অধীন।

তারা একই সংগে বিস্ময় এবং সহানুভূতি উদ্রেক করে। এই যে সব বুর্জোয়া বিশেষত্ব এগুলো সচেতন-ভাবে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টায় স্কটের অধিকাংশ লেখাই নির্জীব হয়ে পড়েছে। এবং এইগুলির বলিষ্ঠ প্রকাশই সেক্‌স্‌পীয়রের শ্রেষ্ঠত্বর কারণ। হ্যামলেট্, ম্যাকবেথ, ওথেলো, এরা সবাই এক একজন জাতীয় বুর্জোয়া বীর।

সেক্‌স্‌পীয়রের মধ্যে আমরা যা পেয়েছি, বঙ্কিমের মধ্যেও দেশ-কালের ভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্যরকম কাঠামোর আড়ালে ঠিক সেই একই মূল বস্তুটি পাই। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অচলায়তন থেকে মুক্তিলাভের বৈপ্লবিক উচ্ছ্বাসে তিনি তাঁর নব-লব্ধ মানসিক স্বাধীনতাকে প্রসারিত করে দিয়েছেন সজীব রোমান্সের মধ্যে। সেই রোমান্সকে অবলম্বন করে তিনি সজীব সবল জীবনাদর্শ প্রকাশ করেছেন। বরং সেক্‌স্‌পীয়রের সাহিত্যে তাঁর যুগের জীবনাদর্শ ফুটেছিল অনেকটা অচেতনভাবে, যুগকে গড়ে তোলার সচেতন প্রয়াস তো তাঁর ছিল না। তাঁর সময়ে রাজধানীর পর-শ্রমজীবী বিলাসীদের জন্য রঙ্গালয়ের উপভোগ্য বস্তু হিসাবেই তিনি তাঁর অমূল্য নাটকগুলো লিখেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের ভূমিকা ছিল আলাদা। সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য তো ছিলই, কিন্তু সেইটেই সব নয়। বঙ্কিম একদিকে তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, আর এক দিকে তাঁর সময়ের সমাজ-শিক্ষক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার জনক। শিক্ষা এবং প্রচারের সচেতন ইচ্ছা থাকার ফলে বঙ্কিম-সাহিত্য জাতীয়তাবাদের খুব উপযুক্ত আধারে পরিণত হয়েছিল। অতীত ইতিহাস এবং অতীত সমাজাদর্শের ভাষায় তিনি আসলে আমাদের দেশের ভবিষ্যতের বিস্তীর্ণ গতিপথটাই চিত্রিত করেছিলেন।

এইবার এই শক্তিশালী জাতীয়তাবাদের বিশেষ প্রকৃতিগুলো নিয়ে আলোচনা করার সময় এসেছে। বাংগালী হিন্দুর জাতি হিসাবে সব চেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল এইখানটায় যে সমাজ-নীতির কেন্দ্রস্থল ছিল বর্ণভেদ। এই বর্ণভেদের বিরুদ্ধে ব্যবহারিক জীবনে আঘাত হানার মত অবস্থা তখনো আমাদের সমাজে হয়নি; কারণ সব সময় মনে রাখা দরকার আমাদের সমাজে বিপ্লব এসেছিল পরাধীনতার দান হিসাবে; তাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে আমাদের আত্মমর্যাদায় ঘা লেগেছে। কিন্তু বঙ্কিম যা করলেন সেটা হল

আমাদের এই কূপমণ্ডুক চিন্তার কেন্দ্রকে ভিন্ন খাদে টেনে নিয়ে যাওয়া। তিনি বল্লেন, বর্ণবৈষম্যের নেশায় মেতে না থেকে আপাততঃ সমস্ত চিন্তা নিয়োগ করে ভাবতে হবে, কি করে জাতি হিসাবে আজকের দ্রুতগামী বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির পাশে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে দাঁড়াতে পারা যায়। ইংরেজ আমাদের উপর অত্যাচার আর শোষণের পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছে; তারা আমাদের স্বাধীন অস্তিত্ব হরণ করে নিয়েছে; দেশের সম্ভারকে তারা লুটে নিয়েছে; এ সব কথার যথার্থতা বঙ্কিম জানতেন। কিন্তু তিনি জোর দিলেন একথার উপর যে সেই সব ভেবে ইংরেজের উপর অভিমান করে বসে থেকে দেশ ইংরেজের মারফৎ যে সভ্যতার আলোক পাচ্ছে তাকে যেন অবজ্ঞা না করে বসে; কারণ বিশ্বের দরবারে আসন করে নেবার কলকাঠি রয়েছে তার মধ্যে। অত্যন্ত স্থিরবুদ্ধি নেতার মত বিজয়ী, অতি অহংকারী এবং অতি অত্যাচারী জাতির থেকেও সদ্‌গুণগুলি আহরণ করাকে তিনি দেশের লোকের শ্রেষ্ঠ জাতীয় কর্তব্য বলে বর্ণনা করেছেন। ভেদ বিভেদ ভুলে জাতি হিসাবে একতাবদ্ধ হতে হবে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, শিক্ষা ও শিল্পকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে হবে; ইংরেজদের চারিত্রিক গুণ, তাদের কর্মকুশলতা, তাদের সামরিক প্রতিভা এবং সাহস, তাদের একতা এবং জাতীয়তা বোধ,—এ গুলোকে পুরোমাত্রায় গ্রহণ করতে হবে। বঙ্কিমের বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় এইখানটায় যে শুধু ধোঁয়াটে জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্থাপন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। সেই আদর্শে পৌঁছবার জন্য আমাদের যে শক্তি সঞ্চয় করা দরকার তা অর্জনের জন্য তিনি বাস্তব কর্মনীতির পরিকল্পনা দিয়েছেন। তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সামরিক শক্তির উপর। এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করার ফল-স্বরূপ একদিন আমরা আজকের প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ-জাতিকে পরাজিত করে দেশকে স্বাধীন করতে পারব। আমাদের জাতীয় অগ্রগতির ফলস্বরূপ আসবে স্বাধীনতা, কিন্তু জাতীয় অগ্রগতির পরিসমাপ্তি সেইখানেই নয়। এবং এই পর্যন্ত এসেই বঙ্কিমী জাতীয়তা তাঁর আধ্যাত্মিক জটীলতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, এবং এই জিনিষটার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই অনেক আধুনিক সমালোচক তাঁকে 'কৃপা' করতে সুরু করেছেন। সেই আধ্যাত্মিকতার তাৎপর্য হল এইখানটায় যে বঙ্কিম আধুনিকীকরণের

কর্ম-প্রণালী দিচ্ছেন শুধু আমাদের প্রাচীন হিন্দু-আদর্শ মত সমাজ-সৃষ্টির জন্য। গোটা পরিকল্পনাটাই হল পথ, কিন্তু উদ্দেশ্য হল এমন হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যা পৃথিবীর সমস্ত জাতির আদর্শ শিক্ষক হয়ে দাঁড়াবে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করব। মোটের উপর এখনই বলা চলে, এই আধ্যাত্মিকতার আদর্শ স্থাপন করতে গিয়ে তিনি যে সাহস এবং আশার বাণী শুনিয়েছেন তা তাঁর সময় আমাদের দেশে ছিল সম্পূর্ণ নতুন। উপন্যাসের মধ্যে বিশেষভাবে 'আনন্দমঠ' এবং 'দেবী-চৌধুরাণী'তে আমাদের জাতির সামগ্রিক প্রগতির এই দীর্ঘপথ অত্যন্ত আশা, শক্তি এবং সাহসের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন।

বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের এই বাস্তব প্রকৃতি ভাল করে বুঝতে গেলে তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধের সুযোগ নেওয়া দরকার। তার মধ্যে প্রধান হল এই কয়টা: 'ভারত কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'অনুকরণ' প্রভৃতি। এইসব প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা চলে। 'স্বতন্ত্র' ও 'স্বাধীনতা' এই দুটো শব্দের মধ্যে একটু পার্থক্য করে বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছেন প্রাচীন ভারত ছিল 'স্বতন্ত্র' ও 'স্বাধীন', আধুনিক ভারত 'পরতন্ত্র' ও 'পরাধীন'। তার মানে এই না যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ একেবারে আদর্শস্থল ছিল। সেই সময়কার ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজে পক্ষপাতিত্ব এবং অত্যাচারের সীমা ছিল না; সেই হিসাবে বর্তমানের পরাধীন ভারতে এবং বর্ণনির্বিশেষে ন্যায়পরায়ণতার একটু প্রচেষ্টা এসেছে। তা ছাড়া প্রাচীন ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজে আভ্যন্তরীণ ভেদ-বোধ এত বেশী ছিল বলে জাতি হিসাবে স্বাধীনতা রক্ষার্থ দাঁড়ানো সে সমাজের পক্ষে সম্ভব হয় নি। যুদ্ধটা ছিল রাজারাজরার কারবার, তার মধ্যে জনসাধারণের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি ইংরেজাগমনের ফলে তারা রাজার জাত হিসাবে আমাদের সঙ্গে যত বৈষম্যমূলক ব্যবহারই করুক না কেন, আমাদের সমাজকে কিন্তু তারা নিজেদের সমাজের গণতান্ত্রিক ছাঁচে অধিকারের এবং আইনকানুনের ব্যাপারে বৈষম্যহীন করে তুলেছিল। তা ছাড়া ইংরেজদের শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা (আধ্যাত্মিক না হোক, ব্যবহারিক দিক দিয়ে তো বটেই) চোখের কাছে থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র ধরে নিয়েছিলেন যে

তার অনুকরণ করে আমরা শিক্ষা-বিজ্ঞান-সামরিক বল প্রভৃতি সর্ব-বিষয়ে উন্নত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। ফলে জাতি হিসাবে দাঁড়ানোর মত অবস্থায় আমরা এসে গেছি। কেউ যদি মনে করে যে বাঙ্গালী জাতি হিসাবে হীন-বীর্য, তার কোনদিন তেমন বাহুবল হওয়া সম্ভব নয়, বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা স্বীকার করতে রাজী নন। বাঙ্গালীর মনে যদি জাতি হিসাবে বড় হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা জন্মায়, এবং তজ্জনিত অধ্যবসায়, ধৈর্য এবং কর্মানুরাগ এসে উপস্থিত হয়, তবে দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে বাংগালীর অগ্রাভিযানে বাধা দিতে পারে। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে জাতি হিসাবে দাঁড়ানোর পথে বাঙ্গালীর এখন আর কোন অন্তরায় নেই; এবং একবার যদি বাংগালীর জাতীয় জাগরণ হয় তবে আর পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার না করে আমরা ছাড়ব না, কারণ অতীত ভারতের যে আধ্যাত্মিক সম্পদ আমরা বংশানুক্রমে পেয়েছি আধুনিক জাতীয়তার সঙ্গে মিলিত হয়ে তা সর্বাঙ্গ সম্পন্ন শক্তিতে পরিণত হবে। যা ছিলাম তা আমরা তো সহজেই হব, যা ছিলাম না কোনদিনই, তাও হব, জাতীয় ভাবাপন্ন হব। কিন্তু মানুষের মন হল অতীতের মধ্যে দৃঢ় সংবদ্ধ। শুধু বর্তমানের ইংরেজের থেকে অনুকরণ করেই কোন জাতির পক্ষে বড় হওয়া সম্ভব নয়, যদি না অতীতের ইতিহাস এই প্রতীতি জন্মায় যে তার উৎপত্তি শক্তিশালী পূর্ব-পুরুষদের থেকে, যদি না তাদের শ্রেষ্ঠতর সমাজ-চিত্র মনের কাছে জাগরূক থাকে। রেনেসোঁসের ইউরোপের কাছে এই আদর্শের স্থান গ্রহণ করেছিল গ্রীক্ এবং রোমক সভ্যতা। বঙ্কিম এই আদর্শের প্রয়োজন অনুভব করলেন, এবং তা পেলেনও প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের মধ্যে। অতীত ভারতে আধ্যাত্মিকতাও ছিল, আবার ব্যবহারিক গুণাবলীরও অভাব ছিল না। কিন্তু তবু তো সে পৌরাণিক কালের কথা! তারপর দীর্ঘকাল ধরে যে ভারতবাসী মুসলমান শাসনের ভিতর দিয়ে এসেছে তার মধ্যে কি আমরা এই দেখি যে, সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব নিঃশেষিত হয়ে হিন্দুজাতি শুধু ক্লীবত্বে পর্যবসিত হয়েছে? অনেক ইতিহাসকার তাই বলে। তারা বলে যে সতেরো জন মুসলমান বাংলা জয় করেছিল। তখনকার সামান্য নথি পত্রের সামান্য নজিরের উপর নির্ভর করে বঙ্কিম ঘোষণা করলেন একথা সত্যি নয়, বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি।

ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্য, তেজস্বিতা, মনুষ্যত্ব,—এগুলোর অভাব বাংগালীর কোনদিনই হয় নি। একটী জিনিষ শুধু ছিল না, এবং তার জন্য সব কিছু পণ্ড হয়ে গিয়েছিল। জাতি হিসাবে চিন্তার অভাবে, স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার অভাবে, আমাদের অধীনতা এমন কায়েম হয়েছিল (বঙ্কিমের একবারও খেয়াল হয় নি যে জাতীয়তাটা ইউরোপেও নেহাত-ই হালের আমদানী, বণিকতন্ত্র তার জন্ম দিয়েছে)। ভারতবর্ষে মাত্র দু'তিনবার জাতীয় গণ-জাগরণ হয়েছে, শিবাজীর মহারাষ্ট্রে, প্রতাপ সিংহ-রাজসিংহের রাজ-পুতানায় এবং রণজিৎ সিংহের পাঞ্জাবে (সবগুলিই আসলে 'ক্রুসেডের' মত ধর্ম-জাগরণ, আধুনিক জাতীয় জাগরণ ভিন্ন জিনিষ)। বঙ্কিমের ধারণা, একমাত্র এই জাতীয়তা আমাদের বিদেশের থেকে ধার করতে হবে, তা ছাড়া আমরা সর্বগুণসম্পন্ন পূর্বপুরুষদের সন্তান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ সংশয় বঙ্কিমের মনে ছিল না। ইতিহাসের উপাদান সামান্যই ছিল কিন্তু তাতে তার প্রত্যয় কিছুমাত্র শিথিল হয় নি। তিনি দৃঢ় হস্তে এই প্রত্যয়কে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে। কিন্তু প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্ক হল বুদ্ধির, আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রধান কারবার হল হৃদয় নিয়ে, কাজেই ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার খাদ মিশিয়ে বঙ্কিম আধা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় নেমে গেলেন। খাদ মিশাতে হল, না হলে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। সেক্‌স্‌পীয়রের মত পুরানো তথ্য ধার নিতেও ইতস্তত করলেন না; আবার তা বিকৃত করতেও সঙ্কোচ করলেন না। এইভাবে স্কট প্রবর্তিত নীতিকে লঙ্ঘন করে তিনি সৃষ্টি করলেন এক একটী জাতীয় বীর। ঠিক সেক্‌স্‌পীয়রের বীরদের মত তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবতা ধর্মে বুর্জোয়া আদর্শেরই অনুকূল। বিরাট তাদের শক্তি, কিন্তু তেমনি আবার তারা অদ্ভুত দুর্বলতার বশীভূত হয়ে পড়ে, রক্ত মাংসের মানুষের যেমন হয়ে থাকে, 'সীতারামে'র সীতারাম, মৃণালিনী'র হেমচন্দ্র, 'রাজসিংহে'র রাজসিংহ, 'চন্দ্র শেখরে'র প্রতাপ, 'দুর্গেশনন্দিনী'র জগৎ সিংহ, প্রভৃতি সবাই সমতান্ত্রিক পরিস্থিতিতেও এক একজন জাতীয় বুর্জোয়া বীরে পরিণত হয়েছেন।

জাতীয়তাবাদকে এতখানি বাস্তব ভিত্তিতে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন বলে বঙ্কিম বাবুকে অনেক সময় নিছক ঔপন্যাসিক হিসাবে না ভেবে বিপ্লবী

নেতা হিসাবে ভাবতে ইচ্ছে করে। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে বাস্তবিকই মনে হয় একটা মহান্ জাতির জীবনের এক বিরাট উজ্জ্বল দিনের সবেমাত্র প্রভাত হয়েছে! সকালের লোহিত সূর্য এত অফুরন্ত আশা আর সাহস, বিশ্বাস আর সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে যে তার প্রেরণায় মানব মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, হাস্যরস, প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে মানুষ ছড়িয়ে দিয়েছে তার কর্ম-প্রেরণা। এত সব বিভিন্ন বিভাগে বঙ্কিম নিজেও উৎসাহের আতিশয্যে অল্প বিস্তর এগিয়ে গেছেন অংশ গ্রহণ করতে (বিজ্ঞান রহস্য, লোকরহস্য, কৃষ্ণ চরিত্র, ইতিহাস সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি তার প্রমাণ)। বাধা-ভয়ের আশঙ্কা নেই, তাড়াহুড়ার কোন প্রয়োজন নেই; সামনে প্রসারিত রয়েছে প্রগতির দীর্ঘ দিন। এইভাবে বিস্তৃততর জীবনের ভিতর দিয়ে যে জাতীয় শক্তি গড়ে উঠবে তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে একদিন স্বাধীনতা আসবে। বঙ্কিমের কাছে স্বাধীনতাটা ক্ষণকালের জিনিষ ছিল না; তার জন্য প্রস্তুতের উপরই তিনি জোর দিয়েছেন বেশী। এবং তার কারণও খুব স্পষ্ট; সাম্রাজ্যবাদের আওতায় সাম্রাজ্যবাদের বাধা সত্ত্বেও তখন জাতীয় শিক্ষা, শিল্প সম্প্রসারণের প্রচুর অবসর ছিল; আগে বরং এ সুযোগ ছিল অনুপস্থিত। কালে কালে সাম্রাজ্যবাদ যখন আমাদের ক্রমবর্ধমান জাতীয় জীবনের একেবারে কণ্ঠরোধ করে ধরেছে, স্বাধীনতার প্রয়োজন তখন হয়ে পড়েছে সর্বাগ্রগণ্য। বঙ্কিমের বেলায় তা ছিল না। সেটা হৃদয়ঙ্গম করে এতটা উপযুক্ত কর্মপন্থা তিনি নির্ধারণ করেছিলেন, যে একমাত্র সাঙ্গঠনিক ক্ষমতাটা এর সঙ্গে যোগ হলে তিনি হতে পারতেন একজন পুরোপুরি বিপ্লবী নেতা। কিন্তু সাঙ্গঠনিক ক্ষমতার অভাব থাকলেও তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ যায় নি। বরং একথা বলা চলে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন প্রথম তার যাত্রা সুরু করে তখন বঙ্কিমের কর্মপন্থার প্রায় সবটাই তারা গ্রহণ করেছিল; বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিই হয়েছিল তাদের মূল মন্ত্র।

সুদূর অতীতের সুন্দর জীবনকে ফিরিয়ে আনাই যখন থাকে নতুন বিপ্লবের মূল মনস্তত্ত্ব তখন স্বভাবতঃই বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল প্রাচীন হিন্দু জাতির ধর্মাদর্শ। পাছে এই ধর্মাদর্শের কথা ভুলে যাই এই ভয়ে বঙ্কিম বারবার সে কথা স্মরণ করিয়ে

দিয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় গণতান্ত্রিক জাতীয়তা এবং তার বিভিন্নমুখী সাধনা, এ সবই হল সেই আধ্যাত্মিক আদর্শে পৌঁছানোর পথ-মাত্র। আধ্যাত্মিকতার এই বাড়াবাড়ির জন্যই অনেক অসাবধান প্রগতিপন্থী সমালোচক বঙ্কিমকে অবজ্ঞা করে থাকেন। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি বঙ্কিম যাকে পথ-মাত্র হিসাবে উপস্থিত করেছেন অল্পস্বল্প রদবদলের সঙ্গে সেই বুর্জোয়া জাতীয়তার আদর্শই এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের লক্ষ্য হয়ে রয়েছে, বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা থাকবেও। বঙ্কিম এই লক্ষ্যকে পথ হিসাবে ভুল করেছিলেন অপরিহার্য ঐতিহাসিক কারণে। বুর্জোয়া বিপ্লব জড়বাদ নিরীশ্বরবাদী প্রভৃতির জন্ম দিলেও তার প্রথম উদ্যোক্তারা, লুথার বা রামমোহন, কেউই নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। পুরানো ধর্মাদর্শকেও নতুন কায়দায় গ্রহণ করার ফলেই তারা ভবিষ্যতের নতুন জীবনের জন্ম দিয়েছিলেন। কাজেই একথা সত্যি, 'আনন্দমঠের' সন্ন্যাসীরাই হোক, বা 'দেবীচৌধুরাণী'র ভবানী পাঠক বা দেবীচৌধুরাণীই হোক, প্রত্যেকেরই জাতীয়তাবোধের সংগে জড়িত রয়েছে ধর্মজীবন। তারা ধার্মিক, তারা শাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিক। কিন্তু এই ধর্মকে গ্রহণ করার প্রণালীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। বঙ্কিম তাঁর সময়ের পুরোহিতকুল বা কুলীনদের থেকে ধর্মের বিধান নিতে যান নি কোনদিন। ধর্মের মধ্যেও বিকৃতি এসেছে, বিপ্লব তাঁর মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছিল। কাজেই কারও 'গুরুত্ব' বা অভিভাবকত্ব না মেনে স্বাধীনভাবে শাস্ত্রানুশীলন করে নিজের যুক্তি বিচার বুদ্ধি, এ সবের পরিপূর্ণ প্রয়োগ করে তিনি নিজের ধর্মাদর্শকে নিরূপণ করলেন। এইভাবে যে ধর্ম তৈরী হল তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, স্বাধীন চিন্তার প্রয়োগে তা সামন্ততান্ত্রিক বিধি নিষেধকে অনেকখানি অতিক্রম করতে সক্ষম। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও চিন্তার স্বাধীনতা একান্তভাবেই নতুন বিপ্লবের দান। এই নতুন প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়ে রামমোহন রায় আদর্শ হিসাবে আবিষ্কার করেছিলেন উপনিষদকে, বঙ্কিম আবিষ্কার করলেন গীতাকে। গীতাকে অবলম্বন করতে পেরেছিলেন বলেই বঙ্কিমের চিন্তাধারা এতখানি বাস্তব-পন্থী হতে পেরেছিল। বঙ্কিমের আর এক বিশেষত্ব হল, তিনি তাঁর নতুন ধর্মের সঙ্গে এক নতুন আদর্শ চরিত্রও আবিষ্কার করেছিলেন। এই আদর্শ চরিত্র হল শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণকে এই মর্যাদা দেওয়ার মধ্যে অনেকখানি তাৎপর্য আছে। হিন্দু ধর্মের মধ্যে সংসার বৈরাগ্য, সমাজাতিরিক্ত জীবনাদর্শের প্রাবল্য বড় বেশী। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ তার ব্যতিক্রম। সমাজকে, সংসারকে এবং সমাজের সংঘবদ্ধ জীবনের কর্মপদ্ধতিকেই, তিনি প্রচার করেছিলেন ধর্মাচরণের শ্রেষ্ঠ নীতি হিসাবে। বিশ্বের দরবারে জাতি হিসাবে যদি আমাদের শ্রেষ্ঠ আসন নিতে হয়, তবে উপনিষদের বৈরাগ্য নয়, গীতার কর্মযোগই বঙ্কিমের কাছে বিশেষ উপযোগী বোধ হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়যুদ্ধ পরিচালনায় কূটনীতির আশ্রয় নিতে ইতস্তত করেন নি। আমাদের জাতীয়তাবাদও তো আসলে ন্যায়যুদ্ধ; সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার নিরংকুশ অভিযান। তার জন্য সবল কর্মনীতি এবং তীক্ষ্ণ কূটনৈতিক বুদ্ধি দু'এরই দরকার। বঙ্কিমের উপন্যাসে শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম কর্মের দর্শন অনেক সময় বিরক্তিকর লাগে। কিন্তু সান্ত্বনা এই যে এই নিষ্কাম কর্ম বিশ্লেষণ করলে তা হৃদয়হীন মমতাহীন কর্মবৈরাগ্য হিসাবে দাঁড়ায় না, তা আসলে বুর্জোয়া মানবতাবাদের হিন্দু সংস্করণ। সমাজের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের সবচেয়ে ভাল যাতে হয় আত্ম-স্বার্থ শূন্য হয়ে সেই আদর্শ গ্রহণ করা কি শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদ নয়? সে পরোপকারও কখনো যান্ত্রিক নয় হৃদয়ের উৎসর্গরত ভালবাসার তা অভিব্যক্তি মাত্র। আশ্চর্য এই যে মিল, বেন্থাম প্রভৃতি ইউরোপীয় মানবতাবাদ প্রচারকদের নাম সেই সময়ে আরও অনেকের মত বঙ্কিমও উল্লেখ করেছেন, এবং যুক্তিবলে সেইগুলোকে নস্যাৎ করে দিয়ে নিষ্কাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

'রাজসিংহ' নামক উপন্যাসের পরিশিষ্টে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে এ বই লেখা হয়েছে এমন কথা কেউ যেন না মনে করেন। বই-এর উদ্দেশ্য শুধু রাজসিংহের মহৎ চরিত্র—যা অনেক ইতিহাস কারই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি,—ফোটানো। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁর লেখার থেকে পাছে কোন মুসলমানের আত্মাভিমানে ঘা লাগে এ আশংকায় তিনি ভীত হয়েছিলেন। বাস্তবিকই প্রবন্ধ লেখার বেলায়—যেখানে লেখকের মনোভাব পুরোপুরি সচেতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে—তিনি মুসলমানদের উপর কোন কটাক্ষপাত তো করেননি, বরং কোন

কোন জায়গায় তিনি তাদের উপর সহানুভূতিও দেখিয়েছেন। 'বাংলাদেশের কৃষক' এই নাম দিয়ে তিনি যে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার মধ্যে হিন্দু জমিদারের হাতে মুসলমান প্রজার উৎপীড়ণের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সমাজের প্রশ্ন উঠেছে, সেখানে যে নতুন অর্থনীতির আওতায় হিন্দু মুসলমানকে আর আলাদা করে দেখার উপায় নেই, এ বোধ তাঁর মনে খুব সচেতনভাবে না থাকলেও তাঁর লেখায় তা প্রকাশ পেয়েছে। তবু শুধু 'রাজসিংহে'ই নয়, আরও কয়েকখানা বইতে যে অনেকের মনে হয় তা পক্ষপাতদুষ্ট, এ অনুভূতিও মিথ্যা নয়। তার কারণ স্পষ্টতই অনেক জায়গায় হিন্দু বীরের তুলনায় মুসলমানগণ সামরিক বীরত্বে হীন, হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বুদ্ধির অভাব,—এগুলি প্রকাশ পেয়েছে (দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিংহ, মৃণালিনী প্রভৃতি)। স্বভাবতঃই নিরপেক্ষ পাঠকের কাছে এ প্রশ্ন জাগবে, সমসাময়িক মুসলমানদের আপেক্ষিক পশ্চাদ্বর্তিতা সত্ত্বেও যে-বঙ্কিমের তাদের প্রতি এতখানি সহানুভূতি ছিল সে-বঙ্কিম কেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে একজনও আকবর বা সের সাকে গ্রহণ করলেন না? ইতিহাসে ঔরংজীব আর টোডরমল ছাড়া আরও তো মুসলমান ছিল! আকবরের কথা তিনি প্রবন্ধের মধ্যে একাধিকবার স্বীকারও করেছেন। এই যে বঙ্কিমের ভিতরকার স্ব বিরোধ এর নিরসন করা হয় যদি আমরা বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের আদর্শের কথা মনে রাখি। আজকে আমাদের কাছে একথা খুবই স্পষ্ট যে জাতীয়তাবাদের আসল কারবার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে, অতীতের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু কোন কারবার নেই। বঙ্কিমের কাছে যদি এ বোধ উপস্থিত থাকত তো গোলমালের কোন কারণ থাকত না। বর্তমানের অর্থ নৈতিক অবস্থায় হিন্দু এবং মুসলমানের যে একই গতি তা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু মুস্কিল বেধেছে এই নিয়ে যে জাতীয়তার প্রথম উন্মেষের সময় এমন অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের কাজ চলেছে যে মানুষ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে ছেড়ে অতীতের কথাই ভেবেছে বেশী, অতীতের আদর্শকে ফিরিয়ে আনার জন্যই চলেছে তার একান্ত সাধনা, যদিও তার ফলে সে নতুন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্ম দিয়েছে। অতীতের প্রশ্ন যেখানেই এল সেখানে আর হিন্দু মুসলমান এক ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে নেই; সেখানে মুসলমান পরদেশ অপহরণে লোভী-হস্ত প্রসারিত করেছে, আর হিন্দু তার স্বদেশ রক্ষায় ব্যস্ত। আরও অতীতে এগিয়ে গেলে দেখা যায় হিন্দু আর মুসলমানে কোন সংযোগ কোন সম্পর্ক নেই; হিন্দুরা গড়ে উঠেছে হিন্দুস্থানে; আর মুসলমান সভ্যতার ভিত্তি সুদূর আরব ভূমিতে। কাজেই মুসলমানহীন 'মহাভারতের' রাজ্যে বঙ্কিম চলে গেছেন তাঁর জাতীয় আদর্শের খোঁজে, আবার জাতীয় বীরের সন্ধানে মুসলমানের

হাতে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হিন্দুদের ইতিহাসই তিনি হাতড়িয়ে বেরিয়েছেন। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে বঙ্কিমকে এ না করে উপায় ছিল না। আমাদের মনে রাখা দরকার বঙ্কিমের অতীত আদর্শ টা নয়, তিনি যে অতীতের ভাষায় যে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে চিত্রিত করেছেন—স্বাধীন চিন্তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, গণতন্ত্র, মানবতাবাদ, তার ভিত্তিতে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, সামরিক বিদ্যা প্রভৃতির অনলস সাধনা, তার ভিতর দিয়ে স্বাধীনতা এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে পরিণত হওয়া—এই আদর্শই আমাদের গ্রহণীয়। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দু এবং মুসলমানের স্বার্থ একসূত্রে গ্রথিত, অতীত ভারতে সে-স্বার্থ ছিল অল্প-বিস্তর বিপরীতমুখী।

একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে বঙ্কিম এবং বঙ্কিম সমসাময়িক হিন্দু সাহিত্যিকরা মাত্র দু'জন মুসলমান নৃপতিকে জাতীয় বীর হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তারা আকবরও নয়, সের সাও নয়। তারা হল সিরাজউদ্দৌলা আর মীরকাসিম। বঙ্কিম 'চন্দ্রশেখর' নামক বই-এ মীরকাসিমের চরিত্র অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করেছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রের এবং গিরীষ ঘোষ সিরাজউদ্দৌলার কাহিনী এমন ভাষায় লিখেছিলেন যা আজও বাঙ্গালীর মনে অমর হয়ে রয়েছে। কারণ কি? কারণ হল এই দুইজন মুসলমান হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অন্যায় যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল না, তারা বরং অন্যান্য স্বাধীনতাকামী হিন্দুদের সহযোগিতায় সাধারণ শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। অতীত ভারতে হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ ভিন্ন ছিল, কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ একসূত্রে গ্রথিত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে গত মহাযুদ্ধের পরে যখন স্পষ্ট দেখা গেল শত অতীতের আদর্শের সাধনা করা সত্ত্বেও ইউরোপে গ্রীক্ বা রোমক সভ্যতা ফিরে এল না, এ্যামেরিকার হাজার জাতির সম্মিলিত রাষ্ট্রশক্তি গণতান্ত্রিক পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করল, রুশদেশে অতীতকে আরও দূরে ঠেলে দিয়ে বহু জাতির সহযোগিতায় নতুন সাম্যবাদী সমাজ গড়ে উঠল—আমাদের দেশের মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় জাগরণের নব জোয়ার এল, তারা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের শত দাবী সত্ত্বেও তাদের আরবীয় এবং ভারতীয় কথা ভুলতে পারল না, এবং সেই ঐতিহ্য অনুযায়ী সমাজ গড়ার নিরঙ্কুশ সুযোগ পাওয়ার জন্য "পাকিস্তান" হয়ে উঠল তাদের জাতীয় দাবী। ইতিহাস এমি করেই তার নিজস্ব পথ তৈরী করে নেয়। মুস্লিম জাতীয়তাবাদের এই প্রথম সূচনায় 'পাকিস্তানে'র দাবী এতখানি সত্য হয়ে উঠেছে যে তার পিছনে প্রায় সমগ্র মুসলমান জনসাধারণ আজ সঙ্ঘবদ্ধ এবং মুস্লিম লীগ এই দাবী উত্থাপন করতে পেরেছিল বলেই শত দোষ সত্ত্বেও লীগ

আজ মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। অনেক হিন্দুই আজকে অনুভব করতে সুরু করেছেন যে এই 'পাকিস্তানের' দাবীর পিছনে রয়েছে অমোঘ ঐতিহাসিক নিয়মের শক্তি, তাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। এবং আশ্চর্য, এই স্বীকৃতির পর আমরা আবিষ্কার করব, আমরা যেমন এতদিনের এত সনাতন জাতীয়তাবাদীদের চেষ্টায় মহাভারতের যুগে চলে যাইনি; ভবিষ্যতেও যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই (তা ইতিহাসের শিক্ষা না বুঝে অসময়ের হিন্দু সভা যতই আস্ফালন করুক); মুসলমানরাও তেম্নি আরবীয় সমাজব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবে না। বরং আমরা উভয়ে মিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, গণতান্ত্রিক, এমন কি সমাজতান্ত্রিক, সমাজ গড়ে তুলব। 'পাকিস্তানকে' স্বীকার করা মানে বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করা নয়; বরং একতার ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করা।

বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত আলোচনাটা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। বোধ করি সেটা একেবারে অদরকারীও নয়। এবার তাঁর সাহিত্য-নীতির আলোচনায় চলে আসা যাক।

সাহিত্য-নীতির প্রসঙ্গে প্রথমেই যে প্রশ্নটা জাগে সেটা হল এই যে জাতীয়তার শিক্ষকের সচেতন ভূমিকা তাঁর সাহিত্যের সৌন্দর্যমূল্যকে ব্যাহত করেছে কিনা, বা ব্যাহত করলেও তার মাত্রা কতখানি। এই প্রশ্নটাকেই একটু অন্যরকম ভাবে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়, বঙ্কিমবাবুর সব উপন্যাসই জাতীয়তাবাদ প্রচারের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি এই কয়টা ভাগ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, যে সমস্ত উপন্যাসে জাতীয়তা এবং জাতীয়তার আদর্শ প্রচারিত হয়েছে; এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে 'আনন্দ মঠ', 'দেবী চৌধুরাণী'। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত উপন্যাসে জাতীয় বীরের চরিত্র-অঙ্কন করা হয়েছে, যেমন, 'রাজসিংহ', 'সীতারাম', 'চন্দ্রশেখর'। তৃতীয়তঃ, যে-সমস্ত উপন্যাসে জাতীয়তা, এমন কি নীতি প্রচারেরও বিশেষ কোন প্রচেষ্টা নেই, যেমন 'দুর্গেশ-নন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। চতুর্থতঃ, সামাজিক উপন্যাস। এই সমস্ত উপন্যাসেও জাতীয়তার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ছাপ নেই, যেমন 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রজনী' প্রভৃতি।

এই শ্রেণীভেদের থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে বঙ্কিমী জাতীয়তাবাদের কোন সাক্ষাৎ প্রকাশ নেই; এমন কি, পরবর্তী কালে যে বুর্জোয়া সাহিত্য-নীতি 'Art for art's sake বা 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই নীতির চোরাবালিতে এসে ঠেকেছিল, বঙ্কিমের শেষের দুই শ্রেণীর উপন্যাস যেন অনেকটা তারই অনুরূপ। অবিশ্যি শরৎচন্দ্র প্রদর্শিত সুনীতি বোধের হস্তক্ষেপ এই সব উপন্যাসের 'আর্টত্ব'কে মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ করেছে, কিন্তু

বঙ্কিমের কালের বিচার করে সেটুকু যদি আমরা ক্ষমা করে নিই, তবে আর 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই নীতিকেই যে বঙ্কিমের শেষোক্ত উপন্যাসগুলির কেন্দ্র তা স্বীকার করতে বাধা কি? তা হলে কি আমাদের এই স্বীকার করতে হবে যে বঙ্কিমের সমস্ত সাহিত্য জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় উজ্জ্বল এমন কথা বলা ভুল? জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তাঁর সমগ্র উপন্যাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এরকম ঘোষণা নেহাৎ-ই অবাস্তব, নেহাৎ-ই বঙ্কিম-সাহিত্যকে না বোঝার ফল?

আসল কথা হল, বঙ্কিম-উপন্যাসের শ্রেণী বিভাগের থেকে আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই তো সে নেহাৎ-ই ইস্কুল পাঠ্য সাহিত্যের ইতিহাসের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হবে। বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের পুরোপুরি স্বরূপ না বোঝা থাকলেই এরকম ভ্রান্তি সম্ভব। বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণ নয়, বরং অত্যন্ত ব্যাপক। দেশের জনসাধারণকে কেবলমাত্র একমুখী সংগ্রামে টেনে নেবার জন্য 'জাগো জাগো' বা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির উত্তেজনা সৃষ্টিকে চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদ বলে তিনি মনে করতেন না। তার কারণও ছিল; জাতি হিসাবে আমরা তখনো এই চেতনায় আসিনি বা এই অবস্থায় আসিনি যে তখুনি আমরা প্রবলতর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নেমে যেতে পারতাম। কাজেই বঙ্কিমের কাছে জাতীয়তা মানে পরবর্তী কালের মত সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া বোঝায়নি, বুঝিয়েছে তার জন্য প্রস্তুতি, শক্তি সঞ্চয়, এবং চেতনা অর্জন। সেইজন্য দরকার ছিল আমাদের জীবনী শক্তিকে চতুর্দিকে প্রসারিত করে দেওয়া, বিভিন্ন শিক্ষায়, নীতিশিক্ষায়, এবং সেই সঙ্গে মনের গূঢ় অনুভূতিগুলিকে তীব্র করে তুলে তার ভিতর নিবিড়ভাবে জীবন রসকে উপলব্ধি করায়। এর ভিতর দিয়েই তখন একমাত্র সর্বাঙ্গীন শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব ছিল। কাজেই স্বভাবতই বঙ্কিম-সাহিত্য এই নীতিকে অনুসরণ করে জীবনের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু জাতীয়তাবাদের দর্শন এবং জাতীয় সংগ্রামের প্রেরণাই নয়, তার সঙ্গে বঙ্কিম-সাহিত্য রোমান্স, হাস্যরস, মানবমনের দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ, প্রভৃতি সমস্ত সাহিত্যের সম্ভাব্য দিকে এগিয়ে গেছে। এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও আবার সব জায়গাতেই একটা দৃষ্টিকোণ ফুটে উঠেছে; সেটা হল রেনেসাঁসের দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী, এবং তার সঙ্গে অফুরন্তভাবে শক্তি, সজীবতা ও অনির্বাণ আশা। আনন্দের জন্য আনন্দ, সৌন্দর্যের জন্য সৌন্দর্য যে ছিল না তা নয়; কিন্তু সেটা ছিল একটা অনেক বৃহত্তর প্রেরণার অংশ মাত্র, সে প্রেরণা হল প্রসারিত বিস্তৃত জাতীয় জীবন। এই কারণেই প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী ছাড়া তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত উপন্যাসও বঙ্কিমের রচনার মধ্যে পাই।

বঙ্কিমের এই দৃষ্টিকোণটাকে একটু তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় পরবর্তীকালের মত বঙ্কিম সমাজ এবং সাহিত্যকে দুটো আলাদা কোঠায় ভাগ করে ফেলেননি। সমাজের রীতি-নীতি, তার জীবন এবং আদর্শ এই সব মিলিয়ে যেমন সাহিত্যের অবয়ব গড়ে তোলে, তেমি আবার সাহিত্য উন্নত মনের আদর্শকে প্রতিফলিত করে সমাজের উপর নতুন সংস্কারের প্রভাব বিস্তার করে। সমাজ এবং সাহিত্য সম্বন্ধে এরকম গভীর পারম্পর্য জ্ঞান ছিল বলেই বঙ্কিম সাহিত্যরচনাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করতেন। সেখানে লঘু মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া মানে সমস্ত সমাজের উপর তার খারাপ প্রভাবের দরজা খুলে দেওয়া। এই নীতির প্রতি বঙ্কিম এতখানি নিষ্ঠাবান ছিলেন যে বারবার পরিমার্জিত না করে তিনি কখনো তাঁর লেখা প্রকাশ করতেন না; এবং প্রকাশিত লেখাও পুনঃ প্রকাশের সময় তিনি অনেক পরিবর্ধন এবং পরিবর্তন করতেন।

জীবন এবং সাহিত্যকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারেননি বলেই বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাস ঐতিহাসিক হিসাবে কখনো সাফল্য অর্জন করেনি। এইখানে আবার স্কটের সঙ্গে বঙ্কিমের পার্থক্যটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। স্কট সচেতন ভাবে জানতেন, বর্তমানের সঙ্গে তাঁর কোন কারবার নেই; তিনি যত বেশী করে বর্তমানকে আড়ালে রেখে অতীতের ঐতিহাসিক আবহাওয়ায় অতীতের চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন তত বেশী হবে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব। তার ফলে স্কটের লেখার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট হল অবিকল অতীতের আবহাওয়া ফুটিয়ে তোলা। ভিন্ন আবহাওয়ার লোকের পক্ষে এতে যতখানি সাফল্য অর্জন সম্ভবপর স্কট তা অর্জন করেছিলেন। বঙ্কিমের সচেতন মনেও কিন্তু এই ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইতিহাস দরকার। নথিপত্রে যেখানে ঘাঁটতি পড়ছে সেখানে কল্পনার খাদ মিশাতে হবে,—সে কল্পনাও যতখানি প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূল হয় ততই ভাল। ঐতিহাসিক সততা হয়তো তাতে ক্ষুণ্ণ হবে, কিন্তু জীবনের প্রতি যে সততা তা তো থাকবে অব্যাহত। সামান্য মাল মসলার সঙ্গে যে তিনি কত বেশী পরিমাণে কল্পনার খাদ মিশাতেন তা তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের প্রারম্ভিক ভূমিকাতে নিজের প্রক্রিয়ার সমর্থনে যে সব যুক্তি অবতারণা করেছেন তার থেকেই মেলে। সচেতন মনেই যার ঐতিহাসিক সততার এতখানি ঘাটতি, মনের অগোচরে তিনি যে আরও কতদূর এগিয়ে যেতে পারেন তা বোঝা শক্ত নয়। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি যে আসলে ছদ্মবেশী বুর্জোয়া বীর তা ইতিপূর্বে কারণসহ বর্ণনা করেছি। কিন্তু শুধু যে প্রধান চরিত্রগুলির ব্যাপারেই তিনি অতীতের মধ্যে বর্তমানের ভেজাল দিয়েছেন

তাই নয়। গিল্টী করা সোণার মত তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপরের আবরণটাই শুধু অতীত। কতকগুলো বন-জঙ্গল, হীরা-জহরৎ, ঘোড়া-বল্লম, রাজ-প্রাসাদ-জেনানামহল প্রভৃতি জিনিষগুলি যদি আমরা তাঁর উপন্যাসগুলি থেকে তুলে দিতে পারি তো দেখবো সেগুলোর ভিতরকার সমাজ-চিত্রটা বঙ্কিমী আমলের সমাজের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। কয়েকটি উদাহরণ পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যাবে। 'কপালকুণ্ডলা'তে নবকুমারকে ঘিরে কপাল-কুণ্ডলা ও তার সপত্নীর মধ্যে যে সূক্ষ্ম যৌন দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করেছে, মধ্যযুগীয় সমাজের বহুবিবাহের যুগে এ ধরণের দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোন পুরুষকে একক ভোগ করতে চাওয়ার মত সাহস সে যুগের মেয়ের ছিল না, বিশেষ করে উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যে। 'রাজসিংহের' রূপকুমারী এবং রাজ-সিংহের মধ্যেও এমনি সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের পরিচয় রয়েছে। 'চন্দ্রশেখরে'র শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি আজীবন, এমন কি উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরেও অনুরাগ, মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগের নারীমন একমাত্র পতিকে ছাড়া আর কাউকে পতি হিসাবে বা পতি সদৃশ বলে ভাবতে পারত না। পতির প্রতি নিষ্ঠা ছিল; প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা বলে কোন জিনিষ ছিল না। ব্যাভিচারের অনেক প্রমাণ অবিশ্যি পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যাভিচার আর শৈবলিনীর একনিষ্ঠ প্রেম এক জিনিষ নয়। এটা সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের। প্রেম বলতে আমরা আজকাল যে একানুরক্তি বুঝি মধ্যযুগে তা একমাত্র নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবে পাওয়া যেত, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে তা ছিল কল্পনারও অতীত; এবং তার প্রমাণ মধ্যযুগীয় সাহিত্য।

বঙ্কিমের অতীতকে চিত্রিত করতে গিয়ে বর্তমানকে টেনে আনার ব্যাপারে আর একটা জিনিষ প্রমাণ হয়; সেটা তাঁর বাস্তববোধ। পরিষ্কার বোঝা যায় সমসাময়িক সমাজের প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। এবং যেহেতু তিনি স্কটের মত সমাজ-বিরূপ হয়ে ওঠেননি, এই সমাজের নরনারীর দুঃখ কোথায় বাজে, তাদের কোন্ কোন্ অবস্থাগুলি বিশেষ ভাবে হাস্যকর, এ সবের তিনি খোঁজ রেখেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস ছেড়ে সামাজিক উপন্যাসের আলোচনায় এলে আমরা দেখতে পাই, অন্ততঃ কয়েকটা চরিত্রের বেলায় বঙ্কিম রীতিমত মনো-বিশ্লেষণের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ভ্রমর, 'বিষ-বৃক্ষে'র নগেন্দ্রনাথ এবং কুন্দনন্দিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সব মনোবিশ্লেষণ খুব সূক্ষ্ম না হলেও সামান্য অদলবদল করলে রবীন্দ্র-শরতের পরেও মোটেই সেকেলে বলে মনে হবে না। কিন্তু বঙ্কিমের মন এইভাবে মনোরাজ্যে বিচরণ করাটা পছন্দ করেনি। খোলা চোখে যে জীবনটা চোখে পরে তার মধ্যে তিনি এত বৈচিত্র্য আর সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছিলেন যে

জীবন রসের খোঁজে বেশী অভ্যন্তরে প্রবেশের দরকার বোধ করেননি। তাঁর অল্পসংখ্যক সামাজিক উপন্যাসে তো বটেই, ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যেও নানাজায়গায় তিনি তাঁর নিজের চোখে দেখা বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের, তাদের অদ্ভুত আচার-ব্যবহারের চিত্র দিয়েছেন। 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রফুল্ল, (বিশেষ করে দেবী হওয়ার আগে) নয়নতারা, সাগর, বামুন ঠাকরুণ, সাগর বৌ, দিবা, ব্রহ্মঠাকরুণ, ব্রজেশ্বরের পিতা; 'ইন্দিরা'র প্রায় সবগুলি চরিত্র, অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম গোত্রহীন ছোট খাটো চরিত্র-গুলি,—এরা সবাই এত বেশী করে জীবন্ত, চিত্তাকর্ষক অথচ ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল যে আজ পর্যন্তও বাংলা সাহিত্যের তারা সম্পদ হয়ে রয়েছে।

কিন্তু বঙ্কিমের এই জীবন্ত এবং শক্তিশালী বাস্তবতা অব্যাহত থাকতে পারেনি। তার কারণ, বঙ্কিম তো আর তাঁর সাহিত্য, সমাজ, সমাজ-নীতি, সমাজাদর্শকে আলাদা আলাদা করে ভাবতে পারতেন না। কাজেই বারবার তাঁর সাহিত্যে নতুন সমাজ এবং পুরানো সমাজাদর্শ নিয়ে বিরোধ বেধেছে। তাঁর পর্যবেক্ষক শিল্পীমন সমাজের থেকে উপকরণ আহরণ করে সেগুলোকে যখন চিত্রিত করতে গেছে, সেই সঙ্গে নতুন সমাজের নতুন সমস্যা, নতুন নিজস্ব নীতি এবং তার ফলস্বরূপ নতুন সমাজ-নীতির প্রয়োজনীয়তাও চিত্রিত হয়ে গেছে। কিন্তু এমন সময় তাঁর কাছে সমাজাদর্শের কথা প্রবল হয়ে উঠেছে। এবং যেই সমাজাদর্শের প্রসঙ্গ এল অম্নি আর বঙ্কিম উনবিংশ শতকের মানুষ নন, তিনি তখন খৃষ্টপূর্ব আমলের জটাবল্কলধারী বনবিহারী তাপস। নতুন সমাজের নতুন সমস্যার সমাধান হিসাবে তিনি এনে ধরেছেন সেই দিনের আদর্শ যার উপযোগিতা বহুকাল নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার ফলে আমরা দেখতে পাই, বঙ্কিমের চিত্রে স্ত্রী শিক্ষা এবং স্ত্রীর শাস্ত্রজ্ঞান লাভ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তার পরিণতি স্বরূপ নতুন নীতি স্ত্রী স্বাধীনতা এবং স্বামী স্ত্রীর সমানাধিকার স্বীকৃত হয়নি ('দেবী-চৌধুরাণী'); বর্তমানে প্রেম একাধিক পাত্রে ন্যস্ত হতে না পারার দরুণ, বিয়ের পরে প্রেমের পাত্র বা পাত্রী-বদল একটা ভীষণ সমস্যা বঙ্কিম তা চিত্রিত করেছেন, কিন্তু তাই বলে তার প্রতিষেধক 'বিবাহ বিচ্ছেদের' নীতিকে তিনি স্বীকার করতে পারেননি ('বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'); বিয়ের আগে বা পরে প্রেমে পড়া এ সমাজে নিত্য-নৈমত্তিক ঘটনা, বঙ্কিম তা চিত্রিত করেছেন, কিন্তু সমাধান হিসাবে বিয়ের আগে প্রেম বা মেয়েদের পুনর্বিবাহকে স্বীকার করা এ বঙ্কিমের পক্ষে ছিল অসম্ভব ('চন্দ্রশেখরে'র শৈবলিনী, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র 'রোহিণী')। নতুন সমাজে নতুন সমাজ-নীতি জন্মলাভ করে অত্যন্ত অলক্ষ্যে। তাকে দেখতে পেতেও সময় লাগে, স্বীকার করতে আরও সময় লাগে।

ইউরোপে নতুন সমাজে তার নীতির আগমনের বহু পরে ইবসেন বা বার্ণার্ড শ সাহস করে তাকে স্বীকার করে নিতে পেরেছিলেন। কাজেই নতুন সমাজের মূলনীতিগুলিকে বঙ্কিম সমুপস্থিত করতে পেরেছিলেন বলেই সেগুলোকে সম্ভবভাবে প্রয়োগ করে নতুন সমাজ-নীতিকে স্বীকার করা তাঁর থেকে আশা করা যায় না। কোন সময়েই আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে বঙ্কিম সজ্ঞান মনে অতীতকেই শুধু কামনা করেছেন, এবং তার ভিতর দিয়েই নিজের অগোচরে তিনি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মূলনীতিগুলি উপস্থিত করেছেন, এবং বর্তমানের নিখুঁত বাস্তব-চিত্র উপহার দিয়েছেন। এই কারণেই বঙ্কিমের মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য, অনেক স্ববিরোধ স্থান পেয়েছে; কিন্তু ইতিহাসের অন্তর্গত বঙ্কিমকে এ সব ছাড়া কল্পনাও করা যায় না।

বঙ্কিমের আলোচনা এইখানেই শেষ, কিন্তু শেষের পরেও তো একটা উপসংহার থাকে। সেই উপসংহারে আবার বঙ্কিম-সমালোচকদের উল্লেখ করি, আলোচনার মধ্যে বঙ্কিম সংক্রান্ত প্রত্যেক সমালোচনারই উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে তবু তার সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনায় দোষ নেই। আমাদের দেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার জন্য বঙ্কিমকে দায়ী করে মুসলমান সমালোচকেরা ভুল করেছিলেন এটা না বুঝে যে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক অবস্থানে তাঁর জাতীয়তায় হিন্দু পক্ষপাতিত্ব ছিল অপরিহার্য। হিন্দু পক্ষপাতিত্বটা নয়, তাঁর নতুন যুগের জাতীয়তাবাদ এবং তার বাস্তব নীতিটাই পরবর্তী যুগের আদর্শ হওয়া উচিত। আর আদর্শবাদ বঙ্কিমের বাস্তব চিত্রকে ক্ষুণ্ণ করেছে এ সমালোচনাও অবান্তর। আদর্শবন্ধ ছাড়া বঙ্কিমের অস্তিত্বই সম্ভব ছিল না; বঙ্কিমের কাছে আমরা যা পেয়েছি আদর্শবাদ না থাকলে তা পেতে পারতাম না। আমরা যদি আলোকের গতির বেগ নির্ণয় করতে পারেন নি বলে আর্যভট্টকে নিন্দা করতে বসি তো সেটা কি হাস্যকর হবে না?

বরং এ কথা বলা চলে, বঙ্কিমের সময়ে আমরা তাঁর থেকে যা আশা করতে পারতাম তা তিনি আশাতিরিক্ত সরবরাহ করেছেন; কিন্তু তার পরে শরৎচন্দ্র, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, আমাদের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার, তার নীতি এবং সংগ্রামের, এবং সেই সঙ্গে নতুন সমাজ-নীতির সময়োচিত পুরোপুরি রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। *

অচ্যুত গোস্বামী

[* ঢাকা প্রগতি লেখকসঙ্ঘের রবিবাসরীয় বৈঠকে পঠিত ও প্রকাশের জন্য অনুমোদিত।]

স্থানচ্যুত

(এক)

গল্পের মাঝখানে বীরেন থেমে গেল। ইজিচেয়ারখানায় ভালো করে শরীর এলিয়ে দিয়ে একদিকের হাতলের উপর দুই-পা তুলে দিল। বইখানার যে পাতায় পড়ছিল, সেখানে একটা আঙুল দিয়ে বাকী আঙুলগুলোর সাহায্যে তাকে বন্ধ করে বুকের উপর রেখে বীরেন কড়ি বরগার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল, হয়ত বা ও কল্পনা করবার চেষ্টা করল, গল্পের অপঠিত অংশটুকু। একবারের জন্য অস্ফুটে আপন মনে উচ্চারণ করল,—আচ্ছা, আমি কি কোন অবিচার করছি ইলার উপর? কোন রকম অবিচার?

বইখানা খুলে বীরেন আবার আরম্ভ করল পড়তে। মাত্র চার লাইনের একটা প্যারা শেষ করেই ফের বন্ধ করল বই। আশ্চর্য মনে হল ওর, যে গল্পের গতির চেয়ে মনের গতি এখন অনেক বেশী। এত বেশী যে গল্প আর তাকে এঁটে উঠতে পারছে না। এইমাত্র শেষ করা প্যারাটা রীতিমত শ্লথতার অনুভূতি আনে ওর মনে।

সত্যি, মেয়েরা কি অদ্ভুত! আর কত সুন্দর, মনোরম! না, সব মেয়ে নিশ্চয়ই তেমন নয়। হয়ত বর্তমান গল্পের নায়িকা মিনাই এত চমৎকার। লেখকের কল্পনার আওতায় গড়ে ওঠা মেয়ে; কত সুন্দর! কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রেও এমন মেয়ে কি থাকা সম্ভব? হয়ত বা কোন মেয়ের মধ্যে বর্তমান নায়িকার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, বা মাত্র একজন শিল্পির ইচ্ছায় ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু শুধু কি শিল্পি? এমনি সব সাধারণ মানুষের সংস্পর্শেও কোন কোন মেয়ে অপূর্বভাবে প্রকাশ পায়। এইতো ইলাই কি অনেক বিষয়ে ওর আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়নি?

কিন্তু নায়িকা মিনার চরিত্র কি অদ্ভুত! তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই তো আমাদের নেই। কত সামান্য কারণ কিন্তু কত বড় বিচ্যুতি! অথবা কত সামান্য বিচ্যুতি! অথবা কত সামান্য বিচ্যুতি, আর তাকে কত বড় কারণ করে দেখা!

স্বামী প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক। বছরের ছয় মাস ভারতের নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায় জ্ঞানের আর সম্মানের উদগ্র নেশায়। বাড়ীতে সুন্দরী এবং সর্বগুণময়ী স্ত্রীকে একরকম একা রেখে। নির্জনতা থেকে স্ত্রীকে কিছুটা বাঁচানোর ইচ্ছায় তার বন্ধুদের এবং নিজের বন্ধুদের বিশেষ করে একজন কবি বন্ধুকে বলে যায় অনুগ্রহ করে মাঝে মাঝে দেখাশুনা করতে। স্ত্রীর কাছে বার বার ক্ষমা চেয়ে যায় নিজের অনিবার্য অনুপস্থিতির জন্য। কবি বন্ধুটি হৃদয়গত ব্যাপারে স্বভাবতই আর পাঁচজনের চেয়ে বেশী বেগবান তাই বোধ করি একটু বেশী খোঁজখবর করে। আর সময়ে সময়ে মিনাকে অনেক ধৈর্যের সঙ্গে অনুনয়ের সুরে কাব্য সাহিত্য আর জীবন সম্বন্ধে বোঝাতে চেষ্টা করে। মিনা অনভিজ্ঞের অনিচ্ছার সঙ্গে শুনতে শুনতে হঠাৎ কখন বা গুণীর উপযোগী একটি মত প্রকাশ করে ফেলে। কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে অনর্গল বলে যায় তার কথা। এমনি চলতে-চলতে একদিন এক বর্ষণমুখর অপরাহ্ণে সহসা মন্ত্রস্পৃষ্টর মত মিনা কবির বাহুর বন্ধনে এসে পড়ে। কবিও সম্মোহিতের মত মিনাকে চুম্বন করে। পরক্ষণেই নিজেদের ব্যবহারে দুজনেই অতিরিক্ত লজ্জিত হয়ে ওঠে। কোথায় কোন সূত্রে একটি ভয়ানক রকম অন্যায়বোধ দুজনকে সমানভাবে আঘাত করতে থাকে।

পরদিন প্রত্নতাত্ত্বিক-গবেষক স্বামী হঠাৎ ফিরে এল। অসুস্থ। মিনা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। স্বামী অসংখ্যবার নিজের অনুপস্থিতি, স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দেবার জন্য আর সর্বোপরি অনেকদিন পরে অসুস্থ হয়ে ফিরে এসে নির্জনতা-ক্লান্ত স্ত্রীকে এমনিভাবে উদ্ব্যস্ত করার জন্য বারবার ক্ষমা চাইল। বলল, "কত অন্যায় যে তুমি আমার বিনা অভিযোগে সহ্য কর, ভেবে অবাক হয়ে যাই।" মিনা চুপ করে জানলার পথে বাইরের ধু-ধু করা মাঠের দিকে চেয়ে থাকে।

স্বামী আবার বলে—কতদিন রাত্রে ক্যাম্পে বসে তোমার কথা মনে করেছি আর ভেবেছি যে তোমাকে যথেষ্ট সমাদর তো করছি না, বলতে গেলে একরকম অবহেলাই করি। আর তা কত অন্যায়। আর তুমি কেমন নীরবে নিজের প্রতি এই বঞ্চনাকে সহ্য করে আসছ। কোনদিন সামান্যমাত্র অভিযোগ তোমার মুখ থেকে শুনিনি। সত্যি, তুমি কত উচ্চ!

মিনা একইভাবে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, এমনি সে স্তব্ধ।

অসুস্থ উত্তেজনায় স্বামী বলে যায়—কত সময় ভেবেছি যে কি অর্থ আছে এই গবেষণার। কি এসে যায় মানুষের যদি না আমি মাটির তলা থেকে দৈবক্রমে বেরিয়ে পড়া বা বারকরা কতকগুলো ভাঙ্গা ফুটো অকেজো জিনিষের চারপাশে যুক্তির জাল বুনে অতীতের কোন এক নগরীর কল্পিত সৌন্দর্যকে জগতের সামনে ধরে না দিই। যা দিতে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমারই গৃহের সহজলব্ধ সৌন্দর্য ও সুষমাকে আমি অবহেলা করছি। কোন সাধারণ স্বার্থবোধী স্ত্রীলোক কি এসবকে সাহায্য করতে পারে? অথচ তুমি নীরবে আমাকে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছ নিজের সুখশান্তির প্রতি না চেয়ে যাতে আমি জগতে জ্ঞানী বলে গৌরব লাভ করতে পারি। ইচ্ছা করলে তুমি ত নিজের সাংসারিক সুখের অধিকারকে না খর্ব করে আমাকে অনায়াসে নিরস্ত করতে পার, এই কাজ থেকে। কিন্তু তুমি তা কর না। নিজের সুখ আনন্দ আর অধিকার সম্বন্ধে তুমি কত নির্লিপ্ত। পৃথিবীতে সবাই জানবে আমাকে মস্ত গবেষক বলে। অথচ এর পেছনে তোমার কত বড় স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ রয়েছে সে সম্বন্ধে হয়ত কেউ জানবে না। জানবে না যে আমার এই গৌরবের অনেকটা তোমারই প্রাপ্য।

মিনা অসুস্থ স্বামিকে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলল। দু ফোটা জল স্বামীর অজ্ঞাতে এমন কি হয়ত তার নিজের অজ্ঞাতে তার চোখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

বীরেন গল্পের এইখানে এসে থামল। নিজের পড়বার ঘরের আলমারিগুলোর দিকে চাইল। অন্ততঃ হাজারখানেক বই এঘরে ঠাসা। ওর পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য, মানবসমাজে উচ্চতর জীব বলে পরিগণিত হবার পরিচায়ক। ইজিচেয়ার থেকে উঠে বীরেন হাত পা টান-টান করে আলস্য ত্যাগ করল। একটা সিগারেট ধরিয়ে সামনের দরজার পরদাখানি হাত দিয়ে তুলে ধরে ডাকল—ইলা!

তরলকণ্ঠের মৃদু জবাব এলো—আসছি।

পরদাটাকে ছেড়ে দিয়ে বীরেন ঘরের মাঝখানে ফিরে এল। ইজি-চেয়ারের হাতার উপর স্যাণ্ডেল সমেত একটা পা তুলে দিয়ে হাঁটুতে একখানা হাত রেখে মনে মনে কি এক কৌতুক বোধ করল, যা প্রতিফলিত হল ওর মুখের সামান্য হাসিতে।

ইলা পরদা ঠেলে ঘরের মধ্যে এল। মুখে চোখে আনন্দ দীপ্তি। বীরেন একমুহূর্ত সেদিকে চেয়ে থেকে বলল, ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায় আজ, ইলা। কোথাও যাচ্ছ নাকি?

—কোথাও না গেলে বুঝি আর আমি ভাল পোষাক পরি না?

—আরে না না; সেকথা কি বলছি তোমায়? কি ছেলেমানুষ তুমি!

—এই ত এখনি বললে।

—আচ্ছা তাই। কিন্তু কোথায় যাচ্ছ বল ত?

—মা ডেকে পাঠিয়েছে যাবার জন্য। যাই একবার। ওবেলাই আসব, তুমি কলেজ থেকে ফিরবার আগেই।

—কি আশ্চর্য! আমি কি সে কথা তোমাকে বলছি। যখন সুবিধা হয় এসো। মা-র যদি কোন কাজ থাকে তাহলেও যে আমার কলেজ থেকে ফিরবার আগেই আসতে হবে, তার কি মানে আছে?

ইলা একটু হাসল। বলল—কিন্তু আমায় কেন ডেকেছিলে তা তো বললে না।

—ও! হ্যাঁ, ভারি চমৎকার একটা গল্প পড়ছিলাম। তুমি পড়ে দেখ।

—তার চেয়ে তুমি আমাকে বল। আমি তো' বলেছি কতবার তোমায় যে গল্প পড়বার চেয়ে তোমার মুখে শুনতে আমার ভাল লাগে।

—কিন্তু এ গল্পটা তুমি নিজেই পড়। বলতে গেলে হয়ত আমি ঠিক রসটি ফুটোতে পারব না।

—আচ্ছা আমি এসে পড়ব। তুমি ফিরে এসে দেখবে আমি গল্প শেষ করেছি।

বীরেন ইজি চেয়ারের হাতার উপর থেকে এই সময় পা-টা নামিয়ে নিলো। চটির ধুলো একটু চেয়ারের হাতার উপর লেগে ছিল। ইলা সেটাকে হাতের রুমাল দিয়ে ঝেড়ে ফেলল।

টেবিলের ওপরকার কাগজপত্রগুলো একটু গুছিয়ে রাখতে রাখতে ইলা বলল—বাবা সেদিন জিজ্ঞেস করছিলেন, তোমার থিসিস্ শেষ হ'লো কি-না। আমি বললাম, শেষ হয়ে গেছে। ঠিক বলিনি?

বীরেন, হুঁ, বলে সিগারেটটা একটু উঁচু থেকে অ্যাশ-পটে ফেলল। পটের কানায় আঘাত খেয়ে সেটা ছিট্‌কে পড়ল মেঝেয়। একটুকরো ছাই মেঝেয় গড়াতে গড়াতে ইজিচেয়ারের পায়ায় বেধে থেমে গেল। ইলার টেবিল গোছান শেষ হয়েছিল। সিগারেটের টুকরোটাকে তুলে সে এবার অ্যাশ-পটের ভিতর ফেলল। দু'খানা ছোট কাগজের টুকরো নিয়ে ছাইয়ের টুকরোটাকে তুলে সন্তর্পণে পটের ভিতর রাখল। তারপর একটা ভাল কাজ যেন খুব ভালভাবে শেষ করেছে, এমনি প্রসন্নতায় সে চাইলো বীরেনের দিকে।

বীরেন এবার বলল—দেরী হয়ে যাচ্ছে না, যাবে তো এখন?

—হ্যাঁ এই যাচ্ছি। তোমার চানের জল আজ কম করে দিতে বলেছি। বেশী জল না ঢেলে ওতেই চান শেষ কর। শরীর খারাপ হতে পারে, এখন সময় ভাল নয়।

—আচ্ছা তাই হবে।

—আর চান করার পর আবার যেন কাজে বস না। খাবার সময় তাড়া-তাড়ি হবে। ঠিক সময়েই সব হয়ে যাবে, আজ তো দেখলাম তোমার সাড়ে এগারটার আগে ক্লাস নেই।

—আজ বুঝি বুধবার, নয়? সাড়ে এগারটা হলে আর কোন চিন্তা নেই। ঠিক পারা যাবে তুমি যা যা বলছ সব।

—আচ্ছা, আমি তা হলে যাই এখন।

—এস।

ইলা চলে গেল। বীরেন ঘরের ভিতর দু-একবার পায়চারি করে আবার ইজিচেয়ারটার কাছে এসে দাঁড়াল। চটসমেত একখানা পা সে তার হাতলের উপর তুলতে গিয়ে নিরস্ত হল। হঠাৎ ওর মনে হল, ইলা ওর সুখ-সুবিধার জন্য কত ব্যস্ত। ওর কাজের কোন রকম অসঙ্গতিকেই সে সমালোচনার এলাকায় আনে না। ওর সুবিধার কথা চিন্তা করাই যেন তার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, এমনিতর তার ব্যবহার। এসব চিন্তা করে বীরেনের ভাল লাগল।

দুই

চারটের সময় বীরেন কলেজ থেকে ফিরল। এক রকম রাস্তা থেকেই ও ইলার উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। উদ্দেশ্য, সন্ধ্যার শো-তে ইলাকে সঙ্গে করে সিনেমায় যাবে। আজ পর্যন্ত সত্যি খুব কমদিনই ও তাকে উদ্যোগ করে সিনেমায় নিয়ে গেছে। ইলাও তেমন ইচ্ছা প্রকাশ করে না ছবি দেখবার। কিন্তু যদিই কখনো বীরেন তাকে সিনেমায় নিয়ে যাবার কথা বলেছে, সে উচ্ছ্বসিত হয়ে রাজী হয়েছে। অনেকদিন পরে আজ কলেজে বসেই বীরেন স্ত্রীর প্রতি মনোযোগী হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। বিগতদিনের অমনোযোগী হবার সঞ্চিত অপরাধ বোধ আজ এক সঙ্গে ঠেলে উঠ্‌ল মনের উপর।

বাড়ীতে ঢুকে বীরেন দেখল গল্পের বইখানা তেমনি ইজি চেয়ারের উপরই পড়ে আছে। ইলা তখনো আসেনি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, চারটে দশ। ইলার এতক্ষণ আসার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল ও নিজেই তাকে সাত-তাড়াতাড়ি ফিরতে নিষেধ করে দিয়েছিল। না, কাজটা দেখছি ঠিক হয়নি। কিন্তু বারণ করেছে বলেই যে সে আসবে না, আর কলেজ থেকে ফিরে এসে তাকে দেখতে পাবে না, এও বুঝি ভাল লাগে? ইলার তো একবার মনে পড়তে পারত যে আজ এমন একটা দিন হতে পারে যেদিন ও তাকে কাছে কাছে চাইতে পারে। না, মেয়েটা বড় যেন বোকা!

একখানা চেয়ারে বসেই পোষাক খুলে ফেলবে মনে করে আবার উঠ্‌ল। তারপর কোটটা খুলে রেখে একেবারে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে পড়ল ইজিচেয়ার-খানায়। প্রায় চারটে কুড়ি। যদি এখনো ইলা আসে তাহলেও বেশ তৈরী হয়ে যাওয়া যায়। একখানা ছোট টেবিলের উপর চাপার নিচে হাতে লেখা কতকগুলো কাগজ একটা দম্‌কা হাওয়ায় পত্‌ পত্‌ করে উঠলো। ওগুলো ওর থিসিসের প্রাথমিক খসড়া। ইলা রেখে দিয়েছে। পরে নাকি বাঁধিয়ে রাখবে। ওর প্রত্যেকটি খুটিনাটি কাজে যদি তাকে সান্নিধ্য দেওয়া যায় তা হলে তার কি উৎসাহ! বরং ও-ই তাকে দূরে দূরে রাখে। এদিকে আবার নিজে উদ্যোগ করে যে সে ওর কাজের মধ্যে এসে পড়বে তাও বেচারা পারে না। কেমন যেন সমীহ করে ওকে।

কিন্তু এদিকে প্রায় পৌনে পাঁচটা। ইলার জন্য বীরেনের মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। একবার ভবানীপুরে গেলে ত' হয়। সেখানে থেকে ইলাকে সঙ্গে নিয়ে হয়ত এখনো সময়ে যাওয়া যেতে পারে। সেই বেশ। বীরেন হাত আর মুখটা ধুয়ে নিয়ে কোটটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ভবানীপুরে শ্বশুরবাড়ির দরজায় বীরেন যখন পৌঁছলো তখন প্রায় স-পাঁচটা। পুরনো বড় রকমের বাড়ী। দারিদ্র্য ঠিক না হলেও অর্থের অপ্রাচুর্য আজ বাড়ির জলুসকে বজায় রাখতে দিচ্ছে না। এখানে-ওখানে অযত্নের ছাপও লক্ষ্য করা যায়। শ্বশুর উকিল। কিন্তু তেমন সুবিধে করতে পারেন নি ব্যবসায়ে কখনো। পূর্বপুরুষের বড়মানষীর রেশ যত না হোক আলস্য তাকে সবচেয়ে বেশী পঙ্গু করেছে জীবনযুদ্ধে। সংসার যাত্রার এখনকার রীতিটা যে ঠিক কিভাবে বজায় আছে তা বীরেন একসময় ভাববার চেষ্টা করছিল। হয়ত কিছু গহনাপত্র আছে যার বিক্রয়লব্ধ অর্থে ভদ্রতা বজায় রেখে জীবন কাটাচ্ছেন। ইলা ছাড়া আর কোন সন্তানাদি না থাকায় ভবিষ্যতের চিন্তাও তেমন নেই। বাইরের ছোট ছোট অর্দ্ধ বৃত্তাকার ধাপগুলো উঠে বীরেন বসবার ঘরে ঢুকল। শাশুড়ী হঠাৎ বীরেনকে দেখে একটু যেন আশ্চর্য হলেন। তারপর হাসিমুখে ওকে বসবার জন্য অনুরোধ করলেন।

বীরেন হেসে বলল—বসবার সময় নেই, মা; কলেজ থেকেই লোক পাঠিয়ে দুটো সিট্‌ বুক করেছি সিনেমার। ইলাকে ডেকে দিন। এর পর দেরী হয়ে যাবে।

—ইলা ত, বাবা অনেকক্ষণ বেরিয়েছে। তার এক বান্ধবী অনেকদিন পরে এসেছে। সেই ওকে ডেকে নিয়ে গেছে। একসঙ্গে পড়ত ওরা।

শাশুড়ী হাসলেন। পরক্ষণেই আবার বললেন—তুমি বস, আমি ওঁকে ডেকে দিচ্ছি। বলে তিনি যাবার জন্য উদ্যত হলেন। বীরেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আর বসবার সময় নেই। আমি একাই যাই তাহলে।

—একটু বস, দেখাটা করে যাও।

অগত্যা বীরেন বসল।

শ্বশুর এলেন অনুযোগ করতে-করতে—এদিকে ত' আর মোটেই আস না বীরেন।

—সময় ত তেমন পাইনে। জানেনই ত থিসিস্‌টা নিয়ে কত ব্যস্ত আছি।

—হ্যাঁ, সে ত জানিই। ইলার কাছে শুনলাম থিসিস্‌টা শেষ হয়ে গেছে। এইবার Doctorate-টা নিয়ে ফেলো। আমার ত মনে হয় তোমার ঐ থিসিস্ বার হবার পর কলকাতার বাইরে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে চেয়ার পেয়ে যাবে। অন্ততঃ ভাল একটা চাকরী অন্যত্র নিশ্চয়ই পাবে। কলকাতায় ত আজীবন কাটালে, এবার কিছুদিন বাইরে অন্য কোথাও গেলে বোধ হয় ভাল হয়। আমি ত ইলার মা-কে তাই বলি।

শাশুড়ীর মুখের দিকে একবার চেয়ে বীরেন সেখানে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করল না।

—দেখি, কতদূর কি হয়,—বলে বীরেন উঠে পড়ল।

—হ্যাঁ শুনছিলাম তুমি বুঝি সিনেমায় যাবার জন্য বেরিয়েছ। আচ্ছা···।

—এখন তা হলে যাই।—বলে বীরেন বাইরের দিকে পা বাড়াল।

গলির মোড় ঘুরে ঐ বাড়ির পাশ দিয়ে কয়েক গজ যেতে হয়। সেখান দিয়ে যাবার সময় বীরেনের কানে গেল, শ্বশুর এবং শাশুড়ীর কথোপকথন।

—ছিঃ কি অন্যায়, কত বিশ্রি! কত করে তোমাকে বলি, শোন না, ভাবতে মাথা হেট হয়ে যায়।

শাশুড়ী বললেন—বুড়ো হয়ে গেছ, বোঝ না? এ কি আমার জন্য না আমার সখ?

ততক্ষণে বীরেন বড় রাস্তায় পড়েছে। কথাগুলোর কোন তাৎপর্য্য ওর মনে এল না। হয়ত কোন পারিবারিক ব্যাপার যার আলোচনা ও আসার আগেও হচ্ছিল, চলে আসার পর আবার সুরু হল।

শো আরম্ভ হবার পর বীরেন সিনেমায় পৌঁছলো। ওকে টর্চ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল ওর সীটে। ছবিটা দেখতে দেখতে বীরেন কেবলই ভাবতে লাগল, ইলা এলে বেশ হতো। চমৎকার ছবিটা। ভারি ভালো লাগত তার।

ইনটারভ্যালের সময় বীরেন নিজেকে সীটের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে নিঝুম হয়ে বসে রইল। ছবি সে দেখছে বটে এসেছে বলে, কিন্তু তেমন উৎসাহ বা

আনন্দ কিছুই পাচ্ছে না। ফিরে যাওয়ার পর কেউ জিজ্ঞেস করলে, বেশ ছবি, এই কথা ছাড়া আর কোন রকম মতামত দিতে পারবে না।

সমাপ্তির পর বীরেন কোন রকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে ধীরে ধীরে সীট্ ছেড়ে উঠল। ওর সঙ্গে একই রো-তে বসা অনেকে ওর নিশ্চেষ্টতা লক্ষ্য করে ওকে পার হয়ে চলে গেল। ফলে বাইরে আসতে ওর লাগল প্রায় চার পাঁচ মিনিট সময়। চাতালের নিচেয় এসে ভীড়টা একটু কমলে রাস্তা পার হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ একখানা সেলুন গাড়ির দিকে নজর পড়তেই ও লক্ষ্য করল, গাড়ির ভিতর ইলা আর একজন ফরসা মত ভদ্রলোক পাশাপাশি বসে আছে। ভদ্রলোককে এক নজরেই ও চিনল। একবার মাত্র তাকে দেখেছে বিয়ের সময় ইলাদের বাড়ি। মাত্র মিনিট কয়েকের জন্য এসেই তিনি চলে গিয়েছিলেন। কি সম্পর্কে তাদের আত্মীয়। কাঁচের ভিতর দিয়ে ইলা বীরেনের দীর্ঘ চেহারা দেখতে পেল। পরক্ষণেই সে গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল সোজা বীরেনের দিকে। গাড়িখানাও তৎক্ষণাৎ ঝাঁ করে ছেড়ে দিল।

ইলা বলল—তুমি যে সিনেমায় আসবে একথা ত' সকালে বলনি। কি আশ্চর্য! তখনো বীরেন নিজের আশ্চর্য ভাবটা সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠেনি। ইলার কণ্ঠস্বরে সে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। বলল—উনি চলে গেলেন কেন?

—তোমার সঙ্গে ট্রামে বাড়ি ফিরব বলে আমি ওদের চলে যেতে বলেছি।

বীরেন চল্‌তে চল্‌তে থেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়ল। ইলা তার মুখের দিকে আর বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া ধোঁয়ার দিকে চেয়ে রইল।

—কে উনি?

—উনিই তো আমার বান্ধবীর স্বামী।

—ও!

ইলা আবার চাইল বীরেনের দিকে। তারপর রাস্তা পার হবার জন্য তার কাছে ঘন হয়ে সরে এল। রাস্তা পার হবার পর বীরেন মুখে সিগারেট রেখেই বলল—হ্যাঁ, তোমাদের বাড়ি হয়ে আসবার সময় শুন্‌লাম তোমার বান্ধবীর কথা, মা বলছিলেন।

সে তো সঙ্গেই ছিল। খুব মাথা ধরার জন্য গাড়ির ভিতর শুয়েছিল। তার আবার সিনেমা দেখলে মাথা ধরে।

ট্রামে উঠে একই সীটে দুজনে পাশাপাশি বসল। কণ্ডাকটার কাছে এলে অন্যমনস্ক বীরেনকে ইলা বলল—টিকিট চাচ্ছে, পয়সা দাও।

বাড়ি ফিরে পোষাক খুলে নিজের ঘরে বসে বীরেন অনেকটা সহজ বোধ করল। মনটাকে হালকা করবার জন্য নিজেই আবার বলল, যাই বল, তোমার বন্ধু আর তার স্বামীর ঐ ভাবে আমার সঙ্গে আলাপ না করে চলে যাওয়া ঠিক হয়নি।

—আমি এদিন গিয়ে বলব। তবে একটা কারণ আছে, বন্ধুর শরীর ভাল ছিল না।

অল্পক্ষণের জন্য দু'জনেই চুপচাপ, ইলা নিরবতা ভঙ্গ করল—তুমি কি এখনি কোন কাজ করবে? যদি তাই হয় তো আমি ও-ঘরে গিয়ে গল্পটা পড়ে ফেলি, তারপর খাবার সময় আলোচনা করব।

কথা শেষ করেই ইলা বইখানা হাতে নিল।—কিন্তু তোমার পেজ মার্ক দেখে মনে হচ্চে গল্প এখনো শেষ করনি।

—না; আচ্ছা তুমি পড়। যদি পারি তো আমি পড়ে নেব।

বইখানা হাতে রেখেই ইলা বলল—তোমার কি শরীর ভালো মনে হচ্ছে না?

—শরীর? না ভালই তো আছে।

বীরেন স্বভাবতঃ এই সময় ঘাড় একদিকে হেলিয়ে দিল। এমনি ভাবে কথা বলার সময় যে হাসির রেখা বীরেনের ঠোঁটের কোণে আর চোখের কোণে চল্‌কিয়ে উঠত, ইলা লক্ষ্য করল, আজ তা প্রকাশ পাবার আগেই বিলীন হয়ে গেল। এক মুহূর্ত্তের জন্য ইলার মুখ চোখের স্বাভাবিক দীপ্তি ম্লান হয়ে এল।

আচ্ছা আমি গল্পটা পড়িগে। বলে সে গেল ঘর থেকে বেরিয়ে। ইজিচেয়ারের ভিতর নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বীরেন শুয়ে রইল।

রাত্রে খাবার সময় ইলা বলল, সন্ধ্যে বেলাটা একেবারে বিনা কাজে কাটালে। এমন তো' কোনদিন কর না।

—এক আধদিন বিশ্রাম নে'য়া দরকার বৈকি। হ্যাঁ তোমাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গিয়েছি; যেভাবে আমি ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, যদি না আমার ঘাড়ের নিচে বালিসটা দিতে তাহলে হয়ত ঘাড়ের ব্যাথা হত।

ইলা বীরেনের খাওয়ার ভাবগতিক লক্ষ্য করছিল। বলল—কিছুই তো খাচ্ছ না আজ। কি হয়েছে তোমার? বল না। শরীর খারাপ করেছে কি? যখন শুয়ে ছিলে আমি তোমার কপালে হাত দিয়ে দেখলাম, একটু গরম মনে হল। কিন্তু গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, ভাল। মাথাটা খুব গরম ছিল। কিছু চিন্তা করছ নাকি?

—চিন্তা, না! আচ্ছা আমি উঠি, আর খাওয়ার ইচ্ছা নেই।

ইলা তাড়াতাড়ি উঠে বীরেনের কাছে এসে বলল—কেন? একদম কিছু খেলে না। কাল শরীর ভারী দুর্বল বোধ হবে যে।

না।

বীরেন উঠে পড়ল। কিন্তু ইলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল—এ কি তুমি উঠলে কেন? খাবে না? আচ্ছা আমি বসছি, তুমি খেয়ে নাও, ইলা।

ইলা বীরেনের মুখের দিকে চাইল। বিকেল থেকে এত কথাবার্তার মধ্যেও বীরেন একবার ওর নামটা উচ্চারণ করেনি। অথচ অন্যদিন প্রতি কথায় সে ওর নামটা যোগ করে। যেন নামটা উচ্চারণ করার মধ্যে কোথায় একটা মৃদু মিষ্ট অনুভূতি আছে। তাই ইলা এই সুযোগটুকু পেয়ে জিদ কোরে দাঁড়িয়ে রইল—না, আমি আর খাব না। তুমি যদি অকারণ না খেয়ে থাকতে পার, আমি বুঝি পারিনে।

ইলা বীরেনের চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। এরপর খাওয়া সম্বন্ধে দুজনের মধ্যে একটা সন্ধি হয়ে গেল। এক সময় ইলা বলল—গল্পটা আমি পড়লাম, কিন্তু ওর গভীর দিকটা ভালো ধরতে পারলাম না; তুমি বলে বুঝিয়ে দাও না।

এখন?

হ্যাঁ এখনই,—ইলা অভ্যাসমত মাথা দুলিয়ে বলল। তার কানের ঝুমকোর দুটো পাথর দুদিকে আলোর রশ্মিতে ঝিকমিক্ করে উঠল।

বীরেন সেদিকে মুহূর্তের জন্য চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—এখন কি হয়? তাছাড়া আমি তো সমস্ত গল্পটা পড়িনি।

কিন্তু তুমি যতটুকু পড়েছ তারপর আর গল্পাংশ বিশেষ নেই। বাকীটুকু তো তুমি কল্পনা করে নিতে পার।

বীরেন চেয়ারখানার পিঠে দেহভার দিয়ে বলল—আজ থাক্‌, আর একদিন বলব।

একটু পরেই যখন বীরেন উঠল তার মুখের দিকে চেয়ে ইলার আশ্চর্য বোধ হল। তার ঋজুতা কমে যেন তাকে ছোট দেখাচ্ছে। যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ তার মুখে চোখে সর্বদা লক্ষিত হত তা যেন অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়ে তাকে দুর্বল, খর্বিত মনে হচ্ছে।

তিন

পরদিন সকাল থেকেই বাড়ির অবস্থায় পরিবর্তন অনুভূত হল। কোথা থেকে কোথায় যে এ পরিবর্তনের ব্যাপ্তি তা ঠিক ধরা না গেলেও এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় যারা সংশ্লিষ্ট তারা এ পরিবর্তন অনুভব না করলেও বিশেষ করে যে দুটি প্রাণী এ পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট তাদের পরস্পরের প্রতি ভাবান্তর সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

একবার বীরেন ভাবল, কাজকি আর ওসব ভেবে। নিশ্চয়ই এমনিতেই ইলা খুব লজ্জিত আর দুঃখিত হয়েছে। এখন সম্ভবতঃ তাকে তার এখানকার পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও রাখলে সহজেই সে নিজের স্বভাবের দুর্ব্বলতাকে শোধন করতে পারবে এবং হয়ত বা ওর এই সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সারাজীবন অতিরিক্ত কৃতজ্ঞ বোধ করবে। সেই বেশ! কলকাতার বাইরে কোথাও একটা চাকরী সংগ্রহ করে ইলাকে নিয়ে চলে যাওয়া যাক। নিজের সঙ্গে এমনি বোঝাপড়া করতে পেরে বীরেন যেন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল।

কিন্তু দোষ এতে কার কতখানি? আশৈশব একাকী জীবন যাপনের বাধ্যতায় নিজের সম্বন্ধে কতকগুলো মতামত এবং সুদৃঢ় ধারণা ও গড়ে নিয়েছিল, যার জন্য অনেক সময় সুবিধা হলেও যারা ওর অতি সান্নিধ্যে আছে তাদের দিক থেকেও সে সব সমান কার্যকরী কিনা ভেবে দেখেনি,

তাছাড়া বিদ্যার গভীরতা বা চরিত্রের দৃঢ়তা, যে সব নিয়ে এতদিন মনে মনে নিজেকে তারিফ করেছে, তা ওকে দুর্বলতার উর্দ্ধে উঠ্‌বার সেই পরিমাণ ক্ষমতা দেয়নি। সেই কারণে পারিবারিক জীবনে নিজেকে নির্লিপ্ত দেখিয়ে এত ও নির্ভরশীল। কিন্তু এর পিছনে যে একটি দুর্বল ব্যক্তি আছে যা কোন না কোন কারণে আজ ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছে। হয়ত ওরই কোন রকম অবহেলা বা যথেষ্ট মনোযোগের অভাবের জন্য ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম। কিন্তু এতটা ভাববার পর এখানে এসেই বীরেনের খট্‌কা লাগল। নিজের দোষের কথা বা তার পরিমাণ সম্বন্ধে ভাববার যথেষ্ট কারণ এখানে আছে কি-না। এখন ঘন ঘন ভবানিপুরে যাওয়ার কারণ এবং অন্যান্য ঘটনাপরম্পরা মনে করে ধরা যায় যে বিয়ের আগে থেকেই ইলা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার এই স্বভাবে অভ্যস্ত। তার বিচ্যুতির জন্য আর যাই কারণ থাক, ও নিজেকে দোষী করতে পারে কি? অথবা এও কি ভাবতে পারে যে ওর ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবহারের গভীরতা বা স্বকীয়তা আরো বেশী হলে, এ ব্যাপারটা বিয়ের পরই থেমে যেত। কিন্তু অমনতর যুক্তি কতক্ষণ মনে দাঁড়ায়?

হঠাৎ বীরেনের মনে পড়ে, বিয়ের পর প্রথম ছুটিতে ওরা বেড়াতে গেলে, ফিরবার সময় ইলার অহেতুক কতকগুলো কথাবার্তা যা তার তখনকার চাপল্য মনে হয়েছিল। সে বলেছিল—এখানে থাকলে বেশ হয়। কলকাতায় ফিরতে আমার ইচ্ছা করে না।

কিন্তু কিছুতেই বীরেন মন থেকে এ ধারণা সরাতে পারে না যে কোথায় যেন এর ভিতর একটা হীনতা আছে যাতে ওর সমস্ত বিবাহিত জীবন যেন একটা একটানা বিদ্রূপের শানিত শলাকার মত এই মুহূর্তে আর একবার ওকে খোঁচা দিয়ে গেল। ইলার প্রত্যেকটি কথা, আত্মপ্রকাশ ভঙ্গি, হাসি যা এতদিন প্রতি মুহূর্তে ওকে মুগ্ধ করেছিল সে সব এখন একসঙ্গে ওর মনকে দ্বিগুণ পরিমাণে বিষাক্ত করে তুলল। হয়ত তার এই অন্তর্গত দুর্বলতাই তাকে সর্বদা একটা অপরাধবোধের ভারে নমিত রাখত যার জন্য সে কোন সময়েই নিজেকে ওর কাছে ওর সমানভাবে জাহির করতে পারত না। কেমন যেন খানিকটা ক্ষুদ্রতাবোধ তার প্রাত্যহিক ব্যবহারে ছিল। এবং সেই সব ক্ষুদ্রতাবোধের প্রকাশ এতদিন ওকে মিষ্টতার মুখোসে মুগ্ধ করেছিল মনে করতেই

বীরেন আর একবার অস্বস্তি বোধ করল তীব্রভাবে। না, কিছুতেই সম্ভব নয় আর ইলার সঙ্গে আগের মত সহজ ভাব অনুভব করা। নিজেকে আর ও নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারে না।

আজকাল মাঝে মাঝে পড়াশুনার সময় অথবা কলেজে অবসর ঘণ্টায়, নয়ত নিতান্তই একান্তে চল্‌তি ট্রামের মাঝখানে বীরেনের মনের ভিতর জেগে ওঠে একটি সুদৃশ্য শুভ্র মসৃণ ঘাড়, ঝক্‌ঝকে চুলগুলি যে ঘাড়ের উপর আলতো ভাবে পড়ে থাকে, যার শুভ্রতা মোটা কাঁচের আড়ালেও আত্মজাহির করে। আর তারপরই সেই ঘাড়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে একখানি কমনীয় তরুণ মুখ, সুন্দর। যা মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য বিয়ের রাতে দেখাতেই ওর মনে ছাপ রেখে গেছে। কত নির্লিপ্ত নির্বিরোধ ভাব তাতে! অথবা হয়ত খাবার টেবিলে ইলার উজ্জ্বল মুখের দু-পাশে তার কানের ঝুম্‌কো আলোর নিচে নড়াচড়ায় যখন ঝক্ ঝক্ করে উঠত, বীরেনের চোখের ভিতর দিয়ে মনে তা প্রেরণা আনবার পথে অকস্মাৎ থমকিয়ে থেমে যেতো। কিম্বা রাত্রে পড়বার সময় ক্লান্তিকর অবস্থায় কফির পেয়ালা সমেত যখন ইলার সুন্দর হাত দুখানা ওর নমিত চোখের সামনে জেগে উঠত, কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ওর শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎরেখার তীক্ষ্ণতায় বয়ে যেত।

এ ছাড়া আজকাল ও আবার মাঝে-মাঝে অসুস্থ হয়ে অথবা মাথা ধরায় আক্রান্ত হয়ে একেবারে দুপুরেই কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে আসতে লাগল। এবং সত্যি সত্যি অসুস্থতার কৈফিয়ৎ স্বরূপ অন্যূন তিন ঘণ্টাকাল সময় ইজি-চেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে থেকে ব্যয় করতে লাগল। এবং সেই সময় ইলার দিক থেকে ঘরে গিয়ে শোবার অনুরোধকে উপেক্ষা করলেও তার সানুরাগ পরিচর্যা কেমন একটা দ্বিধাগ্রস্ত তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করে মনে মনে আরো অস্বস্তি বোধ করত।

এমনি অবস্থায় একদিন ইলা বলল—হয়ত তোমার চশমা বদলাতে হবে। একবার চোখটা দেখিয়ে এসো। আমি কতদিন তোমাকে অতবেশী রাত্রি পর্যন্ত পড়তে বারণ করি, কিন্তু তুমি শোন না। চোখ সম্বন্ধে তুমি মোটেই চিন্তা কর না।

ইলার অনুযোগে এই সহসাগত মধ্যাহ্ন অসুস্থতার একটা সম্ভাব্য কারণ পাওয়া গেছে, এমনি এক ধারণায় বীরেন উৎসাহিত বোধ করল।—সম্ভব তোমার কথাই ঠিক, ইলা। চোখই হয়ত আবার খারাপ হয়েছে। রাতের পড়াটা এবার একটু কমাতে হবে। গেলোবার চশমা বদলানোর সময় ডাক্তার আমাকে এ সম্বন্ধে সাবধান করেছিল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সে উপদেশ পালন করা হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া থিসিস্‌টার আরো কিছু পালিশ দরকার মনে হচ্ছে।

ইলা কোন কথা না বলে ইজিচেয়ারের পিছনে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ওর চুলের ভিতরে আঙুলগুলো সঞ্চালন করতে থাকে। তার নিশ্বাস বীরেনের কপালে মাঝে মাঝে অধিক উষ্ণতায় অনুভূত হয়।

কিন্তু এত সব বিপরীতমুখী অবস্থা দৈনন্দিন জীবনে ওদের এলেও তজ্জনিত প্রাথমিক আলোড়নগুলো শেষ হয়ে আসার পর ক্রমে ক্রমে নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্লান্তিতে অবস্থা আবার শান্ত হয়ে উঠ্‌ল। এবং শুধু শান্তই নয়, এবার ওধার থেকে দমকা হাওয়ায় আবার সেখানে তরঙ্গও উঠ্‌তে লাগল। কিন্তু সে ঢেউএ নিজেকে নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না। সমুদ্রের ফিরে যাওয়া ঢেউএর মত তা যেন নিচের দিকে টানতে থাকে।

তবু আবার যেন দিনে দিনে অবস্থা সহজ হয়ে আসতে লাগল। কথা থেকে কথান্তরে আঘাত খেতে খেতে অন্তরের বেদনা বা অপরাধ-বোধ, দুইই ক্রমে এল নিঃশেষিত হয়ে। বীরেন পূর্ব্বের মতই প্রায় সব রকমে হয়ে এল স্বেচ্ছায় ইলার উপর নির্ভরশীল। সেই রুটীন দেখা থেকে আরম্ভ করে টাই আঁটা সব তাতেই আবার ইলার স্পর্শ।

কিছুদিন পরে আবার একদিন দুপুরে কলেজে শরীর ভাল বোধ না করে বীরেন বাড়ি আসতে মনস্ত করল। পথে নেমে ট্রামে উঠ্‌বার আগেই ওর হঠাৎ মনে পড়ল, বৌবাজারের এক জুয়েলারের দোকানে মাস দেড়েক আগে ইলার জন্য একটি আঙটি তৈরী করতে দিয়েছে, এবং পনরো-ষোল দিনের মধ্যেই ওর তা নিয়ে আসবার কথা ছিল। কিন্তু গত মাসখানেক ধরে সেকথা ওর মনেই পড়েনি। শরীরটা অসুস্থ বোধ হলেও আজই সেটা আনা ঠিক করে বীরেন বৌবাজারের ট্রামে উঠে বসল। দোকানে পৌঁছে দেরীর জন্য একটা মামুলি কৈফিয়ৎ দিয়ে চাইল আঙটি। সেটা হাতে পেয়ে ওর

মনটা ভারী উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কত সুন্দর হয়েছে! কি চমৎকার মানাবে ইলার হাতে! দোকানীকে খুসী মনে ধন্যবাদ দিয়ে বীরেন আঙটিটা পকেটে ফেলে চলে এল। বাড়ির কাছে আসবার আগেই ওর অসুস্থতা অর্দ্ধেক কমে গেল। এবং যখন বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়েছে তখন সুস্থই বোধ করল নিজেকে। সিঁড়িগুলো উঠবার সময় ধাপে ধাপে ওর মনের তারল্য বাড়তে লাগল এত যে শেষের দুটো ধাপ ও একসঙ্গে উঠে পড়ল। ভিতরে ঢুকে কোন না কোন রকমে নিজের আগমন জাহির করল। মাসখানেক আগেও এ বাড়ীতে থাকলেই ইলা ওর আসবার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি আসত। সেই অবস্থা এখন আর না থাকলেও আজ বীরেন আশা করতে লাগল যে ইলা এই এল বলে। কিন্তু পাঁচ ছয় মিনিটেও সে না আসায় বীরেন পকেট থেকে আঙটিটা বার করে লাগল দেখতে। কিন্তু তখনো ইলা না আসায় ওর মনের প্রফুল্লতা কমতে লাগল। সে গেল শোবার ঘরের দিকে। সেখানেও ইলা নেই। স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ দেখে বুঝল যে ইলা চান করছে। বীরেন এদিকে চোখ ফেরাতেই লক্ষ্য করল ইলার হাতব্যাগটা বিছানার উপর পড়ে থাকতে। হঠাৎ ওর মনে একটা তরল রহস্যপ্রিয়তা এল। ভাবল আঙটিটা হাত-ব্যাগের মধ্যে রেখে দেওয়া যাক। ইলা পেয়ে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য আর খুসী হয়ে উঠবে। ব্যাগটা খুলে আঙটিটা তার ভিতর ঠিক কোথায় রাখা যায় ভাবতে ভাবতে এটা ওটা নাড়তে লাগল। একখানা শক্ত মসৃণ ছোট কাগজে পড়ল ওর চোখ। শাদা-পিছনটা তার দেখা যায়। একখানা ছোট ফটো উল্টো করে রাখা। আনমনে বীরেন সেখানা টেনে বার করল। দেখবামাত্রই চিনল, সেই সৌখিন চকচকে পালিশ করা চেহারা, যা একবার সম্পূর্ণভাবে আর একবারমাত্র আংশিকভাবে ও দেখেছে, সেই সযত্ন রক্ষিত দৈহিক চাকচিক্য। এতক্ষণ ধরে ওর মনে জমে ওঠা যে প্রফুল্লতা ওকে উৎসাহিত করছিল তা একমুহূর্ত্তে উবে গেল। হঠাৎ শরীরে আবার যেন অসুস্থতার আভাস পেল। ফটোখানা যথাস্থানে রেখে ব্যাগ বন্ধ করে আবার বিছানার উপর রেখে দিল। আর তার পাশে ফেলে রাখল আঙটিটা। তারপর পড়বার ঘরে ফিরে এসে একখানা মাসিক পত্রিকা

হাতে করে শুয়ে পড়ল ইজিচেয়ারে। কিন্তু মাসিক পত্রিকা বেশীক্ষণ বিভ্রান্ত রাখতে পারল না। কখন একসময় তা ওর মন থেকে সরতে সরতে হাতের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। এবং পরমুহূর্ত্তেই হাতখানা ফিরে এসে আশ্রয় নিল মাথার নিচেয়। তাহলে এ শুধু ঘটনা নয়, রীতিমত একটা অবস্থা। অকস্মাৎ ওর মনে হল যেন আবার ও সেই অনেক পিছনে ফেলে আসা কৈশোরে ফিরে যেতে চায়। সেখান থেকে যাত্রা সুরু করে জীবনের গাঁথুনি গাঁথতে চায় অল্পে-অল্পে। তাতে যদি এখন যতটা ঊর্দ্ধে এসেছে ততটা নাই আসে, অথবা এতখানি সম্ভাবনার স্থানে যদি মোটেই সম্ভাবনা না থাকে সে জীবনে তাও ক্ষতি নেই। ভারি যেন নিজেকে আজ ক্ষুদ্র মনে হতে লাগল ইলার কাছে। কোথায় যেন সে এতদিন পরে জীবনপথে ওকে পিছনে ফেলে ঊর্দ্ধে ওর স্পর্শের বাইরে উঠে গেছে।

স্নান এবং প্রসাধন সেরে ইলা এল। বীরেন চোখ-বোজা অবস্থায় তা অনুভব করলেও মনোযোগ না দেবার ভাব দেখিয়ে রইল চুপ করে। ইলার আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের হাওয়াটা কেমন যেন ঠাণ্ডা মনে হতে লাগল বীরেনের। মনে হল একটা ঠাণ্ডা বাতাসের তরঙ্গ চারদিক থেকে এসে ওকে স্পর্শ দিচ্ছে। ইলা একেবারে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। তার শরীর ও পোষাক থেকে নির্গত একটা সুরভি বীরেনকে সজাগ করে তুলল।

—এটা ওখানে রেখে দিয়ে এসেছ যে বড়। ভারি সুন্দর হয়েছে কিন্তু। আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দাও; দেবে না?

ইলার উচ্ছল কণ্ঠস্বর ঘরের মাঝখানে ছড়িয়ে পড়ল। তার একহাতে আঙটি-টা আর অন্য হাতের আঙ্গুলগুলো বীরেনের চোখের সামনে উঠল ভেসে ছবির মতন।

মুহূর্ত্তের জন্য বীরেন দ্বিধা বোধ করায় ভাবল সেখান থেকে উঠে চলে যাবে। কিন্তু সে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসেই রইল।

নিজের অন্তর্দ্ধানস্থ যে ইলা এতদিন ওকে সমীহ করে চলত আজ তার পরিবর্তন হয়েছে। আজ সে স্বামীকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখবার জন্য চিন্তাকুল নয়; সুযোগ ও সুবিধা মত এখন সে নিজেকে প্রকাশ করে। আর আজকের ঘটনার পর বীরেন-ও ইলার কাছে আত্মস্থ বোধ করে না।

কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত সে ইলার প্রতি মনে একটু ক্ষুব্ধ থাকলেও তার সঙ্গে পূর্বের সম্বন্ধ ফিরে পাওয়া সম্ভব জেনে প্রতিনিয়ত উন্মুখ ছিল। কিন্তু এখন আর সে আশা নেই। সেই যেন এখন ইলার কাছে প্রীতির প্রত্যাশী। ইলার এই মুহূর্ত্তের আত্ম-প্রকাশ তাকে তাই মুগ্ধ না করলেও সে উপেক্ষা করবার মত শক্তি নিজের মধ্যে পেল না। এবং একসময় সে ইলার আঙ্গুলে আঙ্‌টি-টা পরিয়ে দিল।

সৌরীন্দ্রকুমার খাঁ

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হিন্দু-আইনের বিভাগ

যাজ্ঞবল্ক-স্মৃতির মিতাক্ষরা টীকার দায়াধিকারতত্ত্ব বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে আইনরূপে প্রচলিত আছে। কিন্তু স্মৃতিসমূহ পরস্পর-বিরোধী বলিয়া টীকা সৃষ্ট হইয়াছে। এইগুলিকে 'নিবন্ধ' বলা হয়। পুনঃ বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন টীকাকারদের মত গৃহীত হয়; এইজন্য হিন্দু-আইনের বিভিন্ন ব্যাখ্যাতা'র দল (Schools of Law) সৃষ্ট হইয়াছে। যেখানে এই প্রকারের একটি ব্যাখ্যা গৃহীত হইয়াছে সেখানে ইহা "লোকাচার" (usage) রূপে গণ্য হয় (১)। সেইজন্য ইংরেজ-ভারতের আদালতে এইগুলিকে আইনরূপেই গণ্য করা হয়, কারণ হিন্দু-আইনে "লোকাচার" লিখিত আইন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী (২)। এইরূপে দেখা যায় যে, হিন্দুর আইন মূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত—মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ। "মিতাক্ষরাকে" প্রাচীনপন্থী (Orthodox school) আইন বলা হয়, আর 'দায়ভাগ' যাহাকে বাঙ্গালার আইন নামে অভিহিত করা হয়, তাহাকে সংস্কারকদলীয় হিন্দু-আইন (Reformed School of Hindu Law) বলা হয়। "দায়াধিকার" ও যৌথ-পরিবারভুক্ত যৌথ-সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে দায়ভাগ মিতাক্ষরা হইতে পৃথক ব্যবস্থা প্রদান করে (৩)। কিন্তু যেস্থলে মিতাক্ষরার সহিত বাঙ্গলার দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব ও দায়াক্রম সংগ্রহের সংঘর্ষ নাই তথায় মিতাক্ষরা'কে উচ্চতর প্রামাণিক আইন বলিয়া মানা হয় এবং যে-বিষয়ে মিতাক্ষরা কোন মত প্রকাশ করে না তথায় দায়ভাগ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

১। Mulla—Hindu Law, P 8.

২। Collector of Madura, V. Moottoo Ramalinga (1868) 12 M. I. A. 397, Pp. 435-436, Quoted in Mulla, P 8.

৩। Sastri—op. cit. P 22.

মিতাক্ষরা বানারসী, মিথিলা, মহারাষ্ট্র বা বম্বে দ্রাবিড়-স্কুল নামক ব্যাখ্যায় বিভক্ত (৪)। এস্থলে ইহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে, বিজ্ঞানেশ্বর কৃত মিতাক্ষরা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত হয়; মুল্লার মতে জিমূতবাহনের দায়ভাগ খৃষ্টীয় একাদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত হয় (৫)। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় এঁড়ুমিশ্রের কারিকার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গলার রাজা বিষ্কসেনের মন্ত্রী ও ধর্ম্মাধিকরণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন। তিনি বলেন, (৬) এঁড়ুমিশ্র জিমূতবাহনকে বঙ্গে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের অন্যতম ভট্টনারায়ণের বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষের লোক বলিয়া গণনা করিয়াছেন এবং ৯৯৯ সংবতে ব্রাহ্মণদের উক্ত আগমন হয় বলিয়া এঁড়ুমিশ্র উল্লেখ করিয়াছেন। এই বর্ণনানুসারে ৯৯৯ সম্বৎ=৯৪২ খৃঃ, অর্থাৎ দশম শতাব্দীতে ভট্টনারায়ণের উক্ত আগমন হয়, আর সপ্তম পুরুষে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষকাল হয়। কিন্তু জনশ্রুতির বিষ্কসেনের নাম (বল্লালচরিত-এ উক্ত নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়) বাঙ্গালার ইতিহাসে উল্লিখিত নাই; এমন কি, আইন-আকবরীতে সেনরাজবংশের তালিকায়ও তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না *। এইসব কারণবশতঃ জিমূতবাহনের সঠিক তারিখ নির্দ্ধারিত হওয়া কঠিন। জলি বলেন, জিমূতবাহনের 'ধর্ম্মরত্ন' পুস্তক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত হয় (৬ ক)।

কিন্তু কেন এবং কি-প্রকারে বাঙ্গলায় 'দায়ভাগ' প্রচার হয় তাহা সমাজ-তত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। এতদ্বারা বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অজ্ঞাত অধ্যায় পুনঃ প্রকাশিত হইতে পারে। এইস্থলে

৪। Mulla—Hindu Law; P. 8-11.

৫। Mulla—Hindu Law, P. 9.

৬। Sastri—Op. cit. P 37

(৬ ক)। Jolly—tr. by B. K. Ghose, P 79; কানে বলেন, কুল্লুকভট্টে 'দায়ভাগ' পুস্তকের কোন উল্লেখ নাই (P 256-257)।

* আজকালকার ঐতিহাসিক সমালোচকেরা কারিকা ও গোষ্ঠিসম্বন্ধীয় পুঁথি সমূহের প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন; সেইজন্য ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করিয়া তারিখ ও ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে অনিচ্ছুক।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু-আইনের এই নূতন ব্যবস্থা মুসলমান আক্রমণের কম-বেশী সমসাময়িক। মুসলমান আইনের প্রভাব ইহার উপর, অন্ততঃ দায়ভাগের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন (শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, হিন্দুযুগের টীকাকারেরা বাস্তব আইনজ্ঞ ছিলেন, মুসলমানযুগের টীকাকারেরা নিবন্ধকার সংকীর্ণমনা ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁহাদের ন্যায়-বিচারের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকগুলি জাগতিক ও বাস্তব না হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্কপূর্ণ ছিল। এইজন্য তাহারা পশ্চাদ্গমনশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা নিবন্ধমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (§)। এই শেষোক্তগুলি ব্রাহ্মণদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জাল-করা উপকরণ সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত (৭)।

এক্ষণে কথা, মুসলমান আইনের প্রভাব বর্ত্তমানযুগের হিন্দু-আইনে পাওয়া যায় কিনা? শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, মুসলমানেরা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া শাসন করিয়াছিল, তথাপি ঐশ্লামিক আইন হিন্দুর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; কারণ উভয় আইন-ই ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত থাকায় পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট ও বিরুদ্ধ ছিল এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা মুসলমানের ভাষা ও আইন অধ্যয়ন করে নাই। ইহা সত্য বটে যে, কায়স্থেরা শাসকদের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল কিন্তু হিন্দুর আইন-চর্চ্চা ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া ছিল। এইজন্য হিন্দুর 'উইল' ব্যবস্থা মধ্যে এই যুগের হিন্দু-আইনের কোন উল্লেখ নাই। হিন্দুর 'উইল'করণ প্রথা মুসলমান আইন হইতে নিঃসৃত হয় নাই, এই প্রথা ইংরেজশাসনের আমলে ইংরেজ আইনজীবিদের এবং ইংরেজ-শাসন আইনের (Regulations) দ্বারা সৃষ্ট (৮)। কিন্তু হিন্দুর বর্ত্তমান প্রচলিত লোকাচার সমূহ মধ্যে মুসলমান-কৃষ্টি প্রতিফলিত হইয়া হিন্দুর 'লোকাচার' নিঃসৃত আইনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে কিনা তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

§। এই প্রকারেই রঘুনন্দন ও হেমাদ্রী প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

৭। Sastri—Hindu Law, P 37.

৮। Sastri—Pp. 819-821.

এক্ষণে কথা এই যে, কাহারা হিন্দুর আইন দ্বারা শাসিত? যে হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং প্রকাশ্যে অন্যধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, এই আইন তাহারই উপর প্রযোজ্য হইবে। বৌদ্ধ, জৈন ও শিখগণ নিজেদের Civil Law না থাকায় হিন্দু-আইন দ্বারাই শাসিত। শিখদের বিবাহ-বিষয়ক আইন ভিন্ন। এইসব ব্যতীত নম্বুদ্র-ব্রাহ্মণ, মুসলমানদের খোজা, মেমন, বোম্বাই-এর কামাঠি, কচ্ছি-মেমন (যাহারা ইচ্ছা করিলে ১৯২১ খৃঃ Act No. XLVI আইনানুসারে মুসলমান আইন গ্রহণ করিতে পারে), অমৃতসরের ত্রাখানেরা, অমৃতসর জেলার সোধিক্ষেত্রী, পাঞ্জাবের সাইগল ক্ষেত্রী, লাহোরের সারিন ক্ষেত্রী, রাওলপিণ্ডির কৌনত্রিলার ক্ষেত্রী, সিন্ধুর কচ্ছি-মেমন, আসামের কোচ, মোজাফরগড় জেলার কানগড়ের ভাটিয়া প্রভৃতিগণ দায় (inheritance), এবং উত্তরাধিকার (succession) বিষয়ে হিন্দু-আইন দ্বারাই শাসিত। এতদ্ব্যতীত 'ব্রাহ্ম'গণও হিন্দু-আইনের অন্তর্গত (৯)।

বর্ত্তমান ইংরেজশাসনের আইনানুসারে অন্যধর্ম্ম ছাড়িয়া কেহ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে তাহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে অধিকারচ্যুত হইবে না। খৃষ্টান পিতার ঔরসে হিন্দু-মাতার গর্ভে অবৈধভাবে জাত পুত্রগণ হিন্দুভাবে বর্দ্ধিত হইলে হিন্দু-আইনের অধীন হইবে (১০)।

হিন্দু-আইনের উৎপত্তি ও বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে এই স্বল্পপরিসর আলোচনা হইতে ইহা নিরূপিত হয় যে, হিন্দু-আইন মূলতঃ রীতি ও আচার-এর (custom and usage) উপর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্বারা ইহা ধরা পড়ে যে, ধর্ম্ম-আইন (স্মৃতি) দলের লম্বা-চওড়া দাবী কেবল পুঁথিতেই আবদ্ধ, বিচারালয়ে গ্রাহ্য নয়। ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে জাতিতাত্ত্বিক চাবিকাঠি দ্বারা আইন-বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইবে যে, কতকগুলি টটেমিক এবং তৎপূর্ব্ব যুগের ম্যাজিক ও ঝাড়ন (magic and witchcraft) বিশ্বাসের অন্তর্গত রীতি ও আচার কৌমগত হইয়া পরে ধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে (ইহা সকল ধর্ম্মেই হইয়াছে)। যাহা এককালের কৌমগত রীতি ও আচার ছিল তাহা ঈশ্বরের আপ্তবাক্য (Revelation) বলিয়া ধর্ম্মের অনুশাসন মধ্যে

৯। Sastri—Pp. 45-48.

১০। Mulla—P 5.

স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং উহার অনেকগুলি আজও লোক-পীড়নের যন্ত্রস্বরূপ কার্য্য করিতেছে: যেমন, উপরোক্ত কোন কারণবশতঃ উদ্ভিজ্জ বা পশু অথবা মৎস্য আর্য্যভাষী কৌমগুলির মধ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। এই কৌমগুলি সভ্যতার উন্নততর স্তরে উন্নীত হইয়াও সেই আচার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; আর যখন অনার্য্যভাষী কৌমেরাও আর্য্যসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল, তখন তাহাদের কৌমগত রীতি ও আচার সমূহও হিন্দুসমাজে আসিতে লাগিল এবং সেইগুলি 'লোকাচার' বলিয়া গ্রাহ্য হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, স্মৃতিসমূহে দেশের বিভিন্নাংশে বিভিন্ন রীতি ও আচারের কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং সেইগুলিকে 'লোকাচার' বা 'দেশাচার' বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্থানীয় 'লোকাচার'কে সমূলে উৎপাটন করে নাই, অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম তাহা স্বীয়ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল। এই প্রকারে বিভিন্ন কৌমগত বা জাতিগত রীতি ও আচার আজ বিভিন্নাকারে নানাভাবে রক্ষিত হইতেছে। দৃষ্টান্ততঃ মহেন-জো-দাড়োর ভূগর্ভে আবিষ্কৃত খোদিত দ্রব্যসমূহ হইতে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বৃক্ষপূজা, জন্তুপূজার চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ অন্যতম। ইহা টটেমবাদের নিশ্চিত প্রমাণ। কিন্তু 'আর্য্য-সংস্কৃতি' নামে যাহা ভারতে প্রচারিত হইল তন্মধ্যে বিভিন্ন বৃক্ষপূজার সঙ্গে অশ্বত্থকে পাওয়া যায়। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে অশ্বত্থ, তুলসী, আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতে দেখা যায়, আর এইসব পুস্তক অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। মৎস্যভক্ষণ মনুতে নিষিদ্ধ (মৎস্যাৎ সর্ব্বমাংসাৎ) হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গলায় উহার সর্ব্বসাধারণভাবে প্রচলন রহিয়াছে। ইহা বাংলার মূলজাতিগত রীতি। এইজন্যই বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদের অন্যান্যস্থানের ব্রাহ্মণেরা ঘৃণা করিয়া থাকে, কারণ মনু ব্রাহ্মণকে মৎস্যভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ নয়, কারণ জাতিতাত্ত্বিক তথ্যের তুলনামূলক বিচার হইতে ইহা বোধগম্য হয় যে, আদিম ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষী কৌমেরা মৎস্যভোজী ছিল না (১১)। তাহারা পশুপালক ছিল—সুতরাং মাংসভোজী ছিল না এবং

১১। O. Schrader—Reallexicon der Indogermanixshe Altertuemers Kunde, Pp. 243-244.

একটা ঋতুতে পশুহনন করিয়া দেবতাদিগের নামে উহা উৎসর্গ করিত। ভারতে এই উৎসবই 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' নামে পরিচিত হয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন (১২)। আর্য্যদের মৎস্যভোজনে এই বিরতিই মার্শালের নিকট একটা বড় যুক্তি হইয়াছে যে, মহেন-জো-দাড়োর লোকেরা বৈদিক-আর্য্যজাতীয় ছিল না। ইউরোপ ও আমেরিকার অন্ততঃ টিউটনিকভাষী জাতিগুলি 'শুক্রবার' মৎস্যভোজন করেন, ইহাই প্রথা। এই বিষয়ে জনশ্রুতি এই যে, লোকে মৎস্য ভক্ষণ করিত না বলিয়া মৎস্যবিক্রেতাদের ব্যবসা চলিত না। তাহারা কোন 'সন্ত'কে (Saint) ইহার প্রতিকার বিধানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে। তিনিই এই ব্যবস্থা প্রদান করেন যে, অন্ততঃ 'শুক্রবারে' সকলেই মৎস্যভোজন করিবে। এই গল্পের মূলেও আর্য্যভাষীদের মৎস্যভোজনে বিরতির কথাই প্রকাশ পায়। তবে ইহাও সত্য যে, বৈদিক ক্রিয়ার মধ্যে মৎস্য দ্বারা (যজুর্ব্বেদ, ২৪—২০ ; এতদ্ব্যতীত তথায় কাঁকড়া, কুলীয়পান, শিশুমার, মণ্ডুক, কুম্ভীর প্রভৃতি বলিদানের কথা আছে ; ঋগ্বেদেও অনেক সূক্তে মৎস্যের উল্লেখ আছে) যজ্ঞ করিবার উল্লেখ আছে। তবে হয়ত ভারতীয় আর্য্যেরা প্রথমযুগে মৎস্যভোজী ছিলেন না, সেইজন্য সেই প্রাচীন কৌমগত সংস্কার মনুতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া আজ প্রাদেশিক কটাক্ষপাতের বিষয় হইয়াছে !

এই প্রকারের কোন কারণবশতঃ আমিক্ষা (পণির) মনু কর্ত্তৃক পরিত্যাজ্য হইয়া আজ ধর্ম্ম মধ্যে স্থান পাইয়াছে (বাঙ্গলার হিন্দু ব্যতীত অন্যান্যদের কাজে ছানা অব্যবহার্য্য ; এখানেও আবার ব্রাহ্মণেরা হালে ছানা গ্রহণ করিতেছেন (১৩)। সমুদ্রগমনে নিষেধও এই প্রকারের কারণ-প্রসূত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ইউরেশিয়া ভূভাগের মধ্যস্থলের কোন স্থানে ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষী কৌমদের উদ্ভব হয়। সেইজন্যই তাহারা সমুদ্রগমন

১২। জাতিতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এই প্রথা প্রাচীন Norseদের মধ্যে ছিল এবং সাইবেরিয়ার তাতারদের মধ্যে আছে (Vide W. Koeppers, Die Indo-germanische Frage in Lichte der historischen Voelker Kunde—Anttropos, BK. 30. 1935)

১৩। বাঙ্গলার 'ছানা' জার্ম্মাণ Pot Cheese এর অনুকরণ মাত্র। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, দেশের কারিগরদের ইহা প্রস্তুতকরণ শিক্ষা দিয়াছিল।

ব্যাপারে অনভ্যস্থ ছিল ; উহারাই ফলে বোধ হয়, ভারতীয় আর্য্যদের সমুদ্রাতঙ্ক ছিল (বৌধায়নে সমুদ্রগমনকারীদের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে)।

এই জলাতঙ্ক কেবল ভারতীয় আর্য্যদের নহে, কোন কোন গ্রীক্ কৌম ও রোমানদের প্রথম অবস্থায় এবং পারসীকদেরও ছিল (১৪)। পারসীকেরা আজ পর্য্যন্ত সমুদ্রগমনকারী একটি শ্রেণী উদ্ভব করিতে পারে নাই। মুসলমানযুগেও তাহাদের জলাতঙ্ক সম্পর্কে কবি হাফিজের কবিতা প্রামাণিক। ইনি বাঙ্গলা বা দাক্ষিণাত্যের কোন সুলতান কর্ত্তৃক ভারতে আমন্ত্রিত আমন্ত্রিত হয়েন এবং পাথেয়ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু জাহাজে আরোহণ-কালে সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গমালা দর্শনে ভয়ে সুলতানকে এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (১৫)। কিন্তু ভারতে কলিতে সমুদ্রগমন নিষেধ রূপ একটা শ্লোক অপেক্ষাকৃত হালের সংস্কৃত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান সময়ে কত লোককে যে জাতিচ্যুত করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই এবং মুসলমান প্রাধান্যকালে এই রীতি ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত করিবার ফলে হিন্দু-নাবিকশ্রেণীগুলি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আজ তাঁহারা 'বদর বদর' নাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করেন। পুরোহিতেরাই যুগে যুগে প্রাচীন সংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সেইজন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রে সমুদ্র-গমনের বিরুদ্ধে নিষেধ শোনা যায়। কিন্তু হিন্দু প্রাচীনকালে সমুদ্র গমন করিত, গোঁড়া আর্য্যামীর দোহাই মানেন নাই।

এই প্রকারে 'সতীদাহ' যাহা একটা মূলজাতিগত (racial) প্রথা ছিল (১৬) এবং কোন কোন বৈদিক আর্য্য-কৌমের মধ্যে রাজবংশে কখন ঘটিত হইত, তাহা ধর্ম্মের অবশ্যকরণীয় বলিয়া ব্যবস্থিত হয় ; ফলে কত বিধবাকে যে নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়! আবার কৌটিল্যে এইরূপ দেখা যায়, বৎস, ষাঁড়, দুগ্ধবতী গাভী নিহত করিলে ৫০ পণ দণ্ড হইবে ; কিন্তু গরু (cattle), হস্তী, মৎস্য, প্রভৃতি দুষ্ট প্রকৃতির হইলে

১৪। O. Schrader—Op. cit. P. 712

১৫। Browne, "History of Persian Literature."

১৬। এই প্রথা ইউরোপের প্রাচীন Norse এবং তাহাদের জ্ঞাতি রুশীয় Varangians শ্রেণীর মধ্যে ছিল। ইহা কেবল Viking অভিজাতদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

রাজার খাসজমির (Forest Reserve) বাহিরে ধরিয়া মারা যাইতে পারে (১৭)। বোধ হয়, কার্য্যোপযোগী গৃহপালিত গবাদি হত্যা করা হইত না। মেগাস্থিনিস্‌ও বলেন, ভারতীয় দার্শনিকেরা (ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়) মাংস খায়, কিন্তু যেসব পশু শ্রমে নিযুক্ত হয় তাহার মাংস খায় না (Fragments XL) (১৮)। সম্রাট্ অশোক জীবহত্যা নিবারণার্থ যে অনুশাসন প্রদান করেন তন্মধ্যে অনেক পক্ষী, চতুষ্পদ জন্তু ও মৎস্য হত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং এই সঙ্গে কুক্কুটকে খাসি করাও (caponed) নিষেধ করা হইয়াছে (১৯)। বৈদিকযুগ হইতে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ও উত্তর রামচরিতে গোমেধ যজ্ঞ ও গোমাংস ভোজনের কথা উল্লেখ আছে [শতপথ ব্রাহ্মণে ৩।১।২ যাজ্ঞবল্ক্যের নরম গোমাংস ভক্ষণে প্রীতিলাভের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; চরক ২৭শ অধ্যায় এবং শুশ্রুতে (৪৬শ অধ্যায়, ৮৯ শ্লো) রোগবিশেষে গোমাংস ভক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। বৌদ্ধ দিঘনিকায় সূত্তে (Newmann's Translations, Vol. II. P. 448. No. 5) গোমাংসের কষাইদের কথা উল্লেখ আছে] কিন্তু কবে ইহা নিষিদ্ধ হইল এবং গরু দেবতায় উন্নীত হইল, তাহা আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত। কেহ কেহ অনুমান করেন, কোন অনার্য্যভাষী জাতি হিন্দু হওয়ায় তাহাদের গরু টটেমও হিন্দুর দেবতায় রূপান্তরিত হয় এবং টটেমবাদীয় বিশ্বাসানুযায়ী উহার মাংস অভক্ষণীয় বলিয়া বিহিত হয়। কিন্তু এবম্প্রকারের যুক্তির পশ্চাতে উপযুক্ত প্রমাণাভাব। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট হইতে এমন কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই যাহা ভারতীয় আদিম জাতিসমূহের মধ্যে গরুকে দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (২০)। পক্ষান্তরে কৌটিল্য ও মেগাস্থিনিস্ হইতে জানা যায়

১৭। Kautilya—tr. by Shama Sastri, P 123.

১৮। McCrindle-Judice of Magasthenise collected by Schwanbeck 1846. P. 99.

১৯। Corpus Inscriptionum Indicarum, Edited by E. Hullzsch, Vol. I. Fifth Pillar Edict—Delhi-Topra.

২০। এই বিষয়ে Dalton, 283 ; I. A. i, 348f. এবং W. Crook-এর প্রবন্ধ in Hastings Encyclopaedia, Vol. 5, P 8 দ্রষ্টব্য।

যে, কার্য্যোপযোগী গবাদি হত্যা নিষিদ্ধ ছিল, পরে আবার এই সম্পর্কে অশোকের কড়া হুকুম জাহির হয়। যদি 'অর্থশাস্ত্র' পুস্তক মৌর্য্যযুগের রাজকীয় Civil Law হয়, তাহা হইলে অশোকের অনুজ্ঞা তৎসহ সংযোজিত হইয়া লোকের অভ্যাস পরিবর্ত্তিত হয় এবং উহা অবশেষে একটা সংস্কার মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হয়। পরে এই সংস্কারটি অহিংসবাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পুস্তকে ধর্ম্মের অনুশাসনরূপে প্রবিষ্ট হয়, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বোধ হয়, প্রাচীনকাল হইতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বা মানবের কর্ম্মের জন্য ব্যবহারযোগ্য পশুগুলি হত্যা করা রাজকীয় আইন দ্বারা নিবারিত হওয়ার প্রথা ছিল, এবং বহুপরে তাহা ধর্ম্মরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু আজ ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একটা বড় খোঁটা হইয়াছে। আরব সাম্রাজ্যের মেসোপোটামিয়া ক্রমাগত মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে শুনিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা 'আল হাল্লাজ' কৃষিভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত তথায় 'গোবধ' নিষিদ্ধ করিয়া দেন। (২১)। এই প্রকারের হিন্দুর নিষেধ আইনের অনুরূপ নজীরও ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে। হিন্দু গো-ভক্ষণ করে না, এই প্রসঙ্গেই আলবেরুণী এই সংবাদ দিয়াছেন।

এবম্প্রকারের হিন্দুর অনেক সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক আইনের উল্লেখ করা যায়, যাহা এককালে কৌমগত রীতি ও আচার ছিল এক্ষণে তাহা হিন্দুর Positive Law রূপে দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুর আইন বিষয়ে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, নানা কৌমগত প্রথা এক্ষণে আইনরূপে সুদৃঢ় হওয়ায় তাহা আজ অপরিবর্ত্তনীয় হইয়াছে এবং আদালতে সেগুলি হিন্দুর আইনরূপে গ্রাহ্য হইতেছে। আজকালকার হিন্দু তাহা হইতে বিবর্ত্তিত হইয়া বাহির হইতে পারিতেছে না। বিভিন্ন রীতি ও আচারকে কখনও একীভূত করা হয় নাই। সমগ্র সমাজের জন্য যে এক রীতি ও আইন প্রয়োজন, যদ্দ্বারা বিভিন্ন মূলজাতীয় লোক একত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া একজাতীয়তা প্রাপ্ত হইবে তাহা বোধ হয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা উপলব্ধি করেন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মের কতকগুলি বাহ্যিক মোটা-মোটা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান (দশকর্ম্ম, ব্রতাদি, পূজাপার্ব্বণ দেবদ্বিজে ভক্তি প্রভৃতি) দ্বারা

২১। Alberuni—tr. by Sachau Vol. II. Ch. I. XVIII. p. 153

সকলকে একীভূত করিয়া 'কৃষ্টিগত একজাতীয়তা' (cultural nationality) উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যেসব অর্থনীতিক ও সামাজিক রীতি এবং আচার ব্যবহারের 'একত্ব' দ্বারা সকল প্রকারের লোক এক-জাতিগত মনোবৃত্তি (national mind) প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা হিন্দু-সভ্যতার মধ্যে পাওয়া যায় না। এইজন্য আজ হিন্দু শতধাবিচ্ছিন্ন বলিয়া কথিত হয়। হয়ত দীর্ঘকাল স্থায়ী একটা কেন্দ্রীভূত প্রবল নিখিল-ভারত রাষ্ট্র বিবর্ত্তিত হইলে তাহা সম্ভবপর হইত; কিন্তু হিন্দু-রাষ্ট্রগুলি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই; যখন মৌর্য্য ও গুপ্তসাম্রাজ্যের ন্যায় রাষ্ট্র কিয়ৎকাল স্থায়ী হইয়াছিল তাহার ফলে সর্ব্ব-প্রাদেশিক হিন্দু-একত্বও প্রাচীনকালে কিছুটা দেখা গিয়াছিল এবং উহার জের এখনও চলিতেছে! কিন্তু স্থায়ী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয়তার অভাবে এবং হিন্দুধর্ম্মীয় ব্যবস্থার ফলে লোকাচার, দেশাচার ও কুলাচারই আজ পর্য্যন্ত বলবৎ হইয়া আছে। আজপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও তৎপ্রসূত সমাজ তাহার কৌমগত নরতাত্ত্বিক ভিত্তিতেই অবস্থিত আছে, তাহার ঊর্দ্ধে এখনও বিবর্ত্তিত হয় নাই। এইজন্যই প্রাচীন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি আজ হিন্দুর একত্ববোধের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়াছে।

প্রাচীন ইরাণীভাষীরা নানা উপভাষা ও আচার-ব্যবহারে বিভক্ত ছিল, কিন্তু জারুতুষ্ট্রের ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার এবং হাকামিনি সম্রাটদের শাসন ও সেইসব সংস্কার সর্ব্বজনীন করিয়া একটা অখণ্ড ইরানীভাষাভাষী-জাতীয় বোধের সৃষ্টি করে; ম্যাসিডোনিয়ানদের দ্বারা সেই সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলেও পারিসীকদের একত্ববোধ বিলুপ্ত হয় নাই। তাই সাসানীদের অধীনে পারস্য আবার স্বাধীন সাম্রাজ্য উদ্ভূত করিলে পারস্যের সম্রাট প্রাচীনকালের ন্যায় পুনরায় 'সাই-ইন-সাহইরান' বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে সক্ষম হয়। সেই প্রাচীন-কালের সৃষ্ট ইরানী-অখণ্ডতার জের আজও চলিতেছে। অন্যদিকে বারটি কৌমে বিভক্ত ক্ষুদ্র ইহুদিজাতি একত্ব সম্পাদন করিয়া এক ইহুদীতে (Judea) সম্মিলিত-রাষ্ট্র সংগঠন করিয়া এবং কৌমগত বারটি জাবে (Javeh) দেবতার বিসর্জ্জন দিয়া এক সর্ব্বশক্তিমান 'জিহেভা' ভগবান সৃষ্টি করে। এই প্রকারে ইহুদি-একজাতীয়তা বিবর্ত্তিত হইয়া যে-ছাপ সেই জাতির মনে অঙ্কিত করিয়া দেয় তাহা আজও মুছিয়া যায় নাই। আবার চীনের

সম্রাট হুয়াং-টি চিন্ ও কন্‌ফুসীয় আইন চীনের বিভিন্নজাতিকে এক করিয়াছে। পক্ষান্তরে, গ্রীস অখণ্ড একজাতীয়তা বিবর্ত্তন করিতে পারে নাই; তাহার ধর্ম্ম ও রীতি-আচার সমূহে সেই অবস্থাই প্রতিবিম্বিত ছিল। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বিদেশী মেসিডোনিয়াও পরে রোমের অধীনে আসিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু রোম যাহার কোন এক ঐতিহাসিক গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "রোম সাম্রাজ্য যাহা প্রথমে অতি ক্ষুদ্র ছিল এবং শেষে এত বিরাট সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হয় যে ইতিপূর্ব্বে পৃথিবী কখনও তাহা দেখে নাই।" (২২), তাহা নানাজাতি ও সভ্যতার নানাস্তরে অবস্থিত লোক দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও আইন এবং রাজনীতিক অধিকারও বিভিন্ন প্রকারের ছিল। কেবল কঠোর রোমীয়-শাসন তাহাদের একচ্ছত্র শাসনাধীন করিয়া রাখিয়াছিল। প্রত্যেক জাতি নিজের রীতি ও ব্যবহার দ্বারাই শাসিত হইত—ইহাকে তাহার Jus Gentium (কৌম বা জাতিগত আইন) বলা হইত। কিন্তু জাতিগুলিকে একীভূত করিবার জন্য সম্রাট জুস্‌টিনিয়ান্ একটি নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া সকলকে সমান রোমীয় অধিকার প্রদান করেন; এতদ্বারা সকলশ্রেণীর নাগরিক এক রোমান আইন দ্বারা পরিচালিত ও শাসিত হইত। ইহাই বিখ্যাত Code Justinian. কথিত আছে, বিভিন্ন শাসিত জাতিদের Jus Gentium তুলনামূলকভাবে বিচার করিয়া উক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়। এই রোমীয় আইন আজ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় আইন সমূহে প্রতি-বিম্বিত হইতেছে। এই প্রকারে এক রাজনীতিক অধিকার ও আইন দ্বারা ক্ষুদ্র রোম প্রথমে ইতালীতে পরিণত হয়; অবশেষে তিনটি মহাদেশব্যাপী বিস্তৃত আকার ধারণ করে। আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, রোমীয় জাতি মৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু রোম তাহার আইনের ভিতর দিয়া আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে দেখা যায়, বৈদিককৃষ্টি-প্রসূত যেসব ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে তাহার কোনটিই বিভিন্নজাতীয় ভারতবাসীদের মধ্যে একজাতীয়তা-বোধ আনয়ন অথবা জাগ্রত করিতে পারে নাই। প্রত্যেক জাতি বা জনপদের

২২। Cornelius Nepos, "History of Rome"

Jus Gentium পৃথক হইয়া আছে। এতদ্ব্যতীত কুলগত রীতি এবং আচারও আইনের স্থান গ্রহণ করিয়া আছে (২৩)। এতদ্বারাই হিন্দু তাহার শতেক গুণ সত্ত্বেও আজ শতধাবিচ্ছিন্ন এবং এই অবস্থা চিরকালই স্বদেশপ্রেমিক নেতাদের একটা গুরুতর সমস্যার বিষয় হইয়া আছে।

এই সকল কারণবশতঃ ব্রাহ্মণধর্ম্মকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা Anthropological Religion বলিয়াও অভিহিত করেন (২৪)। এই-ধর্ম্মপদ্ধতি-নিঃসৃত সমাজনীতি আজও হিন্দুসাধারণকে শাসন করিতেছে, এবং এইজন্যই ভারত এতদিন সভ্যতার নূতনতর স্তরে উঠিতে পারে নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

২৩। Sastri—Op. cit. p. 28.

২৪। এই সম্পর্কে MaxMueller, "Anthropological Religion এবং August Comte,—"Sociologie" দ্রষ্টব্য।

সাম্যধর্ম্ম

(Edward Carpenter-এর The Law of Equality

কবিতার অনুবাদ)

দীর্ঘকাল ধ'রে সাম্যের ধর্ম্মকে কখনোই উপেক্ষা করতে
পারোনা তুমি।
আর সবাইকে বঞ্চিত কোরে যা তুমি নিজের জন্য আত্মসাৎ
করবে—পরিণামে তাই তোমাকে দীনতর কোরে তুল্‌বে।
এখন যা তুমি দান করবে—একদা নিশ্চয়ই তা তুমি ফিরে পাবে।
যে মুহূর্ত্তে তুমি নিজেকে সকলের চেয়ে বড় মনে করলে সেই
মুহূর্ত্তে তুমি নিজেকে সকলের নীচে নামিয়ে দিলে;
আবার সকলের সেবায় আত্মনিয়োগ কর্‌বে যে, বহুজনের
কল্যাণে যে হবে ব্রতী—সেই হবে সকলেরই নেতা, সকলের
শিরোমণি।

কেবল নিজের জন্য জীবনের প্রাচুর্য্য কামনা কোরোনা—
কারণ তার মধ্যে মৃত্যুর অভিশাপ;
কত আনন্দে এবং কত সার্থক ভাবে নিজের জীবনকে সকলের
মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারো—তারই সাধনায় ব্রতী হও।
দেখবে তখন প্রতি প্রভাতে উদয়গিরির ওপার থেকে চির-
সবুজ প্রাণ এসে তোমাকে বরণ করবে।
শিশু যেমন কোরে হাঁট্‌তে শেখে মানুষকে তেমনি কোরে
মর্‌তে শিখতে হবে—অত্যন্ত সহজে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক
ভাবে।
জলধারাকে যেমন আঙুল দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না তেমনি
সাম্যের জীবন কখনো কবরের মধ্যে নিঃশেষ হ'তে পারে না
—সমস্ত বাধাকে অতিক্রম কোরে সেই জীবনের ধারা ছড়িয়ে
পড়ে দিগ্বিদিকে।

পৃথিবীর সম্পদরাশি নিজের ভোগের জন্য তুমি ছিনিয়ে নিতে
পারো প্রতিষ্ঠালাভের উদগ্র বাসনায়, মানুষের কাছ থেকে
করতালি পাওয়ার লোভে—কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য ?
অচিরে তুমি বুঝ্‌তে পারবে—এমন কোরে প্রকৃতিকে ফাঁকি
দেওয়া অসম্ভব ; হাজার পরিশ্রম করলেও জলকে কখনো
পাহাড়ের উপর পানে তুমি বইয়ে দিতে পারবে না, এর জন্য
সারারাত্রি যদি তুমি জাগরণে কাটাও তবুও পারবে না।
অন্যদের দাবী ঠিক তোমার দাবীর মতোই ন্যায়সঙ্গত।
তোমার কর্ম্মক্ষেত্রে তুমি যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করছো তাদের
নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে তারাও সেই একই গৌরবের অধিকারী।
তোমার কাছে তোমার নিজের জীবন যেমন প্রিয় তাদের
জীবনও তেমনি প্রিয় এবং নিকট হওয়া উচিত।
যে সকল শৃঙ্খল তোমাকে বেঁধে রেখেছিল, যে সকল দুশ্চিন্তায়
এবং উদ্বেগে তোমার চিত্ত ছিল ভারাক্রান্ত তাদের সবাইকে
একে একে ছিন্ন ক'রে,
নিজেকে নিরাপদ রাখবার জন্য তুমি যে দুশ্চেদ্য কৃত্রিম বর্ম্ম
রচনা করেছিলে তারই দুর্ব্বহ বোঝা তোমাকে ভারাক্রান্ত
ক'রে শত্রুর অসহায় লক্ষ্যবস্তু ক'রে রেখেছিল—
এ সমস্ত ফেলে দিয়ে এবং আপন স্বরূপকে ভালো ক'রে
জেনে নিয়ে
তুমি মুক্তির পরমানন্দে উত্তীর্ণ হ'য়ে যাও সাম্যের মহা-
পারাবারে—তুমি শাশ্বত জীবনের অধিকারী হও।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

লক্ষ্মীছাড়ী

(৯)

ছেলেপুলের দৌরাত্ম্যি চাঁপাকে যেন ঘিরে রেখেচে। যেমনি শশী, তেম্‌নি রাখালী আর তেমনি ঐ একরত্তি পুঁটু।

সর্ব্বদাই শশীর হাতে একখানা দা। রাম দুই সাড়ে তিন, বলেই ও এক কোপ মারবে। তা যেখানেই হোক। দরজার কপাট থেকে সুরু করে দাওয়া, দাওয়ার খুঁটি, উঠান, গোয়ালের ছ্যাঁচার বেড়া, বাইরে নারকেল গাছের গুঁড়ি এবং কচু গাছে পর্য্যন্ত ওর দা-কাটা দাগ লেগে আছে।

ঘর দেখবার সময় চন্দোরের নেই। অথচ দুর্গাকে ছেলেগুলো মানতেই চায় না। ও কেবল চেঁচামেচি করে, ছেলেগুলোকে পিটে গালিগালাজ করেই ঝাল মেটায়। চাঁপার কাছে কিন্তু সব উল্টো ; ছেলেপিলেরা ওর কাছে আশ্চর্য্য রকম বশ। ওর কথায় ওঠে বসে। তার কারণ আছে।

চাঁপা তো নিজেই দা নিয়ে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘোরে। শশীকে জিগ্যেস করে, শশী কোন গাছটা কাটি বলতো ?

শশীর উৎসাহ আর ধরে না। গদগদ হয়ে বলে, দিদি, ঐ আতা গাছটা।

চাঁপা বলে, দূর, দেখচিস্‌ না, আতাগুলো ডেঁশেচে। আর কদিন বাদেই পাকবে। এখন কখন ওর গায়ে হাত দিতে আছে। বাপ্‌রে, ফলগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে।

শশী একটু দমে গিয়ে বলে তবে দিদি ঐ কাঁঠালি চাঁপার ঝাড়টা।

চাঁপা বলে, ধ্যেৎ বোকা। ওর ডাল ছাঁটলে ফুল ফুটবে কোথায়।

নিরুৎসাহ হয়ে শশী বলে, তবে আর কি হবে।

চাঁপা বলে কেন ওই চালতার ডাল।

শশী সোৎসাহে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি, তাই। ওর পাতাগুলো কেমন কোঁকড়া, আমি নোবো।

চাঁপা নীচু ডালে কোপ লাগায়। বলে, এই শশী, এসব নিরেট গাছ কাটতে কখনো ভাল লাগে। শব্দ হয় না, কিছু না।

শশী উৎসাহ পেয়ে বলে, তবে দিদি বাঁশ গাছ।

চাঁপা প্রশংসার দৃষ্টিতে বলে, ওঃ শশী, ঠিক বলিচিস্।

মধ্যাহ্ন দুপুরে বাঁশের গায়ের কোপ স্তব্ধ গ্রামের বাতাসে ঝঙ্কার দিয়ে বেজে ওঠে। প্রতিধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে কত দূর ভেসে যায়। চাঁপা আর শশী নীরবে কান পেতে তাই শোনে। তারপর আবার ঘা। শব্দ কেঁপে ওঠে। শশী চাপাগলায় বলে, দিদি গোঁসাইরা জানতে পারবে।

চাঁপার গ্রাহ্য নেই।

শব্দ পেয়ে সত্যিই গোঁসাইঠাকুর বাঁশ বাগানের ওপার থেকে হাঁক পাড়ে, কে রে বাঁশ কাটে?

চাঁপা বলে চুপ।

শশীকে টেনে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে মাথা নীচু করে বসে থাকে। এই সময়টা ওদের ভারি উৎকণ্ঠায় কাটে।

শশী বলে, দিদি, আসচে বোধ হয়। শুকনো বাঁশ পাতার মড়মড়ানি শব্দ শুনতে পাচ্চি যেন। চাঁপা বলে, দূর, এখানে ঢুকলে চান করতে হয়।

শশী তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করে, তাহলে আমরা?

চাঁপা বলে, আমরা কাঁচকলা। কেউ জানতে পারলে তো।

এই সবেতে শশী দেখেচে, চাঁপা বরঞ্চ ওর সঙ্গীই। তা ছাড়া মুখ চালাবার এতরকম কলা কৌশল চাঁপা জানে, যে শশীর তো ওর প্রতি বিশেষ একটা সম্ভ্রম মনে মনে আছে। কারণ,—কোথা থেকে খুঁজে খুঁজে যে চাঁপা কচি ধানের শীষ টিপে দুধ খায়, পদ্ম ফুলের কোষ চিরে মুড়ি বার করে—এই ও ভেবে পায় না। নলপানা ফুলের উল্টোদিকে মুখ দিয়ে টেনে টেনে মধু খাওয়া তো যখন তখন। শাক পাতা যে ও কত রকম চিবোয় তার ঠিক নেই। কোথায় গিমে শাক, কোথায় ব্রাহ্মীশাক, সব চাঁপার চেনা। ও শশীকে বলবে, খা না, শরীরের পক্ষে ভারি ভাল। ও সবই জানে, কোনটায় ঘুম হয়, কোনটায় গলার স্বর মিঠে হয়। ত্যালাকুচো থেকে আরম্ভ করে কামরাঙা বকুল বোঁচ প্রভৃতি সব সন্ধান ওর কাছে। এই সব নানা কারণে, শশী ওর নিতান্ত অনুগত।

রাখালীটার মুখে আধো আধো কথা। চাঁপা বলে, ছাখো বৌ, মেয়েটার পেটে পেটে বুদ্ধি। ঐ বয়েসে অত বড় স্যায়না মেয়ে আমি আর দেখিনি।

ঘুম ভেঙে চাঁপা ছাখে, ওর চুলের কাঁড়ির সঙ্গে শনের দড়ি জড়িয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধবার চেষ্টা করচে। ও গেরো দিতে শেখেনি। তাই দড়িটা নিয়ে শুধু শুধু খানিকটা জড়িয়েছে বাঁশের খুঁটির গায়ে।

ঘুম ভেঙে চাঁপা বলে, ও মুখ পোড়া মেয়ে। দাঁড়াও তো। বলে চুলের জট খোলে। রাখালী কলকলিয়ে হেসে ওঠে। দৌড়ে পালায় অন্যদিকে। ভাবে খুব একটা মজা হয়েচে। তাই তাড়াতাড়ি শশীকে ডাকে, থতী ও থতী।

দুর্গা তেড়ে আসে। ছেলেপুলেদের এ সব আস্পদ্দা ও ভালবাসে না। রাখালী ভেবে পায় না কোনদিকে যাবে। একদিকে মা অন্যদিকে দিদি। ও যেন চাঁপার চোখরাঙানির ভেতোর একটা আশ্রয়ের ছায়া চকচক্ কোরতে দেখতে পায়। তাই এক দৌড়ে ঝাপিয়ে এসে পড়ে চাঁপার বুকের ওপর। চাঁপা আর কি করে, ওকে বুকে চেপে নেয়।

দুর্গা বললে, ছোট্‌গিন্নি, ওকে ছেড়ে দাও তো। দি ঘা কতক। বড় বাড় বেড়েছে।

রাখালী দুহাতে চাঁপার গলা জড়িয়ে ধরে মুখটা ফিরিয়ে পেছনে চায়। মাকে চোখ পাকিয়ে তেড়ে আসতে দেখে, রাখালী ভয় পাওয়ায় চোখ চাঁপার দিকে তুলে কাঁদ কাঁদ গলায় বলে, ডিডি।

চাঁপা ওকে বুকে চেপে নিয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো। এক দৌড়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে কদমতলায় এসে উপস্থিত। মা হেরে গেল দেখে রাখালী হেসে কুটিপাটি।

সন্ধ্যের সময় চাঁপা হয়তো বা দাওয়ায় একটু পা ছড়িয়ে বসেচে, ওমনি রাখালীটা এসে ওর বুকের কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়বে। বলবে থতী, আমি কই?

শশী রান্না ঘরে ক্ষিধের বায়না ধরেছে। রাখালীর গলা পেয়ে ওর লুকো-চুরির নেশা লাগল। তাড়াতাড়ি রান্না ঘরের দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালে।

দেরী হচ্ছে দেখে, রাখালী কাপড়ের ফাঁক দিয়ে মুখ বার করে বলে, থতী, টু-উ।

সাড়া পেয়ে শশী বুনো বাঘের মতন চাঁপার ঘাড়ে ঝাপিয়ে পড়ল। কাপড় শুদ্ধ রাখালীকে চাঁপার বুকের ওপরেই জড়িয়ে ধরে। রাখালী খিল খিল করে হেসে ওঠে।

বৌ রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে বললে, ছোটগিন্নি ওই দস্যিগুলোর কুস্তিতে তোমার লাগে না। দাও না দু-ঘা।

চাঁপা ওদের দুজনকেই দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে, লাগবে কেন বৌ, ওরা কচি ছেলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

পুস্তক-পরিচয়

প্রভাত-রবি

"প্রভাত রবি"—শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। পৃঃ ২৫২।

প্রকাশনী, ১৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের কথা লইয়া লিখিত এই বইখানি পড়িয়া খুব খুসী হইয়াছি। লেখক কিছুকাল শান্তিনিকেতনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিযুক্ত "অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহকারী গবেষক" রূপে কাজ করিয়াছিলেন,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিল, সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে লেখক শান্তিনিকেতনে প্রেরিত হন, এবং তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের পুরা সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন ও নানা বিষয়ে তাঁহার শান্তিনিকেতনে অবস্থানকে বিশেষ সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গ্রন্থকারের এই প্রথম অর্ঘ্য আমাদের দেশের পাঠক-সমাজে তিনি উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব কি ভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার একটী রোচক এবং যতদূর সম্ভব তথ্যপূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যাইবে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য জীবনী এবং চরিত্র-চিত্রণ; জীবনী লিখিতে গেলে যে-সকল আবশ্যক সংবাদের বিচার বিশ্লেষণ এবং উদ্ঘাটন প্রকাশন অপেক্ষিত, সে দিক্ দিয়া কোনও ত্রুটী এর নাই; ইহাতে কবি-জীবনীর কতকগুলি খুঁটীনাটী কথা যাহা সাধারণ্যে প্রচলিত নাই বা সকলের জানা নাই এবং কবির সাহিত্যিক কৃতির কতকগুলি আধার বা পটভূমিকা সম্বন্ধে অনুসন্ধান যাহা কবির রচনার উপর আলোকপাত করে—তাহাও আছে, এবং সেই হেতু উহাতে রবীন্দ্রনাথের জীবন-চরিতের প্রথম পর্ব্ব সম্বন্ধে প্রামাণ্যতা গুণ আসিয়াছে। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের অভিব্যক্তি গ্রন্থকার বিভিন্ন অধ্যায়ে আমাদের সামনে একখানি চিত্রবহুল পটের মত

খুলিয়া ধরিতেছেন, ইহাতে অতি সহজে রবীন্দ্র-অবদানের প্রাথমিক উন্মেষ ধরিতে পাওয়া যাইবে। যে আব-হাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মানুষ হইতেছিলেন, তাহা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তি এবং অন্য প্রমাণের সাহায্যে গ্রন্থকার বেশ সরস ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার "প্রভাত-রবি" পড়িতে পড়িতে, মনে হয় যেন উপন্যাস পড়িতেছি। যে সময়ের কথা লেখক বলিতেছেন এবং যে মহাপুরুষের চরিত্র তিনি অঙ্কিত করিতেছেন তাহা যেন জীবন্ত হইয়া চোখের সামনে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে শিক্ষা পাইয়া উঠিতেছিলেন, তাঁহার শিক্ষক ও সঙ্গীরা কে এবং কেমন ছিলেন, তাঁহারা কিরূপে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ রবীন্দ্রনাথের জীবনে কার্যকর হইয়াছিল, কল্পনাকুশল ঐতিহাসের অনুকল্পনাময় দৃষ্টির সাহায্যে লেখক তাহার অনেকখানিটাই পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মানসিক ও সাংস্কৃতিক জাগৃতি ও প্রগতির বেশ মনোজ্ঞ ছবি ইহাতে পাওয়া যাইবে। ইহাতে তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের রচিত অনেকগুলি কবিতা প্রসঙ্গতঃ আনিয়া লেখক পুস্তকখানির উপযোগিতা আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। বইখানি মোটের উপরে বাঙ্গালাভাষায় একটু নূতন ধরণের জিনিস—আমার তো পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে ফরাসী লেখক Andre Maurois-এর বিখ্যাত পুস্তক, ইংরেজ কবি Shelleyর জীবন কথা লইয়া লেখা Ariel 'আরিয়েল'-এর কথা মনে হইতেছিল। শ্রীযুক্ত বিজন বাবু বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক; এই ধরণে রবি-কথা সম্পূর্ণ করিতে পারিলে, এবং পরে বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্য বড় বড় দুই চারিজন লেখক সম্বন্ধে এই ধরণের বই লিখিতে পারিলে তাঁহার দ্বারা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের জীবনী রচনার দিক্‌টা একটু নূতন ভাবে পূর্ণ হইবে, এবং ছাত্র ও পাঠক-সমাজ উভয়েই উপকৃত হইবে—এই ভাবে মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠ সাধকদের জীবনী ও বাণী সকলের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া তিনি ধন্য হইবেন, আমাদেরও ধন্য করিবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

(১) **জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার** (২) **বিশ্বের উপাদান**। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(৩) **কুটির শিল্প**। শ্রীরাজশেখর বসু। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা; বিশ্বভারতী।

আট আনা মূল্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে অন্যূন একখানি বই বাংলাভাষায় প্রকাশ করার যে আয়োজন বিশ্বভারতী করেছেন তাতে কত প্রশস্তরূপে যে বিষয় নির্ব্বাচন হয়েছে উক্ত বই তিনটিই তার সাক্ষ্য বহন করছে। বই বললে বোধ হয় ভুল হতে পারে; পুস্তিকা, প্রায় ৪০।৪৫ পৃষ্ঠা পরিসর কিন্তু প্রত্যেক পুস্তিকা যেমন যোগ্যতম গ্রন্থকার দ্বারা রচিত তেমনি সুসম্পূর্ণ। চারুবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ বিদ্যার পূর্ব্বতন অধ্যাপক। তিনি পদার্থ বিদ্যার যাবতীয় বিষয় অধ্যাপনায় যেমন সিদ্ধ তেমনি ঐ বিষয়ে নানাবিভাগের তথ্য বাংলাভাষায় ব্যাখ্যানেও প্রথিতযশস্বী। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান সাক্ষাত জ্ঞান। বিশ্বের উপাদান, ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রন প্রভৃতি অতি দুরূহ অথচ রোমাঞ্চকর প্রসঙ্গগুলি তিনি যেমন প্রাঞ্জল এবং ঋজুভাবে বুঝিয়েছেন তা বাস্তবিকই অনন্যসাধারণ। এই পুস্তিকা পড়ে নিশ্চয়ই যে কোন পাঠক বিশ্বের উপাদান সম্বন্ধে চলতি-জ্ঞান সম্যকভাবে লাভ করবেন। অল্প পরিসরে সকল কথা বলা সম্ভব নয়, সুতরাং নিগূঢ় কথা অনেক অব্যক্ত রয়ে গেছে। এক বিষয়ে আমরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন মনে করি,—হাইড্রোজেন অণুর ওজন বা ভর দেওয়া আছে এক স্থানে ১·০০৮, অন্যত্র ১·০০৭৭ আবার এক স্থানে ১·০০৭৪। পাঠকের এতে বিভ্রম হবে যে কোনটি ঠিক। আমরা যতদূর জানি, ওজন ১·০০৮১৩। এ রকম নিউট্রনের ওজন দেওয়া আছে ১·০০৬৭; আমাদের জানা আছে ওজন ১·০০৮৯ হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশী। চারুবাবুর লেখায় আছে নিউট্রন—প্রোটন ও ইলেকট্রনের যোগফল, কিন্তু আধুনিক কালে আবার অনেকে মনে করেন ঠিক ও রকম নয়, নিউট্রন ভেঙে প্রোটন ও ইলেকট্রন বহির্গত হয়। এসব সামান্য খুঁটিনাটি মাত্র এবং এ ব্যাপারে নিত্যই নূতন

তথ্যের আবিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু চারুবাবু যে অভিনব কৌশলে বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন তা স্বল্প পরিসর ইংরাজী বইয়েও মেলা দুষ্কর। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি অনেক স্থানে স্বয়ং জগদীশচন্দ্রের আপন উক্তি তুলে দিয়েছেন। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার প্রধানতঃ দ্বিমুখী—এক তিনি রেডিও সাহায্যে বিনা তারে বার্ত্তা প্রেরণ কৌশলের পথপ্রদর্শক। তাঁর সৃষ্ট Electromagnetic wave মাপে আজও কনিষ্টতম হয়ে খ্যাতি বজায় রেখেছে। তাঁর দ্বিতীয় আবিষ্কার প্রাণী ও তথাকথিত প্রাণহীনের মধ্যে সেতুবন্ধন। পাঠকবর্গ চারুবাবুর বই পড়ে এ বিষয়ে পরম প্রীতিলাভ করবেন।

কুটিরশিল্প সম্বন্ধে রাজশেখর বাবুর বই অতি মনোরম। রাজশেখর বাবু শিল্প সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞ। ভারতের নানারূপ শিল্প ও জীবিকার জন্য শিল্প নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পুস্তিকাটিকে মূল্যবান করেছে। ভারতের প্রাচীন শিল্প চিরপ্রসিদ্ধ; অনেক শিল্প এখন হৃতদর্ব্বস্ব, আবার অনেক নতুন কুটিরশিল্প প্রচলিত আছে। রাজশেখর বাবু লিখেছেন, "অনেক দরিদ্র ব্যক্তি জীবিকা হারিয়েছে ও মোটের উপর দেশের অর্থ বৃদ্ধি হয়নি।" এ বিষয়ে কৌতূহলী পাঠক আরও অনেক কথা জানতে চাইবে। শিল্পী যদি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় তবে শিল্প লুপ্ত হয় কি? পায় না, বোধ হয় মহাজনের কৃপায়। মহাজনের কাম্য মধ্যস্থতার মুনাফা, শিল্প নষ্ট হোক ক্ষতি নেই। এর মিমাংসা কোন পথে?

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।